LIMON

দি অটোমান সেঞ্চুরিস

দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অব দ্য তার্কিশ এম্পায়ার

মূল : লর্ড কিনরস

অনুবাদ : জেসি মেরী কুইয়া

৩টি মহাদেশ বিস্তৃত অটোমান সাম্রাজ্যের ৬০০ বৎসরের ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির এক প্রামাণ্য দলিল অটোমান সেঞ্চুরিস। সে সময়কার অটোমান রাজবংশের শৌর্যবীর্যের নিকট বনেদী ইউরোপিয়ান রাজবংশগুলো ছিল খুবই মলিন। প্রথমদিকে অত্যন্ত সফল এই রাজবংশের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা ছিলেন অলস, একগুঁয়ে ও বদমেজাজী—চলতেন নিজেদের ইচ্ছামত।
এভাবে এক সময় তারা নিজেদেরকে হারেমের মধ্যেই আবদ্ধ করে ফেলে এবং বহির্বিশ্বে কি ঘটছে সে ব্যাপারে থাকে চরম উদাসীন। সময়ের আবর্তনে অটোমান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়া নিয়ে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র আর অন্যদিকে বিশ্বের অপর অংশে অমুসলিম আগ্রাসন চাঙ্গা হতে থাকে। এক সময় এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন হয়। লেখক বইটি লিখতে অটোমান সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনার পাশাপাশি নিজে ভ্রমণ করেছেন তুরস্ক ও বলকান অঞ্চল। লেখক তার বইটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন অটোমানদের ৬০০ বৎসরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং কীভাবে এ বিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটল তার এক অসামান্য দলিল অটোমান সেঞ্চুরিস।
শিক্ষাজীবনে এবং ব্যক্তিজীবনে যারা পাঠ্য হিসাবে অটোমান কিংবা বাইজেন্টাইন ইতিহাস পড়েননি তাদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ বই; যা পড়ে অটোমান সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

দি অটোমান সেঞ্চুরিস
দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল
অব
দ্য তার্কিশ এম্পায়ার

দি অটোমান সেঞ্চুরিস
দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল
অব
দ্য তার্কিশ এম্পায়ার

মূল লর্ড কিনরস

অনুবাদ জেসি মেরী কুইয়া

রোদেলা প্রকাশনী

দি অটোমান সেঞ্চুরিস
দা রাইজ অ্যান্ড ফল
অব
দা তার্কিশ এম্পায়ার
মূল লর্ড কিনরস
অনুবাদ জেসি মেরী কুইয়া

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৪

রোদেলা ২৯৩

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
সেল ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মুল বইয়ের প্রচ্ছদ অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭ ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

The Ottoman Centuries the Rise and Fall of the Turkish Empire
Origine Lord Kinross Auther of Ataturk.
Translated by Jasy Mary Quiya.
First Published *Ekushe Book Fair 2014*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. 500.00 only US $ 10.00
ISBN : 978-984-90630-9-4 Code : 293

অনুবাদকের উৎসর্গ
হলিক্রস কলেজে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
ফৌজিয়া সুলতানা

লর্ড কিনরস ও অটোমান সেঞ্চুরিস

বৃটিশ স্কটল্যান্ডের এক বনেদী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী জন প্যাট্রিক ডগলাস বালফোর (John Patrick Douglas Balfour) পারিবারিক উপাধির কারণে পরিচিত তৃতীয় ব্যারন কিনরস (3rd Baron Kinross) নামে। স্কটিশ রাজনীতিবিদ ও আইনবিশারদ এবং লর্ড অব দি কোর্ট অব দি সেশন (Lord of the Court of the Session) জন বালফোরের (John Balfour) পৌত্র তৃতীয় ব্যারন ছিলেন একজন সুলেখক, সাংবাদিক ও কূটনীতিবিদ। লেখক হিসাবে তিনি লর্ড কিনরস (Lord kinross) নামেই সমাধিক পরিচিত।

২৫ জুন ১৯০৪ সালে স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন প্যাট্রিক বালফোর। পড়াশোন করেন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত উইনচেস্টার কলেজে—পরবর্তীতে অক্সফোর্ডের বালিয়ল কলেজে। উচ্চশিক্ষিত বালফোর প্রথম জীবনে মৌলিক লেখালেখির কারণে বিখ্যাত হওয়ার পরও—পরবর্তীতে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমির উপর লেখালেখি শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ এয়ারফোর্সের কর্মকর্তা প্যাট্রিক বালফোর যুদ্ধপরবর্তীকালীন সময়ে বৃটিশ দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারীর পদে চাকরী নিয়ে কায়রো চলে আসেন। সাংবাদিক হিসাবে তুরস্ক ও অটোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে বিশদ ধারণা থাকলেও এখানেই তিনি অটোমান তথা তুর্কি সংস্কৃতির উপর তিনি বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন এবং পরবর্তীতে অটোমান ও ইসলামিক সংস্কৃতি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেন। ১৯৬৫ সালে রচিত তুর্কি বীর কামাল পাশার জীবনী Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of Modern Turkey তাকে আরো বিখ্যাত করে তুলে এবং একজন অটোমান বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজের আসন স্থায়ী করে নেন।

১৯৩৮ সালে কিনরস, এঞ্জেলা মেরী কুলমে সেইমুর (Angela Mary Culme-Seymour)-কে বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বালফোর কায়রোতে অবস্থানকালে তার স্ত্রী এঞ্জেলা-সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা মেজর রবার্ট হিউইউটের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেন ও তাদের দুটি পুত্র সন্তানও জন্ম দেন। অবশেষে ১৯৪২ সালে প্যাট্রিক বালফোর ও এঞ্জেলা ডির্ভোসের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের ইতি টানেন। এই বিয়ে ভাঙ্গার আরেকটি বড় কারণ বালফোর নিজে, কারণ তিনি ছিলেন

সমকামী। প্যাট্রিক বালফোর ও এঞ্জেলার কোন সন্তান ছিল না। ১৯৪৯ সালে তার প্রথম গ্রন্থ The Ruthless Innocent প্রকাশিত হয়। এঞ্জেলা কুলমে সেইমুরের জীবনের নানা ঘটনাবলি নিয়েই এই গ্রন্থটি রচিত।

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত গ্রন্থ Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire। এই বিখ্যাত গ্রন্থটিতে তিনি ১৩০০ সালের দিকে প্রথম ওসমান প্রতিষ্ঠিত অটোমান সাম্রাজ্যের শুরু হতে ১৬ শতকের সুলেইমান দি গ্রেট এর সেনাবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য বিজয় যাত্রাসহ তুর্কি বীর কামাল পাশা কতৃক সুলতান চতুর্থ মাহমুদকে নির্বাসনে প্রেরণ করা পর্যন্ত—অত্যন্ত সুনিপুনভাবে বর্ণনা করেছেন। একই সাথে অটোমান নিষ্ঠুর সুলতানদের কার্যকলাপের পাশাপাশি—সেখানকার সুদৃঢ় অর্থনীতি-রাজনীতি—সামাজিক বিষয়গুলোও তার বর্ণনাতে বাদ যায় নি।

এই বইটিতে কিনরস একটি বিষয় খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—তা হল অটোমান সাম্রাজ্যে পশ্চিমা ইউরোপ ও আমেরিকান প্রভাব এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি কিভাবে তুর্কী সংস্কৃতিতে স্থায়ী আসন গেড়ে নেয় তার বাস্তব বর্ণনা। অটোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার বিষয়টিকে অধিকাংশ পশ্চিমা লেখকগণই বাঁকা চোখে দেখেছেন এবং তাদের অনেকেই তা খানিকটা নিজের মতো করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কিনরস এ পথে যান নি, তিনি সত্যটাই অকপটে স্বীকার করেছেন যে বলকান অঞ্চলের খ্রিস্টানরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এর বড় কারণ ছিল তৎকালীন সময়ে এ সকল অঞ্চলের দুর্নীতিপরায়ণ খ্রিস্ট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মের নামে ভন্ডামি ও অনাচার। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন—সে সময় ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্ম একটি সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং যার সাথে ঈশ্বর ও যিশুখ্রিস্টের ছিল অনেক ফারাক। অটোমান শাসনামলে খ্রিস্টানদের জন্য এটি একটি সজাগ হওয়ার জন্য এলার্মের মতো ছিল—তা সত্য হলেও খ্রিস্টান নেতারা মোটেও সজাগ হন নি।

কিনরস শুরু করেছেন অটোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনকারী ওসমানের পিতা আর্তঘরুল বে থেকে, আর তারপর পাঠকদেরকে নিয়ে গিয়েছেন ৩৫জন অটোমান সুলতানের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির দিকে। তবে এ গ্রন্থে তিনি আর্তঘরুল ও ওসমান সম্পর্কে খুব একটা বর্ণনা করেন নি, তার বর্ণনায় প্রাধান্য পেয়েছে অটোমান সুলতান, যারা ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১4 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দাপটের সাথে পৃথিবীর তিন মহাদেশ বিস্তৃত—অটোমান সাম্রাজ্যকে শাসন করেছেন।

অটোমান শাসনামলের প্রথম ১০ সুলতান প্রায় ৩০০ বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে নিজেদের ছোট রাজ্যটিকে

সাম্রাজ্যে পরিণত করেন এবং এ বিস্মৃতি ও শৌর্য বীর্যের চূড়ান্তে পৌছে সুলতান প্রথম সুলেমান বা সুলেইমান দি ম্যাগনিফিসিয়েন্ট এর আমলে।

১৫৬৬ সালে এসে ওসমানীয় রক্তের শান একটু একটু করে কমতে থাকে। সুলেইমান পুত্র সুলতান সেলিমের আমলে (১৫৬৬-১৫৬৭) সাম্রাজ্যের ধীর গতিতে পতন শুরু হয়, তার অন্যতম বড় কারণ ছিল সেলিম—যিনি মদ্যপ সেলিম নামে পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি ভাই হত্যার প্রচলিত নিয়মের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। নতুন সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেই তার আপন ভাইদের হত্যা করতেন—যাতে করে তার সিংহাসন প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন ও সুরক্ষিত থাকে । যদিও ভাই হত্যার এ প্রথা প্রচলন করেন সুলতান প্রথম বায়েজীদ (১৩৮৮)—কিন্তু এটিকে স্বীকৃত প্রথা হিসাবে প্রচলন করেন সুলতান বিজয়ী বীর দ্বিতীয় মাহমুদ। দ্বিতীয় মাহমুদ কনস্টান্টিনোপোল (ইস্তাম্বুল) বিজয় করার জন্য বিজয়ী বীর খ্যাতি অর্জন করেন। এ বীর যোদ্ধা ইস্তাম্বুলসহ রাজ্যের পর রাজ্য জয় করলেও সিংহাসনকে সুরক্ষিত রাখার বিকল্প উপায় বের করতে না পেরে ভাই হত্যার বিষয়টিকে ডিক্রি জারী করে স্বীকৃতি দেন।

৭টি অধ্যায়ে যথাক্রমে ডন অব এম্পায়ার (Part I: Dawn of Empire) , দি নিউ বাইজেন্টাইন (Part II: The New Byzantium), জেনিথ অব এম্পায়ার (Part III: Zenith of Empire), সিডস অব ডিক্লাইন (Part IV: Seeds of Decline), রাশিয়ান রাইভালরী (Part V: Russian Rivalry), দি এইজ অব রিফর্ম (Part VI: The Age of Reform) এবং দি লাস্ট সুলতানস (Part VII: The Last of the Sultans)—পাঠক জানতে পারবেন ৩টি মহাদেশজুড়ে বিস্তৃতি অটোমান সাম্রাজ্যে ৬০০ বৎসর ধরে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি। এক সময় অটোমান রাজবংশ ছিল পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ—যা ইউরোপের বনেদী রাজবংশগুলোর চেয়েও অনেক বেশি বিখ্যাত। কিন্তু সময়ের আবর্তনে এই বিখ্যাত ও সফল রাজবংশের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা ছিল অলস, একগুঁয়ে ও বদমেজাজী—তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত চলত। এক সময় তারা নিজেদেরকে হারেমের মধ্যেই আবদ্ধ করে ফেলে এবং বহিঃবিশ্বে কি ঘটছে সে ব্যাপারে থাকে চরম উদাসীন এবং একই সাথে অমুসলিম আগ্রাসন চাঙ্গা হতে থাকে এবং এক সময় এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ ১০০ বৎসর—এই বৃহৎ শক্তি কেবল ঘোরের মধ্যেই ছিল–অন্যদিকে ইউরোপিয়ান রাজবংশগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য এনে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপের দূর্বল মানুষ খ্যাত (Sick Man of Europe বনেদী ইউরোপিয়ানরা নিজেদের মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্যকে এ নামেই অভিহিত করত) অটোমান সাম্রাজ্যে নীতিগত ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে প্রথম

বিশ্বযুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটে আর সেখানেই মূলত ইতি টানে ৬০০ বৎসরের অধিককালের তিন মহাদেশ বিস্তৃত অটোমান সাম্রাজ্য।

এই বইয়ে কিনরস, অটোমান হারেমের বাগানের সৌন্দর্য কিংবা সুলতান আহমেদ মসজিদের স্থাপত্যকলার বর্ণনা—এমনকি প্যাট্রোনা হিলের বিদ্রোহের ঘটনার বিবরণও দেন নি। যারা অটোমান সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে গবেষণা করতে চান—তাদের জন্য এটি সবচেয়ে বড় রেফারেন্স গ্রন্থ। লর্ড কিনরস এর অটোমান সেঞ্চুরিস কেবল একটি গ্রন্থই নয়—নিঃসন্দেহে এটি একটি একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক দলিল।

কিনরসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থদুটি মূলত ভ্রমণ ও সংস্কৃতি বিষয়ক, যার একটি The Orphaned Realm: Journeys in Cyprus প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে এবং ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় Within the Taurus: A Journey in Asiatic Turkey গ্রন্থটি। লর্ড কিনরস অটোমান ও তুরস্ক নিয়ে এতই আগ্রহী হয়ে উঠেন যে তার ১১ গ্রন্থের ৭টি গ্রন্থই *Europa Minor: Journeys in Coastal Turkey* (১৯৫৬), *Atatürk: The Rebirth of a Nation* (১৯৬০), *Atatürk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of Modern Turkey* (১৯৬৫), *Portrait of Egypt* (১৯৬৬), *Hajia Sophia (Wonders of man)* বিষয়বস্তুই অটোমান ও তুরস্ক বিষয়ক। তা ছাড়া কিনরসের The Orphaned *Realm: Journeys in Cyprus* (১৯৫১) বইটির বৃহৎ অংশ জুড়েই রয়েছে অটোমান সাইপ্রাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

কিনরসের অপর ৩টি গ্রন্থ হল *The innocents at home* (১৯৫৯), *Windsor Years: The Life of Edward, as Prince of Wales, King, and Duke of Winsor* (১৯৬৭) ও *Between Two Seas: The Creation of the Suez Canal* (১৯৬৮)

৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে তিনি মারা যান।

আশরাফ উল ময়েজ
লেখক, গবেষক

সূচিপত্র

সূচনা

বহু শব্দাব্দি ধরে্ই তুর্কিস্তান আর এর আশপাশ সংলগ্ন চীন সীমানা থেকে উচ্চ ইউরেশিয়ানের অনূর্বর ভূমির পশ্চিম দিক বরাবর যাযাবর বা গৃহহীন মানুষরা চলাচল করত। এদের বেশির ভাগেরই পেশা ছিল পশুপালন ও দেখাশোনা, উট চালানো ও ঘোড়া পালন করা। এরা একত্রে তাঁবুতে বাস করত। গোত্রের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক পশু লালন-পালন করত। যার মাধ্যমে নিজেদের খাবার আর কাপড়ের সংস্থানও করত। আর এভাবেই বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী পশু পালন করত। আর সময়ে সময়ে আরো ভালো বাসস্থান অথবা পশ্চাদবর্তী কোনো গোত্রের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দল বেঁধে যাত্রা করত। মাঝে মাঝেই তাদের গবাদি পশু থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ শহরের মানুষ বা কৃষিজীবীদের কাছে বিক্রিও করত। আবার মাঝে মাঝে নিজেদের চাষবাষের খাতিরে কোনো নদী বা পানি আছে, এমন জায়গায় বসতি স্থাপন করত। কিন্তু এ রকম খুব কমই হতো। আর এভাবেই একধরনের যাযাবর লোকেরা তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর জন্মসূত্রে পাওয়া প্রকৃতির সাথে যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে গিয়েই গোত্রীয় সমাজ গড়ে তুলেছিল। এর মাধ্যমেই তারা তাদের দক্ষতা, উৎসাহ আর বিভিন্ন প্রথার ব্যবস্থা করত আপাতদৃষ্টিতে সরল সম্মিলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বলশালী হিসেবে পরিচিত ছিল তুর্কিরা। চীনদেশীয় আর অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছে এরা পরিচিত ছিল তূ-কূচ অথবা দুর্কো। একটি যোদ্ধা জাতি যাদের নামকরণ হয়েছে তাদের দেশে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নামানুসারে যেটির আকৃতি দেখতে হেলমেটের মতো (মাথার শিরস্ত্রাণ)। এটি এক অর্থে সুস্পষ্ট যে হান্ (HUN)-দের মতোই তুর্কিরাও মঙ্গোলদের সগোত্রীয় বা সদৃশ, যারা কিনা পরবর্তীতে ফিন (FINN) এবং হাঙ্গেরিয়ান নামে পরিচিত হয়।

খ্রিস্ট্রীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তারা তাদের মতোই আরেক জাতিকে জয় করে নেয় মঙ্গোলিয়া নামক ভূমি শাসন করার অভিপ্রায়ে। আর এভাবেই তারা উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিম বরাবর বিস্তৃত করে তোলে এক যাযাবর সাম্রাজ্য, একে

সর্ববৃহৎ যাযাবর সাম্রাজ্য নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় ঐক্য—খানিকটা কমে গেলেও তাদের মাঝে বজায় ছিল জাতিগত আর ভাষাগত চারিত্রিক সাদৃশ। তাদের পারস্পকি পরিচয়ের চেতনাটি এতটাই দৃঢ় ছিল যে, পৃথিবী, পানি, আগুন আর বাতাসকে পৌত্তলিকতা মতে পূজা করার সময়েও প্রকৃতির এসব শক্তিকে তারা তুর্কি নামেই অভিহিত করত। আর এভাবেই খুব শীঘ্রই সাধারণ পশুপালন বৃত্তির উর্ধ্বে ওঠে তুর্কিরা তাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলে শাসকদের দ্বারা, যারা কি না সাধারণ গোত্রীয় বয়োবৃদ্ধদের তুলনায় ছিল আরো বেশি কিছু। এ শাসকেরা ধীরে ধীরে তাদের চেয়ে নিচু গোত্রদের শাসন করা শুরু করে।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে, যে গোত্রটি পশ্চিম দিকে গিয়েছিল নাম ছিল অগুজ (Oghuz), যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল ধূসর নেকড়ে আর সেলজুক গোত্রের প্রধানরা। তারা সমরকন্দ পৌঁছে পশ্চিম মধ্য এশিয়ায় নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য। একই সময়ে এক নতুন জাতি ইসলামি খলিফা যুগের আরবীয়রা উত্তর আর পূর্বে ছড়িয়ে পড়ে পারস্য সাম্রাজ্য জয় করার জন্য। এদের সামনে তুর্কিদের শক্তি প্রতিহত হয় কিন্তু সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অটুট রয়ে যায়। উভয় গোত্রই তাদের ক্যারাভান যাওয়া-আসা করে এমন রাস্তায় পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে বাণিজ্য করা বজায় রাখে। এ ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের গবাদি পশু আর উৎপন্ন কৃষি দ্রব্য ব্যবহার করত। এভাবেই নবম শতাব্দী পরবর্তী সময় থেকেই তুর্কিরা তাদের পৌত্তলিক বিশ্বাস বর্জন করে ইসলামের দিকে ঝুঁকে যায়।

আরবীয়রা খুব দ্রুতই তুর্কিদের যুদ্ধ কৌশল আয়ত্ত করে নেয় কিছু নৈতিক গুণাবলি যেমন সহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং দূরদর্শিতা ব্যতীত এ ধরনের যাযাবর জীবন তাদের মাঝে জাগিয়ে তোলে যুদ্ধ করার প্রেরণা, স্থানান্তরের অভ্যাস অশ্বারোহণের দক্ষতা, বিশেষ করে ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেও তীর চালানোর মতো দক্ষতা আয়ত্ত করে নেয় তারা।

আব্বাসীয় খলিফা আমলের সেনাবাহিনীতে তুর্কিরা বিভিন্ন পদে আসীন ছিল, দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ দাসেরাও পদমর্যাদা পেয়ে মুক্তি লাভ করত দাসত্ব থেকে। এদেরকে মোসলেম তুর্কি বলা হতো। এভাবে দেখা যায় নবম শতাব্দীর শেষ নাগাদ আরব সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ সামরিক উচ্চপদে আর বিভিন্ন রাজনৈতিক অফিসে মোসলেম তুর্কিরা উচ্চপদে আসীন ছিল। পরবর্তীতে একাদশ শতাব্দীতে যখন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, তখন সেলজুক রাজপরিবার এ শূন্যতা পূরণে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে আব্বাসীয় খলিফা প্রথা অনুসারে, যার মাঝে তুর্ক-

ইসলামিক মূল্যবোধও ছিল। আর পারস্যব্যাপী শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীক হিসেবে বেছে নেয় তীর এবং ধনুক।

মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়া এ সাম্রাজ্যের শাসনাধীন আসে। এভাবেই অনুর্বর ভূমির যাযাবর জাতি এক ধরনের স্থায়ী পরিবেশ লাভ করে।

ইতিহাসের অন্যান্য যাযাবর জাতির তুলনায় হান এবং মঙ্গোলরা— সেলজুক তুর্কিরা জীবনযুদ্ধ মোকাবিলার অধিক মাত্রায় স্থায়ী আর উৎপাদন মনোভাবাপন্ন ছিল। নিজস্ব ঐতিহ্য, প্রথা আর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে, একটি সভ্যতা উৎখাতের মাধ্যমে তারা আবির্ভূত হয় সাম্রাজ্য প্রস্তুতকারীর ভূমিকায়। জাতি গঠনের সাংগঠনিক দক্ষতায় এরা ইতিহাসে ইতিবাচক ভাবনার প্রসার ঘটায় যার ফলে পুরাতন মোসলেম পৃথিবী সামাজিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় আর বুদ্ধিবৃত্তিতে এক নতুন অগ্রযাত্রা শুরু করে। অনুর্বর ভূমির এসব ভেড়াপালক আর যোদ্ধারাই পরিণত হয় শহুরে নাগরিকে। প্রশাসক, ব্যবসায়ী, কারিগর, জমির ক্রয়-বিক্রয়কারী, রাস্তা নির্মাণকারী, বিদ্যালয়, মসজিদ হাসপাতাল স্থাপনকারী, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্ঞানের চর্চার উৎসাহী হয়ে ওঠে, শিল্প এবং সাহিত্যেও উৎসাহী হয়ে ওঠে তারা। এসব ক্ষেত্রে তারা পারস্য আর আরবদের অনুসরণ করা শুরু করে।

তথাপি কেন্দ্রীয় সেলজুক রাষ্ট্রের বাইরে রয়ে যায় এক বিশাল স্বায়ত্তশাসিত তুর্কি জনগোষ্ঠী, যারা তখন পর্যন্ত যাযাবর হিসেবেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। অন্যান্য গ্রাম্য গোত্রদের সাথে যাদের অধিকাংশই ছিল পৌত্তলিক, এরা নির্দিষ্ট দলে যোদ্ধা হিসেবে কাজ করত, যারা ছিল সেলজুক যোদ্ধাদের অংশ। ক্রমে এরা এসে কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের অমার্জিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিরক্ত করা শুরু করে। রাষ্ট্রের বাইরেও একটি পৃথক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এরা। এদের ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি আর ভিন্ন মতবাদ। একত্রে এদের ডাকা হতো তুর্কম্যানস নামে। Turco mans —এ পদবি তাদের মুসলিম উপাদানের কারণেই হয়েছিল।

এদের মাধ্যমেই পরবর্তীতে সূচনা হয়েছিল জনপ্রিয় এক আন্দোলন যাদের পথিকৃৎ ছিল গাজীরা, আন্দোলনের নাম ছিল 'পবিত্র বিশ্বাসের যোদ্ধারা' (Warriors of the faith)। স্বেচ্ছাসেবক, যাদের বেশির ভাগই ছিল ভবঘুরে। অস্থিরমতি, বিদ্রোহী আর চাকরিবিহীন লোকেরা, যাদের প্রয়োজন ছিল সংস্থানের। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল নাস্তিক বা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করা। কিন্তু তাদের প্রধান উদ্দেশ্যেই ছিল লুটপাট করা। ঐতিহ্যগত ভাবে তারা পদাতিক সৈন্য হিসেবে কাজ করত, ইসলামের নামে বিভিন্ন লুণ্ঠন চালাত। একাদশ শতাব্দীতে এসে তারা পশ্চিমে কাজ শুরু করে, এশিয়া মাইনরে সেলজুক রাষ্ট্র আর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মাঝে সীমানাতে তাদের

তৎপরতা ছিল বেশি। এখানে এসে তারা বাধা পায় গ্রিক পদাতিক সৈন্য আর লুণ্ঠনকারীদের কাছে থেকে, যারা ও একইভাবে যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শী এবং কোনো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রধীন নয়। যাদেরকে ডাকা হতো আক্‌রিটাই (Akritai) নামে। এছাড়া তাদের মাঝে আরো বিভিন্ন মনোভাব কাজ করত। যেমন নতুন তৃণভূমি খুঁজে পাওয়া আর গাজীদের সাথে মিশে নতুন নতুন লুণ্ঠন কাজে অংশ নেয়া; কেননা বাইজেন্টাইন শাসন তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

সেলজুক সুলতানদের কাছে এটি কোনো নীতির অংশবিশেষ ছিল না যে, কোনো মুসলিম সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ বিজয়ের কাছে মাথা নত করা। এর মাধ্যমে বাইজেন্টাইনের খ্রিস্টিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করার পথ খোঁজা; বরঞ্চ একটি অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব হিসেবেই তারা এতে অংশ নেয় যুদ্ধংদেহী গাজী আর তুর্কমান শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য। তাই সেলজুক সুলতান তুঘরুল পবিত্র যোদ্ধাদের তার মুসলিম প্রদেশসমূহ লুণ্ঠনের চেয়েও আর্মেনীয়ার খ্রিস্টিয়ান রাজ্যের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। আর এই যুদ্ধে তাদের সফলতার ফলে লুণ্ঠনের মাত্রা এবং সহিংসতা যায় আরো বেড়ে যায়, যেটি ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব থেকে মধ্য আনাতোলিয়ায়।

নিজের রাজ্যের এই ভগ্নদশা ঠেকাতে গিয়ে বাইজেন্টাইন সম্রাট রোমানাস চতুর্থ ডায়জিনিস বাধ্য হন প্রতিহত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। আর্মেনীয়ার শাসন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনি তুর্কিদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। যাদের বেশির ভাগ ছিল ভাড়াটে সৈন্য। ফলস্বরূপ ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে সাম্রাজ্যের পরাজয়ে ঘটে এবং সেলজুক সুলতান আল্প আর্সলান (সাহসী সিং) মানজিকার্ট (Manzikert) এর ঐতিহাসিক সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধ গ্রিকদের কাছে চিরদিনের জন্য ভয়ংকর দিন হিসেবে আখ্যা পায় এবং ঐতিহাসিক একটি সংঘাত। দুটি সাম্রাজ্য এবং দুই ধরনের বিশ্বাসের মধ্যে, যা এশিয়া মাইনরে সারা জীবনের জন্য তুর্কিদের দরজা খুলে দেয়।

মানজিকার্ত-এর যুদ্ধের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরো ভূমির জন্য অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যায়। বর্তমানেও এ যাত্রা অব্যাহত থাকে। আর এর মাধ্যমে সেলজুক রাষ্ট্রের অনিয়মিত সামরিক বাহিনীর কদরও বেড়ে যায়। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব থেকে মধ্য এশিয়া মাইনর পর্যন্ত গাজীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তুর্কমান যাযাবররা কোন সম্মুখ বাধা ছাড়াই নতুন নতুন ভূমিতে প্রবেশ শুরু করে।

জীবন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক ধরনের মিশ্র প্রভাব পড়ে, যা জয়ী এবং বিজিতদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। এমনকি আনাতোলিয়া এবং আর্মেনিয়া বাসীও তুর্কিদের একেবারে বিদেশি হিসেবে গণ্য করত না। এ ক্ষেত্রে পল উইটেক লিখেছেন, ‘শুধু বাইজেন্টাইন বানির্শটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। যেটি

পরবর্তীতে ইসলাম জায়গা করে নিয়েছিল।' সেলজুক রাষ্ট্র নিজেও এতটা তাড়াহুড়ো করেনি। বিজিত সম্রাটকে ছেড়ে দেওয়ার পরে এর শাসকবর্গদেরকে বিভিন্ন জয়ী অঞ্চলসমূহের শাসনভার দেয়া হয় একজন সেলজুক রাজকুমারের অধীনে। সলেমান পরবর্তীতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ক্রুসেডের সূত্রপাত ঘটে। এভাবেই মুসলিম এবং খ্রিস্টিয়ানদের মাঝে ব্যবধান গড়ে ওঠে।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের আগ পর্যন্ত সেলজুক রাষ্ট্র এশিয়া মাইনর গঠনে হাত দেয়নি। এরপর তারা পুরাতন মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বের হয়ে এশিয়া মাইনর গঠনে হাত দেয়। মধ্য আনাতোলিয়াকে কন্যা শহরে রাজধানী স্থাপন করে মুসলিম ধারায় এবং একটি সুস্থির গঠনের ভিত্তিতে নিজের সুলতানদের দ্বারা শাসন শুরু করে। অন্যান্য মুসলিম শক্তিদের কাছে তাদের বংশধারা পরিচিতি পায় রূমের সালতানাত নামে (Sultanate of Rum), আরবীয় ভাষায় এর অর্থ 'রোমের সিজার' বাইজেন্টাইন খ্রিস্টিয়ানররা।

মিরিত্তখেপালন, যুদ্ধের পর মানজিকার্ত এরও শতবর্ষ পরে) পশ্চিম আনাতোলিয়া শাসন করত। একটি সম্মিলিত সেলজুক রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ অবস্থান ছিল এর ভিত্তি। এভাবেই রূম সেলজুকরা ইসলামকে সাথে নিয়ে প্রভূত সম্মান অর্জন করে এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে পারস্যের বিখ্যাত সেলজুক পরিণত হয়। ক্রমেই এরা একটি সমৃদ্ধশালী ও উন্নত শক্তিতে পরিণত হয়, যা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে সাফল্যের শীর্ষচূড়া স্পর্শ করে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় একটি স্থায়ী হয়নি। এ পর্যায়ে এসে তাদেরকে মোকাবিলা করতে হয় অনেকটা তাদেরই স্বগোত্রীয় যাযাবর জাতি মঙ্গোলদের। তুর্কিদের মতোই এরাও ইউরেশিয়ান অনুর্বর ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর হয়ে রাশিয়াতে, পূর্ব দিকে চীনে এবং পশ্চিম দিকে এশিয়াতে এসে মঙ্গোলরা মুসলিম বিশ্ব অধিকার করতে চায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চেঙ্গিস খান আক্রমণের সূচনা করেছিল আর পরবর্তীতে তার-ই বংশধরাও একই কাজ করে। তুর্কি যাযাবর জাতিরা মঙ্গোলদের আগেই এ অংশে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তারপর তুর্কমান আর ছোট ছোট যোদ্ধা জাতি এশিয়া মাইনর জুড়ে সেলজুক রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ দেখা দেয়। এদেরই পথ ধরে আসে ভয়ংকর মঙ্গোল সেনাবাহিনী। ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলরা তখন পর্যন্ত অজেয় সেলজুক্ সেনাবাহিনীকে রুখে দেয়, কো দা (Kose Dagh) নামক জায়গায় বাইজেন্টাইন সহায়তায় ও সাধারণ ভাড়া করা সৈনিকদের মাধ্যমে সেনাবাহিনী গড়ে তোলে আর যত শহর পর্যন্ত তা জয়ে এগিয়ে যায়। এর ফলে মাত্র এক দিনেই এশিয়া মাইনরের ইতিহাসের সম্পূর্ণ পথ বদলে যায়। সেলজুক রূম সালতানাতের শক্তি, পারস্যের বিখ্যাত সেলজুক কারো শক্তিই আর স্থায়ী হতে

পারেনি। কন্যার সুলতান পরিণত হয় মঙ্গোলদের প্রজা রাষ্ট্রে, যার অভিভাবক নিযুক্ত হয় হুলাগু (Hulagu)। তারপরে মঙ্গোলদের শক্তিও এশিয়া মাইনরের অন্যান্য যাযাবর জাতির মতোই ক্ষণস্থায়ী ছিল।

ইতিমধ্যে এশিয়া মাইনরের সামগ্রিক অংশই পুরাতন সীমানাময় সভ্যতায় ফেরৎ যায়। সেখানে কেন্দ্রীয় শাসক ছিল স্বাধীন। বাইজেন্টাইনের সম্মুখ দিক দিয়ে পদাতিক সৈন্যরা পূর্বের মতোই আবারো লুণ্ঠনকাজে মেতে ওঠে। এমনকি কোনো বাধা ছাড়াই বিভিন্ন শহরও দখল করে নেয়। কয়েক দিনের মাঝেই এদের সাথে এসে জড়ো হয় তুর্কমান গোত্রীয় লোক আর এমনকি সেলজুক রাষ্ট্র থেকে আগত শরণার্থীরা। এছাড়া শেখ (Sheikh) এবং দরবেশ শ্রেণীর মানুষরাও এসে জুটে যায়, যারা তুর্কিস্তান আর পারস্য থেকে পালিয়ে এসে এশিয়া মাইনরে স্থান নেয় আর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত তুর্কিদের যুদ্ধে একমত পোষণ করে।

ক্ষমতা এসে কেন্দ্রীভূত হয় গাজীদের হাতে। বাইজেন্টাইন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নতুন নতুন অঞ্চল আর লুণ্ঠনের জন্য, এমনকি ভ্রাতৃপ্রতিম শত্রু আকরিতাই (Akritai) রাও গাজীদের বাধা দিতে পারেনি। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অরক্ষিত গ্রিক শক্তির কাছ থেকেও কোনোরূপ বাধা ছাড়াই গাজীরা পশ্চিম এশিয়া মাইনরে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সমস্ত অঞ্চলের ভাগ বাটোয়ারা করতে গিয়ে গোত্রপ্রধানরা নিজেদের মাঝে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে এ প্রধানরা হয়ে ওঠে মোটামুটিভাবে গাজী মতবাদের ধারক এবং বাহক। এদের মাঝে অন্যতম ছিল ওসমানীয় মতবাদ (Principality of Osmarm) পরবর্তীতে যা অটোমান সাম্রাজ্য হিসেবে অন্যতম বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হয়। এর ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শূন্যস্থান পূর্ণ হয় আর এর অধীনে শাসিত হয় পরবর্তী ছয়টি শতাব্দী।

অধ্যায় এক

সাম্রাজ্যের সূর্যোদয়

॥ ১॥

অটোমান রাজবংশের প্রথম দিকটার ইতিহাস ঢেকে আছে বিভিন্ন পৌরাণিক কল্পকাহিনীতে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতও প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিকভাবে এর প্রতিষ্ঠাতা আর্তঘরুল নামে একজন গোত্রপ্রধান। এশিয়া মাইনরে অভিবাসনের সময় তিনি মাত্র চারশ ঘোড়সওয়ার সাথে করে নিয়ে আসেন। পথিমধ্যে দুই অজানা দলের মাঝে বিবদমান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু অজানা হলেও নিজের লোকদের পরামর্শে বিজিত শক্তিকে সহায়তা করার জন্য মনস্থির করেন। এর ফলে তারা জয়লাভ করে। পরবর্তীতে জানা যায়—এই দলটি ছিল সেলজুক, রাষ্ট্র কন্যার সুলতান আলা-এদ-দিন এর বাহিনী। যারা মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে লড়ছিল। এর ফলে খুশি হয়ে আল-এদ-দিন আনাতোলিয়ার পশ্চিমে সুগতে গ্রীষ্ম আর শীতের বসবাসের উপযোগী জমি পুরস্কার দেন আর্তঘারুলকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আর্তঘরুল সুলতানকে আরেকটি যুদ্ধে জয়ী হতে সহায়তা করে। এই পর্যায়ে যুদ্ধটি ছিল গ্রিকদের বিরুদ্ধে। এভাবেই অটোমান বংশের সাথে রাজশক্তির বৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে সুলতান স্বয়ং আর্তঘরুলের পুত্রসন্তান ওসমানকে সার্বভৌমত্বের চিহ্ন প্রদান করেন, বাদ্য আর ব্যানারের আদলে।

এছাড়া আরো কিছু কল্পকথা প্রচলিত আছে এ ক্ষেত্রে। যেমন—আর্তঘরুল ও তাঁর সন্তান ওসমানের স্বপ্ন। বলা হয়ে থাকে যে, ওসমান এক রাত্রে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিমের বাড়িতে রাত কাটান। নিদ্রার পূর্বে এই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ওসমানকে একটি বই দিয়ে যায়। বইয়ের ওপরে নাম পড়তে গিয়ে ওসমান প্রতিউত্তর পান যে, "এটি কোরআন। ঈশ্বরের বাণী, যা তিনি তাঁর নবী মোহাম্মদের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রকাশ করেছেন।" ওসমান পুস্তক পাঠ শুরু করেন এবং সারা রাত্রি দাঁড়িয়ে থেকে পাঠ করে যান। ভোর বেলা এসে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। মুসলমানদের মতে যেটি নবীকে স্বপ্নে দেখার আসল সময়। ঘুমের মাঝে একজন দেবদূত আসেন ওসমানের কাছে। আর উচ্চারিত হয় এই বাণী

"যেহেতু তুমি এতটা শ্রদ্ধা ভরে আমার বাক্য পাঠ করেছো, তোমার সন্তান এবং তাদেরও সন্তানেরা যুগযুগান্তর ধরে সম্মানপ্রাপ্ত হবে।"

পরবর্তী স্বপ্নে আছে এক নারী। যার নাম মালকাতুম, যিনি শীঘ্রই ওসমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কথা। মালকাতুম পাশ্ববর্তী এক গ্রামের বিচারকের কন্যা। বিচারকের নাম শেখ ইদেব আলী। দুই বছর যাবৎ বিবাহে দ্বিমত পোষণ করে আসছেন। এর পরে ওসমান আরেকটি স্বপ্ন দেখতে পান। স্বপ্নে ওসমানের পাশে ঘুমন্ত শেখের বুক চিরে চাঁদ ওঠে, যেটি তাঁর সমগ্র বুক ঢেকে ফেলে। তারপর ওসমানের কোমর থেকে জন্ম নেয় এক বৃক্ষ। যেটি এক পর্যায়ে সমগ্র বিশ্ব ঢেকে ফেলে এর সুন্দর সবুজ শাখা-প্রশংসা দিয়ে। এর নিচে ওসমান দেখতে পান চারটি পবর্তমালা—ককেশাস, মানচিত্র, বৃক্ষ রাশি এবং বলকান অঞ্চল। এর শিকড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে চারটি নদী। তাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস, নীল এবং দানিয়ুব। শস্যভরা মাঠের পর মাঠ, জঙ্গলে পূর্ণ পাহাড়। উপত্যকার ওপর শহরজুড়ে পিরামিড, সুউচ্চ টাওয়ার, সমাধি সৌধ ঢেকে আছে অর্ধচন্দ্র দিয়ে। সুগন্ধযুক্ত শাখা প্রশাখায় বসে নাইটিঙ্গেল আর উজ্জ্বল রঙের তোতা পাখি।

এই গাছের পাতা রূপ নেয় তরবারির ফলায়। বাতাস এসে কনস্টান্টিনপোলের দিকে নির্দেশ করে; যেটি অবস্থিত দুটি সমগ্র ও দুটি মহাদেশের মাঝখানে, মনে হয় যেন দুটি ম্যাপায়ার ও দুটি এমেরাল্ডের মাঝখানে হীরার পর্বত আর এভাবেই পরিণত হয় একটি মূল্যবান আংটির পাথরে, যা ঘিরে আছে পুরো পৃথিবী। ওসমান আংটিটি তাঁর হাতে পরতে যান আর ঠিক সেই সময়ে ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ইদেব আলীর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা পান ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে। ফলস্বরূপ ইদেব আলী নিজের কন্যার সাথে ওসমানের বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যান। অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় সত্যিকারের বিশ্বাস আর কঠিন প্রথার সাথে একজন দরবেশের মাধ্যমে। যার জন্য ওসমান পরবর্তীতে একটি প্রার্থনার স্থান নির্মাণ করেন।

এই দুই কাহিনীর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওসমান ও তাঁর লোকেরা বসতি স্থাপনের প্রথম দিকেই মুসলিম ছিলেন না। একাদশ শতাব্দীর পর থেকে এশিয়া মাইনরে আগত তুর্কিরা আরব সমাজের সাথে তাদের পূর্ব সম্পর্কের কারণে মুসলিম ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে যে দ্বিতীয় প্রবাহ শুরু হয় তাদের বেশির ভাগ ছিল পৌত্তলিক। আর ধারণা করা হয় অটোমান-রাও এদের অনুসারী ছিল। এদের বেশির ভাগই ছিল শরণার্থী, যারা মঙ্গোল পৌত্তলিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এদের মাঝে অনেকেই পূর্বাঞ্চলে রয়ে গিয়েছিল এবং সম্ভবত মঙ্গোলরা চলে যাবার পরে নিজেদের অঞ্চলে ফেরত চলে

গিয়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগই ছিল যুদ্ধ মনোভাবাপন্ন, যারা সেলজুকদের ভূমিতে গিয়ে হামলা করে।

এদের মাঝেই ছিল অটোমানরা, যারা পরবর্তীতে সুলতান আলা-এদ-দিনের অনুগ্রহ লাভ করেছিল। সুলতান অটোমানদের নিজের সেনাবাহিনীতে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে না রেখে বরঞ্চ সীমান্তবর্তী বিবদমান অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। সেখানে অটোমানদের কাজ ছিল আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখা অথবা বাইজেন্টাইন গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের নব্য প্রাপ্ত ক্ষমতা ব্যবহার করা। আর এখানেই সবচেয়ে সম্ভাবনা বেশি বলা যায় যখন আর্তঘরুল এবং ওসমান ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এভাবেই অটোমান জাতি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। যাদের মাঝে একাধারে ছিল যাযাবরদের চারিত্রিক গুণাবলি আর তুর্কিমানদের মতো পদাতিক যোদ্ধার বৈশিষ্ট্য আর জয়ীর প্রতি সামরিক সম্মাননা দেয়া, অবিশ্বাসী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইত্যাদি।

একটি জনগোষ্ঠী যারা নিজেদেরকে শুধু তুর্কি মনে করত না— সাধারণভাবে যেখান তুর্কিস্তানের অধিবাসীদেরকেই তুর্কি বলা হতো। কিন্তু ওসমান অনুসারীরা তাদের তুর্কি প্রতিবেশীদের তুলনায় বেশ কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। অটোমানদের অঞ্চলটিই ছিল সেসব দশ রাষ্ট্রের একটি যারা সফলভাবে সেলজুক সাম্রাজ্য এবং মঙ্গোলদের প্রতিহত করতে পেরেছিল। কিন্তু দশ অঞ্চলের মধ্যে এটিই ছিল ক্ষুদ্রতম। অটোমানরা তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিকভাবে ভূতাত্ত্বিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম কোনে স্থায়ী হওয়ার পেছনে অটোমানদের কারণ ছিল সহজেই সমুদ্রপথে যাত্রার সুবিধা আর এর পেছনেই ছিল ইউরোপের বলকান অঞ্চল।

পদাতিক সৈন্যদের মাঝে অটোমানরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে। কেননা সামরিক অভিযানের ফলাফলকে একটি কার্যকর রাজনৈতিক গঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তারা।

ওসমান একজন প্রশাসক হিসেবে ততটাই দক্ষ ছিলেন যতটা ছিলেন একজন সৈনিক হিসেবে। এক্ষেত্রে সাহায্য পেয়েছিল শ্বশুর ইদেব আলীর কাছ থেকে। ওসমান ছিলেন জ্ঞানী এবং সহিষ্ণু শাসক। অনুসারীরা যাকে শ্রদ্ধা করত মান্য করত যোদ্ধা হিসেবেই শুধু নয়, ইসলাম থেকে প্রাপ্ত অর্ধস্বর্গীয় মর্যাদার জন্যে নয় বরঞ্চ নিজের লোকদের প্রতি ধীরস্থির এবং সহনশীল শাসক হিসেবে। প্রকৃতিগতভাবেই ওসমানের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল যে তিনি আধিপত্যের নামে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতেন না। আর এই কারণে ওসমানের আশপাশের সবাই ছোট অথবা বড় তাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাদের মাঝে কোনো সংঘর্ষ ছিল না। কেবল বিশ্বস্ততা। অনুসরণকারীরা ওসমানের সাথে কাজ করত ও তাকে

মান্য করত শান্তিপূর্ণভাবে। আর এভাবেই এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি এর সামাজিক ঐক্য বিধান করেছিল এবং যার ফলে স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল। এরই মাঝে নিজেদের সেনাবাহিনীর গঠন করে নিজেরাই বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করত। আর সেখানে প্রয়োজনে এদের নরজদারি করত নেতারা।

সত্যিকারের ধর্মীয় উদ্দীপনা ও শুদ্ধি পাওয়ার আশায় ওসমান মতাদর্শ হিসেবে ধারণ করেছিলেন খলিফা ওসমানের মতবাদকে। আর তাই শক্তি এবং সম্পদের ওপরে ন্যায়বিচারকে স্থান দিয়েছিলেন। একই সময়ে শাসন কার্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত সার্বভৌমত্ব। তাই প্রথম দিককার অটোমানরা অন্যান্য সেলজুক মতবাদের মধ্যে রাজবংশীয় সংঘর্ষ থেকে মুক্ত ছিল। নতুন পরিবেশে জীবন শুরু করেছিল; তাদের ছিল ইচ্ছাশক্তি, ধৈর্যও সহিষ্ণুতার মতো গুণাবলি। এভাবেই তারা অর্জন করেছিল যে ভূমিতে শাসন করছে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্য যৌক্তিক ও গঠনগত অভিজ্ঞতা।

ওসমান অনুসারীরা নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে তোলে আর একত্রিত করে বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ীদেরকে। আর সময় যত গড়িয়ে চলে অন্তর্গত বিশৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে ওঠে নতুন জীবন আর ভবিষ্যতের সন্ধান করে। তারা গ্রিকদের সকল প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত দক্ষতা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে আর এভাবেই মৃতপ্রায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এই সীমান্তবর্তী অংশ সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আরো গভীর পড়াশোনা চালিয়ে যায়।

অটোমানরা পূববর্তী আরবীয় অভিযানের জয়ীদের তুলনায় ভিন্নভাবে ধর্মীয় উন্মাদনার ঊর্ধ্বে ওঠে শত্রুদের সাথে ব্যবহার করত। তুর্কিদের তুলনায় গ্রিকদের মধ্যেই বসবাস করত বেশি। ওসমানের প্রতিবেশী গ্রাম আর দুর্গের প্রধান নেতারা ছিল খ্রিস্টান। যাদের সাথে ওসমানের বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় ছিল। কাছের সাথিদের মাঝে ছিল মাইকেল ও মার্কোসের ছেলেরা, তাদের গ্রিক পরিবারসমূহ। যারা কিনা এককালে শত্রু ছিল, তারাই পরবর্তীতে সমর্থনকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর ওসমানের সাথে বন্ধুত্বের খাতিরে পরবর্তীতে তারাও ইসলাম গ্রহণ করে।

অটোমান ভূখণ্ডের মাঝে সাধারণভাবে সব খ্রিস্টানকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান নিজেদের পছন্দেই ইসলাম গ্রহণ করে। কনস্টান্টিনোপলের ক্রমেই প্রশাসনিক অবনতিতে এসব খ্রিস্টান মনে করতে থাকে যে শাসকশ্রেণী তাদের অবহেলা করছে। ফলে বাস্তববুদ্ধি বশত তুলনামূলকভাবে সুশৃঙ্খল ও বিশ্বস্ত ওসমান শাসনামলে ঝুঁকে যায়। আর এর ফলে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ খুলে যায় আর অত্যাচারী কর প্রদানের হাত থেকে বেঁচে যায়। আত্মিকভাবে অর্থডক্স চার্চের ভাঙনের ফলে এসব

দেশীয় গ্রিকরা নতুন বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে যায়। সামাজিকভাবে অটোমানরা তাদের সীমান্তবর্তী প্রতিবেশীদের তুলনায় ততটা ভিন্ন ছিল না যতটা ছিল জীবনযাপনের অভ্যাসের ক্ষেত্রে। এই গ্রিকরাও নিজেদের খুব সহজেই অটোমানদের সাথে মানিয়ে নেয়। ধর্মান্তরিত হোক বা না হোক এটি কোনো বাধা ছিল না। তুর্কি এবং গ্রিকদের মাঝে অসবর্ণ বিবাহ হয়ে ওঠে সাধারণ আর এর ফলে সন্তান জন্মদান ও তাদের লালন-পালনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে একটি মিশ্র সমাজ।

এভাবেই অটোমান তুর্কিরা শুধু যাযাবর নয়; বরং স্রষ্টা এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সময়ের প্রবহমানতায় এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম কোনে এ পার্বত্যঞ্চলে নিজেদের নতুন সভ্যতা স্থাপনের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এশিয়া, ইউরোপ, মুসলিম-খ্রিস্টান, তুর্কি এবং তুর্কমান যাযাবর এবং পরিশ্রমী সবকিছুর মিশ্রণে একটি জনপ্রিয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বাহ্যিকভাবে যা ছিল প্রায়োগিক আর পূর্বের সামন্তবাদী তুর্কি মতবাদের তুলনায় অর্থডক্স সংস্কৃতি ও সামাজিক বিধি-নিষেধ মুক্ত। অটোমানরা ছিল একটি আদর্শ সমাজের নমুনা যাদের লক্ষ্য ছিল বাইজেন্টাইনের মতো হওয়া। যেভাবে সেলজুক তুর্কিরা আরব সাম্রাজ্যের শূন্যস্থান পূরণ করেছিল, যেভাবে বাইজেন্টাইন নিজে রোমে সফল হয়েছিল।

প্রতিবেশীদের বিনিময়ে নিজের রাজ্য বাড়ানোর প্রতি ওসমানের কোনো তাড়াহুড়া ছিল না। ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাঁর পরিকল্পনা ছিল পর্যবেক্ষণ করা এবং অপেক্ষা করা। বেঁচে থাকা এবং শেখা আর এভাবেই ক্রমান্বয়ে বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডে কাজ করা। এশিয়াতে এই বাইজেন্টাইন ভূখণ্ড শাসন করত তিনটি শহর। দক্ষিণে ছিল বার্সা, অলিম্পাস পর্বতের ঢালু থেকে বিস্তৃত সমৃদ্ধ বিথিনিয়ান সমভূমি পরিচালনা করত। মধ্যখানে ছিল একটি হ্রদের মাথায় অবস্থিত রাজধানী নিকাইয়া, উত্তরে ছিল নিকোমেডিয়া বন্দর, কনস্টান্টিনোপলের দিক সমুদ্রপথ নির্দেশ করা দীর্ঘ উপসাগরের মাথায় ছিল এর অবস্থান, এর মাধ্যমে কৃষ্ণ সাগরেও যাতায়াতের সুবিধা ছিল। আর এ সমস্ত জায়গাই ছিল ওসমানের রাজধানী থেকে মাত্র একদিনের পথ। কিন্তু ওসমান প্রথমেই তাদেরকে আক্রমণ করেননি। পূর্বতন গ্রাম্য বিবাদ যা ষাট বছর পূর্বে হয়েছিল আর্তঘরুলের আমলে তারপর অটোমানরা মাত্র ষাট মাইল এগিয়েছে পুরাতন শহর ইসকিস্সেহির থেকে নতুন শহর ইয়েনিস্সেহিরে। এর ফলে অবশ্য নিকাইয়া ও বার্সার মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কিন্তু ওসমান এ ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন যে কনস্টান্টিনোপলের কাছে এ অঞ্চলে শহর রক্ষায় দুর্গ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া

নিজের কিছু দুর্বলতার জন্য ও যথাযথ সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। ইতিমধ্যে তার নিজের বাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি পায়। একদা আর্তঘরুলের আমলের মাত্র ৪০০ যোদ্ধা সময়ের সাথে বেড়ে দাঁড়ায় চার হাজার যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনীতে। এছাড়া সৈন্য সংগ্রহের আরো কিছু উৎস ছিল। যেমন—প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের বেকার সৈন্যরা এদের মধ্যে বস্তুত ছিল গ্রিক সৈন্যরা যাদের বেশির ভাগই দল বদলে প্রস্তুত ছিল। একাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল কনস্টান্টিনোপলের কাছ থেকে পাওয়া অবহেলা, করের বোঝা আর উৎপীড়ন।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম বছরে এসে ক্ষমতায় আরোহণের বারো বছর পরে ওসমান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন কয়ুন হিসারে (Koyun Hisar)। নিকোমিডিয়ার সামনে অবস্থিত একটি উর্বর উপত্যকায় অটোমানদের লুণ্ঠনকাজের মোকাবেলা করতে এসে গ্রিকরা সহজেই হেরে যায় দ্রুত গতি আর তৎপর তুর্কমানদের কাছে। এক সাধারণ তুর্কমান নেতার কাছে রাজ-সেনাবাহিনীর এই পরাজয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে উদ্বিগ্নতা ছড়িয়ে পড়ে। আর এর ফলে ওসমানের অঞ্চলকেও বিবেচনা করা শুরু হয়। এর ফলে তার সুখ্যাতি বেড়ে যায়। আর এই কারণে আনাতোলিয়ার চারপাশে থেকে পবিত্র যোদ্ধারা ওসমানের কর্তৃত্বের ছায়ায় আসতে শুরু করে, গর্বভরে নিজেদের ওসমান অনুসারী পরিচয় দিতে থাকে। ফলে ওসমানের মতবাদ এবার সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এতে উৎসাহী হয়ে ওসমান তৎক্ষণাৎ নিকোমিডিয়ার বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ শুরু করেননি। তার সৈন্যরা নিজেদের চারপাশ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। সাত বছর পার হয়ে যায় যখন ওসমান নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী অনুভব করেন এবং আর্ক হিসারের দুর্গ আক্রমণ করেন। নিকোমিডিয়ার পেছনে সার্কাযা নদীতে আক্রমণ পরিচালনা করেন। আর এই বিজয়ের ফলে অটোমানরা সমুদ্রপথে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা পেয়ে যায়। প্রথমবারের মতো তারা বসফরাসে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে এর পূর্বে কৃষ্ণসাগরের বিভিন্ন সমুদ্রবন্দর ও দুর্গ দখল করে নিতে থাকে এবং অবশেষে কালোলিমিনি দ্বীপ অধিগ্রহণের জন্য মারমারা সাগরে প্রবেশ করে। এভাবে ওসমান বার্সা নিকোমিডিয়া থেকে সমুদ্রযাত্রার পথে বাধা স্থাপন করে।

এমনকি এই দুই শহরের মধ্যবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থাও বাধাগ্রস্ত হয়। একে অন্যের কাছ থেকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরপর স্থলপথে বার্সাকে আক্রমণ করা হয় এবং ১৩২৬ সালে এসে বার্সা অটোমানদের অধিকারে আসে এবং ওসমান মৃত্যুবরণ করেন।

সাত বছরের মধ্যে শত্রুদের হাতে শহরতলী চলে যাওয়ায় কনস্টান্টিনোপলের কাছ থেকে গ্রিক দুর্গসমূহ সহায়তার আশ্বাস হারিয়ে ফেলে। রাজবংশের মঝে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। ফলে সেনাপ্রধান ইভারনস্ অন্যান্য নেতৃত্বস্থানীয় গ্রিকদের সম্মতিক্রমে শহরকে সমর্পণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। এখানে অলিম্পাস পর্বতের উর্বর ভূমিতে অটোমানরা তাদের সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী তৈরি করে। ধীরে ধীরে একে উন্নত করে এবং গঠনরীতি, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি দিয়ে সমৃদ্ধশালী করে তোলে, যা হয়ে ওঠে কলা এবং বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সভ্যতার কেন্দ্র। ইউরোপে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পর এ রাজধানী উঠে অন্যত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু এটি সব সময় ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের পবিত্র শহর। সবকিছুর ঊর্ধ্বে এখানে ছিল ধর্মীয় বিদ্যালয় আর এর ইসলামি আইন ও ঐতিহ্যের কারণে এটি উলেমাদের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। মুসলমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান)।

গাজীদের তুলনায় মুক্ত এবং অর্থডক্সবিহীন যোদ্ধা মনোভাবের কারণে এই উলেমা সম্প্রদায় পুরাতন ইসলামের ঐতিহ্য বহন করে চলত আর এভাবেই তারা অটোমান অঞ্চলসমূহে পথনির্দেশ অথবা অবরোধ আরোপের ক্ষেত্রে প্রধান প্রভাব খাটাত।

এই বার্সাতেই ওসমানকে সমাহিত করা হয়। তার সমাধিসৌধটি ছিল সমুদ্রের ওপর দিয়ে কনস্টান্টিনোপলের দিকে তাকিয়ে আছে এমন আকৃতির। পূর্বপুরুষদের সমাধিসৌধসহ এ জায়গাটি হয়ে ওঠে একটি মুসলিম তীর্থস্থান। সমাধিসৌধে অটোমান সিংহাসনের সব উত্তরাধিকারীর প্রতি উচ্চারিত হয়েছে একটি বাণী : "আশা করা যায় যে ওসমানের মতোই ভালো হবে।"

প্রথম দিককার মুসলিম ঐতিহ্যের মাঝে তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন ভালো মানুষ। নিজের পুত্রকেও বলে গেছেন যে, 'ন্যায়বিচার করো এবং এভাবেই পৃথিবীকে সজ্জিত করো। আমার বিদেহী আত্মাকে আনন্দ প্রদান করো বিভিন্ন বিজয় দ্বারা....নিজের বাহু দিয়ে ধর্ম রক্ষ করো। সম্মান করতে শেখো যার ফলে স্বর্গীয় আইন প্রতিষ্ঠিত হবে।"

ঐতিহাসিকভাবে ওসমানের ভূমিকা ছিল একজন গোত্রপ্রধান হিসেবে জড়ো করেছিলেন এক জনগোষ্ঠী। তার পুত্র অর্খান এই জনগোষ্ঠীকে দিয়েছিলেন একটি রাষ্ট্র এবং তার পৌত্র এই রাষ্ট্রকে পরিণত করেছেন সাম্রাজ্যে। ওসমানের বংশধরদের এই রাজনৈতিক অর্জন সম্পর্কে উনিশ শতকে একজন অটোমান কবি এভাবেই জয়গান করেছেন– "একটি গোত্র থেকে ওঠে পৃথিবী বশীভূত করার শক্তি গড়ে তুলেছিলাম আমরা।"

অলিম্পাস পর্বত এবং ব্রুসা: পশ্চিম আনাতোলিয়া সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করার পর অলিম্পাস, পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ব্রুসা বা বার্সা, নগরী হয় অটোমান রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী।

রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্য তৈরি করার ক্ষেত্রে অটোমানরা গাজীদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী। এই ঐতিহ্যের ভিত্তি তাদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ভিত্তিক জীবন। গুণগত আচরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাব বা ভ্রাতৃসংঘ। প্রাথমিক ধর্মের উদ্দেশ্যে তারা কিছু বস্তু নিরপেক্ষ ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। সেখানে ছিল না কোনো কঠিন রহস্য (প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বাইরে), এটি ব্যবহারিক এবং বস্তুগত উভয় আকার ছিল শহরে, বণিক এবং কারিগরদের একই মর্যাদা ছিল। এভাবে গড়ে ওঠে সহভ্রাতৃত্ব বোধ যাদের মাঝে ধর্ম এবং যুদ্ধ নিয়ে একই রকম উন্মাদনা কাজ করত। শক্তিশালী প্রমাণের মাধ্যমে তারা নাইট পদমর্যাদাকে জনপ্রিয় করে তোলে। এভাবে পারস্পরিক কিছু নীতি মেনে চলত, চলতে বাধ্য করত আরেকটি জায়গায় একত্রিত হয়ে নীতি নির্ধারণ করত। যা প্রথম রহস্যময় ইসলামি আমলের রহস্যময় ভ্রাতৃসংঘের তুলনায় ভিন্ন ছিল।

চতুদর্শ শতাব্দীর ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা এ সম্পর্কে লিখে গেছেন এভাবে :

পৃথিবীর আর কোথাও তাদের মতো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরা আগন্তুক অতিথির জন্য এতটা উৎকণ্ঠিত থাকে, সন্তুষ্টি না আসা পর্যন্ত খাবার পরিবেশন করে। অত্যাচারীদের হাত স্তব্ধ করে দেয়, অত্যাচারী শাসকের নীতি আর তাদের দোসরদের হত্যা করে। তাদের বাগধারা অনুযায়ী একজন আঁখি-কেই (akhi) তার ব্যবসায়ী বন্ধুরা অবিবাহিত পুরুষ ও অন্যান্য যারা জীবনের জয়গান গায়, তাদের সম্মতি অনুযায়ী নিজেদের নেতা নির্বাচন করে।

বিবর্ণ কাপড় পরিহিত একজন মুচির আমন্ত্রণে ইবনে বতুতা এক গৃহে ভ্রমণ করছিলেন যেখানে জুতা প্রস্তুতকারী ছিল তরুণ আঁখিদের শেখ এবং এছাড়াও জড়ো হয়েছিল দুইশ জন বিভিন্ন পেশার বণিক। এ সম্পর্কে ইবনে বতুতা লিখে গেছেন এভাবে,

এটি সুদৃশ্য দালান, সুন্দর রুমী কার্পেট আচ্ছাদিত, ইরাকি কাচ দ্বারা সজ্জিত....চেম্বারে ছিল সারি সারি তরুণ যাদের পরনে ছিল লম্বা কাপড় আর পায়ে বুট জুতা....মাথায় ছিল সাদা উলের পাগড়ি, প্রতিটি পাগড়ির মাথায় ছিল এক হাত লম্বা একটি জিনিস....আমার তাদের মাঝে আসন গ্রহণ করার পর তারা বড় বড় পাত্রে করে নিয়ে আসে বিভিন্ন ফল আর মিষ্টান্ন। এরপরে তারা নাচ এবং গান শুরু করে। তাদের সবকিছুর প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধা জাগে আর তাদের দয়া এবং অন্তরের মহত্ত্ব আমাদের মুগ্ধ করে তোলে।

সুলতান অর্খান বার্সাতে ইবনে বতুতাকে স্বাগত জানান যিনি ছিলেন তুর্কমান রাজাদের মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং ধন-দৌলত জমি এবং সামরিক শক্তির দিক দিয়ে সবচেয়ে সম্পদশালী। তার অধীনে থাকা দুর্গের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ এবং তিনি আরো বেশি নির্মাণে সবসময় ব্যস্ত থাকতেন...। এটি

বলা হয়ে থাকে যে তিনি কখনোই এক শহরে পুরো একটি মাসও কাটাননি। তিনি নিয়মিত অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ করতেন ও তাদের দমন করতেন।

ওসমানের দুই ছেলের মাঝে অর্খান ছিলেন ছোট, যার নামকরণ হয়েছিল সামরিক দক্ষতার কারণে। ওসমানের বড় ছেলে আলা-এদ-দিন ছিলেন বিদ্যান্বেষী। আইন ও ধর্মের ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এক্ষেত্রে কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে যে তিনি ছোট ভাইয়ের দেয়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ সম্পর্কে অর্খান লিখে গেছেন, "যেহেতু আমার ভাই আমি তাকে যে পালও দল দিতে চেয়েছিলাম তা অস্বীকার করেছেন তাহলে তিনিই হবেন ভেড়া পরিচালনকারী। তিনি আমার লোকদের পথ দেখাবেন। আমার ভেজির হয়ে (Vezir)"। এই ক্ষমতাবলে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রশাসক, সেনাবাহিনীর প্রশাসক এবং নতুন আইনপ্রণেতা।

বার্সাতে রাজধানী স্থাপন করার পরে অর্খানের পদবি হয়েছিল "সুলতান, গাজীদের সুলতানের ছেলে, গাজীর ছেলে গাজী, পৃথিবীর হিরো।।" এখানেই প্রথমবারের মতো তিনি অটোমান রুপালি মুদ্রার প্রচলন করেন সেলজুক মুদ্রার পরিবর্তে যাতে লেখা ছিল "ঈশ্বর অর্খানের ওসমানের ছেলে, সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করুন। অর্খানের কাজ ছিল তার পিতার রেখে যাওয়া কাজ সমাধা করা। একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী যাদেরকে ওসমান নিজের চারপাশে জড়ো করেছিলেন তাদের নিয়ে একটি সুদৃঢ় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা; আরো বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করা ও নিজের আধিপত্য বৃদ্ধি করা; সব অধিবাসীকে একত্রে এনে রাষ্ট্রকে অটোমান শক্তির কেন্দ্রে বসানো। পিতার তুলনায় সুন্দর গাত্রবর্ণ আচরণে আরো সভ্য এবং জাদুকরী প্রভাবের অর্খান ছিলেন স্বাদের ক্ষেত্রে যতটা সাধারণ মেজাজের ক্ষেত্রে ততটাই নীতিবান। চারিত্রিকভাবেও তিনি উন্মুক্ত, ভয়ংকর অথবা ছলনাকারী ছিলেন না। ওসমানের তুলনায় তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুবিস্তৃত এবং কাজকর্মে ছিলেন শক্তিশালী। ফলে যুদ্ধ অথবা রাষ্ট্রগঠন উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অর্জন করেছেন অনিঃশেষ শক্তি, উদ্দেশ্যে অর্জনে ছিলেন একাগ্রমনা আর কূটনৈতিক দক্ষতা এবং জটিল সরকারব্যবস্থা সবকিছুতেই ওসমানের ছিল অসম্ভব ক্ষমতা।

প্রথমে নিকাইয়া ও নিকোমেডিয়া উভয় শহরকে অধিগ্রহণের কথা ভাবেন অর্খান। শহর দুটির প্রতিরক্ষা দেয়াল এতটাই মজবুত ছিল যে তারা দুর্গের মতো ঝড়ের আক্রমণও ঠেকাতে পারত। বার্সার পতন হয়েছিল কনস্টানিনোপল থেকে সহায়তার অভাবে। যখন অর্খান নিকাইয়ার দিকে মনোযোগ দেন—শতবর্ষ পূর্বে এটি ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী। যখন ল্যাটিনরা কনস্টান্টিনোপল অধিকারে রেখেছিল সম্রাট তৃতীয় আন্দ্রোনিকাস এ শহরকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু ১৩২৯ খ্রিস্টাব্দে

অটোমানদের সাথে পেলিকাননের যুদ্ধে আহত হওয়ার পর তিনি তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কনস্টান্টিনোপলে ফিরে যান। আর যেসব সৈন্য পশ্চাতে ফেলে যান তাদের বেশির ভাগও তার অনুরণ করে। এভাবে নিকাইয়ার দুর্গের পতন ঘটে। একইভাবে আট বছর পরে নিকোমেডিয়ও অর্খানের অধিকারে আসে।

তিনটি শহরেরই পতনের পেছনে প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক। নিজেদের উন্নয়নের জন্য এগুলোর প্রয়োজন ছিল চারপাশের অঞ্চলে যাতায়াত করা। যখন এসব অঞ্চলে অটোমান শাসন কায়েম হয় কোনো লুণ্ঠনকারী হিসেবে নয় বরং স্থায়ী বসবাসকারী হিসেবে, যেখানে কনস্টান্টিনোপলের কিছুই করার থাকেনি। এর অধিবাসীদের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। এদের মাঝে অনেকেই সমর্পণ করার শর্তসমূহের সুবিধা নেয়নি, কনস্টান্টিনোপেলে যায়নি। তারা যেখানে ছিল সেখানে থাকাটাই মনস্থির করে, নিজেদের ব্যবসা এবং চাষবাস চালিয়ে যায়, পুরাতনের বদলে তাদের চারপাশে যে নতুন জগৎ গড়ে উঠেছিল তাতে যোগদান করে। এভাবে অর্খানের শাসনকালের শেষ দিকে তার রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বেড়ে যায়, প্রায় অর্ধ মিলিয়ন হয় সংখ্যায়, যা আর্তঘরুলের চারশ ঘোড়সওয়ারের চেয়ে অনেক বেশি।

খ্রিস্টানদের সহনশীলতার ফলে এটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবেই রয়ে যায় যেটির জাতীয়তার বীজ নিহিত ছিল ধর্মে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরও মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের মাঝে পার্থক্যও বজায় ছিল। মৌলিকভাবে এটি ছিল জমি ও এর ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে। মুসলিমরা বাধ্য ছিল সামরিক দায়িত্ব পালনে। ফলে তারাই জমির স্বত্বাধিকারীর উপযুক্ত ছিল। দায়িত্ব পালনে পুরস্কারস্বরূপ এটি বণ্টন করা হতো। এর ফলে সৈন্য নিয়োগের উৎস হিসেবে ও কাজ করত জমি, কেননা এতে কর দিতে হতো না। খ্রিস্টানরা সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারত না, তাই কোন রূপ জমির মালিকানার সুবিধাও পেত না। বরঞ্চ তারা সামরিক বাহিনীর জন্য মাথাপিছু কর দিত। এ কারণে পদমর্যাদার ক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের চেয়ে নিচু স্তরে ছিল। গ্রাম্য জেলাগুলোতে এ প্রবণতা ছিল বেশি। তাই খ্রিস্টানরা শহরে বাস করতে চাইত। যেখানে এ বৈষম্য অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুবাদে অনেকটাই দূর হতো। কিন্তু স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হলে সেই খ্রিস্টান রাতারাতি ওসমান অনুসারী বনে যেত। এতে করে তার পূর্ব ইতিহাসও সহজে ভুলে যাওয়া হতোও করমুক্ত জীবন-যাপন করত। জমি অধিগ্রহণ করতে পারত, উন্নযনের সুযোগ পেত এবং মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর মাঝে জায়গা পেত। অটোমান ইতিহাসে এ পর্যায়ে এসে এশিয়াতে মুসলিম দীক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে যায়।

সামন্তপ্রথা হলেও এই অটোমানীয় সামরিক জায়গির প্রথা ইউরোপে প্রচলিত সামন্তপ্রথার তুলনায় ভিন্ন ছিল। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ছিল কম এবং সবার ওপরে ছিল দৈবাৎ উত্তরাধিকার। কেননা সব জমিই ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এভাবে অংশ এসে জমি দিয়ে কোনোরূপ মহত্ত্ব বিবেচিত হতো না, যেমনটা ছিল ইউরোপের জমিদার অভিভাবকরা। বিজয়ী অঞ্চলের ওপর সুলতানেরই শুধু একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় ছিল। এছাড়া তারা যত বিজয়ী হচ্ছিলেন সৈন্যরা ততই পুরস্কারস্বরূপ জমির মালিক হয়ে যায়। এ জাতীয় ব্যবস্থা কাঠামোতে অর্খান, বড় ভাই আলা-এদ-দিনের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন সার্বভৌম অধিকার বলে, পেশাদার সামরিক শক্তি যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে চির প্রস্তুত রূপে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা ইউরোপে পরবর্তী দুই-শতাব্দীতেও অনুকরণ করা হয়নি।

অর্খানের পিতা ওসমানের সেনাবাহিনীতে শুধু ছিল অনিয়মিত তুর্কমানরা, স্বেচ্ছাসেবক, যাদের নাম ছিল একিনজিস, (Akinjeis) যাদের নিয়োগ দেয়া হতো গ্রামে গ্রামে মুখের ভাষায় শমন জারির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দিনে। ভাষা ছিল "যারা যুদ্ধ করতে চায়।" তারা ছিল দক্ষ ঘোড়সওয়ার, চলাচল করত একত্রে, যেন একটি দেয়াল। অর্খান এদেরকে নিয়োগ দিতেন। সামরিক জায়গিরদারদের মাঝে থেকে এদেরকে প্রস্তুত করা হতো অশ্বরোহী সৈন্যদল হিসেবে, যাদের কাজ ছিল কোনো নির্দিষ্ট আক্রমণের পূর্বে দেশটিকে উন্মুক্ত করা। এভাবেই সৈন্যদের বিশ্বস্ততা জমির পরিমাণে নিশ্চিত হতো। এদেরকে সহায়তা করত নিয়মিত বেতনভুক্ত অশ্বারোহী সৈন্যদল সিপাহিরা এবং চাভূস (Chavush) নামধারী গাইডেরা।

এছাড়াও অর্খান অনিয়মিত একটি বাহিনী প্রস্তুত করতেন, নাম ছিল আজাব (Azab)। যাদের অবস্থান থাকত সম্মুখে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর ওপর প্রথম আঘাত হানত। এদের পেছনে শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে মুখোমুখি হতো সাবধানতার সাথে বাছাই করা সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর। বেতনভুক্ত সৈন্যরা একত্রে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ পেত। তাদের নেতাকে তারা মান্য করত, যিনি তাদের পরিচিত ও সম্মানীয় ছিলেন। এই সময়কার প্রচলিত অন্যান্য ভাড়াটে সৈনিকদের তুলনায় অর্খানের সৈন্যরা নিজেদের সার্বভৌমত্বের কাছে উৎসর্গীকৃত ছিল। তাকে মান্য করত আর বিশ্বাস করত যে এভাবেই তাদের পদোন্নতি ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত থাকবে। মৌলিকভাবে তারা সময় "সুলতানের তাঁবুর দরজায়" থাকত। তারা সুলতানের একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নিয়ে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে তার আজ্ঞা পালন করত সেনানায়কের আদেশানুযায়ী। এই নতুন নিয়মিত অটোমান সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তিই ছিল তাদের ঐক্য। এছাড়া আরেকটি শক্তি ছিল যুদ্ধের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা।

অটোমানরা সবসময় প্রস্তুত থাকত, তাদেরকে আকস্মিকভাবে আশ্চর্য করা যেত না। তাদের সেনাবাহিনীতে ছিল প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা ব্যবস্থা। শত্রু কখন এবং কোথা দিয়ে আসবে তা নিয়ে নিশ্চিত খবর থাকত তাদের হাতে। এছাড়াও ছিল দক্ষ গাইডেরা। যারা তাদের সৈন্যদের পথ দেখাত। একজন ভ্রমণকারী ব্রট্রান্ড দে ব্রোকুইরে এসব অটোমান সৈন্য সম্পর্কে লিখে গেছেন :

তারা হঠাৎই শুরু করতে পারত। আর মাত্র একশ খ্রিস্টান যোদ্ধাও দশ হাজার ওসমান অনুসারীর চেয়ে বেশি শব্দ করতে পারত। ড্রাম বেজে ওঠার সাথে সাথে তারা চলা শুরু করত আর আদেশ না আসা পর্যন্ত থাকত না। হালকা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এক রাতে তারা এতটাই পথ চলতে পারত যা তাদের খ্রিস্টান শত্রুরা তিন দিনে পার হতো।

শত বছরের যাযাবর জীবনের অভ্যাস, দ্রুতগতি আর এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণের অভ্যাসের ফলে এভাবেই গড়ে উঠেছিল একটি সামরিক জাতি; যারা ছিল পরিশ্রমী, সুশৃঙ্খল আর একরোখা। একই কথা বলা যায় প্রতিষ্ঠান এবং কৌশলের ক্ষেত্রেও, যা যুদ্ধের প্রধান নীতি। এভাবেই অটোমান রাষ্ট্রের নিয়তি নির্ধারিত হয়েছিল সাম্রাজ্যের দিকে। এক্ষেত্রে এ জনগোষ্ঠীর যাযাবর জীবনের অভ্যাস ক্রমেই সামনের দিকে যাওয়া, নতুন তৃণভূমির সন্ধানে, কাজ করেছিল। ইসলামে ধর্মান্তরিত হবার সাথে সাথে এই যাত্রা আরো বেগবান হয়ে এবং গাজী হিসেবে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন মুখ্য হয়ে ওঠে। এভাবেই তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পবিত্র আইনের ভিত্তিতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে। এগিয়ে যায় দার-নাল হারবের জমি দখল করার জন্যে। সম্পত্তি দখল করে, হত্যা অথবা বন্দি করে এর জনগণকে এবং সবকিছুকেই মুসলিম শাসনাধীনে নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তাগিদ ও ছিল। কেননা জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। অন্যান্য শরণার্থীরাও ছিল। যেমন যাযাবর, গোঁড়া নয় এমন মুসলিম অথবা মূল আনাতোলিয়া থেকে আগত অভিযাত্রী। সুতরাং মধ্য এশিয়ার অনুর্বর ভূমি থেকে বের হয়ে এসব তুর্কিকে এখন মোকাবেলা করতে হবে অপরিচিত এবং রুক্ষ এক পরিবেশের—সমুদ্র। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে তাদের সৈন্যরা প্রস্তুত হয় ইউরোপে যাত্রার জন্য।

॥ ২ ॥

এশিয়াজুড়ে মঙ্গোলদের আগমণের মতো ইউরোপে তুর্কিদের প্রবেশ কোনো হঠাৎ আক্রমণ নয়। ধীরে ধীরে ক্রমানুসারে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল যার ক্ষেত্রে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ভাগ্যাকাশ ভেঙে পড়া এবং পতন একটি বড় ভূমিকা রেখেছিল। বিভিন্ন অনৈক্য এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। ধর্মীয় থেকে

রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রে খ্রিস্টান শক্তিসমূহের ঐক্যের অভাব—পূর্বের বিরুদ্ধে পশ্চিম, গোঁড়া খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক খ্রিস্টান, গ্রিকদের বিরুদ্ধে রোমান। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে এটি শুরু হয়েছিল চতুর্থ ক্রুসেডের ল্যাটিন নাইটদের বিশ্বাসঘাতক হয়ে আক্রমণের মাধ্যমে। প্রথমে এটি পবিত্র ভূমির মুসলিমের বিরুদ্ধে ছিল না। এই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল কনস্টান্টিনোপলের গ্রিক খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে শহর দখল এবং ধ্বংস করার মাধ্যমে ইউরোপে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ অঞ্চলেই ল্যাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের মাঝে অনৈক্যের উপাদান বিশেষভাবে ধন্যবাদের যোগ্য। কেননা এ ল্যাটিন সাম্রাজ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, মাত্র অর্ধশতাব্দী ছিল এর আয়ু। এ সময় নিকাইয়া থেকে গ্রিকেরা এশিয়াতে তাদের অন্যান্য ল্যাটিন আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া অঞ্চল শাসন করত। ১২৬১ সালে তারা পুনরায় কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয়।

কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যের ভাগ্য পুনরায় দুর্যোগের মুখে পড়ে। পরবর্তী দুই শতক ধরে যদি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য টিকে ছিল, কিন্তু এর ভাবমূর্তি ছিল পূর্বের সাম্রাজ্যের তুলনায় কোনোরূপ অবয়বহীন ভূতের মতো। সভ্যতা ও শক্তি নিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্র হিসেবে এর পূর্বেও গৌরব পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পূর্বের নিরাপত্তা ও শক্তি কোনোটাই আর পুনরুদ্ধার করা যায়নি। সাম্রাজ্যের ভূ-খণ্ড আস্তে আস্তে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। বুলগেরিয়া, সার্বীয়া, মেসিডোনিয়া শত্রুর হাতি চলে যায়। কনস্টান্টিনোপল অর্ধেক ভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়, সম্পদসমূহ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে আর অধিকাংশ অধিবাসী অন্যত্র চলে যায়। পূর্বের সাথে এর বাণিজ্য সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। পশ্চিমে এর যতটুকু বাকি ছিল তা-ও ভেনেশিয়া ও জেনোইসের হাতে চলে যায়। পোপতন্ত্র ও ল্যাটিন শক্তির মধ্যে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় চরম আকার ধারণ করে। এতে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে অন্তর্গত প্রশাসনিক অনৈক্য, সামাজিক ক্ষয় এবং অর্থনৈতিক দেউলিয়া অবস্থা।

বাইজেন্টাইন ইতিহাসের এ রকম সংকটপূর্ণ অবস্থাতে এসেও কোনো রাজবংশীয় সম্রাটই চেষ্টা করেননি বেঁচে থাকা উপাদানসমূহ নিয়ে একে নতুন জীবন দান করার। উপরন্তু পালাইয়োলগ সম্রাটদের প্রথম শাসনামলে কনস্টান্টিনোপল পুনরায় অধিকার করার পর অনুসরণ করা হয় পৃথিবীর কলাচর্চার ক্ষেত্র যদিও কোনো রেনেসাঁর জন্য নয়, বরঞ্চ সাম্রাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্তিতার জন্যই এমনটা হয়েছিল। খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানের এ অপবিত্র যুদ্ধের কারণ ছিল সাম্রাজ্যের রাজবংশের অন্তর্গত অনৈক্য। এ রাজবংশ ব্যাপৃত ছিল গৃহযুদ্ধে। পুত্র যুদ্ধ করে পিতার বিরুদ্ধে, পৌত্র যুদ্ধ করে পিতামহের বিরুদ্ধে, বৈধ সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক দখলকারী। এই

ঐক্যের অভাব পরিস্থিতি তুর্কিদের অনুকূলে কাজ করে। যেহেতু তারা ইসলামের জন্য পবিত্র যুদ্ধের ক্ষেত্রে একজোট ছিল। এই অবস্থায় বলা যায় তারা ইউরোপে আক্রমণ করেনি বরঞ্চ তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

প্রথম দিকে এখানে তারা তাদের ভাড়াটে সৈনিকের ভূমিকা পালন করে। যেমনটা তারা করেছিল আব্বাসীয় খলিফার আমলে আরবীয় সাম্রাজ্যে তিন শতাব্দী পূর্বে। প্রথমে তুর্কমানরা দোবরুজা, পশ্চিম কৃষ্ণ সাগরীয় উপকূলে বসতি স্থাপন করে। প্রথম পালাইয়োলগের সম্রাট হিসেবে অষ্টম মাইকেল রাজ্যাভিষেক নেওয়ার পর ল্যাটিন অধিকৃত থেকে শরণার্থী হিসেবে সেলজুক কোর্টে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তুর্কমানরা একজন রাজ্য হারানো সেলজুক সুলতান ইজ-এদ-দিনকে সহায়তা করে, যিনি কনস্টান্টিনোপলে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে একটি দুর্ধর্ষ আন্দোলন পরিচালনা করার পর তারা সম্রাটের হাত থেকে সুলতানকে রক্ষা করে। এবং ক্রিমিয়াতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তার পুত্র এবং পাহারাদারদের একজন কনস্টান্টিনোপল থেকে এবং খ্রিস্টান হয়ে যায় আর একটি তুর্কি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে, যারা খুব দ্রুত সংখ্যায় বেড়ে যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় আন্দ্রেনিকাস ক্যাটালান গ্রান্ড কোম্পানির বিশাল খ্রিস্টান ভাড়া করা সৈন্যদেরকে সহায়তা করার আমন্ত্রণ জানান। এর সেনাপ্রধান ছিল ভাগ্যান্বেষী সৈন্য রজার দে ফ্লোর। যখন ক্যাটালান সৈন্য কনস্টান্টিনোপলে সমস্যা তৈরি করে, সে তাদেরকে সরিয়ে এশিয়া মাইনরে নিয়ে আসে। এখানে তারা তুর্কিদের সাথে সফলভাবে যুদ্ধ করে গ্রিকদের ভাগ্যের বিনিময়ে। পরবর্তীতে গ্রিকদের সাথেও তারা সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, গালিপল্লীতে তাদের নিজেদের হেডকোয়ার্টার বানিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা করে। তারপর যখন রজার দে ফ্লোর সম্রাটের প্রাসাদে খুন হয়, তখন ক্যাটালান সৈন্যরা গ্রিকদের ওপর চড়াও হয় আর তাদের সাহায্য করার জন্য পূর্বশত্রু তুর্কিদেরকে ডেকে আনে। যে সম্রাটকে প্রতিরক্ষা দিতে এসেছিল তাঁর বিরুদ্ধেই এশিয়া মাইনর থেকে তুর্কিদেরকে ডেকে আনে ক্যাটালানরা।

এভাবে ক্যাটালানদেরকেই দায়ী করা হয় তুর্কিদেরকে ইউরোপে আনার ক্ষেত্রে। এখানে তারা গ্রিকদের বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে যুদ্ধ করে। অবশেষে ক্যাটালানরা যখন থেসালীতে চলে যায়, পেছনে থ্রেস এবং মেসি-ডোনিয়াতে রেখে যায় বিপুলসংখ্যক তুর্কি যোদ্ধা, যারা যোগাযোগব্যবস্থার ওপর হামলা করে বিশৃঙ্খলা বাধিয়ে দেয়। তাদের নেতা হালিল নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে বসফরাস অঞ্চলে স্বাধীন কার্যক্রম চালানোর

অনুমতি জোগাড় করে নেয়। কিন্তু যখন গ্রিকেরা এ চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তুর্কিদেরকে শিক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নেয়, হালিল এশিয়া থেকে আরো অধিক সৈন্য নিয়ে এসে তরুণ সম্রাট নবম মাইকেলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সমাট তাকে সহায়তা করার জন্য সার্বিয়ান সৈন্যদেরকে ডেকে নিয়ে আসেন।

এরপর থেকে চতুদর্শ শতাব্দীজুড়েই বাইজেন্টাইন দ্বীপ এবং উপকূল অঞ্চলে এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন অংশ থেকে এসে তুর্কিরা হামলা ও লুণ্ঠন কার্য চালায়। এদের মাঝে কিছু কিছু আক্রমণ অবশ্য বিফল হয়ে যায়। যখন তাদের মাঝেই শত্রুতা গড়ে ওঠে। একটা সময় আসে যখন তুর্কিদের মাঝে অনেকেই গ্রিকদের জন্য যুদ্ধ করে, আবার অনেকেই তুর্কিদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে ছিল তাতাতেরা। কৃষ্ণ সাগরের উত্তরাংশ থেকে এদের আবির্ভাব হয়েছিল। এদের জাতিগত ঐতিহ্যগত ভিত্তি ছিল তুর্কিদের মতোই। যারা দক্ষিণ রাশিয়া হয়ে ক্রিমিয়া এবং পশ্চিমে হাঙ্গেরি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে আয়দিন থেকে তুর্কি জলদস্যুরা আজিয়ার্নের দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ করে পোপতান্ত্রিক সেনাবাহিনীকে ক্রুসেডে উদ্বুদ্ধ করে তোলে; যারা স্মূর্না শহর অধিগ্রহণে করে রেখেছিল।

এসব ধ্বংসযজ্ঞে অটোমানরা নিজেরা কোনো ভূমিকা পালন করেনি। তারা শুধু তাদের শত্রু অন্যান্য তুর্কি প্রতিবেশী ও গোত্রকে দুর্বল করার কাজ করে যায়। যদিও বসফরাসের তীরভূমি তাদের অধিকারে ছিল, (কনস্টান্টিনোপলের ঠিক বিপরীতে ১৩৩০ খ্রিস্টাব্দে) পরবর্তী সাত বছর পর্যন্ত তারা এর পানি পার হয়ে ইউরোপে যায়নি। তারা তাদের ধৈর্য ও সতর্ক থাকার নীতিতে অটুট থাকে।

সাত বছর পরে তারা ইউরোপে পা রাখে যখন গ্রাণ্ড চ্যালেন্সর জন কাটাকুজিনে, একজন যোগ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা বৈধ বালক-সমাট জন পালাইয়োলগের বিরুদ্ধে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে, তার প্রয়োজন ছিল এর প্রেক্ষিতে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধে তুর্কি সহায়তার। এই সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে কাটাকুজিন নিজের কন্যা থিয়োডরাকে অর্খানের সাথে বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এই প্রস্তাব সাদরে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা হয়। ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ছয় হাজার অটোমান সৈন্য ইউরোপে প্রবেশ করে। এখানে তারা কাটাকুজিনকে সাহায্য করে কৃষ্ণ সাগরের উপকূল অঞ্চলসমূহ দখল করতে, থ্রেস লুঠ করতে, আদ্রিয়ানোপলকে ভয় দেখাতে এবং কনস্টান্টিনোপলকে অবরোধ করতে।

পরের বছরই ইউরোপীয়ান তীরভূমি মেতে ওঠে বাইজেন্টাইন রাজকুমারী এবং অটোমান সুলতানের জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহোৎসবে। অর্খান স্ফুটারি-র বিপরীতে তাঁবু ফেলে ত্রিশটি তুর্কি জলযানের এক বিশাল ফ্লিট পাঠান

অশ্বরোহী সৈন্যদল যোগে তার নববধূকে নিয়ে আসার জন্য। সেলিমব্রিয়াতে সম্রাটের তাঁবুটিও সজ্জিত করা হয়েছিল মহামূল্যবান কার্পেট দিয়ে। এক্ষেত্রে গিবন (Gibbon) লিখে গেছেন "বেগুনি রঙের প্রতি অসম্মান।"

থিয়োডোরা এমন একটি সিংহাসনে বসেন, যেটির চারপাশে ছিল সিল্ক আর স্বর্ণের পর্দা। সৈন্যরাও ছিল অস্ত্রবিহীন কিন্তু সম্রাট একাই ছিলেন ঘোড়ার ওপর আসীন। একটি মাত্র নির্দেশের সাথে সাথে পর্দা উঠিয়ে ফেলা হয়। নববধূ বা বলির পাঁঠাকে উন্মুক্ত করা হয় সবার সামনে। চারপাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল নপুংসকের দল, বাঁশি আর বাজনার সুরে এই আনন্দময় ঘটনার ঘোষণা হচ্ছিল আর রাজকুমারীর খুশির অভিনয় বয়ান করছিলেন এমন সব কবি যাদের বয়সের কোনো গাছ-পাথর নেই। কোনো রকম গির্জার অনুষ্ঠান ছাড়াই থিয়োডরাকে তার বর্বর প্রভুর হাতে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু এটি সুনিশ্চিত করা হয় যে থিয়োডরা বার্সার হারেমে গিয়েও নিজের ধর্ম পালন করতে পারবে। এই ধরনের একটি অস্পষ্ট দ্ব্যর্থবোধক অবস্থাতেও তাঁর পিতা কন্যার দয়া এবং উৎসর্গীকৃতের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন।

বস্তুত এর মাধ্যমে থিয়োডরা অগুণতি খ্রিস্টান দাস এবং বন্দিদের ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

পরবর্তীতে অটোমানদের সাথে এই বিবাহ এবং সামরিক মৈত্রী জোটের মাধ্যমে ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে কাটাকুজিন কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করে নিজের ছোট কন্যা হেলেনার বিয়ে দেয় তরুণ জন পালাইয়েলগের সাথে এবং উভয়ে যৌথ সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এভাবে অটোমান তুর্কিরা ইউরোপে পা রাখে শত্রু হিসেবে নয়, বরং মৈত্রী হিসেবে এবং বলা যায় বাইজেন্টাইন ব্যবসায়ীদের আত্মীয় হিসেবে। তাদের সুলতান ছিলেন একজন সম্রাটের জামাতা এবং অপর সম্রাটের ভগ্নিপতি। এছাড়াও তিনি ছিলেন পার্শ্ববর্তী বুলগেরিয়ার জারের জামাতা।

তবে এসব কিছুই অর্খানকে স্তব্ধ করতে পারেনি বাইজেন্টাইনের অন্য আরেক শত্রুর সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়তে। স্টিফেন দুশান, যিনি নিজের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সার্বিয়াকে সাম্রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। এমনকি ভেনেশীয়ানরা যাকে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট হিসেবে ডাকত। তিনি নিজেই নিজেকে "সব রোমান সাম্রাজ্যের প্রভু" হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তারপরেও কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের ক্ষেত্রে ভেনেশীয়ানের সহায়তা না পেয়ে অর্খানের সাহায্য কামনা করেন। এর বিনিময়ে নিজের কন্যার সাথে অর্খানের পুত্রের বিবাহ দিতে প্রস্তাব করেন। এর মাধ্যমে সার্বিয়ান এবং অটোমানদের যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে কনস্টান্টিনোপল দখল করতে চাইলেও এ ঘটনা কাটাকুজিন টের পেয়ে যায়। অর্খানের সম্মতি নিয়ে যাওয়া দূতেরা

তার হাতে ধরা পড়ে যায়। কাটাকুজিন এদেরকে মেরে ফেলে এবং বন্দি করে। কিন্তু স্টিফেন অথবা অর্খান কেউই কোনো সমঝোতায় বসেনি। ফলস্বরূপ স্টিফেন ১৩৫৫ সালে নিজেই কনস্টান্টিনোপলের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করেন আশি হাজার মানুষের এক বাহিনী নিয়ে। কিন্তু যাত্রার দ্বিতীয় দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং একই পরিণতি হয় তাঁর সার্বীয়ান সাম্রাজ্যেরও। ইতিমধ্যে ১৩৫০ সালে, কাটাকুজিনে আরো বিশ হাজার অটোমান অশ্বারোহী সেনাদেরকে ডেকে পাঠায় নিজের সাহায্যর্থে। সেলোনিকাকে ইশনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মেসিডোনিয়ার উপকূল থেকে নিজের সৈন্যদেরকে সেলোনিকার চারপাশে জড়ো করে। সেলোনিকা নিরাপদ হয়; যদিও তুর্কি যোদ্ধারা এ দুই শহরের কোনোটিই অধিগ্রহণ করেনি। সুলতানের নির্দেশানুযায়ী এশিয়া মাইনরে ফিরে আসে। দুই বছর পরে অর্খান, জেনোয়িসকে তার ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী ভেনেশীয়ার বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে সহায়তা দেন। ১৩৫২ সালে যখন ভেনেশীয়া বুলগেরিয়াকে সাথে নিয়ে জন পালাইয়োলগের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন কাটাকুজিন আবারো বিশ হাজার অটোমান সৈন্য ডেকে পাঠায়। এ ব্যয়ভার মেটাতে কনস্টান্টিনোপলের গির্জাসমূহ লুটপাট করে। এছাড়াও থ্রেসিয়াতে অর্খানকে একটি দুর্গ পুরস্কার দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। এর মাধ্যমে কাটাকুজিন আড্রিয়ানোপলকে সুরক্ষিত করে। থ্রেস এবং বেশির ভাগ মেসিডোনিয়াতে নিজের অবস্থান শক্ত করে আর নিজের পুত্র ম্যাথিউকে সহ-সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে।

১৩৫৩ সালে অর্খন পুত্র সুলেমান পাশা অটোমান বাহিনী নিয়ে হেলেনপন্ট অতিক্রম করেন দুর্গ অধিকারের জন্য, যা কাটাকুজিন প্রতিজ্ঞা করেছিল। এর অবস্থান ছিল গালিপল্লী এবং আজিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী উপদ্বীপে। পৌঁছানোর পরপরই ভূমিকম্পের ফলে গালিপল্লীর দেয়ালের কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। সুলেমান তড়িঘড়ি এ দুর্গও দখল করে নেন। শীঘ্রই এ দেয়াল মেরামত করে সুলেমান এশিয়া থেকে আগত প্রথম অটোমান বসতি স্থাপন করেন এখানে। পরবর্তীতে খুব দ্রুত সফলতার সাথে আরো বসতি স্থাপন করা হয়। এর ফলে খ্রিস্টান নেতারা নিজেদের জমিতে মুসলিমদের অধিকারে চলে যায়। এ মুসলিমরা ছিল অর্খানের যুদ্ধের সাথি। এদের ওপর একত্রিত শক্তি এবং সহযোদ্ধা হিসেবে অর্খান ভরসা করতেন। এদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ইউরোপে অটোমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাকে সহায়তা করে। এরই মাঝে চাষী ব্যতীত আর সমস্ত স্থানীয় গ্রিকেরা তাদের প্রদেশসমূহের দুর্গ এবং শহরে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। যেখানে স্বেচ্ছাশ্রম ব্যতীত তাদের ওপর উৎপীড়ন ঠেকানোর আর কোনো উপায় ছিল না।

এভাবেই দখল কার্য শুরু হয়ে তা ক্রমেই ত্বরান্বিত হয়। এর ফলে ইউরোপে গাজীদের সমাজ বৃদ্ধি লাভ করে। আর বাইজেন্টাইন ভূমিতে অটোমান নিয়ম-নীতি আরোপ করা শুরু হয়। খুব দ্রুত চলার মাধ্যমে দূরত্ব অতিক্রম করে, রাস্তা বন্ধ করে, শস্য ধ্বংস করে অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করে প্রধান সেনাবাহিনী হাইওয়ের উভয় পার্শ্বে আনাতোলিয়ার তুর্কিদের বসতি স্থাপন করে এবং এভাবে চারটি নদী উপত্যকা দখল করে নেয়, যা দানিয়ুয়ের দিকে গেছে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি যেখানে স্থানীয়রা শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। এ ধরনের বলকান সমাজে আক্রমণকারীদের তেমন বাধা দেয়া হতো না। ফলে তাদেরকে কিছু বলা হতো না। দরবেশ ভ্রাতৃসংঘ এভাবে নতুন নতুন তুর্কি স্থাপিত গ্রামে আশ্রয় নিতে শুরু করে। মুসলমানদের যেসব জমি তারা দখল করেছিল সেখানকার কৃষকদের সাথে নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এই কৃষকদের সংখ্যা যে কোনো সামাজিক বিপ্লবের জন্য যথেষ্ট ছিল। এসব মুসলমান প্রভু পুরাতন জমিদারি প্রথা বিলোপ করে দেয়, সেটা গ্রিক বা ল্যাটিন যাই ছিল না কেন। এর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢিলেঢালা এবং পরোক্ষ এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পূর্বের অবৈতনিক শ্রমের প্রথা বিলুপ্ত করে কৃষকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট করের ব্যবস্থা করা হয়। অটোমান সংকেত অনুযায়ী এ মুসলমান মালিকেরা জমিদার ছিল না, বরঞ্চ কৃষক এবং সুলতানদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিবেচিত হতো। সুলতান ছিলেন সকল জমির মালিক।

এভাবে বাইজেন্টাইন আমলের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনৈক্য দূর করে অটোমানরা সবকিছুর ওপর রাষ্ট্রের অধিকারকে শক্ত করে। এভাবে অটোমান ভূখণ্ডের মাঝে খ্রিস্টান জমিদার বা প্রভুরা সুলতানের সার্বভৌমত্বে নিজেদেরকে প্রজা হিসেবে মেনে নিয়ে তাকে বাৎসরিক একটি কর প্রদানে সম্মত হয়, এটিকে বিবেচনা করা হতো একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে প্রদান করা আনুগত্য হিসেবে। প্রথম থেকে অটোমান রাষ্ট্র খ্রিস্টানদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে, যেন তারা কৃষকদেরকে কোনো রকম বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ না করতে পারে। ফলস্বরূপ বলকান অঞ্চলের কৃষকেরা অটোমান ক্ষমতাকে প্রশংসা করতে শুরু করে। কেননা এর মাধ্যমে তারা খ্রিস্টান সামন্তপ্রথা থেকে উদ্ধার পেয়েছিল, যাদের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। অটোমান শাসনামল তাদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা বয়ে আনে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল আইনশৃঙ্খলা উন্নতি। পরবর্তীতে এক ফরাসি ভ্রমণকারী লিখে গেছেন" দেশটি বেশ নিরাপদ। পথদস্যুর কোনো খবর নেই কোথাও।" এ সময়কার অন্যান্য খ্রিস্টান অঞ্চলের তুলনায় এটি ছিল বেশ সন্তোষজনক।

প্রথম দিকে অটোমানরা গালিপল্লী দ্বীপপুঞ্জের বেশির ভাগ অংশ এবং মারমারা সাগরের ইউরোপীয়ান অংশ যা ছিল কনস্টান্টিনোপলের কতক মাইল ভেতরে, এতটুকই নিয়ন্ত্রণ করত। কাটাকুজিনের অবস্থান এ সময় হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। অর্খানের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ এনে দশ হাজার মুদ্রার বিনিময়ে জিম্পি (Tzympe) দুর্গ ফেরত চায়। অর্খান বুঝতে পারেন যে যখন ইচ্ছে তখন তিনি আবার এটি দখল করতে পারবেন, তাই পণের শর্তে রাজি হয়ে যান। কিন্তু গালিপল্লী ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। তার মতে এর দেয়াল অর্খানের সামনে ভেঙে পড়েছিল অস্ত্রবলে নয়, বরঞ্চ ঈশ্বরের ইচ্ছায়। এ ব্যাপারে আর কোনো আলোচনাতেও রাজি হননি তিনি। এভাবে সহায়তার কারণে অটোমান তুর্কিরা এ জায়গাতেই থেকে যায়।

কাটাকুজিন অপমানিত বোধ করতে থাকেন। বিদেশে বলকান, সার্বীয়া বুলগেরিয়ার খ্রিস্টান শক্তিসমূহ ও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে কাটাকুজিনের সাহায্য প্রার্থনা নামঞ্জুর করে দেয়। সাহায্য প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে বুলগেরিয়ার জার বলেন, তুর্কিদের সাথে অপবিত্র মৈত্রী জোট গড়ে তোলাই কাটাকুজিনের জন্য এ বিপদ ডেকে এনেছে। বাইজেন্টাইনকেই এখন এ ঝড় সামলাতে হবে। তিনি আরো বলেন, "যদি তুর্কিরা আমাদের বিরুদ্ধেও আসে, আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিরক্ষা গড়ে তুলব। নিজের দেশে কনস্টান্টিনোপলের অধিবাসীরা জন কাটাকুজিনের বিরুদ্ধে খেপে গিয়ে তাকে রাজপ্রসাদে বন্দি করে রাখে এবং জন পালাইয়োলগের রাজত্ব কামনা করে। জনসম্মুখেও কাটাকুজিনকে এই বলে তিরস্কার করা শুরু হয় যে তার ইচ্ছাই ছিল কনস্টান্টিনোপলকে অটোমানদের হাতে তুলে দেওয়ার। উপায়ন্তর না দেখে কাটাকুজিন স্পার্টার কাছাকাছি মিস্টরা নামক জায়গায় আশ্রমে চলে যায় রাজকার্য পরিত্যাগ করে। এখানে যোয়াসাপ নাম গ্রহণ করে পরবর্তী ৩০ বছর অতিবাহিত করে আর নিজের সময়কাল নিয়ে একটি ইতিহাস রচনা করে।

সুলেমান পাশা দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গা দখল করে কলোনি গড়ে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। এভাবে ডেমোটিকা দখল করেন এবং চোরলু দখল করে আড্রিয়ানোপল থেকে কনস্টান্টিনোপলকে বিচ্ছিন্ন করেন। এ সমস্ত অভিবাসনের ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রিকেরা বা জন পালাইয়োলগের সৈন্যরা তেমন কোনো বাধা দান করেনি। এরাও অটোমানদের জন্যে আশীর্বাদ প্রমাণিত হয়। যেমনটা ছিল কাটাকুজিন কিন্তু সম্রাটের জন্য একটি কঠিন সংবাদও অপেক্ষা করছিল। ১৩৫৭ সালে হালিল এবং থিয়োডরার পুত্রসন্তানকে জলদস্যু ধরে নিয়ে যায়। সুলতান চান সম্রাট ফোকাইয়াতে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনুক। এই ফাঁকে অটোমান সেনাবাহিনী থ্রেসের দিকে অগ্রসর হলে সম্রাট ফোকাইয়াকে অবরোধ করেন। কনস্টান্টিনোপলে ফিরে আসার পরও আবার সুলেমানকে

যাত্রা করতে হয়। পরবর্তীতে জন সৈন্যগণের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেননি এবং অর্খানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অর্খান এখন সম্রাটের প্রভু হিসেবে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ১৩৫৯ সালে পঞ্চম জন স্কুটারিতে সুলতানের কাছে গিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সুলতান সম্রাটের কাছে একটি চুক্তি পেশ করেন। সেখানে সম্রাট সুলতানের ছেলের মুক্তিপণের অর্ধেক দিতে রাজি হয় এবং থ্রেসে অটোমানদের সাম্যবস্থা মেনে নেন। হালিলকে উদ্ধার করার পর জন নিজের দশ বছর বয়সী কন্যার সাথে তার বিয়ে দেন। সম্রাট ফোকাইয়ায় ফিরে এসে অর্খানের দাবিনুযায়ী বিপুল অঙ্কের মুক্তিপণ দেন এবং হালিলকে নিকাইয়াতে নিয়ে আসেন। সেখানে হালিলের সাথে খ্রিস্টান রাজকুমারীর বিয়ে হয় পুরোপুরি মুসলিম উৎসবের মাধ্যমে। জন কাটাকুজিন ইউরোপে অটোমানদেরকে সৈন্য হিসেবে পরিচিত দিয়েছিল আর এভাবেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী জন পালাইয়োলগ তাদের পরবর্তী উপস্থিতিকে অভিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন।

১৩৫৯ সালে অর্খান মৃত্যুবরণ করেন। এর আগের বছরই তার বড় সন্তান সুলেমান গালিপল্লী দ্বীপপুঞ্জে শিকার করার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। অর্খানের ছোট পুত্র সফল হয়েছিলেন, যার নাম ছিল মুরাদ আই অর্খান, তিনজন অটোমান 'প্রতিষ্ঠাতা'র মাঝে দ্বিতীয় জন ছিলেন এই মুরাদ, যোদ্ধার চেয়ে কূটনৈতিক হিসেবেই সাফল্য অর্জন করেছিলেন বেশি। নিজের রাষ্ট্রকে তিনি একত্রিত জাতিতে পরিণত করেন। একটি আধুনিক সেনাবাহিনী নিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি তার সরাসরি শক্তি ব্যবহার করেননি, কিন্তু একে উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য পরোক্ষ উপায়ে ব্যবহার করেন। দুর্বল এবং বিভক্ত শত্রুর মোকাবেলা করেন। এক্ষেত্রে গতিবেগের দ্রুততার চেয়েও তিনি ব্যবহার করেছেন ধৈর্যশক্তির এবং সুচতুরতার সাথে ঘটনাসমূহকে নিজের পক্ষে আনার ক্ষমতাকে। এভাবেই অটোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ইউরোপে।

এখন সময় হয়েছে সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়ানোর; আরো বিভিন্ন অঞ্চল জয় করার মাধ্যমে এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বাকি অংশ অধিকার এবং এর সীমান্তবর্তী সকল বলকান খ্রিস্টান রাজ্যসমূহকে অধিকার করার জন্য অটোমান সেনাবাহিনীকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করার। এই ছিল চল্লিশ বছর বয়সী সুলতান মুরাদের দায়িত্ব, যিনি তাঁর দুই পিতৃপুরুষকে অতিক্রম করার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন। একজন সামরিক নেতা এবং রাষ্ট্রনায়ক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন নিজের সময়ের সেরা। এক্ষেত্রে মুরাদ ধন্যবাদের দাবিদার। কেননা তার মাধ্যমেই পশ্চিম পূর্বের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়; যেমনটা করেছিল পূর্ব পশ্চিমের কাছে গ্রিক এবং রোমান শতকসমূহের সময়ে।

॥ ৩ ॥

অর্খান ছিলেন ইউরোপে অটোমান সাম্রাজ্যের অগ্রদূত। মুরাদ ছিল এর প্রথম শ্রেষ্ঠ সুলতান। চর্তুদশ শতাব্দীর বাকি অংশজুড়ে তিনি পুরো একটি প্রজন্ম শাসন করেছিলেন। একজন যুদ্ধবাজ হয়েও তিনি নিজের সামরিক আগ্রহকে এক পাশে সরিয়ে রেখে নেতৃত্বের গুণাবলির মাধ্যমে অটোমান অঞ্চলকে বলকান দ্বীপপুঞ্জের শেষ সীমা পর্যন্ত বর্ধিত করেন। আর এই বিজয়ে স্থায়ী হয়েছিল এর পরবর্তী পাঁচটি বছর। একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং রাজনৈতিকভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেছেন বিশাল এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত সরকারব্যবস্থার কাঠামো। এভাবে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ভেঙে যাওয়া টুকরাগুলোকে একত্রিত করে শূন্যস্থানটি এমন ভাবে পূরণ করেন, যা ইতিহাসের এ সময়কার অন্য কোনো শক্তি পারেনি। এক নতুন অটোমান সভ্যতার অগ্রযাত্রার ঘোষণা করেছিলেন, জাতি, ধর্ম ও ভাষার বৈচিত্র্য নিয়েও যা হয়ে উঠেছিল অনন্য, অতুলনীয়।

মোটের ওপর কাকতালীয়ভাবে পূর্ব ইউরোপে এমন সময় অটোমান সাম্রাজ্যের বুৎপত্তি ঘটে যখন পশ্চিমে বর্জনের একটি যুগ চলছিল। মধ্য ত্রয়োদশ শতকে জেরুজালেমের পতন এবং এশিয়া মাইনরে মঙ্গোলদের অতর্কিত হামলা সবকিছু মিলিয়ে খ্রিস্টান সামন্তবাদ পূর্বে প্রসারিত হতে পারেনি। ক্রুসেডের শক্তি এর নিজের ওপরই আঘাত হানে, ল্যাটিন খ্রিস্টানরা নিজেদের মাঝেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইটালির ব্যাংকসমূহ যারা পূর্বের সাথে লাভজনক ব্যবসায় জড়িয়ে ক্রুসেডকে অর্থ সাহায্য করত এগুলোও একের পর এক ভেঙে পড়ে। আর্থিক ও অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে সাধারণভাবেই সামাজিক সংকট দেখা দেয়। অস্থিতিশীল ও অনুদ্দীপ্ত ইউরোপীয় সমাজ ক্রমেই ক্ষয় হতে থাকে। জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ, বণিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিদ্রোহ হয়ে ওঠে প্রবল।

পূর্ব থেকে প্লেগ "কালো মৃত্যুর" কারণে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিম ইউরোপের জনগণ নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। আর তাই নতুন পৃথিবীর আবিষ্কার তার শক্তি সংগ্রহের জন্য আটলান্টিক পার হয়ে যায়। মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার ক্ষেত্রে এ সময়টা তাই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ যখন অটোমান তুর্কিদের কাছ থেকেই এর ঊষার আলো দেখতে পায়।

১৩৬০ সালে ইউরোপে মুরাদের আত্মরক্ষাকাল শুরু হয় তাঁর রাজ্যভিষেকের পূর্বেই। সুদক্ষ জেনারেলদের মাধ্যমে এর প্রথম পর্যায়ে খুব দ্রুত পূর্ণ হয়। মাত্র পনেরো মাসের মধ্যেই অটোমানরা কার্যকরিভাবে থ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এর চাবিকাঠি ছিল দুর্গসমূহ আর বলকান পর্বতের পাদদেশে পর্যন্ত বিস্তৃত উর্বর সমভূমি। চোরলূল দুর্গতে পাইকারি হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে বলকানের সমগ্র অঞ্চলে তুর্কিভীতি ছড়িয়ে পড়ে। বার্সার পরিবর্তে শীঘ্রই আড্রিয়ানোপল

অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। এরপর অটোমানরা কনস্টান্টিনোপলকে পাশ কাটিয়ে পশ্চিমে যাত্রা করে। জন পালাইয়োলগ পরিণত হন একজন পুতুল সম্রাটে। এমন একটি চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হন যার কারণে ভবিষ্যতে থ্রেসের দাবি উত্থাপনের কোনো চেষ্টা করার সুযোগ হারান। অথবা সার্বিয়া বা বুলগেরিয়া থেকেও কোনো সহায়তা নিতে পারবেন না অটোমান অগ্রযাত্রাকে দমন করার। মোটের ওপর অটোমানদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয় এ চুক্তি যাতে তারা এশিয়া মাইনরে নিজেদের তুর্কি শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে। এর দশ বছর পরেই তিনি মুরাদের প্রজায় পরিণত হন। মুরাদকে নিজের অধিরাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে অটোমান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।

এরই মাঝে তুর্কিরা যখন ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বুলগেরিয়া, মেসোডোনিয়া, সার্বীয়া এবং শীঘ্রই হাঙ্গেরিতেও পৌঁছে যায়, অটোমান বাহিনী, ল্যাটিন গির্জার শক্তিশালী একটি অংশ পোপ আরবানের নেতৃত্বে ও আনুকূল্যে খ্রিস্টান শক্তিরা নিজেদের মধ্যে একতা এনে গ্রিকদের সাথে নিয়ে খ্রিস্টান শক্তি রক্ষায় একত্রিত হয়ে বিভিন্ন আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। ১৩৬৩ সালে সার্বীয়া এবং প্রথমবারের মতো হাঙ্গেরিয়ান সেনাবাহিনী গ্রিকদের সাহায্য ব্যতীত আড্রিয়ানোপলের দিকে অগ্রসর হয় মারিতজা নদী পার হয়ে। কিন্তু তার পর পরই তুর্কিরা হঠাৎ আক্রমণ করে এদের ওপর। যখন সার্বীয়ান ও হাঙ্গেরিয়ানরা কোনো বাধা না পাওয়ায় রাতের অন্ধকারের উৎসব শেষে ঘুমিয়ে পড়ে, তুর্কিরা বন্য পশুর মতোই এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুনরায় বাতাসের আগে ধোঁয়া ছোটার মতো করে সার্বীয়ান ও হাঙ্গেরিয়ানরা নদী পার হয়ে ফিরে যেতে চাইলেও তুর্কিরা সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এ ধরনের আরো একটি ক্রুসেডের উদ্যোগও ভেস্তে যায় ল্যাটিন এবং গ্রিক গির্জার মাঝে বিবাদের কারণে। এ সম্পর্কে পেত্রক পোপ আরবানকে এক পত্রে জানান, “ওসমানীয়রা শত্রু। কিন্তু গির্জা নিয়ে বিভক্ত গ্রিকরা শত্রুর চেয়েও খারাপ।” এক্ষেত্রে জন পালাইয়োলগের কাছে বন্ধু জোগাড় করার একটাই পথ ছিল, তা হলো রোমান গির্জার কাছে গ্রিকদেরকে সমর্পণ করা। আর ঠিক এই কাজটিই তিনি করেন হাঙ্গেরিতে গোপন একটি ভ্রমণের মাধ্যমে। কিন্তু নিজ দেশে ফেরার সময় পথিমধ্যে বুলগেরিয়ানদের হাতে দুর্গে বন্দি হন। এটি স্যাভয়ের আমাডেও-কে আক্রমণ পরিচালনা করতে উস্কে দেয়, যিনি ১৩৬৬ সালে আরেকটি পোপতান্ত্রিক ক্রুসেডে প্রবৃত্ত হন। তিনি তুর্কিদের কাছ থেকে গালিপল্লী দখল করে নেন। কিন্তু এখানে থেকে তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করার বদলে কৃষ্ণ সাগর পার হয়ে বুলগেরিয়ার খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করতে রওনা হন। সম্রাটকে শক্তি দিয়ে যেমনটা হাঙ্গেরিয়ানরা করেছিল,

রোমান গির্জায় সমর্পিত হতে বলেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে আমাডেও ফিরে যান এবং গ্রিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

সম্রাট আত্মসমর্পণ করেন এবং ১৩৬৯ সালে রোমে যাত্রা করেন। এখানে তিনি শপথ করে গোঁড়া গির্জাকে পরিত্যাগ করেন এর বিনিময়ে তুর্কিদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান রাজকুমারদের সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পান। কিন্তু কোনো সাহায্যও তো আসেইনি বরঞ্চ দেশে ফেরার পথে ভেনিসে ঋণের দায়ে বন্দি করা হয় তাঁকে। যখন তাঁর বড় ছেলে আন্দ্রোনিকাস মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করে, ছোট ছেলে ম্যানুয়েলও একই কাজ করে। কিন্তু রোমের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণকে কনস্টান্টিনোপলে কোনো সমর্থন দেয়া হয়নি। ফলে মুরাদের প্রজা হিসেবে আত্মসমর্পণের পরই তিনি মুক্তি পান।

ল্যাটিন গির্জার বিরুদ্ধে বলকান খ্রিস্টানদের এই ঘৃণার মনোভাব থেকে অটোমানরা ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। এই কারণে ক্যাথলিক গির্জার বিপরীতে গোঁড়াবাদকেই তারা সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে গ্রিক অথবা স্লাভ, সার্ব অথবা বুলগেরিয়ান যেই হোক না কেন প্রতিবেশীর চেয়ে অটোমান শাসনকেই পছন্দ করে বেশি আর সবার ওপরে হাঙ্গেরিয়ানরা যাতে তাদেরকে শাসন করতে না পারে, সে দিকেই লক্ষ রাখা হয়। এ জাতীয় মনোভাবের কারণেই মুরাদকে রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হতে পথটুকুকে সহজ করে দেয়। এর পূর্বে অটোমানদের জয় করা অঞ্চলের সংখ্যা ছিল সামান্য। কিন্তু ইউরোপে এসে এশিয়ার ক্ষেত্রে কয়েক গুণ বেশি জনসংখ্যা জয় করে নেয় তারা। অন্যদিকে এদের মাঝে জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত এবং রাজনৈতিক চরিত্রের দিক দিয়েও বৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি। কিভাবে এদেরকে সংমিশ্রণ করা যায়?– এটাই ছিল মুরাদের সমস্যা। এর সমাধান করতে গিয়েই তিনি একটি কার্যকর ও সফল রাষ্ট্র পরিচালনার চর্চা করতে থাকেন।

বলকানের খ্রিস্টান জনগণ ইসলাম সম্পর্কে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানত না। তাই এশিয়ার খ্রিস্টানদের মতো সহজেই ধর্মান্তরিত হতে রাজি হয়নি তারা। একই ভাবে মুরাদ এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যয় করছিলেন। বাড়তি সামরিক সম্পদ ও ছিল না। যার মাধ্যমে পুলিশি নিয়ন্ত্রণের আরো অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন খ্রিস্টান ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বিলোপ না করে। ফলে জোরপূবক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হলে খ্রিস্টানদের মাঝে অটোমানদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকেই যায়। এই কারণে বলকানের প্রজারাষ্ট্রসমূহে দেশীয় খ্রিস্টানদের মেনে নেয়ার নীতি গ্রহণ করেন মুরাদ। অটোমান সেনাবাহিনীতে সামরিক লোকদের জায়গা দিয়ে হাজার হাজার আঞ্চলিক খ্রিস্টান সৈন্যদেরকে নিয়োগ দেন তাদের নিজেদেরই রাজকুমার বা জমিদারের অধীনে। মুক্তি দেয়া হয় এবং বণ্টিত রাষ্ট্রীয় জমির সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়।

কিন্তু একত্রীকরণের সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রধানত কাজ করেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাসত্বপ্রথার নীতি। যেমনটা অটোমান তুর্কিরা তাদের ইতিহাসের শুরুর দিকে নিজেরাও অভিজ্ঞতা করেছিল। এই দাসত্বপ্রথা আরোপ করা হয়েছিল যুদ্ধবন্দি ও দখলীকৃত অঞ্চলসমূহের—জনগণের ওপর। একটি আইনের মাধ্যমের অটোমান সৈন্যকে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, যার মাধ্যমে সে তার বন্দিকে অধিকারে রাখতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বন্দিটি স্বেচ্ছায় ইসলামচর্চায় রাজি হয়। এক্ষেত্রে বন্দি লোকটিকে গৃহকাজ বা কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারত অথবা খোলা বাজারে বিক্রিও করে দিতে পারত। এটি নির্ভর করত মোট বন্দিদের ওপর বাজারমূল্যের পঞ্চমাংশের ওপর সরকারের অধিকারনুযায়ী। গ্রিকদের পক্ষে এই অবমাননা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। বাইজেন্টাইন সম্রাটরা দাসত্বপ্রথার বিলুপ্তির ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তুর্কি শক্তি এভাবে নির্দিষ্ট একটি হারে খ্রিস্টানদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিল, যারা স্বাধীনতার বিনিময়ে ধর্ম পরিবর্তন করতেই বেশি আগ্রহী ছিল।

কিন্তু প্রক্রিয়াটি ছিল স্থিতিস্থাপক। অনেক গ্রিক-ই সুযোগ পেয়েছিল ধর্মান্তরিত না হয়েও মুক্তি পাবার। এটি ঘটত সেসব শহরের ক্ষেত্রে যেখানে দাঙ্গা ছিল, কখনো কখনো শর্তসাপেক্ষ দখলীকরণে, আর বেশির ভাগ সময়ে মুরাদের সেনাবাহিনী দাসদের কাছ থেকে মুক্তিপণ পেয়ে তাকে মুক্তি দেয়াটাকেই অধিক পছন্দ করত। গ্রাম্য জেলাগুলোতে দাসত্বপ্রথার ভয় ছিল কম। পর্বতে আশ্রয় নেয়া ছিল সহজ আর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে কারো পিছু নেয়ার সময় ছিল কম। এ সমস্ত জমি তাদের জয় করে নেয়া বিজয়ী মালিকের অধিকারে চলে যেত। শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া জমিতে একটি নির্দিষ্ট করের বিনিময়ে অটোমান জমি মালিকদের প্রয়োজন ছিল তাদের জমি চাষবাসের লোক। আর এদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়।

অন্যদিকে নারীরা, যুদ্ধ বিধবা বা গ্রিক, সার্ব অথবা বুলগেরিয়াবাসীদের তরুণী কন্যা যাই হোক না কেন বিজয়ীদের স্ত্রী বা উপপত্নীতে পরিণত হয়। যাদের নিজের কোনো স্ত্রী ছিল না। এভাবে অটোমান জাতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মিশ্র রক্তের বংশধারা জন্মাতে থাকে। পূর্বদেশীয় রক্ত—তাতার, মঙ্গোল কার্কাশান, জার্জিয়ান, পারস্য এবং আরবীয় রক্ত, যা ইতিমধ্যে তুর্কিদের শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। তা এবার মিশে যায় বলকান জাতির রক্তের সাথে আর এর ফলে এক শতাব্দীর মাঝেই গ্রিক, রোমান এবং বাইজেন্টাইনের মতো বৈশ্বিক নাগরিক এক সভ্যতা গড়ে ওঠে।

অবশেষে এ ধরনের সাধারণ একটি ভূমিদাস প্রথার পাশাপাশি যেখান থেকে মুক্তি মিলত স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হলে বা অন্য পথে, মুরাদ নিজের

সেনাবাহিনীতে খ্রিস্টানদের মাঝ থেকে বেছে বেছে সৈন্য নিয়ে শৃঙ্খলিত একটি বাহিনী গড়ে তোলে যারা সুলতানকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা প্রদান করত। এদেরকে বলা হতো জানিসারিসদের বাহিনী বা "নতুন সৈন্যদল"। অর্খানের শাসনামলে এরা ছিল দেহরক্ষী আর মুরাদ এদেরকে মিলিশিয়া বাহিনীতে পরিণত করেন। ইউরোপে জয়ে করা খ্রিস্টান অঞ্চলসমূহের প্রতিরক্ষার কাজ করার জন্যই এদের প্রস্তুত করা হয়েছিল। বলপূর্বক ধর্মান্তরিত চর্চার ওপর নির্ভর করে প্রতিটি বিজয়ী অঞ্চল থেকে এই নীতির ওপর ভিত্তি করে সেনাবাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। কর প্রধানের মাধ্যমে সামরিক সেবাকাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার নিয়মটুকু একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত খ্রিস্টান বালকদের ক্ষেত্রে মানা হবে না। এদের মধ্য থেকে অটোমান প্রশাসকরা নির্দিষ্ট সৈন্যদের নিয়োগ দান করত। যাদেরকে তাদের পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুসলিম ধর্মে বড় করা হতো। তাদের কাজ ছিল সুলতানের কাজ করা, ব্যক্তিগতভাবেও তারা সুলতানের ওপর নির্ভর করত আর সুলতান তাদেরকে অন্যান্য সেনাদের চেয়ে বেশি অর্থ বেতন দিত। পৌরুষদীপ্ত শারীরিক গঠন, বুদ্ধিমত্তা, কঠোর প্রশিক্ষণ, সুশৃঙ্খল এবং যে কোনো কষ্ট করতে প্রস্তুত হওয়ার কারণে তারা ছিল সন্ন্যাসীদের মতো। বিয়ে করতে পারত না, নিজের জমি রাখতে পারত না, অথবা অন্য কোনো কাজ করতে পারত না। সুলতানের নির্দেশানুযায়ী সামরিক সেবা কাজেই তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করত।

খ্রিস্ট ধর্মের পরিবর্তে এরা বেড়ে উঠত দরবেশের বেকতাশী নিয়মানুযায়ী, যাদেরকে অর্খান অসম্ভব রকম মান্য করত। এ দরবেশের জন্য তিনি বার্সাতে আশ্রমও নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। দরবেশদের শেখ হাজী বেকতাশ নতুন সেনাবাহিনীকে আশীর্বাদ করত আর তাদের মর্যাদার চিহ্ন দিত। যেখানে অর্ধচন্দ্র ও ওসমানে দ্বিমুখী তলোয়ার অঙ্কিত থাকত। প্রথম সৈনিকের মাথার ওপরে নিজের কোটের হাতা রেখে শেখ এর ভবিষ্যৎ বর্ণনা করত "এর মুখমণ্ডল হয়ে উঠবে উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ, এর বাহু শক্তিশালী তলোয়ার হয়ে উঠবে, পিপাসার্ত, ধনুক হয়ে উঠবে তীক্ষ্ণধার। এটি সব যুদ্ধেই জয় হবে আর বিজয় ছাড়া কখনোই ফিরে আসবে না।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে জানিসারিসদের সাদা টুপি পদাতিক সৈন্যদের মাথায় শিরস্ত্রাণ—তাতে পালক লাগানো হয়। এ সেনাবাহিনীর পরিচয় চিহ্ন অন্যান্য সৈন্যদের চেয়ে তাদের জীবন যাত্রার উচ্চ মানকে নির্দেশ করত; এটি ছিল চামচ ও পাত্র। ক্যাম্পের রান্নাঘর থেকে এর অফিসারদের পদমর্যাদা চিহ্নিত হতো।—প্রথম স্যুপ প্রস্তুতকারক থেকে শুরু করে প্রথম রাঁধুনী, প্রথম পানি বহনকারী রেজিমেন্টের প্রধান পাত্র ছিল স্যুপ তৈরির পাত্র। এর চারপাশে জানিসারিসরা একত্রিত হতো। খাবার জন্য নয়, নিজেদের মাঝে আলোচনা করার জন্য।

ইউরোপের জনগণ পূর্ব থেকে আগত এসব তুর্কিদের নৈতিক অবক্ষয়মূলক এসব কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। যেখানে খ্রিস্টানদের ওপর রক্তের করারোপ করা হয়। তরুণদেরকে নিয়ে দাস বানানো হয়, পিতা-মাতার কাছ থেকে আলাদা করা হয়, অপরিচিত ধর্ম চাপিয়ে দিয়ে এক ধরনের অনুগত জীবন-যাপন পদ্ধতিতে বাধ্য করা হয়। এক্ষেত্রে বেতন-ভাতাকে সামরিক বয়সানুযায়ী ঠিক করা হয়। যেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাকে জীবন ধারণের উপাদান হিসেবে ঠিক করা হয়। এ শতাব্দীতে খ্রিস্টানরাও প্রায় অন্যদের সাথে তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হয়ে ওঠে নির্দয়। বলকান অঞ্চল হয়ে ওঠে এক ধরনের যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে খ্রিস্টানরা অনবরত তুর্কিদের হয়ে যুদ্ধ করে চলে।

একবার নাম নিবন্ধ হয়ে গেলে এসব তরুণের উচ্চ শ্রেণীর শারীরিক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করত। উচ্চশিক্ষা পেত, তাদের সামর্থ্যকে বাড়ানোর জন্য ব্যারাকের নিয়ম-কানুন ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে একটি সুস্থ সাম্যাবস্থা বিরাজমান ছিল আর ছিল জীবনব্যাপী সুনিশ্চিত বৃত্তি। ফলে নিজের রেজিমেন্টের প্রতি গড়ে ওঠে গর্বিত ভাব, সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং এক ধরনের একাত্মত্বাবোধ, যার ভিত্তি ছিল ধর্ম।

কারাকুলুকচুস বা কালো উর্দি-ধারী। জানিসারিসদের খাদ্য বহনকারী।

এ ধরনের সামরিক দাসত্ব প্রথায় খ্রিস্টান-বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু ইসলামিক বিশ্ব, বিশেষ করে তুর্কিদের সাথে তারা যথেষ্ট পরিচিত ছিল। এদের কাছে ক্রীতদাসোচিত সেবা পেয়েছে খ্রিস্টানদের পূর্ব ইতিহাস। আব্বাসীয় খলিফার আমলে মধ্য এশিয়ার অনুর্বর ভূমি থেকে অ-মুসলমান তুর্কিদেরকে ধরে নিয়ে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করা হতো অথবা দাস হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। তারপর ধর্মান্তরিত করে মুসলমান হিসেবে বাগদাদে সৈন্য অথবা প্রশাসক হিসেবে গড়ে তোলো হতো। ব্লড কাহেন লিয়ে গেছেন–"এ ধরনের দাসিদের যোগানের ফলে এদের পদমর্যাদা ছিল গৃহকর্মীদের তুলনায় অনেক ওপরে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে এদের রাখা হতো যে এতে তুর্কি জনগণ নিজেরাই কোনো সমস্যা বোধ করেনি বা ক্রোধান্বিত হয়নি। সে সময়ে দাসত্ব নিয়ে কারো মনে কোন ভাবের উদ্রেক হয়নি। যা পরবর্তীতে হয়েছিল।" এভাবে অনেক তুর্কি-ই পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে উঁচু সামরিক পদে অথবা প্রশাসনে আসীন হয়েছিল। সামানিড রাষ্ট্রে রাজবংশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের নতুন বংশধারা তৈরি করে তারা। দাস থেকে উদ্ভূত হয়ে রাজংবশের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তুর্কিরা একইভাবে সফল হয়েছিল মিসরে। তুলুনিডস এবং পরবর্তীতে মামলুক প্রথম দিকে সালাদীন এবং আয়ুবিদ রাজবংশের।

মুরাদের অধীনে অটোমানদেরকে একই সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। আরনল্ড টয়েনবি লিখে গেছেন, অনুর্বর ভূমির এক ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে তুলে নিয়ে একটি আঞ্চলিক সম্প্রদায়কে স্থাপন করা হয় অপরিচিত পরিবেশে। যেখানে তারা পূর্বের প্রকৃতির বন্দিত্ব থেকে রেহাই পায়। কিন্তু আরো একটি গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়; তা হলো অপরিচিত মানব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করা।

অন্যান্য যাযাবর জাতি যারা একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। এর সমাধান করে সহজভাবে মেষপালক থেকে মানব পালকে পরিণত হয়।

এক্ষেত্রে সাধারণভাবে সবাই অনুত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু অটোমানরা ইতিহাসে এক্ষেত্রে নিজেদের অন্যন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে। মানুষ পাহারাদার কুকুর খুঁজে নিয়ে, তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষ মেষপাল এবং তাদেরই মানুষ প্রতিবেশীকে নজরে রাখার চর্চা শুরু করে তারা। এই মানব সহকারীরা ছিল খ্রিস্টান দাস। সুলতান মুরাদ, সামরিক বিস্তারের মাধ্যমে দাসপ্রথার ওপর নির্ভর করে অটোমান সাম্রাজ্যে এক ধরনের শাসন করার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন জানিসারিসদের নিয়ে। এভাবে সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ততা ধীরে ধীরে সরকারি কাজের প্রতিটি ক্ষেত্র ছড়িয়ে যায়। আর এভাবেই সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান অংশটুকুকে এখন প্রশাসকরা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে যাদের প্রায় পুরোপুরি

খ্রিস্টান অতীত বা শিকড় আছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মুসলমান শাসকদের যাত্রা শুরু হয় যারা তাদের মুসলিম বা খ্রিস্টান প্রজার ওপর শাসন করা শুরু করে খ্রিস্টান প্রতিনিধিত্বের (ageney) মাধ্যমে।

ইতিমধ্যে জানিসারিসদের ছোট্ট, দক্ষ সেনাদলটি যারা ছিল রোমান প্রায়োটোরিয়ান গার্ডদের মতো। এ সময়কার অন্য খ্রিস্টান সামরিক বাহিনীতে যাদের জুড়ি মেলা ছিল ভার, বলকান অঞ্চলে মুরাদ এবং তাঁর জেনারেলদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলে। আর বিজয়ী অঞ্চলসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বসতি স্থাপনেও কাজ করত তারা।

থ্রেস জয় করার ফলে অটোমান সেনাবাহিনীর কাছে বুলগেরিয়া এবং মেসিডোনিয়াতে যাওয়ার পথ খুলে যায়। একত্রীকরণের জন্য যথোপযুক্ত একটি বিরতির পর মুরাদ বুলগেরিয়া আক্রমণ করেন। বিভিন্ন বিষয় থেকে তিনি লাভবান হয়েছিলেন। যেমন জারের মৃত্যুর পর তিনজন রাজকুমারের মধ্যে পাস্পরিক শত্রুতার কারণে দেশটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাজকুমার সিসমান এবং তাঁর দুই ছোট ভাইয়ের মাঝে বিভক্তি এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, একটি প্রজন্ম ধরে দেশটিকে বলা হতো তিনটি বুলগেরিয়া। মুরাদ পক্ষে আরো একটি বিভক্তি সহায়তা করে। হাঙ্গেরি পশ্চিমবুলগেরিয়াতে আঘাত হানে একটি ক্রুসেড, যা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে পোপের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পরিচালিত হয়েছিল। এতে ফ্রান্সিসকান মিশনারীরা জোর পূর্বক দুইশ হাজার বুলগেরীয় জনগণকে গোঁড়ামি ত্যাগ করে ল্যাটিন আচার গ্রহণে বাধ্য করে। তাদের অত্যাচার এতটাই তীব্র ছিল যে এর প্রেক্ষিতে মুসলিম অভিযানকে অনেকটাই স্বাগত জানায়; এতে করে অন্তত তাদের উপাসনার স্বাধীনতা বজায় থাকবে।

১৩৬৬ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় তিন বছর সময়কালে অটোমানরা মারিতজা উপত্যকার প্রায় সবটুকু এবং দক্ষিণ বুলগেরিয়ার অধিকাংশ অংশ নিজেদের দখলে আনে। সিসমান জন পালাইয়োলগের মতোই মুরাদের প্রজায় পরিণত হন। তাঁর কন্যাও ধর্মান্তরিত না হওয়ার শর্তে সুলতানের উপপত্নীতে পরিণত হয। অটোমান সেনাবাহিনীর সহায়তায় হাঙ্গেরিয়ান সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করতে পারলেও যেমনটা আশা করেছিলেন তেমনভাবে নিজের ছোট ভাইয়ের অঞ্চল দখল করতে পারেননি। ১৩৭১ সালে সার্বীয়ার সহায়তার তুর্কিদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ও সামকোভের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে চলে যান। সোফিয়ার পূর্বে বিশাল সমভূমিতে যাওয়ার পথ তুর্কিদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু সোফিয়া দখলে মুরাদের কোন তাড়াহুড়ো ছিল না। তিনি কোনো মামুলি লুণ্ঠনকারী ছিলেন না, ছিলেন সাম্রাজ্য নির্মাতা। নিজের এই নীতির

প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই সুগঠিত কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে নিজের বাকি অঞ্চলসমূহকে সুরক্ষিত করেন। সার্বীয়ার বিপক্ষে ভার্ডার এবং স্ট্রুমা উপত্যকাকে দখল করেন। এভাবে মেসিডোনিয়ায় আক্রমণের নির্দেশ দেন।

অন্তগর্তদ্বন্দ্বের কারণে মেসিডোনিয়া এবং সার্বীয়ার অবস্থা বুলগেরিয়ার চেয়েও খারাপ ছিল। ১৩৫৫ সালে কনস্টান্টিনোপলে যাত্রার প্রাক্কালে স্টিফেন দুশনের মৃত্যু ঘটে। তার পুত্র সাম্রাজ্যের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার সৃষ্টি করে। ১৩৭১ সালে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সার্বীয়ান সেনাবাহিনী আবারো মারিতজা নদী অভিমুখে অগ্রসর হয়। সার্নোমেন নামক জায়গায় এসে অটোমান সেনাবাহিনী এদেরকে পরাজিত করে এবং তিনজন রাজকুমার ডুবে মারা যায় অথবা খুন করা হয়।

এক দশক পূর্বে থ্রেসের মতই পূর্ব মেসিডোনিয়াও দ্রুত জয় করা সম্ভব হয়। এর শহরদ্বয় ড্রামা এবং সেরেসে অটোমানরা নিরাপদে বসতি স্থাপন করে এবং গির্জাগুলোকে মসজিদে পরিণত করা হয়। স্ট্রুমা উপত্যকার চারপাশের গ্রাম এবং শহর ও অটোমান সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। অন্যদিকে জঙ্গলপূর্ণ জেলাগুলোতে সার্বীয়ানরা অটোমানদের প্রজায় পরিণত হয়। ১৩৭২ সালে অটোমান সেনাবাহিনী ভার্ডার নদী অতিক্রম করে। উপত্যকার পূর্ব দিকের জনগণ অটোমান পতাকা তলে চলে আসে। উত্তর দিক রাজকুমার লাজারের হাতে থাকে, যিনি সার্বীয়ান রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। খুব বেশি মানুষ তাঁকে রাজা হিসেবে মেনে নেয়নি। এভাবেই স্টিফেন দুশনের মেসিডোনিয়া সাম্রাজ্যের সমাপ্তি রচিত হয়।

এই সফল অভিযানের পর স্থির হওয়ার জন্য মুরাদ আরো দশ বছর আক্রমণ পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকেন। উপলব্ধি করেন যে হাঙ্গেরিকে এখনই আক্রমণ করাটা ঠিক হবে না। এর পরিবর্তে আনাতোলিয়ার দিকে মনোযোগ দেন। কিন্তু তিনি ইউরোপে ফিরে আসতে বাধ্য হন, যখন তাঁর ঘৃণ্য পুত্র কুন্ডুজ সম্রাট জনের বড় পুত্র আন্ড্রোনিকাসের সাথে কঠিন মৈত্রী গড়ে তোলে। কুন্ডুজ এবং আন্ড্রোনিকাস নিজ নিজ পিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন জন্য থ্রেসের অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু ডেমোটিকায় তাদের দুজনকেই বন্দি করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। দুজনকেই একত্রে বেঁধে শহরের দেয়াল থেকে মারিতজা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। তারপর মুরাদ নিজ সন্তানের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেন ও তার গলা কেটে ফেলে হয়। এছাড়াও মুরাদ নির্দেশ দেন যে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি তরুণ তুর্কির পিতারাও যেন তাদের নিজ পুত্রদেরকে একইভাবে বেঁধে হত্যা করে। প্রত্যেকেই তাই করে। কিন্তু দুজনে ব্যতীত, যারা আত্মহত্যা করেছিল। মুরিদ নিজের সন্তানের চোখ তুলে নিয়েছিলেন। অন্যরাও তাই করেছে। মুরাদ এরপর সম্রাটকেও চাপ প্রয়োগ

করে একইভাবে নিজের বিদ্রোহী পুত্র এবং পৌত্রের চোখ তুলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু এটি করা হয়েছিল গরম সিরকার সাহায্যে—প্রক্রিয়াটি যথার্থ হয়নি। তাই তারা পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল। এর মাধ্যমে মুরাদের স্বার্থ রক্ষা পায়। আন্দ্রোনিকাস তাঁর পিতার সাথে কনস্টান্টিনোপলে অটোমান স্বার্থ রক্ষায় কাজ শুরু করে।

এর কিছুদিন পরই সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র ম্যানুয়েল বিদ্রোহ করে। সালোনিকার গভর্নর হিসেবে সেরেসে মুরাদের প্রশাসন বাতিল করার জন্য ম্যানুয়েল একটি নাটকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় ম্যানুয়েল কনস্টান্টিনোপলে পালিয়ে যায়। অটোমান সেনাবাহিনী সালোনিকা দখল করে নেয়। কিন্তু মুরাদের ভয়ে ম্যানুয়েলের পিতা পুত্রকে অস্বীকার করেন। ফলে ম্যানুয়েল বাধা হয় বার্সাতে মুরাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করতে। সুলতান দয়ালু হয়ে ম্যানুয়েলকে ক্ষমা করে দেন আর এভাবে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে পিতার সাথে আসীন করেন।

এই সব ডামাডোলের মাঝে আন্দ্রোনিকাস তার পিতা তাকে যে টাওয়ারে বন্দি করে রেখেছিল সেখান থেকে মুক্ত হয়ে যান। জেনোইস এবং অটোমান সেনাবাহিনীকে সাথে করে কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করেন এবং একই টাওয়ারে পিতা ও ছোট ভাই ম্যানুয়েলকে বন্দি করেন, নিজেকে সম্রাট চতুর্থ আন্দ্রোনিকাস হিসেবে ঘোষণা করেন। তিন বছর পর সম্রাট ছোট পুত্রকে নিয়ে বন্দিদশা থেকে পালিয়ে বসফরাসে চলে গেলেও শীঘ্রই সুলতানের সামনে তাদের পেশ করা হয়। উভয় পক্ষকে নিজের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করেন মুরাদ এই বাইজেন্টাইন রাজবংশীয় যুদ্ধে। আন্দ্রোনিকাসকে ক্ষমা করে সালোনিকার গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ম্যানুয়েল ও তাঁর পিতাকে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসান বিপুল অঙ্কের বার্ষিক করপ্রাপ্তির নিশ্চয়তায়। এছাড়াও সম্রাট প্রতিজ্ঞা করেন যে বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীর একটি অংশ অটোমান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবে আর এশিয়াতে শেষ বাইজেন্টাইন শহর ফিলাডেলফিয়াকে অটোমানদের হাতে সমর্পণ করার প্রতিজ্ঞাও সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করে নেন সুলতান। কিন্তু ফিলাডেলফিয়াবাসী বাধা দিলে জন এবং ম্যানুয়েল এ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়েন মুসলিম শাসন কায়েম করার জন্য। একজন বাইজেন্টাইন সম্রাটের প্রভাবেই চূড়ান্ত অবনতি ঘটে, যখন তিনি তুর্কি সুলতানের দয়া এবং বদান্যতায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেষ্টা করেন।

এরপরও বলকানে মুরাদের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য তিনটি শহর রয়ে যায় উত্তর বুলগেরিয়া থেকে দানিয়ুব পর্যন্ত দখলে রাখার সোফিয়া শহরটি, সার্বিয়ার চাবিকাঠি হিসেবে নিশ শহর এবং মনাস্তির শহর, যার মাধ্যমে

ভার্ডারের পশ্চিম উপকূলে অটোমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এশিয়া অভিযানে থেকে ফিরে আসার ছয় বছরের মধ্যে, মুরাদের জেনারেলরা এই সব কয়টি উদ্দেশ্য অর্জন করে। ১৩৮০ সালে মনাস্তির শহর অটোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত বর্তী দুর্গে পরিণত হয়। যদিও অটোমান সেনাবাহিনী পার্শ্ববর্তী আলবেনিয়া এবং ইপিরাস অভিযানের উদ্যোগ নেয়নি, তথাপি এসব অঞ্চলেও তারা প্রবেশ করে স্থানীয় রাজকুমারদের অনুরোধে। নিজস্ব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অটোমান সহায়তা তাদের প্রয়োজন ছিল।

সার্বীয়াতে অগ্রসর হবার জন্য সোফিয়ার সমভূমি অর্জন করাটা অটোমান সাম্রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এর অবস্থান ছিল বলকানের একেবারে কেন্দ্রে। ১৩৮৫ সালে কোনো রকম যুদ্ধ ছাড়াই সোফিয়ার পতন ঘটে। এর ফলে মোরাভাতে সার্বীয়ার শহর নিশে এ প্রবেশের দরজা খুলে যায়। পরবর্তী বছর এ শহরেও একটি যুদ্ধের পর অটোমান শাসন কায়েম হয়।

ইউরোপে মুরাদ প্রধান ছয়টি বলকান শহরের প্রভু হিসেবে কনস্টান্টিনোপল থেকে বেলগ্রেড পর্যন্ত প্রাক্তন রোমান মহাসড়কের চার-পঞ্চমাংস অংশ নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। এর সাথে আরো ছিল বেলগ্রেড থেকে সালোনিকা পর্যন্ত একটি অংশ। এভাবে প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় বসফরাস থেকে আদ্রিয়াটিক পর্যন্ত সড়কপথে যাত্রার শেষ দিনের যাত্রা করতে হতো অটোমান ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে। অ্যাঙ্গোরা থেকে বসফরাস পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণের ক্ষেত্রে মোট প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় বেয়াল্লিশ দিন। অথচ সাতাশি বছর পূর্বে এর পরিধি ছিল মাত্র তিন দিন।

১৩৩৫ সালে আদ্রিয়াটিক উপকূল অঞ্চল ভবিষ্যৎ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে মুরাদ নিশ্চয়তা পান। এ সময় রাগুসান প্রজাতন্ত্র থেকে একটি বাণিজ্যিক চুক্তির প্রস্তাব আসে। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে অটোমান ও অন্যান্য শক্তির মাঝে আলোচনা করা হয়েছে এ রকম চুক্তির মাঝে এটাই ছিল প্রথম। নির্দিষ্ট বার্ষিক কর প্রদানের বিনিময়ে রাগুসান সাম্রাজ্যের ভেতরে বাণিজ্য করার অধিকার এবং কোনোরূপ অটোমান হস্তক্ষেপ ছাড়া গভীর সমুদ্রে যাত্রা করার অধিকার পায়। মুরাদ এ চুক্তিটি সই করার সময় খেলাপড়া না জানা সাপেক্ষে টিপসই দিয়ে ছিলেন। তুগরা-র সূচনা হয়, যা এভাবেই ক্যালিগ্রাফিক রীতিতে পরবর্তীতে ওসমান হাজিজের সকল সুলতানের সরকারি সিলে পরিণত হয়।

মুরাদ দুটি ভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধ করেছিলেন। একটি এশিয়াতে অন্যটি ইউরোপে। একটি ক্ষেত্রের উন্নতি অপরটিতে উন্নতি ডেকে আনতে থাকে। এশিয়াতে তাঁর প্রয়োজন ছিল নিজের শাসন ক্ষেত্রকে বাড়ানো ও সুরক্ষিত করা। আনাতোলিয়ার কেন্দ্রে অবস্থিত অ্যাঙ্গোরা দখল করার পর ইউরোপে

মনোনিবেশ করে। সুচতুরতার সাথে মুরাদ বুঝতে পেরেছিলেন যে বলকানের লোকবল ও সম্পদের অর্থের মাধ্যমে আর এর খ্রিস্টান উপাদানের একত্রীকরণের মাধ্যমে এশিয়া মাইনরকে একত্রিত করা যাবে। মোটকথা খ্রিস্টান ক্রুসেড ছিল মুরাদের ভীতির কারণ। বলকান দখলের মাধ্যমে এ ভয় দূর হয়। দক্ষিণ স্লাভদের হাঙ্গেরির সাথে সমস্যা দেখা দেয়, সার্বীয়াতে অরাজকতা, বুলগেরিয়াতে নেতার অভাব, আর বাইজেন্টাইন ভেঙে পড়ে রাজবংশীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে। পরবর্তীতে মেসিডোনিয়া অর্জনের পরই মুরাদ ইউরোপ থেকে এশিয়াতে সেনাবাহিনী স্থানান্তরকে নিরাপদ মনে করতে থাকেন।

বস্তুত এশিয়া মাইনরে নিজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কোন রকম যুদ্ধ ছাড়াই পূর্ণ করেন। জারমিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল যেখানে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর কুটাইয়ার অবস্থান ছিল, মুরাদ নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন নিজের পুত্র বায়েজীদের সাথে এই শহরের আমিরের কন্যার সাথে বিবাহের মাধ্যমে। এছাড়া একটি সম্পূর্ণ ভূখণ্ড যৌতুক হিসেবেও দেয়া হয় বায়েজীদকে। এর পরে মুরাদ হামিদের অঞ্চলসমূহ অধিকার করেন। এর অবস্থান ছিল জারমিয়া ও কারামানিয়ার মাঝখানে। এ অঞ্চল এর আমিরের কাছ থেকে ক্রয় করেন মুরাদ। এর দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চল টেক্কি দখলের জন্য মুরাদকে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু এর হ্রদ অঞ্চলের চারপাশে অবস্থিত উচ্চভূমি জয় করেই মুরাদ সন্তুষ্ট হন এবং এর দক্ষিণ উপত্যকা ও টরাস পর্বতমালা ও ভূমধ্যসাগর সাগরের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি টেক্কির আমিরকে ছেড়ে দেন।

যখন সময় আসে বৃহৎ এবং ভয়ানক কারামানিয়ার অঞ্চলসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার, মুরাদ কুতাইয়াতে বায়েজীদের নেতৃত্বে সৈন্য সমাবেশ করেন। এদের মাঝে ছিল গ্রিক, সার্বীয়া ও বুলগেরিয়ার সৈন্যরা। এদের চালনা করা হতো সম্রাট জন ও সৈন্যদের নিজ নিজ শাসনকর্তার সাথে করা শান্তিচুক্তির সহায়তায়। ১৩৮৭ সালে বাধে যুদ্ধ। কন্যার আগে অবস্থিত সমভূমিতে। এর ফলাফল অমীমাংসিত প্রমাণিত হয়, কেননা উভয় পক্ষই জয়ের দাবি করতে থাকে। মুরাদ কোনো অঞ্চল পাননি, কোনো লুণ্ঠনদ্রব্য, সামরিক সহায়তা বা কারো নিশ্চয়তা কিছুই পাননি। বলকান খ্রিস্টানদের বিপক্ষে জয়ী মুরাদ এভাবেই তাঁর সমকক্ষ মুসলিম রাজকুমারের দেখা পান এবং এশিয়াতে নিজের রাজসীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হন।

পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধ তাঁকে বলকানে আরেকটি অভিযানে নিযুক্ত করে। এশিয়া মাইনরের মুসলিমদেরকে অসন্তুষ্ট না করার জন্য মুরাদ নিজের সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন কোনো প্রকার লুটপাট বা হাঙ্গামা না করতে। কিন্তু এই নির্দেশ সার্বীয়ার সেনাবাহিনীর যে অংশ মুরাদের সেনাবাহিনীতে কাজ করে

তাদের খেপিয়ে তোলে; যারা লুণ্ঠনদ্রব্যকে যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী সৈনিকের প্রাপ্য বলে মনে করে। এভাবে তাদের অনেকেই এ নিয়মের লঙ্ঘন করে আর জায়গাতেই তাদেরকে মেরে ফেলা হয়। বাকি সৈন্যরা সার্বীয়াতে ফিরে যায় এবং তাদের সাথিদের সাথে করা দুর্ব্যবহারের দাওয়াই খুঁজতে থাকে। এই সুযোগে সার্বীয়ার রাজকুমার লাজার এক ধরনের প্যান-সার্বীয়ান মৈত্রী জোট গড়ে তোলেন বসনিয়ার রাজকুমারের সহায়তায়, যার ক্ষমতা আড্রিয়াটিক উপকূলে অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর উত্তরে অটোমানরা ভার্ডার নদী পার হতে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, পরাজিত হয় এবং সেনাবাহিনীর চার-পঞ্চমাংশ অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অটোমান বিজয়গাথার এই ছন্দপতনে বলকানের স্লাভ জনগোষ্ঠী সার্বীয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, ওয়ালাসিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহ বন্য উল্লাসে মেতে ওঠে। সবাই এসে লাজারের পাশে একত্রিত হয়, যা পূর্বে আর কখনোই হয়নি। সবাই একই লক্ষ্যে অগ্রসর হয় আর তা হলো ইউরোপ থেকে তুর্কিদেরকে বিতাড়িত করা।

মুরাদ এশিয়া মাইনরেই থেকে যায়। নিজের পরাজয়ের জন্য তাড়াহুড়া করে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রসর না হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এটা দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য যে শত্রুরা প্রাথমিক উল্লাস আর আত্মবিশ্বাস ভেঙে যাওয়ার পরে কতটা দিন একত্রিত থাকতে পারে। পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং নিজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে মুরাদ ভালোভাবেই জানতেন যে স্লাভ জাতিসমূহের মাঝে সৌহার্দ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

এভাবে সার্বীয়দের বিরুদ্ধে আরো একবার অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ১৩৮৮ সালে বুলগেরিয়া অভিযান সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অগ্রসর হন। রাজকুমার সিসমান শেষ একবার চেষ্টা করেন অটোমানদের প্রতিহত করতে। কিন্তু অটোমান শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে বন্দি হন। ফলাফলস্বরূপ অটোমান সেনাবাহিনী দানিয়ুবের উপরেই উত্তর এবং মধ্য বুলগেরিয়াতে শাসন প্রতিষ্ঠা করে। দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অবস্থিত বিভিন্ন দুর্গের শাসন ক্ষমতা নিয়ে বলকান পার্বত্যাঞ্চলে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয় অটোমান সৈন্যরা। রাজকুমার সিসমানের অবস্থান আর এতটা শক্তিশালী থাকে না, যার মাধ্যমে তিনি স্লাভ বন্ধু রাষ্ট্রকে সহায়তা করতে পারেন।

এভাবে বুলগেরিয়া জয় করে সত্তর বছর বয়সে বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে সুলতান মুরাদ সার্বীয়ার দিকে অগ্রসর হন। স্বাধীন সার্বীয়ার ভাগ্য নির্ধারণের এই যুদ্ধ হয় কসোভোর জনশূন্য প্রান্তরে কৃষ্ণপাখির সমভূমিতে (Plain of the Blackbirds)—এ স্থানটিতে সার্বীয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া এবং হারজেগোভিনার সীমান্ত এক হয়ে মিশেছে। সার্বীয়া ও তার মিত্র শক্তির

তুলনায় অটোমান সেনাবাহিনী সংখ্যায় ছিল কম, কিন্তু নৈতিকভাবে ও আত্মবিশ্বাসে ছিল ভরপুর। মুরাদ বিজয় নিয়ে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে দূরদৃষ্টিতার বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন যুদ্ধের সময়ে কোনো রাজপ্রাসাদ শহর বা গ্রাম ধ্বংস না হয়। একটি সমৃদ্ধ দেশের অধিকার পাওয়ার জন্য এর সম্পদ যাতে না নষ্ট হয়, সেদিকে কড়া নির্দেশ ছিল তাঁর।

অন্যদিকে সার্বীয়ানদের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব ছিল এবং নিজের সেনাবাহিনীতে বিশ্বাসঘাতকও ছিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে এক প্রকাশ্য বক্তৃতায় রাজুকমার লাজার যার মাঝে সব সময় প্রশাসনের কমতি ছিল, এখন আত্মবিশ্বাসেরও অভাব দেখা যায়, নিজের জামাতাকে রাজদ্রোহী আখ্যা দেন। মুরাদ বাতাসের গতিপথ নিয়ে সংশয়ে ছিলেন। বাতাস শত্রুর দিক থেকে বইছিল, অটোমানদের চোখে তাহলে ধুলা পড়ার আশঙ্কা ছিল। প্রমাণ আছে যে, সারা রাত্রি জুড়ে তিনি স্বর্গীয় আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করেন এবং সত্যিকার বিশ্বাসের জন্য শহীদের মতো মৃত্যু কামনা করেন।

পরদিন সকালে বাতাস থেমে যায়। অটোমান সেনাবাহিনী নিজস্ব রীতিতে যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মাঝখানে থাকেন সুলতান জানিসারিস ও অশ্বারোহীদের নিয়ে, ডান দিকে বড় সন্তান বায়েজীদ নিজের ইউরোপীয় সেনাবাহিনী ও বাম দিকে ছোট সন্তান ইয়াকুব নিজের এশীয় সেনাবাহিনী নিয়ে পিতার পাশে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। দুই হাজার তীরন্দাজ অটোমানদের পক্ষ থেকে প্রথম আক্রমণ করে। সার্বীয়রা প্রতিউত্তরে এত প্রচণ্ড আক্রমণ করে অটোমানদের বাম পাশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বায়েজীদ ডান পাশ থেকে সরে এসে তুমুল আক্রমণ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে শত্রুদের ধ্বংস করতে থাকেন। লাজারের অপর জামাতা, হতে পারে মুরাদের সাথে তার পূর্ব ব্যবস্থা করা ছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের বারো হাজার সৈন্য নিয়ে চলে যান। তার পিছু হটার ঘটনা সার্বীয়দের এতটাই দুর্বল করে ফেলে যে তারাও নিজেদের অবস্থান থেকে পালিয়ে যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে স্লাবদের অনৈক্য নিয়ে মুরাদের পূর্ব ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আক্ষরিক অর্থেই মঞ্জুর হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই মর্মান্তিক বেদনাবিধুর ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। যা পাওয়া গেছে বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে। ঘটনাটি ঘটিয়েছে লাজারের জামাতা। নিজের শ্বশুরের কাছ থেকে যে রাজদ্রোহী তকমা পেয়েছিল। নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য কাজটি করে সে। অটোমান সেনাবাহিনীতে পালিয়ে যাওয়ার ভান করে লাজারের জামাতা মুরাদের কাছে নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী একটি উচ্চ পদ দাবি করেন। যখন মুরাদ এ দাবি মেনে নেন, মিলশ্ সুলতানের সামনে হাঁটু গেড়ে বশ্যতা স্বীকারের অভিনয়

করে আর সুলতানের বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দেয়। পালিয়ে যাওয়ার পূর্বেই অটোমান সৈন্যরা তাকে হত্যা করে। কিন্তু যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত মুরাদ বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কাজ ছিল লাজারের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা।

এভাবে বিজয়ের মুহূর্তে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ শাসকের জীবনাবসান ঘটে। মাত্র এক প্রজন্মের মাঝেই মুরাদ তাঁর পিতার অটোমান রাষ্ট্রকে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করেন, যার ভাগ্যই ছিল পৃথিবীর বুকে স্থায়ী হয়ে শক্তিশালী হিসেবে রাজত্ব করা।

মুরাদ কোনো তুচ্ছ যোদ্ধা ছিলেন না। যুদ্ধকলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দক্ষ। কৌশল প্রস্তুতে সুদক্ষ ছিলেন দশা। কৌশল প্রস্তুতে সুদক্ষ বস্তুত নির্দয়ও ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে, নিজের সেনাপ্রধানদের প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু তার শক্তি নিহিত ছিল শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করেছে। যুদ্ধে জয় করার পর তিনি সব সময় চিন্তা করতেন কিভাবে একটি খ্রিস্টান অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে যতটা সম্ভব কম বাধার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইউরোপীয় ভূমিতে অটোমানদের প্রতিষ্ঠিত কোনো সরকার বা প্রশাসনই খাপ খায় না। তাই প্রয়োজন ছিল নতুন ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা– সময়, পরিবেশ এবং রীতি অনুযায়ী। আর মুরাদের শাসনামলেই এগুলো সম্ভব হয়েছে। যিনি নিজের প্রশাসকদের সেনাপ্রধানদের মতোই বিশ্বাস করতেন।

নিজের শত্রুদের মানসিক গঠন লক্ষ করতেন মুরাদ। হোক সেটা গ্রিক অথবা স্লাভ। নিজের ধর্মবিশ্বাসে কট্টর মুসলমান হলেও নিজের সাম্রাজ্যে "অবিশ্বাসী" খ্রিস্টানদের প্রতি তিনি ছিলেন সহনশীল। কোনো খ্রিস্টানের ওপর নির্যাতন করতেন না এবং জানিসারিস ব্যতীত কাউকেই ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি। ১৩৮৫ সালে অর্থডক্স ধর্মনেতা নিজে এক পত্রে পোপকে জানায় যে সুলতান তার গির্জাকে কাজ করার পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছেন।

এই ধরনের সাদৃশ্যকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুরাদ একটি বহুজাতিক বহুধর্মের বহু ভাষা-ভাষীদের একটি সমাজের বীজ বপন করে যান, যা তাঁর পরবর্তী শাসকদের আমলেও যথাযথভাবে কাজ করে যায়। নিজের কৃতিত্বেই অটোমান সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যের যথাযথ উত্তরসূরি হিসেবে প্রমাণিত হয়। রোমান সাম্রাজ্যের মতোই অটোমান সাম্রাজ্যেও বিদেশিদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান করত। নিজেদের রীতিতে মানিয়ে নিয়ে এই বিদেশিদেরকে উৎসাহিত

করত সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের এবং সাম্রাজ্যের প্রগতিতে কাজ করার জন্য। এর মাধ্যমে সুলতানের সাম্রাজ্যে খ্রিস্টান বংশোদ্ভূতরাও মুসলিম বংশোদ্ভূতদের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা পেত ও রাষ্ট্রের সবচেয়ে উচ্চ কর্মস্থলেও কাজ করতে পারত। এটি পরবর্তীতে একটা চর্চার মতো হয়ে দাঁড়ায়, যা প্রফেসর টয়েনবীর ভাষায় "এটিই রোমানদেরকে প্রথম সাম্রাজ্য গড়ে তুলে, পুনরায়—আবার এবং তারপরেও এ সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানে সক্ষম করেছে।" এই নীতির কারণে টয়েনবীর মতে, অটোমানরা এমন একটি সাম্রাজ্য মধ্যপ্রাচ্য এবং এর কাছাকাছি গড়ে তুলেছে যে প্রকৃত রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের মতোই।

॥ ৪ ॥

মুরাদের হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজেকে মুরাদের উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষণা করে। এ সময় বায়েজীদ ছিলেন কসোভার যুদ্ধ ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রের কাউন্সিলের ওপর থেকে চাপ, সিংহাসনের দাবিদার নিয়ে দ্বন্দ্ব এসব কিছু মীমাংসা করার জন্য সুলতান হিসেবে বায়েজীদ প্রথমেই নির্দেশ দেন নিজের ছোট ভাই ইয়াকুবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য। নিজের সৈন্যবাহিনীর মাঝে ইয়াকুবের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। এভাবে বায়েজীদ সাম্রাজ্যের মাঝে ভ্রাতৃহত্যার একটি চর্চা স্থাপন করেন, যা অটোমান রাজবংশের ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছিল।

পরবর্তী শতাব্দীতে এ অমানবিক ঐতিহাসিক আইনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন বায়েজীদের উত্তরসূরি দ্বিতীয় মাহমুদ, যিনি নিজের ছোট ভাইকে শিশু অবস্থায় পানিতে চুবিয়ে হত্যা করেন। পরবর্তীতে অটোমান নেতারা সিংহাসনে আরোহণের ক্ষেত্রে এ নিয়মের প্রতি ছিল নমনীয়। এভাবে সাম্রাজ্যের অবিভক্ত সার্বভৌমত্ব এবং রাজবংশের অখণ্ডতা বজায় থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে।

শীঘ্রই এ ব্যাপারে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে বায়েজীদ নিজের পিতার মতো ধীরস্থির স্বভাবের খুব কমই নিজের মাঝে ধারণ করতেন। স্বভাবের দিক থেকে দ্রুত এবং প্রচণ্ডতার কারণে একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পূর্বসূরিদের তৈরি করা অনেক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটান বায়েজীদ। অন্যদিকে একজন সেনানায়ক হিসেবে বায়েজীদ ছিলেন সুদক্ষ। যুদ্ধ করার প্রতি তাঁর তৃষ্ণা ছিল অদম্য। ইউরোপ এবং এশিয়াজুড়ে এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে তিনি নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে এত দ্রুত ছুটে বেড়াতেন যে, তাঁকে "বিজলী" বা "বিদ্যুৎ চমক" হিসেবে অভিহিত করা হতো।

সুলতান প্রথম বায়েজীদ (১৩৮৯-১৪০২), যাঁকে 'বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর' নামে অভিহিত করা হতো। এছাড়াও গাজী বা সত্য বিশ্বাসের যোদ্ধা উপাধি ও লাভ করেছিলেন। এ উপাধি তাদেরকেই দেয়া হতো, যারা অ–মুসলিম ভূখন্ডে ইসলামের রাজত্ব বৃদ্ধি করেছিলেন।

ইউরোপে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বায়েজীদ পাইকারি হত্যাযজ্ঞে মতে উঠেন। এর ফলে কসোভোর যুদ্ধক্ষেত্রে সার্বীয়ান সেনাবাহিনীর সকল প্রকার মহত্ত্ব ধুয়ে মুছে যায়। এরপর বায়েজীদ প্রিন্স লাজারের পুত্র স্টিফেন বালকোভিটজ্রে সাথে এক প্রকার সমঝোতায় আসেন। বায়েজীদ বুঝতে পারেন যে সার্বীয়ান সেনাবাহিনী অটোমানদের জন্য হুমকির কারণ নয়। বরঞ্চ সার্বীয়ান সেনাবাহিনীর সহায়তা তাঁর দরকার—যেমনটা মুরাদ এশিয়া মাইনর অভিযানের সময় করেছিলেন—দানিয়ুব উপত্যকার প্রতিরক্ষার জন্য হাঙ্গেরিয়ার বিপক্ষে সার্বীয়া অটোমানদেরকে সাহায্য করবে। তাই তিনি স্টিফেনের সাথে আনন্দের সাথেই মৈত্রী জোটে আবদ্ধ হন; যা তাঁর পুরো শাসনকালব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। সার্বীয়া অটোমানের সাথে একীভূত হয়ে যায়নি; কিন্তু একটি স্বাধীন প্রজারাষ্ট্র হিসেবে কাজ শুরু করে। স্টিফেন বার্ষিক কর প্রদানের বিনিময়ে তার পিতার মতোই সমস্ত সুখ-সুবিধা ভোগ করত। বায়েজীদের সাথে স্টিফেন নিজের বোন ডেসপিনার বিবাহ দেন, অটোমান সেনাবাহিনীর একটি অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে সার্বীয়ার সেনাবাহিনী, অটোমান বাহিনীর যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেভাবেই পৌঁছে যাবে—তাদের পূর্ব অনুযোগসমূহ এখন দূরীভূত হয় লুণ্ঠনদ্রব্যের ওপর সমান অংশীদারত্বের প্রতিশ্রুতিতে। এরই মাঝে জয় করা সার্বীয়া অঞ্চলে মুসলিম কলোনি স্থাপিত হয়।

এরপর বায়েজীদ এশিয়া মাইনরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এখানে এসে তাঁর অধৈর্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ফলে পুরো সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে তিনি সফলতা পান। আয়েদীন-এর আমিরকে প্রজায় পরিণত করে এবং সারুখান ও মেন্ডিজকে পরাজিত করে আজিয়ানে অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথমবারের মতো ভূমধ্যসাগরের উদ্দেশ্যে পৌঁছান। এই প্রস্তুতির জন্য তাদের নৌশক্তি বৃদ্ধি পায়।

তারপর খ্রিস্টান প্রজাদের সহায়তায় এর মাঝে ম্যানুয়েল পালাইয়োলগও ছিলেন, বায়েজীদ কারামানিয়া আক্রমণ করে কন্যাকে ঘিরে ধরেন চারপাশ থেকে। কারামানিয়া আক চাই-এর যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং সাথে সাথে কেয়সারি, সিঙায়, উত্তরে কাস্তামুনী অটোমানদের দখলে আসে। এর ফলে কৃষ্ণ সাগরের বন্দরে প্রবেশের রাস্তা উন্মুক্ত হয়। এর মাধ্যমে বায়েজীদ আত্মশ্লাঘায় ভুগতে থাকেন যে, তিনি এখন আনাতোলিয়ার বৃহৎ একটি অংশের প্রভু।

কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে সার্থক হয়নি। কেননা মুরাদ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে খ্রিস্টান ইউরোপের বড় একটি অংশকে অটোমান শাসনতলে নিয়ে এসে ছিলেন, যা খ্রিস্টান জনগণও মেনে নিয়েছিল কিন্তু বায়েজীদ-এর ততটা

রাজনৈতিক জ্ঞান না থাকায় আনাতোলিয়ার বৃহৎ অংশ অটোমানদের দখলে আসে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসনাতলে নয়।

বায়েজীদ ইউরোপীয় বিচারব্যবস্থায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে জয়ী অঞ্চলসমূহে কী ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না।

এশিয়া মাইনরে বিজয় কাজ সম্পন্ন করে নিজের গভর্নরদের ওপর শাসন কাজ ন্যস্ত করে বায়েজীদ ইউরোপে ফিরে আসেন। এখানে হাঙ্গেরি কাছ থেকে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের মুখোমুখি হন তিনি। হাঙ্গেরীর রাজা সিগিসমুন্ড, বায়েজীদের প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে হাঙ্গেরিতে বায়েজীদ উসকানিমূলকভাবে লুণ্ঠনকাজ করে বসেন এবং এর আশপাশের অঞ্চলে। ফলে মধ্য ইউরোপে তুর্কিদের নিয়ে সবার মাঝে ভীতির সঞ্চার হয়। বায়েজীদের সেনাবাহিনী দানিয়ুব নদী পার হয়ে হাঙ্গেরির মাটিতে প্রথম যুদ্ধ করে আর এক্ষেত্রে মিত্র হিসেবে লাভ করে ওয়ালাসিয়ানদেরকে যারা হাঙ্গেরির অধীনতা থেকে মুক্তি চাইছিল।

এরই মাঝে সিগিসমুন্ড বায়েজীদের বিপক্ষে বুলগেরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনে। এ অভিযোগের কোনো উত্তর না দিয়ে বায়েজীদ নিজের তাঁবুতে ঝুলানো তরবারির প্রতি রাজার প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সিগিসমুন্ড এর উত্তরে বুলগেরিয়া আক্রমণ করে বসেন। দানিয়ুব নিকোপলিস দুর্গ দখল করে নিলেও বিপক্ষে থাকা বিশাল অটোমান সৈন্যবাহিনীর কারণে আবার এ দুর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় সিগিসমুন্ড। বায়েজীদ পিতা মুরাদের মতো সিসমানকে বিশ্বাস না করে হাঙ্গেরিয়ার বিপক্ষে মৈত্রী না করে বরঞ্চ তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বুলগেরিয়াকে অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে। থ্রেস এবং মেসিডোনিয়ার মতো বুলগেরিয়াও সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। ওয়ালাচারিয়া, থ্রেস এবং মেসিডোনিয়া মিলে দানিয়ুবের তীরে হাঙ্গেরির বিপক্ষে বাফার (Buffer) গড়ে তোলে। এরপর বায়েজীদ স্থানীয় এসব রাজবংশ উচ্ছেদ করে বলকান অঞ্চলে সাম্রাজ্যের শাসন কেন্দ্রীভূত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হন। এভাবে অটোমানদের সাথে একত্রীত হওয়ার ফলে এবং ইসলাম গ্রহণ করার বুলগেরিয়া শুধু তার স্বাধীনতা হারায়নি; বরঞ্চ জাতি হিসেবে বুলগেরীয় জনগণের প্রতীক অর্থডক্স চার্চও হারায়। পূর্বে ল্যাটিন আচার-ব্যবস্থার অংশ থাকা এ গির্জা এবারে গিয়ে গ্রিক অর্থডক্স গির্জার হাতে। মুসলিম পাশাদের তুলনায় এ ব্যবস্থা ততটা সহনীয় ছিল না।

এরই মাঝে বায়েজীদ কনস্টান্টিনোপলের দিকে দৃষ্টি ফেরান। সম্রাট পঞ্চম জন পালাইয়োলগের মৃত্যুর পর সন্তান ম্যানুয়েল ক্ষমতায় আরোহণ

করেন। ম্যানুয়েলের কাছে বায়েজীদ চরমপত্র পাঠান। প্রজাশর্ত পালনের পাশাপাশি বার্ষিক করের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং কনস্টান্টিনোপাল মুসলিম জনগণের জন্য একটি কাদি বা বিচারালয় স্থাপন করতে হবে। এই চাহিদার পাশাপাশি অটোমান সেনাবাহিনীর কনস্টান্টিনোপলের প্রধান দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পথিমধ্যে দক্ষিণ থ্রেসে এমন সব গ্রিক জনগণকে কচুকাটা করে তারা, যারা এখনো খ্রিস্টান ধর্ম পালন করত। এভাবে কনস্টান্টিনোপল ঘিরে ধরে অটোমান বাহিনী।

সাত মাস অবরুদ্ধ থাকার পর সম্রাট ম্যানুয়েল জোরপূর্বক রাজি হন বায়েজীদের পূর্বের চেয়েও কঠিন সব শর্তে। গালাতা বন্দরের প্রায় অর্ধেক অংশ ছয় হাজার অটোমান সৈন্য থাকার জন্যে দুর্গ নির্মাণকল্পে ছেড়ে দিতে হয় ম্যানুয়েলকে। এ সময় থেকে দুইটি মসজিদের মিনার থেকে সারা শহরজুড়ে মুসলিমরা প্রার্থনা করতে থাকে। একেই এখন ইস্তাম্বুল নামে অভিহিত করা হয়। ১৩৯৫ সালে বায়েজীদ সেরেসে বিচার সভা বসান। এখান থেকে সম্পূর্ণ পালাইয়োলগ পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার রায় দেন। কিন্তু তাঁর প্রধান আমির আলী পাশার সুবিবেচনায় আদেশ বিলম্ব হতে থাকে এবং সুলতানের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে বহু বাইজেন্টাইন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির হাত কেটে চোখ উপড়ে ফেলা হয়। এভাবে দ্বিতীয় ম্যানুয়েল রাজত্ব করতে থাকেন এবং একজন যোগ্য শাসক প্রমাণিত হন।

এরই মাঝে হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমুন্ডের কাছ থেকে বায়েজীদ নতুন করে হুমকিস্বরূপ আচরণ পেতে থাকেন। অটোমান বাহিনীর আক্রমণ ও দানিয়ুবের তীরে তাদের দুর্গ থেকে হুমকির কারণে সিগিসমুন্ড অন্যান্য পশ্চিমা খ্রিস্টান শক্তিসমূহকে একত্রিত করতে চেষ্টা করতে থাকে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হিসেবে। মুরাদের তুলনায় বায়েজীদ খ্রিস্টানদের বিপক্ষে তাঁর আচরণ সম্পর্কে কম সচেতন ছিলেন। দাম্ভিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ইটালি থেকে আগত দূতকে বায়েজীদ জানিয়ে দেন যে হাঙ্গেরি বিজয়ের পর তাঁর পরবর্তী গন্তব্য হবে রোম এবং সেন্ট পিটারস্রে বেদিতে নিজের ঘোড়াকে ছোলা খাওয়াবেন বলেও জানিয়ে দেন। এ সময় থেকেই প্রকাশ্যে খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে থাকেন।

তাই "ইউরোপ থেকে তুর্কি বিতাড়ন" অভিযানের পক্ষে নিজের মিত্র সংগ্রহের জন্য সিগিসমুন্ড ফ্রান্সের প্রায় পাগল রাজা ষষ্ঠ চার্লসের কাছে গোপনে দূত পাঠান। রাজার চাচা ডিউক অব বারগান্ডি নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে নিজের তরুণ পুত্র কোতে দি নেভারস্-এর অধীনে ভাড়াটে সৈনিক ও অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপজুড়ে সিগিসমুন্ডের আর্তি পৌঁছে যায়। তখন এমন একটা সময় যখন একশ বছরের যুদ্ধ মাত্রই শেষ হয়েছে এবং রোমান সাম্রাজ্য কার্যত শান্তিপূর্ণ শুধু ফরাসি সামরিক বাহিনীই নয় ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ফ্ল্যান্ডার, লম্বার্ডি, স্যাভয়, জার্মানি থেকে সেনাবাহিনী এবং পোল্যান্ড বোহেমিয়া ইটালি, স্পেন থেকে আগত অভিযাত্রীরা সিগিসমুন্ডের নিজের বাহিনীর সাথে এসে জড়ো হয় বায়েজীদের বিদ্যুৎগতি থামাতে এবং বলকান থেকে চিরতরে তুর্কিদের হটনোর উদ্দেশ্যে। এভাবেই একটি আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী যার সংখ্যা ছিল প্রায় একশ হাজার মানুষ। ১৩৯৬ সালের গ্রীষ্মের শুরুতে বুদা (Buda) তে জড়ো হয়। এটি ছিল অবিশ্বাসীদের মোকাবেলা করা সবচেয়ে বৃহত্তম খ্রিস্টান সেনাবাহিনী। এরা আরো সহায়তা পেয়েছিল কৃষ্ণ সাগরের অবস্থিত রণতরীসমূহ, ভেনেশীয়া, জেনোইসদের কাছ থেকে। সিগিসমুন্ড আশা করেছিলেন মে মাসের মধ্যেই বায়েজীদ দানিয়ুব পার হয়ে এসে হাঙ্গেরির আক্রমণ করবেন। কিন্তু এটি না হওয়ায় সিগিসমুন্ড প্রতিরক্ষা কৌশল তৈরি করে। কিন্তু নাইটেরা গৌরবের জন্য আক্রমণের দিকেই বেশি উৎসাহী ছিল। কিন্তু তারপরেও বায়েজীদের কাছ থেকে কোনো রূপ আক্রমণের চিহ্ন না পেয়ে তারা ভাবতে থাকে, বায়েজীদ নিশ্চয়ই ব্যাবিলনিয়ার কায়রো চলে গেছেন এবং বাগদাদের খলিফার প্রার্থনা এবং নির্দেশে তাতার, পারস্য, মেডিয়া সিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া এ ধরনের অবিশ্বাসী দেশসমূহের সৈন্যদেরকে নিয়ে আক্রমণ করতে আসবেন। আর যদি তাও না হয় তাহলে তারা নিজেরাই তুর্কি অধিকৃত অঞ্চলসমূহের মাঝ দিয়ে গিয়ে সিরিয়া ও পবিত্র ভূমি জয়ে করে নেবে, জেরুজালেমকে সুলতান ও তার শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করবে। এর পরেও বায়েজীদের কার্যত কোনো দেখাই ছিল না।

ইতিমধ্যে ক্রুসেডাররা ভাবল অলস বসে সময় না কাটিয়ে যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তা পূর্ণ করতে। সুতরাং তারা দানিয়ুব উপত্যকা বেয়ে নিচে নেমে আর্সোভায় পৌঁছায়। হাঙ্গেরিয় কোনো বাধা ছাড়াই সার্বীয়াতে ছড়িয়ে পড়ে মোরাভা উপত্যকায় অগ্রসর হয়। এখানে উন্নত ওয়াইনের সন্ধান পায় তারা। তারা নিশ্ শহরকে দখল করে নেয় নির্বিচারে নারী-পুরুষ ও শিশুদেরকে হত্যা করে।

বুলগেরিয়াতে প্রথম দানিয়ুব দুর্গ খ্রিস্টান সেনানায়কেরা খুলে দেয়ায় তুর্কি সৈন্যদের নির্বিচারে নিধন করে খ্রিস্টান আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনী। নদীর তীর ধরে যেতে যেতে তারা এরপর রাহোভা দুর্গ আক্রমণ করে। এখানে তুর্কি যোদ্ধারা আত্মসমর্পণ করে। এরপর খ্রিস্টান সেনাবাহিনী একত্রে নিকোপলিসের মূল দুর্গে ঘাঁটি বানায়। তারপরেও বায়েজীদের তুর্কি সেনাবাহিনীর কোনো দেখা পাওয়া যায় না।

পশ্চিমা নাইটেরা শত্রুর কোনো পদচিহ্ন না দেখতে ভোগ-বিলাসে, নারীসঙ্গ ও পানাহারে মেতে ওঠে। এছাড়া বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

ষোলতম দিন পার হয়ে গেলেও বায়েজীদের কোনো দেখা থাকে না। তারপর হঠাৎ করেই নিজের স্বভাবসুলভ দ্রুত গতিতে তুর্কি সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হন বায়েজীদ–সু-প্রশিক্ষিত কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের চেয়ে দ্রুত গতির তুর্কি বাহিনী যাদের দেখে রাজা সিগিসমুন্ড বুঝতে পারেন এদেরকে তুচ্ছ করে ভাবার অবকাশ নেই। তাই একটি সুপরিকল্পিত কৌশল দরকার। প্রাথমিকভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ফরাসি নাইট দে কোচি। পর্বতে ঢোকার মুখের রাস্তায় একদল তুর্কি সৈন্যকে পরাজিত করে দে কোচি। নিজের পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। অন্য নাইটেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলে সিগিসমুন্ড আবারো প্রতিরক্ষার কৌশল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে।

কিন্তু কোতে দে ইলু সিগিসমুন্ডকে অবজ্ঞা করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আর ফ্রয়র্জাট এর মতে, হাঙ্গেরির রাজার জন্য অপেক্ষা না করে গর্ব ভরে নিজেরাই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নিজেদের পরাজিত করে তারা।

পাহাড়ে উঠার মুখে এ বাহিনী বায়েজীদের বাহিনীকে আকস্মিক আকমণ করে হত্যা করে। রক্তমাথা তরবারি দেখে নিজেদের বিজয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরই সুলতানের প্রধান ষাট হাজারের সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হয়। যারা একদম টগবগে এবং যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। এ বাহিনী গড়ে উঠেছে সার্বীয়ার সহায়তায়। এ ব্যাপারে সিগিসমুন্ড আগে থেকেই পরিচিত যে বায়েজীদের নীতি হচ্ছে প্রথম সারিতে অদক্ষ সৈন্যদের রাখায়। তাদের কতল করার মাধ্যমে শত্রুর শক্তিই ক্ষয় হয়। এরপর এগিয়ে যায় বায়েজীদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী। নাইট বাহিনী নিজেদের অস্ত্রভারে ভারাক্রান্ত ও ঘোড়ার সাহায্য ব্যতীত এ আঘাতে সমূলে বিনাশ হয়ে যায়। ঘোড়ারা মালিক ছাড়াই ক্যাম্পে ছুটে চলে যায়। ইউরোপীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সুদর্শন ফুলগুলো নিকোপালিসের মাটিতে ছড়িয়ে থাকে, মৃত অথবা তুর্কিদের হাতে বন্দি হয়ে।

সময়ের তুলনায় ক্রুসেডের যোদ্ধারা ছিল শিক্ষানবিশ সৈন্যর মতো। পেশাদার যুদ্ধের কোনো জ্ঞানই তাদের ছিল না। যা আয়ত্ত করতে হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ও সামরিক শিক্ষার মাধ্যমে। অন্যদিকে তুর্কি বাহিনী ছিল সবদিক থেকে চৌকস। তাদের প্রশিক্ষণ, নিয়মানুবর্তিতা কৌশল, হালকা অস্ত্র সংযোগে চলাচল ও অশ্বারোহী তীরন্দাজ ছিল। এভাবেই সিগিসমুন্ডও হাঙ্গেরিয় অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এরপরে সিগিসমুন্ড দানিয়ুবে নিজের জীবিত সৈন্যদের সাথে নিয়ে জাহাজে করে পালিয়ে যায়। আর নাইট বাহিনীর কিছু অশ অটোমানদের হাত থেকে পালিয়ে জাহাজে ওঠে। বাকি আরো হাজারো জন কার্পেথিয়ান পর্বত বেয়ে বহু কষ্টে প্রস্থান করে। পরের দিন বায়েজীদ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে নির্বিচারে বন্দি হত্যার নির্দেশ দেন। এদের মাঝে কোতে দে নেভারস্ ও তার সঙ্গী সাথিদের জোরপূর্বক সুলতানের পাশে দাঁড়িয়ে বন্দি হত্যার দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়।

এদিন অন্তত দশ হাজার পুরুষ মৃত্যুবরণ করে। এভাবেই খ্রিস্টান ইউরোপের কেন্দ্রে শেষ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ মুসলিমদের হাতে শোচনীয় পরাজয়ে বরণ করে।

এরপর সুলতান গ্রিসে আক্রমণ করে থেসলীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করেন। হেলেন কাটাকুজিনের মেয়েকে পত্নী রূপে গ্রহণ করেন। মোরিয়া-তে আনাতোলিয়া থেকে আগত তুর্কিরা বসতি স্থাপন করে কিন্তু এথেন্স খ্রিস্টানদের হাতেই রয়ে যায়।

বায়েজীদ বাহিনীর নৌশক্তি ততটা সুদক্ষ ছিল না। এছাড়া দুটি নৌ শক্তিশালী দেশ ভেনিস এবং জেনোয়া সুলতানের বিরোধিতা করে। ১৩৯৯ সালে পেরা-তে জেনোয়া বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে এগিয়েও দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ফিরে আসতে হয় বায়েজীদকে। এখানে মোকাবেলা করতে হয় ফরাসি মার্শাল বসিকল্টের যে কিনা নিকোপলিস থেকে অটোমানদের কাছ থেকে পালাতে পেরেছিল। বসিকল্টের সহায়তায় জেনোয়া এবং ভেনেশিয়া বাহিনী প্রথম নথিবদ্ধ যুদ্ধে সুলতানের নৌবাহিনীকে দার্দেনালিসে পরাজিত করে বসফরাসের এশিয়া উপকূল পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে। ফিরে যাওয়ার পূর্বে বসিকল্ট কনস্টান্টিনোপল শহরে একটি ফরাসি দুর্গ স্থাপন করে এবং ম্যানুয়েলের পাশাপাশি সহকারী সম্রাট হিসেবে জনকে বসিয়ে রেখে যায়।

ম্যানুয়েল বসিকল্টের সাথে ইউরোপ ভ্রমণ করে পুনরায় খ্রিস্টান সহায়তা পাওয়ার আশায়। ইটালি, ফ্রান্স, এবং ইংল্যান্ডে রাজোচিত সম্মান পেলেও আশার বাণী ব্যতীত খালি হাতেই ফিরতে হয় ম্যানুয়েলকে। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যের রাজধানী ছয় বছর ধরে অবরুদ্ধ থেকে উপোস হওয়ার জোগাড়। অধিবাসীরা একে একে দেয়াল বেয়ে দড়ি নিয়ে নেমে অটোমানদের কাছে আত্মসমর্পণ শুরু করে। সাম্রাজ্যের রাজকোষ হয়ে পড়ে শূন্য। পুরো শহরই প্রায় আত্মসমর্পণের পথে। মোরিয়া, আলবেনিয়া, আড্রিয়াটিক—সবদিক থেকেই বায়েজীদ প্রস্তুত হয়ে ওঠে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দখল করার জন্য।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ১৪০২ সালের বসন্তে—পূর্ব থেকে আসে নতুন ঝাঁক। সব অভিযান বাতিল করা হয়—বলকান অঞ্চল থেকে খ্রিস্টান মুসলিম

সব সৈন্যকে এশিয়া মাইনরে সরিয়ে নেয়া হয়। কনস্টান্টিনোপল আর এর সাম্রাজ্যের চিহ্নসমূহ শেষ মিনিটের জন্য বেঁচে যায়।

একজন নতুন এবং পৃথিবী কাঁপিয়ে দেয়া বিজয়ী পশ্চিমে যাত্রা শুরু করে, যেমনটা করেছিল চেঙ্গিস খান এবং তাঁর মঙ্গোল জাতি প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে। তাঁরই বংশধারার মানুষ তামুরলেন অথবা তিমুর দ্য তাতার।

॥ ৫ ॥

তাতারদের কাছে লোহা যখন প্রথম পরিচিত হতে থাকে তখন শুরুতেই একে অন্যান্য ধাতুর মতো বাঁকানো যেত না। তাই তারা ধরে নেয় নিশ্চয়ই এখানে অন্য কিছু আছে। তাতাররা এরই নাম দেয় তিমুর। এভাবেই নিজেদের নেতাদেরও নাম দেয়ার প্রচলন হয়ে দাঁড়ায় "তিমুর" শব্দের মাধ্যমে। যার অর্থ দাঁড়ায় সাধারণের চাইতে বেশি কোনো বৈশিষ্ট্য আছে এ নেতার। যা শুধু শারীরিক শক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। এসব তিমুরদের মাঝে সর্বোচ্চ পদটিই পান তাতার। যার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহমানব; পৃথিবী জয় করাই যার লক্ষ্য। স্বর্গে যেমন একজনই ঈশ্বর তেমনি পৃথিবীতেও একজনই শাসক থাকবেন।

ছোট একটি তাতার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। যৌবনে তিনি এ গোত্রের অধিপতি হন। আর এভাবেই শাসন করেন সমরকন্দ ও হিন্দুস্তানের পাহাড়ি সীমান্ত। তামুরলেন ছিলেন সাহসী, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, সামরিকভাবে জ্ঞানী এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ছিলেন স্রষ্টার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলে তিনটি সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন—পারস্য, তুর্কিস্তান এবং ভারত। মাত্র এক প্রজন্মের মাঝেই তামুরলেন নয়টি রাজবংশ ধ্বংস করে সমরকন্দ থেকে এশিয়ার বৃহৎ একটি অংশ শাসন করেন। ইসলামের নামে প্রভু হিসেবে।

তিমুরের ব্যক্তিগত আধিপত্য ছিল ব্যাপক। সুশ্রী ত্বক, ফর্সা গাত্রবর্ণ, শুভ্র কেশ, বৃহদাকারের মস্তক, বাহুবল নিয়ে কোনো মন্ত্রী ছাড়াই তিনি শাসনকাজ পরিচালনা করতেন।

মৌন স্বভাব, কঠোর ধর্মপ্রাণ এবং নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন দক্ষ হিসাব এবং পরিকল্পনাকারী। প্রায় সময় কাটাতেন দাবা বোর্ড সামনে নিয়ে। দাবার গুটির সাহায্যে কৌশল পরিকল্পনা করতেন; যার ফলে শত্রু যেই হোক না কেন, জয় সুনিশ্চিত। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ নাগাদে তিমুরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল পূর্বে চীনের প্রাচীর, উত্তরে রাশিয়ার অনুর্বর ভূমি, দক্ষিণে গঙ্গা নদী এবং পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে পারস্য, আর্মেনীয়া এবং ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিসের উপর অববাহিকা এবং এভাবে এশিয়া মাইনরের সীমান্ত পর্যন্ত। এর বাইরে একমাত্র বিস্তৃত ছিল অটোমান সাম্রাজ্য, আরেকটি

শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাম্রাজ্য। এখন এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট তিমুর এবং বায়েজীদ, তাতার এবং অটোমান একে অন্যের মোকাবেলা করবেন।

একজন সৈন্য হিসেবে তিমুর তুর্কিদের সামরিক শক্তিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য আরো অঞ্চল রয়ে গেছে জয়ের অপেক্ষায়; দক্ষিণে আছে সিরিয়া, পবিত্র ভূমি। মেসোপটেমিয়া এবং মিশর। একই ভাবে বায়েজীদের প্রয়োজন বলকান অঞ্চল জয় করে কনস্টান্টিনোপলকে নিজের হাতে আনা। তিমুর বুঝতে পারেন কোথায় তাদের স্বার্থের ভিন্নতা আছে; কিন্তু বায়েজীদ নন। অহংকার অপরিণামদর্শিতা আর প্রায় এক দশক ধরে কোনো যুদ্ধে না পরাজিত হওয়া বায়েজীদ এমন ভাব করতে থাকেন যেন তিনি অনুগ্রহ করে তিমুরকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন।

বায়েজীদ আনাতোলিয়া দখল করলেও সময়ের অভাবে একত্রীকরণ প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেননি। ফলে জয়ী অঞ্চলসমূহের রাজুকমারদের অনেকেই শরণার্থী হিসেবে তিমুরের বিহার সভায় দেশান্তরী হয় আর পুনরায় অটোমানদের হাত থেকে নিজেদের ভূমি পুনর্দখল করার চেষ্টা করতে থাকে। এদের নিয়ে অথবা সুলতানের বিষয় নিয়ে তিমুর ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠেননি যতক্ষণ না অটোমানরা সিভাস দখল করে নেয়। এ শহরকে বায়েজীদ নিজের পুত্র সুলেমানের হাতে রেখে পূর্বে অগ্রযাত্রার ঘাঁটি হিসেবে তৈরি করেন। এখানে অটোমানরা একজন তুর্কমান রাজকুমার কারা ইউসুফের ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে তাকে বন্দি করেন। কারা ইউসুফ তিমুরের নিরাপত্তাধীন ছিল।

প্রথমবারের মতো তিমুর বায়েজীদের ওপর রাগ করে তাঁর বন্দি ফেরত চান। তিনি বায়েজীদের কাছে একজন কূটনৈতিকের মতো করেই পত্র পাঠান। কিন্তু বায়েজীদের উত্তর ছিল বিদ্রূপাত্মক।

তিমুর তৎক্ষণাৎ সিভাসের বিপক্ষে মাঠে সৈন্য নিয়ে জড়ো হন। সুলেমানের কাছে পর্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্য না থাকায় পিতার কাছে পত্র লিখেও কোনো ফল পায়নি। সাহসের সাথে এগিয়েও নিজের কম সৈন্যসংখ্যা নিয়ে পরবর্তীতে শহর ত্যাগ করে সুলেমান। আঠারো দিন লাগিয়ে তিমুর শহরের দখলকাজ দুর্গ নির্মাণ শেষ করেন। এরপর প্রায় হাজারখানেক অবাধ্য প্রতিরক্ষা সৈন্যকে কবর দেন; যারা ছিল আর্মেনীয়ার খ্রিস্টান। এরপর এশিয়া মাইনরের দিকে আরো এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে বরঞ্চ দক্ষিণে এগিয়ে যান। পথিমধ্যে জয় করেন আলেপ্পো, দামাস্কাস এবং বাগদাদ। ১৪০১ সালের শরতে তিমুর এশিয়া মাইনরে ফিরে আসেন। এখানে শীতের জন্য বসতি স্থাপন করেন এবং ভাবতে থাকেন অটোমানদের বিপক্ষে যুদ্ধে এগোবেন কি-না।

বায়েজীদ এই প্রথমবারের মতো সত্যিকার কোনো হুমকির মুখে পড়লেন এবং নিজের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পেলেন। বায়েজীদের ক্ষেত্রে নিজের স্বভাবসুলভ দ্রুতগতি বা সিদ্ধান্ত কিছুরই দেখা মিলল না।

১৪০২ সালের গ্রীষ্মে তিমুর অবশেষে বায়েজীদের বিরুদ্ধে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এখন তিনি অটোমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপের খ্রিস্টান শক্তি এবং জেনোইসদের মিত্রতা চাইলেন। সিরিয়া দখলের পর থেকে অন্য মুসলিম শক্তিগুলোর সাথে সৌহার্দ্য বজায় রাখার আর কোনো তাড়না অনুভব করেননি তিমুর। তাই বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে দক্ষিণে সিভাসে সরে আসেন। এবার প্রাথমিক ক্ষয়-ক্ষতির দুই বছর পরে বায়েজীদ কনস্টান্টিনোপল শহর অবরোধ করে রাখার কাজ ছেড়ে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে এশিয়া পার হয়ে আসেন। বার্সা থেকে যাত্রা করে আনাতোলিয়ার উত্তপ্ত মালভূমি পেরিয়ে আসেন আঙ্গোরাতে।

বায়েজীদের বাহিনীও তিমুর এবং তাঁর তাতার বাহিনীর মতোই শৃঙ্খল। সাহসী ও সামরিকভাবে দক্ষ ছিল। কিন্তু এ বাহিনী অতীতের মতো পুরোপুরি একত্রিত বা তৃপ্ত ছিল না। এর এক-চুতর্থাংশ সৈন্যই ছিল তাতার। বায়েজীদ তাঁর বাহিনীকে চলার পথে কোনো বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ দেননি। নিজের রাজকোষ প্রকাশ না করায় বেতন-ভাতা নিয়েও সৈন্যদের মধ্যে অসন্তুষ্টি ছিল।

ইতিমধ্যে সুলতানের সেনাপ্রধানেরাও তাঁর সাথে যুদ্ধ অভিযানের পরিকল্পনা বিষয়ে একমত ছিল না। সেনাপ্রধানরা চেয়েছিল অটোমানরা তাদের প্রথানুসারে প্রতিরক্ষার নীতি গ্রহণ করুক। কিন্তু বায়েজীদ একগুয়েমিতার দরুণ আদেশ দেন সৈন্যরা হালি নদীর তীরে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করবে। যেন তিমুর পৌঁছানো মাত্র যুদ্ধ করা যায়।

বেশ কিছু দিন পার হয়ে গেলেও তিমুরের দেখা পাওয়া যায় না। অবশেষে সংবাদ আসে যে তিমুর তুর্কি বাহিনীকে চার পাশ থেকে ঘিরে এগিয়ে আসছেন। তিমুর নিজের সৈন্যদের জন্য পাকা ফসলের কথা চিন্তা করে নদীপথে এগিয়ে আসতে থাকে পশ্চিমের কঠিন পাহাড় বাদ দিয়ে। এভাবে তুর্কি বাহিনী থাকে তিমুরের পূর্ব পাশে। অন্যদিকে শত্রুর গতিকে শামুকের সাথে তুলনা করে অবজ্ঞা করা বায়েজীদ নিজের বাহিনীকে পানি বর্জিত জায়গায় এনে জড়ো করে। ফলে তারা তৃষ্ণায় প্রায় মুমূর্ষু হয়ে পড়ে।

তিমুর আঙ্গোরার চারপাশ পরিদর্শন করতে করতে এমন এক জায়গায় আসেন, যেখানে পূর্বে বায়েজীদের ক্যাম্প ছিল। এখানে তুর্কি বাহিনীর ফেলে যাওয়া তাঁবুতে নিজেদের হেডকোয়ার্টার বানিয়ে তাতার বাহিনী প্রথমেই

পার্শ্ববর্তী নদীতে বাঁধ দিয়ে নিজেদের পানির ব্যবস্থা করে। তিমুর আরো নির্দেশ দেন যেন তুর্কিবাহিনীর পথে পড়ে এমন একটি ঝরনা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়। তুর্কিবাহিনী পূর্ব থেকে বায়েজীদের পিছু ধাওয়া করতে অগ্রসর হয়েছে। এখানেই তিমুর যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেন।

এভাবেই বায়েজীদ দেখেন নিজের তৃষ্ণার্ত বাহিনী নিয়ে এমন এক শত্রুর মোকাবেলা করতে চলেছেন যে তাঁরই শহর আঙ্গোরাতে রয়েছেন, যেখানে বায়েজীদের থাকার কথা। শহরের দেয়ালের পাশাপাশি অবস্থিত বিশাল সমভূমিতে শুরু হয় বিখ্যাত এক যুদ্ধ।

বায়েজীদের বাঁ পাশে ছিল পুত্র সুলেমানের অধীনে আনাতোলিয়ার সেনাবাহিনী। ডান দিকে সার্বীয়া এবং ইউরোপী থেকে আগত সৈন্যরা। মাঝখানে অবস্থান নেন বায়েজীদ নিজে। তুর্কি বাহিনীর নিয়ামনুযায়ী প্রথমে অদক্ষ বাহিনী দিয়ে শত্রুকে ক্লান্ত করার লক্ষ্যে বায়েজীদ নিজের আনাতোলিয়া থেকে আগত তাতার অশ্বারোহীদের এগিয়ে দেন। কিন্তু যুদ্ধ তখনো শুরুও হয়নি। বায়েজীদের তাতার বাহিনী নিজের গোত্রের সাথে তিমুরের সাথে যুদ্ধ করতে রাজি না হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যায়। ফলাফলস্বরূপ সুলতান এক ধাক্কায় নিজের এক-চতুর্থাংশ সৈন্য হারিয়ে বসেন।

বায়েজীদ এবার বা পাশ থেকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। সুলেমান এবং তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী সাহসিকতার লড়াই করল তীর-বর্ষার বিরুদ্ধে। কিন্তু তিমুরের সৈন্য ভঙ্গকে কোনো রূপ হটাতে না পেরে প্রায় পনেরো হাজার সৈন্য হারিয়ে নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এরপর তিমুরের সৈন্যরা তাঁর চারপাশে থেকে তুর্কি সৈন্যদের সরিয়ে দিয়ে অবশেষে মাঝখানে সুলতানের সামনে পৌঁছায়। সুলতান একাকী জানিসারিস আর কিছু সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এভাবে সৈন্যবিহীন, জেনারেলবিহীন হয়েও এক পা এক পা করে পিছিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টার বায়েজীদ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে গেছেন। তারপর রাত নামার পর শেষ হয় সবকিছু। তুর্কি, ইতিহাসবিদের মতে, যেমন করে উপোসী নেকড়ে ভেড়ার পালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনিভাবেই বায়েজীদ শত্রুর সাথে লড়েছেন। তাঁর কুঠারের প্রতিটি কোপ শত্রুর গায়ে এমনভাবে পড়েছে যে, দ্বিতীয় আঘাতের প্রয়োজনই পড়েনি। এরপর শেষবারের মতো ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে পালিয়ে যেতে চাইলেও অসমর্থ হন তিনি। ঘোড়া থেকে নামিয়ে বেঁধে বন্দি বেশে তিমুরের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয় বায়েজীদকে। তিমুর তখন পুত্রের সাথে দাবা খেলায় রত। কথিত আছে যে বন্দি হিসেবে তিমুর বায়েজীদকে শিকল দিয়ে বেঁধে নিজের পা রাখার আসবাব হিসেবে ব্যবহার করতেন।

বায়েজীদ নিজের অতিরিক্ত সীমাবদ্ধতার কারণে পরাজিত হয়েছেন। তিনি নিজের পুর্বপুরুষ, গাজীদের ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন এশিয়া মাইনর ও ইউরোপে।

তিমুর খুব দ্রুত এশিয়া মাইনর পার হন। তাতার বাহিনী খুব দ্রুত বার্সা দখল করে তরুণী নারীদের হরণ করে, মসজিদে বানায় ঘোড়ার আস্তাবল, শহর তছনছ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু বায়েজীদের পুত্র সুলেমানকে ধরতে অসমর্থ হয়। সুলেমান পালিয়ে ইউরোপে চলে যান। এরপর তিমুর ব্যক্তিগতভাবে সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্মূর্নার বিপক্ষে অগ্রসর হন। এটিই ছিল শেষ খ্রিস্টান অধিকৃত অঞ্চল। গাজীদের রীতিনুযায়ী অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন মুসলিম বিশ্বের অনুমোদন লাভ করার জন্য। আনাতোলিয়াতে তিমুর বায়েজীদের চার পুত্রকে একে একে অন্যের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন। প্রত্যেকের মাঝে নিজেকে অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার ভাবার প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলেন। সুলেমানকে তাতার প্রজা হিসেবে ইউরোপে অটোমান সাম্রাজ্যে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন তিমুর। কিন্তু বাইজেন্টাইন সম্রাট যখন তিমুরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে ও তাঁকে কর প্রদানের প্রস্তাব জানায়; তিমুর নিজের সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপে পৌঁছানোর জন্য ফেরি তৈরি করার আদেশ দেন। এর মাধ্যমে দ্রুত ভয় ছড়িয়ে যায় যে তিনি কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করতে চাইছেন। কিন্তু তিমুরের এমন কোনো মনোবাসনা ছিল না। একজন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি ছিলেন পূর্বমুখী। ১৪০৩ সালে বায়েজীদের মৃত্যুর পর তিমুর এশিয়া মাইনর ত্যাগ করে চীন অভিযানে উদ্যোগী হন। কিন্তু পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

বায়েজীদের চার পুত্র সিংহাসনের দাবি নিয়ে নিজেদের মাঝে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে—এরই মাঝে আরেকজন এসে নিজেকে বায়েজীদের পঞ্চম পুত্র হিসেবে দাবি করে। এদেরকে সমর্থন দিতে থাকে যার যার অনুসারী স্থানীয় রাজপরিবার। বাইজেন্টাইন সম্রাট নিজের উদ্দেশ্য হাসিল হয় এমন কাউকেই নির্বাচন করার কথা চিন্তা করেন। অন্যদিকে বলকান অঞ্চলের খ্রিস্টান প্রজা রাষ্ট্ররাও নিজেদের ভূমি পুনরুদ্ধারের আশায় জেগে ওঠে।

পুরো সাম্রাজ্যের সমগ্র অঞ্চল প্রধান দুইটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ইউরোপীয় অংশ। এ অংশ শাসন করতেন আদ্রিয়ানোপল থেকে সুলেমান। অন্যদিকে বার্সা থেকে শাসন করতেন মাহমুদ। তাঁর অংশ ছিল আনাতোলিয়া। কোনো সাম্রাজ্যই এমন বিভক্ত হয়ে টিকে থাকতে পারে না। বায়েজীদের অপর দুই পুত্র ইসা মুসা গৃহযুদ্ধে মেতে ওঠে। মুসা সুলেমানকে হত্যা করার পর নিজেও মাহমুদের হাতে নিহত হন। অবশেষে মাহমুদ বিজয়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৪১৩ সালে তিনি সুলতান প্রথম মাহমুদ নামধারণ করে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। সমর্থনকারী হিসেবে পেয়েছেন দুই শক্তিশালী মিত্র। আনাতোলিয়া এবং জানিসারিয়া। এভাবে বিশৃঙ্খলার পর অবশেষে কেন্দ্রীয় প্রশাসক নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অটোমান রাষ্ট্র পুনরায় একত্রিত হয়।

রাষ্ট্রনায়কসুলভ আচরণের ফলে মাত্র আট বছরের শাসনামলেই মাহমুদ অটোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি পুনঃস্থাপন করেছেন। মাত্র এক প্রজন্মের মাঝেই পরবর্তীতে উন্মেষ ঘটে অটোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা– দ্বিতীয় মাহমুদ।

অধ্যায় দুই

নব বাইজেন্টাইন

॥ ৬ ॥

বিজয়ী মাহমুদের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত ছিল; যে তিনি কনস্টান্টিনোপল দখল করবেন। তিনি প্রথম মাহমুদের পৌত্র এবং দ্বিতীয় মুরাদের পুত্র। দ্বিতীয় মুরাদ ছিলেন একজন আলোকিত শাসক। যিনি নিজের ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে ন্যায়বিচার, বিশ্বস্ততা, প্রজাদের মঙ্গলার্থে দয়াশীল কার্যক্রমের জন্য অটোমান জনগণের স্নেহ এবং শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শান্তিবাদী মানুষ। কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন যুদ্ধের ডামাডোল লেগেই থাকত এ সময়ে।

শাসনকালের শুরুতেই মুরাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম ভেস্তে যায়। ইউরোপ এবং এশিয়া উভয় ক্ষেত্রেই শত্রুরা তাঁর নিজের মাঝের বলশালী ও সামরিক দক্ষতাকে উসকানি দিতে থাকে। একই সাথে শত্রুর সাথে আলোচনা ও চুক্তির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সৎ।

প্রথমেই জানিসারিসদের সহায়তা ও উলেমাদের সমর্থনে সালতানাতের ভুয়া দাবিদারকে' পরাজিত করেন। এরপর কনস্টান্টিনোপল অবরোধে অগ্রসর এবং প্রথমবারের মতো এর দেয়ালে কামানের গোলা নিক্ষেপ করেন এবং চলনশীল টাওয়ার প্রস্তুত করেন। কিন্তু গ্রিকরা শহর প্রতিরক্ষা করে। ইতিমধ্যে ম্যানুয়েলের মৃত্যুর পর মুরাদ তাঁর উত্তরসূরি অষ্টম জনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কনস্টান্টিনোপল অবরোধ বিলম্ব করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের অঞ্চলকে পুনরায় সংকুচিত করে শহরের মাঝে খুব কম অংশই বাকি রাখেন রাজত্ব করার জন্য। এরপর নিজের সৈন্যবাহিনীকে আনাতোলিয়া পার হয়ে ছোট ভাই মুস্তাফার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর করেন। কারামানিয়ার বাহিনী মুস্তাফার সাথে যোগ দেয়। এদেরকে দ্রুতই পরাজিত করে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এরপর দক্ষিণ আনাতোলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে মুরাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউরোপে দুটি শক্তি হাঙ্গেরি এবং ভেনিস মুরাদের বিরোধিতা শুরু করে।

বিজয়ী সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ (১৪৫১-৮১)।

হাঙ্গেরি কনস্টান্টিনোপলকে নিয়ে স্লাভ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে আর ভেনেশীয়রা সমুদ্রে নিজেদের আধিপত্যের স্বপ্ন দেখতে থাকে। মুরাদ এদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে বাধ্য হন, যখন সম্রাট ভেনিসের কাছে সালোনিকার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বিক্রি করে দেন। ১৪৩০ সালে আক্রমণ করে শহর দখল করে নেন মুরাদ। ফলে এ শহর এবং চারপাশ অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়। ভেনেশীয়রা পরাজিত হয় কিন্তু সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ, অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করা থেকে নিজের সৈন্যদের নিবৃত্ত করেন এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা মোতাবেক তাঁর রাজত্বজুড়ে ভেনেশীয়রা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো ও সমুদ্রে বাণিজ্য করার সুবিধা পেয়েছিল।

১৪৩৭ সালে রাজা সিগিসমুন্ডের মৃত্যুর পর কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকায় বলকান অঞ্চলে অরাজকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দানিয়ুবের দক্ষিণাঞ্চলে ও সার্বীয়ার ওপর অটোমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাই মুরাদ রাজার মৃত্যুর পরের বছরই অগ্রসর হন। সোমেন্দ্রিয়ার শক্তিশালী দুর্গ দখল করে অত্যাচারী রাজা জর্জ ব্রাঙ্কোভিটজকে উৎখাত করেন। কিন্তু কয়েক মাস অবরোধ করে রাখার পরও বেলগ্রেভ দখল করতে অসমর্থ হন মুরাদ। কিন্তু রাজার মৃত্যুর কারণে ওয়ালাসিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে দানিয়ুব হয়ে হাঙ্গেরির ওপর নজরদারি করতে সমর্থ হন। হাঙ্গেরি নিজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ হয়ে পোলান্ডের রাজা তৃতীয় লাডিসলাসের মুখাপেক্ষী হয়। তিনিই উভয় দেশ শাসন করতে থাকেন। এখানেই হাঙ্গেরির জাতীয় নেতা হুনযাদীর আবির্ভাব ঘটে। হুনযাদী রাজা লাডিসলাসের হয়ে ট্রানসিলভ্যানিয়ার অঞ্চল এবং হাঙ্গেরি শাসন করতে থাকে।

হাঙ্গেরিয়রা আবেগতাড়িত হয়ে তাঁকে 'শুভ্র নাইট' খেতাবে ভূষিত করে। পূর্বদেশীয় খ্রিস্টান রাজাসমূহের আশার আলো হিসেবে দেখা দেন তিনি। এর মাধ্যমে তারা আশা করতে থাকে যে অবিশ্বাসী তুর্কিদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে একতাবদ্ধ হতে পারবে। এভাবে দক্ষিণ হাঙ্গেরির সীমান্তের প্রায় দুইশত মাইল পর্যন্ত সফলভাবে প্রতিরক্ষার মাধ্যমে হুনযাদী তুর্কিদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এতে করে তুর্কি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয় আর খ্রিস্টানরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেদের গির্জাসমূহ দখলকৃত অটোমান ট্রফি আর পতাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে হুনযাদী রাজা সিগিসমুন্ডের সত্যিকার পুত্র। একসময় রাজা যেটা চেয়েছিলেন হুনযাদীও সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করছে ক্রুসেডের মাধ্যমে তুর্কিদেরকে ইউরোপে থেকে বিদায় করা।

প্রথম দিকে শুধুমাত্র হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড এবং পরবর্তীতে ওয়ালাসিয়া, বলকান জনগণ, সার্বীয়ারা, বুলগেরিয়াবাসী, বসনিয়াবাসী, আলবেনিয়াবাসীর

সমন্বয়ে এই ক্রুসেড ১৪৪৩ সালে নিশ্ শহর দখল করে। তুর্কি দুর্গের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এরপর সোফিয়া দখল শেষ হওয়ার পর তুষারবৃত্ত বলকান পার হয়ে থ্রেসিয়ার সমভূমিতে পৌঁছায় ক্রুসেডাররা।

পথিমধ্যে তুর্কি বাহিনীর বাধা গলিত তুষারপাত সবকিছু মিলিয়ে ক্রিসমাসের পর তাদের বিভিন্ন জিনিসপত্রের মজুদের অভাব দেখা যায়। ক্রমবর্ধমান তুর্কিদের চাপের কথা মাথায় রেখে অবশেষে হুনযাদী পিছিয়ে বুদা-তে যাওয়ার নির্দেশ দেন তাঁর বাহিনীকে।

এ সময় সুলতান মুরাদ দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতির আলোচনা করেন। এটি মোতাবেক সার্বীয়া এবং ওয়ালাসিয়া কার্যত অটোমান সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে হাঙ্গেরি দানিয়ুব পার না হতে রাজি হয়।

নিজের সাম্রাজ্যের সীমান্তসমূহে শান্তি ও একতা পুনঃস্থাপিত করার পর সুলতান কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। জানিসারিসদের সংখ্যা এবং বিস্তৃতি বাড়ান। এক্ষেত্রে শুধু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ধরে আনা তরুণেরা নয়; বরঞ্চ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দেশীয় খ্রিস্টান জনগণের মধ্য থেকেও নিয়োগদান শুরু করেন। প্রায় সাত হাজার সৈন্যযোগে এ বাহিনী সাম্রাজ্যের স্তম্ভরূপে আবির্ভূত হয়।

দ্বিতীয় মাহমুদের শৈশব ততটা মধুর ছিল না। পিতা নিজেও মাহমুদের তুলনায় বড় দুই ভাইকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাদের মায়েরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত ঘরের। অন্যদিকে মাহমুদের মা ছিলেন দাস বংশের এবং যদিও প্রমাণ পাওয়া যায়নি কিন্তু সম্ভবত খ্রিস্টান বংশের।

দুই বছর বয়সে নার্সের হাতে বড় হওয়া মাহমুদকে আমাসিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি উত্তর আনাতোলিয়াতে অবস্থিত। এখানে বসবাস করত অটোমানদের প্রাচীন এবং প্রভাবশালী পরিবারসমূহ। একই ভাবে এটি ধর্মীয় স্থান হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি মুরাদের জন্মস্থান ছিল। তিনি পুত্রদেরকে রাজধানীর বাইরে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। যেন বিদ্রোহের কোনো ক্ষতি তাদের ছুঁতে না পারে।

কিন্তু মাহমুদের বড় ভাইয়েরা কম বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন। মাহমুদ আমাসিয়ার গভর্নর হিসেবে ছয় বছর বয়সে শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন। মাহমুদের অন্য ভাই ম্যাগনেসিয়ার গভর্নর হন। দু'বছর পর পিতার নির্দেশ তারা কর্মক্ষেত্র বদলি করেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে নিজের বিছানায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন আলী।

এগারো বছর বয়সে মাহমুদকে ম্যাগনেসিয়া থেকে আড্রিয়ানোপল ডেকে পাঠান মুরাদ। কিন্তু মাহমুদের শিক্ষার অভাব দেখে পিতা মর্মাহত হন। তিনি পুত্রের জন্য আহমেদ কৌরানী নামধারী মোল্লাকে নিয়োগ দান করেন কোরান এবং ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

প্রমাণ আছে যে সুলতান শিক্ষককে একটি রড দিয়েছিলেন, যেন প্রয়োজন হলে রাজকুমারের ওপর ব্যবহার করা যায়।

প্রথমে শিক্ষকের কথা না মানতে চাইলে বেত্রাঘাতের পর মাহমুদ মোল্লাকে মান্য করা শুরু করেন। শীঘ্রই তিনি কোরান আয়ত্ত করে নেন। এভাবে আলোকিত পণ্ডিত এবং পরামর্শকদের মাধ্যমে মাহমুদ মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠতে থাকেন।

আড্রিয়ানোপল থেকে মুরাদ এশিয়াতে অবসর যাপনে যান। এক্ষেত্রে প্রধান উজির হালিলের নির্দেশ মাহমুদ মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে এক পারসীয় দরবেশের প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রচারিত বাণীর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন মাহমুদ। প্রধান বিষয় ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টান তত্ত্বের মাঝে সাদৃশ্য।

এদিকে মাহমুদের আগ্রহ দেখে প্রধান উজির হালিল এবং প্রদান মুফতি প্রতিষ্ঠিত ধর্মব্যবস্থা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। পারসীয় দরবেশকে ধরার চেষ্টা করলেও তিনি পালিয়ে সুলতানের রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে প্রধান মুফতির মাধ্যমে মাহমুদ এ সঙ্গ ছাড়লেও তাঁর মাঝে দোটানা সৃষ্টি হয়। অটোমান প্রতিষ্ঠিত ধর্মব্যবস্থা ও নিজের সত্য অনুসন্ধান নিয়ে। ফলে প্রধান উজির হালিলের সাথে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়।

এর কিছুদিন পরই জানিসারিসরা বেতন বৃদ্ধির জন্য বিদ্রোহ শুরু করে। প্রথমে মাহমুদ তাদের আবেদন খারিজ করে দিলে জানিসারিসরা খেপে যায়। আড্রিয়ানোপল জুড়ে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে গেলে নির্বিচারে গণহত্যা শুরু হয়। জানিসারিসরা মাহমুদের ব্যক্তিগত কাউন্সেলর সিহাব-নদ-দীন পাশার ওপর রোষায়িত হয়ে উঠলে তিনি পালিয়ে প্রাসাদে আশ্রয় নেন। ফলে তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবি মেনে নেয়া হয়।

পরবর্তীতে হালিল এবং মাহমুদের মাঝে দূরত্ব গড়ে ওঠে জানিসারিস ড্রাফট সিস্টেমকে কেন্দ্র করে। এর মাধ্যমে শাসন প্রতিষ্ঠানগুলোতে খ্রিস্টান ধর্মত্যাগীরা ধীরে ধীরে উচ্চ পদ দখল করা শুরু করে। এদের একজন ছিলেন সিহাব-এদ-দীন। অনেক সময় প্রাক্তন ক্ষমতাবান মুসলিম পরিবারসমূহ এ অধিকার বঞ্চিত হতে থাকে। যেমন ঘটে হালিলের ক্ষেত্রে। এটি ধরা হয় যে হালিল জানিসারিসদের বিদ্রোহ উসকে দিয়ে নিজের ক্ষমতার প্রয়োগ ও তরুণ মাহমুদকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে। ফলে সাম্রাজ্যের প্রশাসনে পুরাতন মুসলিম ও নতুন ধর্মত্যাগী খ্রিস্টানদের নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। ফলাফলস্বরূপ সুলতান মুরাদ অবসর যাপন থেকে ফিরে আসেন।

জেন্‌টিলি বেলিনি আঁকা বিজয়ী সুলতান মাহমুদের বিখ্যাত প্রতিকৃতি।

মুরাদের প্রথম অবসর যাপনের সময়কাল খুব বেশি হলে তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল। এদিকে হুনযাদীর অভিযান বিদেশে সবার মাঝে প্রত্যাশা বাড়িয়ে তুলতে থাকে। হুনযাদী প্রতিজ্ঞা করেন যে প্রণালি পথকে নৌবাহিনী দিয়ে সুরক্ষিত রাখবেন। বাইজেন্টাইন সম্রাট মুরাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে লাডিসলাসের কাছে অনুনয় করেন খ্রিস্টানদের বর্ম সুরক্ষার জন্য। লাডিসলাস এতে সম্মতি প্রদান করেন। এক্ষেত্রে তিনি পোপের কার্ডিনাল জুলিয়ানের দ্বারা ক্রুসেডে উদ্বুদ্ধ হন।

ফলাফলস্বরূপ সার্বীয়ার সেনাবাহিনী বাদ দিয়ে অন্যান্যদের নিয়ে ক্রুসেড বাহিনী তৈরি হয়। সবাই সুলতানের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ জয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়।

কিন্তু ১৪৪৪ সালের নভেম্বরে মুরাদ ভার্নাতে হঠাৎ করেই তাদের সামনে উদয় হন। অনুকূল বাতাস, নৌবাহিনীর চোখে ফাঁকি, জেনেয়াকে ঘুষ দিয়ে রাস্তা বের করা প্রভৃতির মাধ্যমে সুলতান মুরাদ খ্রিস্টান বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য প্রণালি ধরে এগিয়ে যান। জানিসারিসরা প্রধান খ্রিস্টান আক্রমণকে ঠেকিয়ে দেয়। লাডিসলাসকে যুদ্ধক্ষেত্রেই হত্যা করে বর্শার মাথায় তাঁর হেলমেটসহ মাথা ও অন্য বর্শায় চুক্তি ভঙ্গের কপি ঝুলিয়ে খ্রিস্টানদের দেখানো হয়। কার্ডিনাল জুলিয়ান যিনি এই ক্রুসেডকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। পালিয়ে যান এবং তাকে আর কখনো দেখা যায়নি। হুনযাদীকে ওয়ালাসিয়ার নেতা পূর্বশত্রুতার জের ধরে বন্দি হিসেবে নিয়ে যায় নিজের সাথে। রাজা লাডিসলাসের ছিন্ন মস্তক অটোমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত রাজধানী বার্সাতে নিয়ে মধুতে চুবিয়ে রাখা হয়। পরবর্তীতে নদীর জলে পরিষ্কার করে বর্শায় করে প্রণালি ধরে প্রদর্শন করা হয়।

এই জয়ের ফলে দানিয়ুব পর্যন্ত সব অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসে। এরপর ১৪৪৪ সালের শেষ দিকে মাহমুদকে সিংহাসনে বসান আনুষ্ঠানিকভাবে। সুলতান হিসেবে মাহমুদ শাসনকাজ শুরু করে।

কিন্তু ১৪৪৬ সালের বসন্তে মুরাদ পুনরায় আড্রিয়ানোপল ফিরে আসেন। কেননা হালিলের সাথে মাহমুদের সম্পর্কের অবনতি হয়। এ সময় মাহমুদ কনস্টান্টিনোপল আক্রমণে উদ্যত হন, যখন কিনা অটোমান সৈন্যরা গ্রিক এবং আলবেনিয়া সীমান্তে ব্যস্ত। এ সময় আবারো হালিলের সাথে মাহমুদের মতবিরোধ হয়। হালিল শান্তিকামী মানুষ। তাঁর পক্ষে ছিলেন জানিসারিস এবং মুরাদ। এবার মাহমুদ অবসর গ্রহণ করে ম্যাগনেসিয়ায় ফিরে যান। পিতা মুরাদ পুনরায় সিংহাসনে বসেন, মৃত্যু পর্যন্ত।

যুদ্ধ পুনরায় মুরাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাইজেন্টাইনের রাজা মোরিয়াতে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। ফলে মুরাদ বাধ্য হন গ্রিস অভিমুখে অভিযান শুরু

করতে। এখানে সফলভাবে যুদ্ধে জয় লাভ করে গ্রিক স্বেচ্ছাচারী রাজাকে প্রজায় পরিণত করেন তিনি। একই সাথে ল্যাটিন প্রজাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনেন।

আলবেনিয়াতে যুদ্ধ শুরু হয়। এখানে হুনযাদীর ন্যায় জর্জ ক্রাস্তিয়োটার উত্থান ঘটে। জর্জ সুলতানের কোর্টে বেড়ে ওঠে এবং শিক্ষা লাভ করে। মুসলিম ধর্মান্তরিত হয়ে ইস্কান্দার বেগ নামগ্রহণ করে অটোমান সেনাবাহিনীর কাজ করে। দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে অটোমান বাহিনী ছেড়ে নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ শুরু করে। কাকতালীয়ভাবে হুনযাদীর সাথে উদ্দেশ্যে মিলে যাওয়ায় দুই নেতা একত্রে ১৪৪৮ সালে সার্বীয়া ও বসনিয়ার সহায়তায় হাঙ্গেরির সীমান্ত রক্ষায় তুর্কি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ঐতিহাসিক কসোভোর ময়দানে মুরাদ দ্রুত এ বাহিনীকে পরাজিত করেন। এর মাধ্যমে সার্বীয়ার স্বাধীনতার যবনিকাপাত ঘটে।

এরই মাঝে মাহমুদ ম্যাগনেসিয়ায় গুলবাহার নাম্নী এক রমণীর সাথে জড়িয়ে পুত্রসন্তানের জনক হন। যে শিশু পরবর্তীতে দ্বিতীয় বায়েজীদ নামে শাসন ক্ষমতা লাভ করে। সুলতান মুরাদ রাজবংশীয় বধূ হিসেবে গুলবাহারকে মেনে না দিয়ে প্রভাবশালী তুর্কমান রাজকুমারের কন্যার সাথে মাহমুদের বিয়ে দিলেও মাহমুদ তাঁকে সবসময় অবজ্ঞাই করেছেন। এমনকি কনস্টান্টিনোপলে মাহমুদ কোর্ট প্রতিষ্ঠার পরেও তিনি আদ্রিয়ানোপলের হারেমেই দিন কাটিয়েছেন।

শেষ বছরগুলোতে মুরাদ পুত্রের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। কসোভোর যুদ্ধে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন মাহমুদ। পিতার সাথে ১৪৫০ সালের অসফল আলবেনিয়ার যুদ্ধেও সঙ্গী হন। এর পরের বছর মুরাদের মৃত্যুর সময় মাহমুদ ছিলেন ম্যাগনেসিয়ায়। পিতার মৃত্যুর সংবাদ শোনার পরপরই নিজের আরবীয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে উত্তরে যাত্রা শুরু করেন, প্রধান উক্তি ছিল, "আমাকে যে ভালোবাসো, আমাকে অনুসরণ করো।"

গালিপল্লীতে দুই দিন অপেক্ষা করে নিজ বাহিনী সহযোগে আদ্রিয়ানোপল পৌঁছান। হালিল এবং পিতার কাছের বন্ধু দ্বিতীয় উজির ইশাক পাশাকে দেখতে পান। তাদেরকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে হালিলকে পূর্ব পদে এবং ইশাককে আনতোলিয়ার গভর্নর পদে নিয়োগ দান করে পিতার মৃতদেহকে বার্সাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে বার্সাতে মুরাদ আরো একবার জানিসারিসদের বিদ্রোহের মোকাবেলা করেন। কঠোর হাতে এ বিদ্রোহ দমন করেন তিনি। এছাড়া আরো নতুন নতুন ইউনিট তৈরি করে জানিসারিসদেরকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। ফলে এ বাহিনী সাম্রাজ্যের শক্তিশালী নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এরপর শীঘ্রই প্রস্তুত হয়ে উঠেন নিজের গন্তব্যের লক্ষ্যে—কনস্টান্টিনোপল অবরোধে।

॥ ৭ ॥

খ্রিস্টান শক্তিসমূহ প্রথম দিকে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদকে তেমন একটা আমল দেয়নি। বখে যাওয়া রাজকুমারের পূর্ব ইতিহাস দেখে কেউ ধারণা করেনি যে, তিনি একদিন পিতার মতোই দক্ষ হয়ে উঠবেন। ছোটখাটো কিন্তু শক্তিশালী ও সুদর্শন মাহমুদ ছিলেন ঠাণ্ডা স্বভাবের। নিজের উপস্থিতি দিয়ে চারপাশের শ্রদ্ধা আদায় করে নেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর।

গিবন লিখে গেছেন, "তাঁর ঠোঁটে ছিল শান্তির বাণী। কিন্তু হৃদয়ে ছিল যুদ্ধের বাসনা।" বিদেশি দূতদের সাদরে গ্রহণ করে তিনি পিতার সই করা চুক্তিসমূহ পালনে আগ্রহী হয়ে উঠেন। সম্রাট কনস্টান্টাইনের রাষ্ট্রদূতকে বন্ধুসুলভ আতিথেয়তা প্রদান করেন।

আবার এশিয়া মাইনরে অনেক রাষ্ট্রদূতই সুলতানের কাছে যথোপযুক্ত সম্মান না পাওয়ার অভিযোগ করেন। প্রধান উজির হালিল এদেরকে সাবধান করে লিখেন, তোমরা যদি অর্খানের (বায়েজীদের পৌত্র) সাথে বাহিনী গঠন করে অগ্রসর হও; নিশ্চিত থাকো যে নিজেদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করবে।

আড্রিয়ানোপলে ফিরে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ স্ট্রুমা শহর থেকে গ্রিকদেরকে বিড়াতন ও তাদের রাজস্ব বায়েজাপ্তকরণের নির্দেশ দেন। এশিয়া মাইনরে ফিরে এসেই বাইজেন্টাইন অঞ্চলে প্রাসাদ তৈরির আদেশ দেন। এর ফলে প্রণালি পথকে নজরে রাখা এবং কনস্টান্টিনোপলকে অবরোধ করা সহজতর হবে।

কিন্তু বাইজেন্টাইন সম্রাট তৎক্ষণাৎ এ সিদ্ধান্তকে চুক্তির বরখেলাপ ভেবে রাষ্ট্রদূত পাঠান মাহমুদের কাছে। সুলতান রাষ্ট্রদূতকে অস্বীকার করেন। প্রাসাদের নির্মাণকাজ শুরু করার পর সম্রাট দ্বিতীয় আরেকজন রাষ্ট্রদূত পাঠান নানা উপঢৌকনসহকারে এবং বসফরাসে গ্রিক গ্রামগুলোর সুরক্ষার অনুরোধ জানিয়ে। সুলতান আবারো তাদের ফিরিয়ে দেন। সবশেষে শেষ রাষ্ট্রদূত এসে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করা হবে না মর্মে নিশ্চয়তা চাইতেই সুলতান তাদের হত্যা করেন। এর ফলেই সবার মাঝেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সুলতান নিজে পরিকল্পনা করে প্রাসাদের দেয়াল তৈরি করেছেন। মাত্র সাড়ে চার মাসের মধ্যে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। বোগাজ কেসেন নামে নামকরণ করা হয়।

প্রাসাদের নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর সুলতান সেনাবাহিনী নিয়ে কনস্টান্টিনোপলের দেয়াল পরিদর্শন করেন তিন দিন ধরে। এরপর শীতে আড্রিয়ানোপলে নিজের কোর্টে ফিরে এর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করেন। রাতারাতি তিনটি কামান স্থাপন করেন প্রণালির পাশের একটি উঁচু টাওয়ারে।

নির্দেশ জারি করেন যে প্রণালি পায় পাপ হওয়ার সময় প্রতিটি জলযান নিজেদের পাল এবং নোঙ্গর নামিয়ে রাখবে। প্রাসাদের সামনে নোঙ্গর নামিয়ে রেখে নিজেদের যাত্রা অব্যাহত করার জন্য অনুমতি জোগাড় করবে নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদানের বিনিময়ে। নচেৎ কামানের গোলা মেরে তৎক্ষণাৎ তাদের ডুবিয়ে দেয়া হবে।

মাহমুদ নতুন নতুন সামরিক সরঞ্জামের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। হাঙ্গেরিয়ান ইঞ্জিনিয়ার আরবান কামানের মাধ্যমে তাঁকে আরো উৎসাহী করে তোলেন এই বলে যে, এর গোলা বাইজেন্টাইন নয়, ব্যাবিলনের দেয়ালও ফুটো করে দিতে পারবে। এভাবে আরবানকে বোগাজ কেসেনের ওপর স্থাপন করার মতো কামান তৈরির নির্দেশ দেন সুলতান, যাতে বসফরাসকে কামানের গোলার নাগালের মাঝে রাখা যায়।

মাহমুদ এরপর আরবানকে নির্দেশ দেন দুইগুণ বড় একটি কামান তৈরি করার জন্য। এটি তৈরি শেষ হওয়ার পর দেখা যায় আড্রিয়ানোপলে সাতশ সৈন্য ও পনেরো জোড়া ষাঁড় প্রয়োজন হয় এটি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নেয়ার জন্য। শহরবাসীকে সতর্ক করা হয় এর শব্দে ভয় না পাওয়ার জন্য। তারপর এটি পরীক্ষা করা হয়। দশ মাইল দূর থেকেও এর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় আর গোলাটি এক মাইল ছুটে গিয়ে ছয় ফুট গভীরে গিয়ে থামে শেষ পর্যন্ত।

এই মহড়ায় উল্লসিত হয়ে সুলতান নির্দেশ দেন রাস্তা ও সেতু মেরামত করার জন্য যেন বসন্তে এই কামান কনস্টান্টিনোপলের দেয়ালের বাইরে কোনো অংশে স্থাপনের জন্য নিয়ে যাওয়া যায়। এভাবে আর্টিলারি বাহিনী গঠন করে গান পাউডার ব্যবহারের প্রচলন করেন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ, যা পশ্চিমে পরিচিত থাকলেও পূর্বের মানুষের অজানা ছিল।

১৪৫২ সালের পুরো শীতজুড়ে সুলতান কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন নিজের কৌশল, পরিকল্পনা, আক্রমণের প্রস্তুতি। ছদ্মবেশে শহরে ঘুরে সৈন্যদের ও সাধারণ মানুষের মনোভাব সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

নিজের সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রদেশ থেকে সৈন্য এনে থ্রেসে জড়ো করেন সুলতান। যাদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় শত হাজারে। এদের মাঝে জানিসারিসরাই ছিল বারো হাজার। ব্যক্তিগতভাবে তিনি সেনাবাহিনীর সরঞ্জামের তদারক করেন। রাজ্যজুড়ে কারিগররা তৈরি করতে থাকে বর্ম বর্শা, শিরস্ত্রাণ, তরবারি, তীর-ধনুক-প্রকৌশলীরা বানায় চাকা ও ব্যাটারি, এই বিশাল বাহিনীর সামনে কনস্টান্টিনোপলের গ্রিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র সাত হাজার।

ইউরোপ ও এশিয়া'র দূর্গদ্বয়। ডানদিকে রুমেলি হিসারি, বাম দিকে আনাডলু হিসারি। আনাডলু হিসারি তৈরি করেন প্রথম বায়েজীদ আর এর ঠিক অর্ধ শতাব্দী পরে ১৪৫১-৫২ এর শীতকালে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ মাত্র সাড়ে চার মাসে নির্মাণ করেন রুমেলি হিসারি এবং নামকরণ করেন 'প্রণালী বিভক্তকারী'। দুর্গদ্বয় এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যে একে অপরের ঠিক বিপরীতে এমন এক পয়েন্টে অবস্থিত যেখানে বসফরাস সবচেয়ে সংকীর্ণ। ২৩০০ ফুট মাত্র।
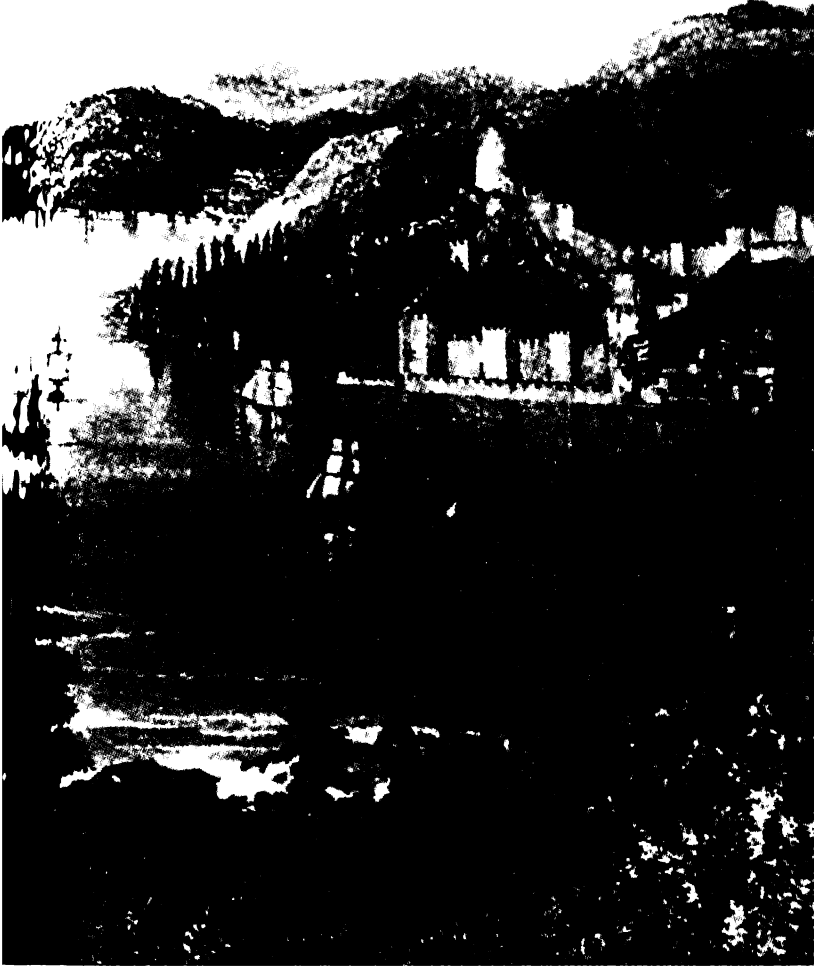
সম্রাট গিওভান্নি নামে জেনোয়ার বিশেষজ্ঞকে চাকরিতে নিয়োগ দান করেন শহর প্রতিরক্ষার জন্য। অস্ত্রের পুনর্বণ্টন করা হয়। আর্থিক সাহায্যের জন্য ফাণ্ড গঠন করা হয়। ব্যক্তি থেকে শুরু করে গির্জা, আশ্রম সব জায়গা থেকেই এতে অর্থ দান শুরু হয়।

সুলতান সচেতন ছিলেন যে কনস্টান্টিনোপলকে অবরোধ করার পূর্বের সব অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পেছনে কারণ ছিল শুধু স্থলপথে আক্রমণ। বাইজেন্টাইন সব সময় নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল বিধায় সমুদ্রপথে নিজেদের প্রয়োজনীয় রসদ আনত। অন্যদিকে তুর্কিরা এশিয়া মাইনর থেকে সৈন্য পরিবহনের জন্য খ্রিস্টান জাহাজ ব্যবহার করত। ফলে মাহমুদ বুঝতে পারেন যে নৌশক্তি জড়ো করাও জরুরি। এই চিন্তা থেকেই আজিয়ান জাহাজ ঘাঁটিতে খুব দ্রুত একশত পঁচিশটি নৌযান তৈরি করা হয়।

১৪৫৩ সালের বসন্তে গ্রিকবাসী অবাক হয়ে দেখল তুর্কিদের বিশাল নৌবহর তাদের নিজেদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি। এরপর নিজের মন্ত্রিপরিষদের কাছে আক্রমণের ও যুদ্ধের পরিকল্পনা খুলে বলে সুলতান ঘোষণা করেন যে তুর্কিরা এখন নৌশক্তিতে বলিয়ান এবং কনস্টান্টিনোপল ছাড়া অটোমান সাম্রাজ্য অসম্পূর্ণ মন্ত্রিপরিষদ একবাক্যে সুলতানকে সমর্থন দেয়।

সুলতান নবীজির সমর্থনও পেয়েছিলেন। অটোমান সেনাবাহিনী এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে স্বর্গে যে সৈন্য বিশেষ একটি জায়গা পাবে সে শহরে প্রবেশ করবে। সুলতান প্রায়ই বলতে থাকেন যে তিনিই সেই রাজকুমার হবেন যিনি অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ইসলাম নাম নিয়ে জয়ী হবেন।

অন্যদিকে গ্রিকরা পুরো শীতজুড়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বাধার মুখোমুখি হয়। ভূমিকম্প, বন্যা, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, তারা পতন সবকিছু মিলিয়ে অ-খ্রিস্টানদের হাতে সাম্রাজ্যের পতনের ঘণ্টা বাজতে থাকে।

বসন্তের শুরুতে সুলতান থ্রেসের মধ্য দিয়ে নিজের বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করেন এবং ২ এপ্রিল ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের দেয়ালের কাছে পৌঁছান। ভূমির পাশের দেয়ালের একটি কেন্দ্রীয় অংশকে বাছাই করে সুলতান নিজের হেডকোয়ার্টার তৈরি করান। চারপাশে জড়ো করেন জানিসারিসদের। পাশেই রাখা হয় সেই দানবীয় কামান। সুলতানের অপর পাশে ঠিক তাঁর সোজাসুজি জেনোইস সৈন্যদের নিয়ে সম্রাট অবস্থান নেন। এছাড়াও ভেনেশীয়ান খ্রিস্টানরাও তাঁর পক্ষে আছেন প্রমাণ করার জন্য সৈন্যরা নিজেদের ইউনিফর্ম পরে তুর্কিদের সামনে দিয়ে হেঁটে বেড়ান।

কূটনৈতিক পর্যায়ে সুলতান কোন আগ্রহ না দেখানোয় এটাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে তাই হোক মর্মে সুলতানকে একটি পত্রে জানান সম্রাট।

এরপর শহরের প্রধান দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। পরিখার ওপর থেকে সেতু সরিয়ে ফেলা হয়। পবিত্র সপ্তাহজুড়ে খ্রিস্টানরা গির্জাতে প্রার্থনা

করে উদ্ধারের জন্য। এরপর সুলতান সম্রাটের কাছে দূত পাঠান যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তির জন্য। শহরের অধিবাসীদের সুলতান আত্মসমর্পণের বিনিময়ে অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে নিরাপত্তা ও সম্পত্তি লাভের কথা শোনান। শহরবাসীরা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর এপ্রিল মাসের ছয় তারিখে শুরু হয় বোমাবর্ষণ। এক সপ্তাহ পর এর প্রচণ্ডতা বেড়ে যায়, চলে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত।

শহরের দেয়াল ফুটো করার ক্ষেত্রে সুলতান মানব শক্তির চেয়েও গোলন্দাজের ওপর নির্ভর করেছেন বেশি। কিন্তু তারপরেও তাঁর সৈন্যরা কোনো দ্রুত সাফল্য দেখাতে পারেনি। বিশাল বিশাল গোলার আঘাতে দেয়ালের কোনো কোনো অংশ সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো কার্যকর ফাটল তৈরি করতে পারেনি। বরঞ্চ গ্রিক সৈন্যরা দ্রুতই তা মেরামত করে নেয়।

সমুদ্র আক্রমণের ক্ষেত্রেও সুলতানের সৈন্যরা প্রত্যাশিত সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়। গোল্ডেন হর্নের ওপর আগের মতোই গ্রিকদের আধিপত্য বজায় থাকে। এর ওপরে আবার এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে অস্ত্র ও রসদবোঝাই তিনটি জেনোইস বিশাল জাহাজ দার্দেনালিসের ভেতর দিয়ে চালিয়ে শহরের কাছে পৌঁছে যায়। সুলতান তাঁর অ্যাডমিরাল এ জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেও কাঙ্ক্ষিত ফল আসে না। খ্রিস্টান জাহাজগুলো তুর্কিদের হারিয়ে নিরাপদে গোল্ডেন হর্নের আশ্রয়ে পৌঁছে যায়।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ বুঝতে পেরেছিলেন শুধু স্থলপথে আক্রমণ করলেই কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটানো যাবে না। কিন্তু এখন তাঁর সমুদ্রপথের আক্রমণও ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠার জন্য সম্ভবত তাঁরই কোনো ইটালিয়ান সৈন্য সুলতানের মাথায় অভিনব এক পরিকল্পনা ঢুকিয়ে দেয়। জমির ওপর দিয়ে বসফরাস থেকে গোল্ডেন হর্ন পর্যন্ত জাহাজগুলোকে টেনে নেয়া। সুলতানের প্রকৌশলীরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুইশ ফুট উচ্চতায় উপত্যকায় ওপর থেকে শুরু করে ঢালু বেয়ে পোতাশ্রয় পর্যন্ত আরেকটি উপত্যকা পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করে। তেল মাখানো কাঠের গুঁড়ি ফেলে ষাঁড়ের সাহায্যে জাহাজগুলোকে টেনে নেয়া হয়।

এভাবে পাল উঠিয়ে পতাকা টাঙিয়ে বিস্মিত খ্রিস্টান সৈন্য ও পাহারাদারদের চোখের সামনে পাহাড় বেয়ে তাদের পোত্রাশ্রয়ের ওপর নেমে আসে জাহাজের বহর। এভাবে গ্রিক ও প্রতিরক্ষা ব্যূহর মাঝে গোল্ডেন হর্নের ভেতরে সত্তরটি তুর্কি জাহাজ ভাসাতে শুরু করে। জোনাই এবং ভেনেশীয়রা হালকা জলযান দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করলেও তুর্কিরা আক্রমণ প্রতিহত করে। গ্রিকরা গোল্ডেন হর্নের নিয়ন্ত্রণ হারায়। তুর্কিরা পোতাশ্রয়জুড়ে নৌকা দিয়ে ভাসমান সেতু বানিয়ে নিজেদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। এভাবে প্রোতাশ্রয় এবং স্থল উভয় দিকের দেয়ালের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইস্তাম্বুলের বাইজেন্টাইনের প্রতিরক্ষার জন্যে চৌদ্দ মাইল দেয়ালের অংশ থিওডোসিয়াস দেয়াল। ১৪৫৩ সালে শহরটি অটোমানরা দখল করার অনেক পরের চিত্র এটি। বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় মিনার সমূহ।

কিন্তু নৌপথের এই বিজয় সহসাই কোনো স্থলপথের বিজয়ের সৃষ্টি করতে পারেনি। ধীরে ধীরে প্রতিরক্ষাকারীদের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে থাকে। পশ্চিমা খ্রিস্টান বিশ্ব থেকে কোনো সহায়তা না আসায় কেউ কেউ সম্রাটকে প্ররোচিত করতে থাকে বাইরে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার।

কিন্তু সম্রাট নিজের জনগণ, সিংহাসন, ঈশ্বরের গির্জাসমূহকে এ অরাজকতার মাঝে ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন।

প্রায় সাত সপ্তাহ অবরোধ করে রাখার পরও আধুনিক অস্ত্রাদি থাকা সত্ত্বেও কোনো তুর্কি সৈন্য শহরের দেয়ালের ওপর পা ফেলতে পারেনি। এ অবস্থায় প্রধান উজির হালিল দূত মারফত সম্রাটের কাছে বার্ষিক মোটা অঙ্কের করের বিনিময়ে শান্তির প্রস্তাব করেন। অথবা শহর খালি করে দিতে হবে। পেলোপনিসে সম্রাটকে একটি রাজ্য দেওয়ার কথাও বলা হয়। কিন্তু সম্রাট উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে সুলতান গর্জে উঠেন। আত্মসমর্পণ ব্যতীত গ্রিকদের আর কোনো সুযোগ দিতে তিনি নারাজ। হয় তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করো, নয়তো ইসলামে ধর্মান্তরিত হও।

সুলতান মে মাসের ঊনত্রিশ তারিখে সবশেষ ভয়ংকর আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। সৈন্যদের এই বলে উৎসাহিত করেন যে শহরের সম্পত্তি তাদের মাঝে সমবণ্টন করা হবে। শুধু দালান এবং দেয়াল সুলতানের নামে থাকবে। সৈন্যরা উৎসাহিত হয়ে রাত জেগে পরিখা নির্মাণ করে। উল্লাসে চিৎকার করে এসব দেখে শুনে গ্রিকদের হাঁটু গেঁড়ে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। সবকিছুর ওপর ঝটিকা পরিদর্শন শেষে সুলতান নিজের মন্ত্রিপরিষদের সাথে বসেন। নিজের সৈন্যদের কাছে সাহস এবং নিমানুবর্তিতার আশার কথা জানান।

নিজের সৈন্যদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সম্রাট জানান একজন মানুষকে সবসময় তার বিশ্বাস, দেশ, পরিবার এবং সার্বভৌমত্বের জন্য মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন সময় এসেছে এ চার ক্ষেত্রকেই মৃত্যুবরণ করে হলেও রক্ষা করার। নিজের সৈন্যদের কাছে প্রাচীন গ্রিক এবং রোমান বীরদের ন্যায় বীরত্বের আশার কথা জানান।

১৪৫৩ সালের ২৯ মে শুরু হয় সুলতানের আক্রমণ। বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোলের মাধ্যমে কামানের গোলা গর্জে ওঠে। বাদকেরা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ওঠে, দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে থাকে যুদ্ধংদেহী সেনাপ্রধানরা। তৎক্ষণাৎ পাহারাদাররাও গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। সারা শহর জেনে যায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পুরুষেরা তাদের নিজ নিজ পোস্টে ছুটে যায় যুদ্ধ করতে, মহিলারা হাতে পাথর তুলে নেয়। শিশু ও বৃদ্ধরা গির্জার আঙিনায় একত্রিত হয়ে প্রার্থনা শুরু করে।

এরই মাঝে দেয়ালের পাশে সুলতানের আক্রমণ তিনবার সফল হয়। প্রথমে ছিল অস্থায়ী সৈন্যদল, প্রায় দুই ঘণ্টা যাবত যুদ্ধ করে তারা প্রাথমিকভাবে শত্রুকে ভয় পাইয়ে দেয়।

এরপর আসে সশস্ত্র এবং সুদক্ষ আনাতোলিয়ার সেনাবাহিনী। গির্জার সংকেত আবারো বেজে উঠার পরপরই এর শব্দ ঢেকে যায় দেয়ালের ওপর সৈন্যদের ঝনঝন শব্দে। আনাতোলিয়ার সৈন্যরা যদিও পাথর বৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু আরবানের তৈরি করা বিশাল কামানের গোলা সরাসরি দেয়ালে আঘাত হানে। সৈন্যরা হইহই করে সেই ফাঁক গলে ঢুকে যায়। কিন্তু সম্রাট স্বয়ং গ্রিকদের নিয়ে এদের প্রতিহত করেন। বেশির ভাগ সৈন্যকে কচুকাটা করে বাকিদেরকে পরিখার কাছে ফিরতে বাধ্য করেন। সুলতান একই সাথে সৈন্যদের প্রশংসা এবং ভর্ৎসনা দুটোই করেন। এরপর সময় আসে যুদ্ধে জানিসারিসদেরকে ব্যবহার করার। যুদ্ধের প্রধান আক্রমণের জন্য এদেরকে সংরক্ষিত রেখে ছিলেন সুলতান। জানিসারিসরা সময় আসতেই সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যায় রণসংগীত গাইতে গাইতে। মাহমুদ চিৎকার করে তাদেরকে উৎসাহিত করতে থাকেন। কিন্তু হাতাহাতি যুদ্ধের এক ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও তারা তেমন আগাতে পারেনি। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা প্রায় চার ঘণ্টা ধরে একই উদ্যম নিয়ে লড়াই করে চলেছে।

কিন্তু তারপরই দুর্ভাগ্য তাদের থামিয়ে দেয়। প্রথমত বলা যায় পেছন দিকের খিড়কীর দরজার কথা। দেয়ালের উত্তর দিকের এই দরজা দিয়ে এক দল তুর্কি সেনা প্রবেশ করে টাওয়ারে চড়ে বসে। গ্রিকরা হয়তো এটাকে থামাতে পারত যদি না দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য তাদের না থামিয়ে দিত। তাদের সেনাপ্রধান জিউসটিয়ানীর বুকের বর্ম ভেদ করে খুব কাছ থেকে ছোড়া গুলি ঢুকে গেলে তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সাহস হারিয়ে প্রার্থনা করেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যাওয়ার। কিন্তু এ কথায় কান না দিয়ে সম্রাট অনুরোধ করেন তাঁকে ছেড়ে না যেতে। ভেতরের দরজা খুলে জিউসটিয়ানীকে গোল্ডেন হর্নে অবস্থিত জেনোইস জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়। এ অবস্থায় তার জেনোইস সৈন্যরা যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছে ভেবে সেনাপতির সাথে চলে যায়।

এর ফলে সৈন্যদের মনোভাব ভেঙে যায়, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খুব দ্রুত এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে সুলতান চিৎকার করে উঠেন, "শহর আমাদের" এবং জানিসারিসদের সর্বশেষ আক্রমণের নির্দেশ দেন। আনাতোলিয়ার দৈত্যাকৃতি সৈন্য হাসান নেতৃত্ব দিয়ে মৃত্যুবরণ করলেও জানিসারিসরা শীঘ্রই গ্রিকদের কচুকাটা করে ফেলে। এরপর অনেক জানিসারিস কোনো বাধা ছাড়াই ভেতরের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে। একই খিড়কীর দরজাতেও তুর্কি পতাকা উত্তোলন করে তুর্কিদের বিজয় ঘোষিত হয়।

এরই মাঝে সম্রাট খিড়কীর দরজার কাছে যেতে চাইলেও গুজবে শুনতে পান তুর্কিরা পৌঁছে গেছে; কিছুমাত্র জেনোইস আছে প্রতিহত করার জন্য। সম্রাট ঘুরে প্রধান দরজার কাছে যেতে চাইলে দেখতে পান, ইতিমধ্যেই তা তুর্কিদের দখলে চলে গেছে। শহর কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং আমি এখনো বেঁচে আছি, ভেবে সম্রাট ঘোড়া থেকে নেমে রাজকীয় চিহ্ন খুলে ফেলে ছুটে আসা জানিসারিসদের মাথা লক্ষ করে দৌড় দেন। এরপর জীবিত অথবা মৃত আর কখনোই দেখা যায়নি তাঁকে।

সুশৃঙ্খলভাবে দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেই বিজয়ী সৈন্যদল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। শহরজুড়ে নরহত্যা শুরু করে। গির্জা, আশ্রম, প্রাসাদ বাড়িঘর সবকিছু তছনছ করে ফেলতে শুরু করে। গ্রিকরা হাজারে হাজারে দৌড়ে যায় তাদের প্রধান গির্জার দিকে।

ইতিহাসবিদ মাইকেল দুকাস এ সম্পর্কে লিখে গেছেন, বিশাল গির্জা চত্বরে প্রবেশ করেই গ্রিকরা প্রধান দরজা বন্ধ করে দেয়। অপেক্ষা করতে থাকে কোনো স্বর্গদূত এসে তাদের রক্ষা করবে। দিনের প্রথম ঘণ্টাও পার হয়নি। শহর লণ্ডভণ্ড করে তুর্কিরা এসে গির্জায় দরজার কুঠারাঘাত করতে থাকে।

সুলতান বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করে দিনের শেষ ভাগে। জানিসারিস ও মন্ত্রিপরিষদ পরিবৃত হয়ে শহরের রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে সোজা থামেন প্রধান গির্জার সামনে। ঘোড়া থেকে নেমে এক মুঠো মাটি নিয়ে নিজের মাথায় মাখান। গির্জায় প্রবেশ করে বেদীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পান একজন সৈন্য মেঝে থেকে মার্বেল পাথর খুলে নিচ্ছে। সুলতান তৎক্ষণাৎ সৈন্যটিকে তরবারির আঘাত করে জানিয়ে দেন যে সম্পদ এবং বন্দি সৈন্যদের। কিন্তু দালান-কোঠা সুলতানের। সৈন্যটি পায়ের ওপর পড়ে গিয়ে চলে যায়।

মাহমুদ নির্দেশ দেন এ গির্জা মসজিদে রূপান্তর হবে। তৎক্ষণাৎ মুসলিম ধর্ম নেতা উঠে আজান দেয়। এরপর সুলতান নিজে বেদিতে ওঠে আল্লাহকে অভিবাদন জানান এ বিজয়ের জন্য। তারপর যখন তিনি রাস্তায় বেরিয়ে আসেন সব কিছু নিশ্চুপ হয়ে যায়। সুলতান নির্দেশ দেন একদিনের লুণ্ঠনই যথেষ্ট হয়েছে সৈনদের জন্য।

॥ ৮ ॥

কনস্টান্টিনোপলের পতনের ফলে পশ্চিমা খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ নিজেদের বিনাশের কথা ভেবে হতচকিত হয়ে ওঠে। শেষ মুহূর্তে ভেনেশীয়ান জাহাজ বহরের মাধ্যমে পোপের সৈন্যবাহিনী শহর রক্ষার চেষ্টা করলেও আজিয়ানের তীর থেকে আর এগোতে পারেনি। এই বিপর্যয় পশ্চিমা সভ্যতাকে হুমকির

মাঝে ফেলে। আবেগের দিক থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটা মানসিক। কিন্তু কার্যত শতাব্দী পূর্বেই কনস্টান্টিনোপল পরাজিত হয়েছে। নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় পশ্চিমা বিশ্ব এটা আন্দাজ করতে পারেনি যে আধুনিক একটি সেনাবাহিনীর কাছে মধ্যযুগীয় একটি দেয়াল কতটা অসহায়।

১৪৫৩ সালের ২৯শে মে তারিখটি ইতিহাসে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের মাঝের সন্ধিক্ষণ হিসেবে পরিচিত। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে কনস্টান্টিনোপলের পতন বিভিন্ন ক্রমাগত প্রক্রিয়ার মাঝের একটি উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ নিজের রাজ্যভিষেকের সময় থেকেই নিজেকে রোমান সাম্রাজ্য ও এর খ্রিস্টান বিজয়ীদের উত্তরসূরি হিসেবে দেখে আসছে। কনস্টান্টিনোপলের বিজয় এ ধারণাকেই আরো পাকাপোক্ত করে। নিজের শিক্ষা এবং সরকার পরিচালনাকারী হিসেবে নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে মাহমুদের সাম্রাজ্যিক চিন্তাচেতনা ছিল সুদূরপ্রসারী। নিজের ক্ষমতার ওপর আত্মবিশ্বাস থাকাতে মহাবীর আলেকজান্ডার ও সিজারের খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে যেতে চান।

নিজের অটোমান ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে দ্বিতীয় মাহমুদ পৃথিবীব্যাপী ইসলামিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চান। পশ্চিমকে আমন্ত্রণ জানান দুটি ভূমি এবং দুটি সমুদ্রকে নিজেদের সার্বভৌমত্ব হিসেবে ঘোষণা করতে। রুমালিয়া ও আনাতোলিয়া ভূমধ্যসাগর এবং কৃষ্ণসাগর কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে পূর্বতন খলিফারা যা করতে পারেনেনি, মাহমুদ তাই করে দেখান।

মাহমুদ নিজেই নিজের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা নয়, বরঞ্চ অটোমান রীতির মাধ্যমে একে নতুন জীবন দান করা। রাজধানীর নতুন নাম হয় ইস্তাম্বুল।

মাহমুদের চিন্তানুযায়ী এটি হবে এমন এক সাম্রাজ্য যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইসলামের নামে ধর্ম উভয়ই থাকবে। কিন্তু একইভাবে একে একটি বিশ্ব সাম্রাজ্যও হতে হবে। যেখানে সকল জাতিবর্ণের মানুষ একত্রে সুখে শান্তিতে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করবে। বাইজেন্টাইন সম্রাটের পরাজয়ের সাথে সাথে গির্জা এবং রাষ্ট্র একই প্রশাসনের ছায়াতলে চলে আসে। খ্রিস্টান গির্জা এখন মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে চলে যায় এবং কর দেয়ার অঙ্গীকার করে। কিন্তু এর বিনিময়ে এর সম্প্রদায় পূর্বের মতো উপাসনার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং নিজস্ব জীবনযাত্রার ধরন বজায় রাখার স্বাধীনতা পায়।

পরাজিত জাতি হিসেবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাদের না থাকলেও শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে সবার অংশগ্রহণ ছিল সমান। এ কারণে মাহমুদ ঠিক করেন ইস্তাম্বুলের দেয়ালের মাঝে উলেমা সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অর্থডক্স, আর্মেনীয়ান এবং জিউ প্রধান রাব্বি থাকতে হবে।
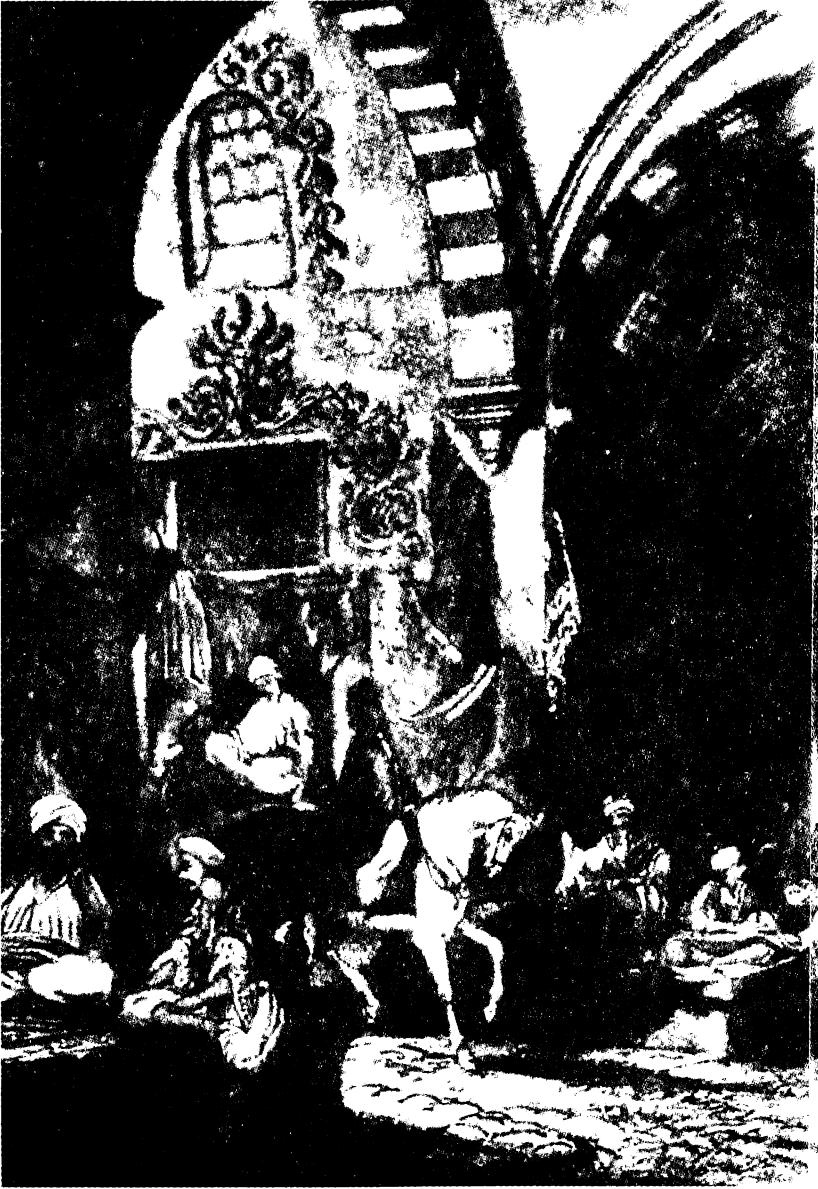
ইস্তাম্বুলের বাজার। শহরটি দখল করার পরপরই সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এটি নির্মাণ করেন ও পরের শতাব্দীতে এ বাজার আরো বিস্তৃত হয়। আলমে'র অঙ্কিত চিত্রে প্রধান 'এভিনিউ' ও পথের দু'ধারের দোকানসমূহ দেখা যাচ্ছে।

বিজয়ী মাহমুদ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন যে শহরের বৃহৎ অংশ ধনী এবং সংস্কৃতমনা অ-মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে গ্রিকরা সাম্রাজ্যের জন্য সম্পদ। অন্যদিকে গ্রিক শিক্ষার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। গ্রিক ইতিহাস শিক্ষা নিয়েছিলেন মাহমুদ। এমনকি তাঁর নিজের রক্তেও গ্রিক মায়ের ভূমিকা ছিল।

তাই গ্রিক গির্জার ক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রধানকে নিয়োগ করেননি মাহমুদ। ১৪৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রিক প্রধান হিসেবে জেনোডিয়াসকে অভিষিক্ত করেন সুলতান। জোনোডিয়াস বাইজোন্টাইন সম্রাটদের আমলে প্রাপ্ত সকল সুযোগ-সুবিধা পূর্বের মতোই ভোগ করত। ব্যক্তিগতভাবে অভিষেক অনুষ্ঠানে সুলতান জেনোডিয়াসকে রোব, রুপার কাজ করা নতুন ক্রুশ প্রদান করেন। বাইজেন্টাইন সম্প্রদায়ের ওপর বিশেষ অধিকার, তিন ক্ষেত্রে পাশা-র মর্যাদা লাভ করে জেনোডিয়াস। যথাযথ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অভিষেক কর্ম সম্পাদিত হয়। হাগিয়া সোফিয়া, মসজিদে পরিণত হয়। সাদা ঘোড়ায় চড়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে হলি অ্যাপোসেলস্ গির্জার অংশে নিজের বাসভবনে ওঠে জেনোডিয়াস।

মসজিদে রূপান্তরিত হওয়ার পর হাগিয়া সোফিয়ার নামকরণ হয় আয়া সোফিয়া এবং এর গম্বুজের ওপর রাখা ক্রুশটি সরিয়ে মক্কা অভিমুখী অর্ধচন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

নতুন গ্রিক প্রধান পোপের বিরুদ্ধে গ্রিক অর্থডক্স গির্জার রক্ষক এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সুলতানকে মর্যাদা দেন। জেনোডিয়াসের ক্ষমতা এবং সম্মান এতটাই বেড়ে যায় যে তাকে অনেকটা গ্রিকদের পোপে ভূষিত করা হয়। জেনোডিয়াসের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব ও খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে সুলতানের জ্ঞান অন্বেষণের ইচ্ছা পূরণ হয়। সুলতানের অনুরোধে জেনোডিয়াস অর্থডক্স গির্জার একটি বিশ্বাস বাণীকে তুর্কিতে রূপান্তরিত করে দেয়। এর ফলে পশ্চিমা বিশ্বে প্রত্যাশার জন্মে নেয়, হয়তো সুলতান খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হবেন।

পরবর্তীতে পোপ দ্বিতীয় পিউস সুলতানের কাছে ক্যাথলিক মতবাদের গভীর বিশ্বাস তুলে ধরে দীক্ষাস্নান গ্রহণের প্রস্তাব করেন। পোপ আরো জানান, এর মাধ্যমে সুলতান পোপের নিরাপত্তা বলয়ে থেকে খ্রিস্টান রাজকুমারে পরিণত হবেন। কনস্টান্টিনোপলে এক গ্রিক দার্শনিক সুলতানের কাছে ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মের সাদৃশ্য তুলে ধরে উভয়কে একই ধর্মের ছায়াতলে নিয়ে আসার কথা বলে।

কিন্তু এ ধরনের কোনো উদ্যোগই সুলতানের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। নিজেকে তিনি খলিফাদের উত্তরসূরি হিসেবে আল্লাহর ইচ্ছা পালনকারী হিসেবেই দেখতেন। আত্মিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইসলামের

অনুসারী হলেও অর্থডক্স খ্রিস্টানদের সভ্যতা রক্ষায় ছিলেন সমান আগ্রহী। পিতার মতোই খ্রিস্টানদের প্রতি সব সময় সহনশীল ছিলেন।

ধর্মীয় বিষয়ে সহনশীল হলেও রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত অবস্থায় সুলতান ছিলেন ঠাণ্ডা মাথার নির্মম, নিষ্ঠুর একজন মানুষ। শহর জয় করার পর সম্রাটের অনেক মন্ত্রীদেরকেই সুলতান নিজের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দান করেন। এদের মধ্যে ছিল মেগাডাক্স, লুকাস নোটারাস। প্রথম প্রথম সুলতান নোটারাসকে শ্রদ্ধা করতেন। এমনকি শহরের গভর্নর বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো এক ঘটনার ফলে সুলতান সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেন। এর পরীক্ষাস্বরূপ সুলতান যার কিনা ওয়াইনের আসক্তি ছিল এবং যৌনরুচি ছিল বৈচিত্র্যময়। নোটারাসের বাসায় দূত পাঠিয়ে নোটারাসের চৌদ্দ বছর বয়সী পুত্রকে পাঠাতে বলেন সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য। কিন্তু নোটারাস প্রত্যাখ্যান করলে তৎক্ষণাৎ তার এবং তার পুত্র ও পৌত্রের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন সুলতান। এবং এই তিন মস্তককে সুলতানের সামনে হাজির করার কথাও বলা হয়। নোটারাস আর্জি জানান যেন ছেলেদের মৃত্যু পিতার পূর্বে হয়, যেন তারা নোটারাসের মৃত্যু দেখে খ্রিস্টানের মতো মারা যাওয়ার সাহস না হারিয়ে ফেলে। এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় প্রাক্তন সম্রাটের অন্যান্য কর্মচারীকেও পথ থেকে সরিয়ে দেন সুলতান।

এরই মাঝে নোটারাস হালিল পাশার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করে যায় সুলতানের কাছে। সুলতান নিজেও এ ব্যাপারে খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। হালিলকে তাই অ্যারেস্ট করে আড্রিয়ানোপলে ফেরত পাঠানো হয়। এখানে একদিন হালিলের বাসার সামনে একটি হরিণ বাঁধা দেখতে পেয়ে সুলতান মন্তব্য করেন, "হে বোকা পশু হালিলের কাছে কেন তোমার মুক্তি ভিক্ষা চাও না?" হালিল এ মন্তব্যে নিজের ভাগ্য সম্পর্কে ভয় পেয়ে মক্কায় ধর্মযাত্রার আবেদন করেন। শীঘ্রই তাকে মেরে ফেলা হয়। এভাবে বাল্যকাল থেকে চলে আসা শত্রুর হাত থেকে মুক্তি লাভ করেন মাহমুদ। এরপর পিতার আমলে থাকা অন্যান্য কর্মচারীদেরকেও বরখাস্ত করেন মাহমুদ। নতুন উজির হয় জাগানোস পাশা।

সুলতানের সবচেয়ে প্রধান কাজ ছিল পৃথিবীর রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইস্তাম্বুল শহরকে নতুন জন্মদান করা। এর মাঝে প্রধানত ছিল জনসংখ্যার সমস্যা। প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার ছিল অধিবাসী। যুদ্ধের ফলে শহরের বেশির ভাগ প্রাসাদ এবং দালানকোঠা ধ্বংস হয়। খুব দ্রুত রাস্তা থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে দেয়ালগুলো মেরামত করা হয়। অর্থডক্স খ্রিস্টান, যারা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাদের ফিরে আসতে বলা হয়।

তাদের সম্পদ ও ধর্মের নিরাপত্তা, কর মওকুফ এমনকি গৃহ মেরামত ও দোকান মেরামতের ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যের কথাও বলা হয়। তুর্কিদের হাতে বন্দিদের মুক্তি দিয়ে পানার জেলায় বসতি স্থাপন করে কিছু সময়ের জন্য কর মওকুফের কথাও বলা হয়। রুমালিয়া এবং আনাতোলিয়া উভয় প্রদেশের গভর্নরদের বলা হয় খ্রিস্টান অথবা মুসলিম যাই হোক না কেন চার হাজার পরিবারকে ইস্তাম্বুল পাঠাতে। বিভিন্ন সফল অভিযানের মাধ্যমে ধরে আনা প্রায় ত্রিশ হাজার কৃষককে ইস্তাম্বুলের আশপাশের গ্রামসমূহ স্থাপন করা হয় শহরের খাদ্য উৎপাদনের জন্য।

সুলতানের আদেশে বিভিন্ন শহর থেকে ব্যবসায়ী, কারিগর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদেরকে ইস্তাম্বুলে আনা হয় শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য। এদের মধ্যে ছিল সালোনিকা ও ইউরোপের জিউ সম্প্রদায়। পরবর্তী পঁচিশ বছরের মধ্যে মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের পরে শহরের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয় এ জিউরা।

মাহমুদের রাজত্বকাল শেষ হওয়ার অনেক পূর্বেই এ শহর আবারো বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও বাজারে ঝকমক করে ওঠে। ব্যবসায়িক কার্যক্রম বেড়ে যায় এবং জনসংখ্যা হয়ে ওঠে যুদ্ধের সময়কার তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশি এবং মিশ্র গঠনের। পরবর্তীতে একশ বছরের মাঝে এর অধিবাসী হয়ে দাঁড়ায় অর্ধ মিলিয়ন, যাদের মাঝে বেশি ছিল তুর্কি।

অর্থনৈতিক জীবনের সমৃদ্ধির জন্য মাহমুদ ছিলেন বেশি উদ্যোগী। এই উদ্দেশ্যে ব্যাপক হারে ঐতিহ্যগত ইসলামিক প্রতিষ্ঠান, ইমারত তৈরি করা হয়। বার্সা এবং আড্রিয়ানোপলে এটি পূর্ব থেকেই ছিল। এখন ইস্তাম্বুলেও তৈরি করা হয় বাজার এবং সরকারি কাজের সম্প্রসারণের জন্য। বস্তুত এটি ছিল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক কাজের জন্য সমন্বিত একটি প্রতিষ্ঠান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই হতো এর পৃষ্ঠপোষক। যদিও বা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুদান দেয়া হতো, তথাপি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকত বেশি, এর চারপাশে থাকত সরকারি দালান। একটি মসজিদকে কেন্দ্র করে এসব স্থাপনা গড়ে উঠেছিল। এর একদিকে যেমন ছিল হাসপাতাল, মাদ্রাসা এবং ভ্রমণকারীদের জন্য ছাত্রাবাস অন্যদিকে বাজার, কারখানা, স্নানঘর, লন্ড্রি, কসাইয়ের দোকান, সরাইখানা, স্যুপ রান্নাঘর প্রভৃতি ছিল ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে অর্থ জোগানমূলক কাজ করার জন্য।

আয়া সোফিয়ার জন্য মাহমুদ বেদেস্তান বা বাজার তৈরির নির্দেশ দেন। এখানে ছিল একশটি দোকান ও স্টোর। এর পাশাপাশি রাস্তায় ছিল আরো হাজারখানেক দোকান। কার্যত এটি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। মাহমুদ নিজের যে বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তার চারপাশে প্রতিদিন ছয়

হাজার ছেলেমেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত, ভ্রমণকারীদের জন্য দুটি ছাত্রাবাস, গরিবদের মাঝে খাবার বিতনের জন্য রান্নাঘর, হাসপাতাল—যেখানে ছিল চোখের ডাক্তার, শল্যবিদ, ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী রান্না করার জন্য পাচক।

সুলতান নিজের রাজ্য থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষদের এনে শহরের অন্যান্য অংশেও এভাবে ইমারত নির্মাণ করেন। এভাবে জনসাধারণের উন্নতির জন্য ক্যারাভান চলাচল করে এমন সব রাস্তার পাশেও এসব ইমারত নির্মিত হয়। ব্যবসা বাড়তে থাকে এবং এভাবেই অবশেষে ইস্তাম্বুল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্থান হিসেবে বার্সা ও আড্রিয়ানোপলকে অতিক্রম করে। কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর এবং এশিয়া মহাদেশেও বাণিজ্যিক পথসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে।

ইসলামিক অর্থনৈতিক জীবনের আরো একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের ওপর সুলতান মাহমুদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত করেন; যা ছিল শ্রমিক সংস্থা বা শ্রমিক ইউনিয়ন। একে ঘিরে আর্বত হতো সব পেশাজীবী লোক। গ্রিক রোমান বিশ্বে জন্মলাভ করে ইউরোপে পরিচিত থাকলেও ধীরে ধীরে ইসলামেও পরিচিত হতে থাকে। পূর্বের অটোমান সমাজে আঁখিদের নেতৃত্বাধীনে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং শ্রমিক ও কারিগরদেরকে রাজনৈতিক নিরাপত্তা দান করত। ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এ শ্রমিক সমাজের শ্রেণী বিভাজন করা হতো। প্রতিটিতে একজন নেতা থাকত, প্রতিনিধি হিসেবে যে সরকারের কাছে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া পেশ করত। যদিও এদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু এগুলো রাষ্ট্রের কাছে দায়বদ্ধ থাকতো বিভিন্ন বিষয়ে। যেমন শ্রম দাম, লাভের পরিমাণ, গুণগত মান, হঠকারিতা রোধ করা প্রভৃতি। রাষ্ট্র এদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলেও জনসাধারণ ও রাজকোষের নিরাপত্তার দিকটি নিয়ে সরকার মাথা ঘামাত।

নগরায়ণ এবং বাজার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পাশাপাশি এই সমাজ ব্যবস্থাও অটোমান সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। পশ্চিমের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, যা সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদানে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে এ সাম্রাজ্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে বাণিজ্যিক যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে; যার ফলে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও শুরু হয়।

যাযাবর বৃত্তি থেকে ধীরে ধীরে ইসলামিক সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়া এ রাষ্ট্রের জনগণ এবং সম্পদের একটাই কাজ ছিল আর তা হলো শাসকের শক্তি সংরক্ষণ করা। জনগণ প্রধানত দুভাগে ভাগ ছিল। তাদের এক অংশ সুলতানের শাসনকাজের প্রতিনিধিত্ব করত—প্রশাসক, সেনাবাহিনী, ধর্মীয়

গুরুরা। অন্যদিকে ছিল রায়া সম্প্রদায়। কৃষক এবং এক শ্রেণীর কারিগর। এরাই ছিল উৎপাদনকারী ও কর প্রদানকারী। সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এদের উৎপাদন পদ্ধতি ও লাভের পরিমাণের ওপর কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকত। এটি নিশ্চিত করার জন্য খুব কঠোর একটি যুক্তি মানা হতো—প্রত্যেক মানুষই তার নিজের শ্রেণীতে বাস করবে।

এর বাইরেও তৃতীয় এক শ্রেণীর মানুষ ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। বণিক শ্রেণী, যারা এ ধরনের আইনি এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে ছিল। আর এরাই একমাত্র পুঁজিপতি হতে পারত। এরা ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা লাভের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে ব্যবসা করত, বহু দূর থেকে পণ্য আমদানি করত। পঞ্চদশ শতাব্দীর এ অংশে বাণিজ্য নিয়ে সুলতানের উদ্বিগ্নতার কথা পাওয়া যায় সিনাল পাশার রচনায়। মাহমুদ শহরের দেয়ালসমূহ পুনরায় নির্মাণ ও সুরক্ষিত করার কাজ শুরু করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্থাপত্যবিদ্যার ক্ষেত্রে বাইজেন্টাইন আমলের থেকেও সুন্দর করে এগুলো নির্মাণ করা। এমনকি নিজের মসজিদ নির্মাণেও তিনি ততটা সময় ব্যয় করেননি। একজন গ্রিক স্থাপত্যবিদকে নিয়োগ দিয়ে হলি অ্যাপোসেলস-এর জন্য মালামাল ও জায়গা নির্বাচন করেন। মাহমুদের নিজের মসজিদে আয়া সোফিয়ার আয়তনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং এ নিয়ে তিনি বেশ গর্ববোধ করতেন। এটি ছিল বিশাল গম্বুজ, মসজিদের মাঝে প্রথম এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ইস্তাম্বুলের গৌরবকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে হাগিয়া সোফিয়ার বাইজেন্টাইন রীতি থেকে অনুপ্রাণিত হলেও ধীরে ধীরে নতুন স্থাপত্যরীতির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব শহর হিসেবে খ্রিস্টানদেরকে অতিক্রম করে।

মাহমুদ ইয়ুব মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন। নবীজির সঙ্গী, যিনি এসব দেয়ালের পাশে মৃত্যুবরণ করেন এবং লাগাতার অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাঁর কবর পাওয়া যায়। এর পরবর্তী কাজ ছিল সম্রাটের প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাসাদ মেরামত করা। মাহমুদ নিজের জন্যে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করে আড্রিয়ানোপল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।

॥ ৯ ॥

রাজধানী জয় লাভ করার পর সামরিক ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের কাজ ছিল নিজের সাম্রাজ্যকে একত্রিত করে সীমান্ত সম্প্রসারণ করা। সমুদ্রের দিকে সুলতানের ছিল বিশাল দুর্গবিশিষ্ট পোতাশ্রয়, এর নৌশক্তিও ছিল ব্যাপক। এরপর দার্দেনালিস, এর উভয় প্রান্তে নতুন দুর্গ তৈরি করা হয়। সুলতান ব্যক্তিগতভাবে সেনাবাহিনী পরিচালনা করতেন, জেনারেলদের চালাতেন,

যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোনো মন্ত্রণা-সভা ছিল না, ইউরোপ এবং এশিয়াতে প্রতিবছর যে সুদক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তার গন্তব্য সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা থাকত না। একবার এক অভিযান নিয়ে এক জেনারেলের প্রশ্নের উত্তরে সুলতান জানান যে যদি তাঁর দাড়ির একটি চুলও তাঁর মনোবাসনা জানতে পারে তাহলে তিনি তা তুলে ফেলে দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

পিতার শত্রুদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনিও শত্রু হিসেবে পেয়েছিলেন। একের পর এক বিভিন্ন পরিকল্পনা করে তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৪৫৪ এবং ১৪৫৫ সালের প্রথমেই অগ্রসর হন সার্বীয়ার বিরুদ্ধে। এখানে মাহমুদ গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঞ্চল দখল করেন, মূল্যবান রূপার খনির অধিকার পান এবং অটোমান সাম্রাজ্যের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসেন। কিন্তু হাঙ্গেরিতে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আরো একটি বাধা রয়ে যায়—দানিয়ুবে বেলগ্রেড শহর।

এ উদ্দেশ্যে ১৪৫৬ সালে প্রায় দেড় লক্ষ সশস্ত্র সৈনিক এবং হালকা নৌযানের বহর নিয়ে দানিয়ুব থেকে ভিদিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন মাহমুদ। দানিয়ুব থেকে শহর অবরুদ্ধ করার জন্য নদীর ওপর অববাহিকায় নৌকা দিয়ে দেয়াল প্রস্তুত করেন মাহমুদ। মোহনায় পশ্চিমমুখী করে ভারী অস্ত্র তাক করেন। জুনের প্রথমে, শস্য পাকার মৌসুমে পাহাড়ের মাথায় সুলতানের তাঁবু ফেলা হয়।

জুলাইয়ের প্রথম দিকে তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনী পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে হামলা শুরু করে। বোমা ফেলা শুরু হয়; দেয়াল গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বেসামরিক ক্ষয়-ক্ষতি তেমনটা হয়নি। এরপর হুনযাদীর নৌসেনারা দানিয়ুবের নিচে আবির্ভূত হয়। অন্যদিকে তার অশ্বারোহী বাহিনী নদীতীরে তুর্কিদের পিছু হঠার রাস্তা দখল করে নেয়। পাঁচ ঘণ্টা ধরে ভয়াবহ যুদ্ধ হওয়ার পর তুর্কিরা দুঃসাহসী হয়ে উঠলে নদীর পানি লাল হয়ে ওঠে রক্তে। অবশেষে হাঙ্গেরিয়রা তাদের হালকা নৌযান দিয়ে তুর্কিদের নৌকা দিয়ে সাজানো ভঙ্গুর শিকলটি ভেঙে দিয়ে দুটি গ্যালি জাহাজকে ডুবিয়ে দেয় ও আরো চারটিকে অস্ত্রসহ দখল করে নেয়। তুর্কিদের অন্যান্য নৌযান জান নিয়ে পালাতে চাইলেও সুলতানের নির্দেশে সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা হয়; যেন শত্রুদের হাতে এগুলো না পড়ে।

হাঙ্গেরির বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর হুনযাদী এবং ভয়ংকর সন্ন্যাসী কাপিসট্রানো সৈন্যদের নিয়ে সিটাডেল যায় বেলগ্রেড দুর্গবাসীদের সাহস যোগানোর জন্য। দেয়ালের ছিদ্রসমূহ দূত মেরামত করে অস্ত্রগুলোকেও পরিষ্কার

করা হয়। নদীতীরের পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে মাহমুদ। ব্যক্তিগতভাবে জানিসারিসদের নিয়ে সিটাডেল শহর আক্রমণ করতে অগ্রসর হন। শহরের নিম্নাংশে পৌঁছে শহরে পৌঁছানোর জন্য জায়গা খুঁজতে শুরু করে জানিসারিসরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করে তারা। কিন্তু হুনযাদী পূর্বেই চতুরতার সাথে নিজের সৈন্যদের দেয়ালের পাশ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। ফলে জানিসারিসরা সুনসান রাস্তা বিজয়ের হাসি হাসতেই হুনযাদীর সৈন্যরা রণ হুঙ্কার দিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশির ভাগকেই কচুকাটা করে ফেলে।

যারা বেঁচে গেছে তাদেরকে দুর্গের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলা হয়। নিচে ছিল স্তূপীকৃত কাচ, সালফারে ভেজানো। সকল হতেই এসব কাঠে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ফলে দলে দলে তুর্কিরা পালানোর কোনো পথ না পেয়ে পরিখাতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এরপর ক্রুসেডাররা সোজা শত্রুর অস্ত্র দখলে অগ্রসর হয়। তুর্কিরা এদের সামনে অসহায়ের মতো অস্ত্র ফেলে সুলতানের ক্যাম্প বরাবর পালিয়ে যায়। মাহমুদ জেদের বশে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে একজন ক্রুসেডারের মাথা কেটে ফেলেন নিজের তরবারি দিয়ে; কিন্তু এরপরই উরুতে তীরের আঘাত পেয়ে ক্ষতের কারণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। জানিসারিসরা দ্বিধায় পড়ে ছঙ্গভঙ্গ হয়ে গেলে সুলতান তাদের সেনাপতি হাসানকে অভিশাপ দেন আর এরপর পরই হাসান যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। রাত নামার পরে সুলতান পশ্চাদগমনের মতো শব্দ করলে সৈন্যরা উন্মত্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এভাবে অস্ত্রের বিশাল এক ভাণ্ডার, রসদ, সব গিয়ে পড়ে শত্রুর হাতে।

খ্রিস্টানদের বিজয়ে ইউরোপ উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু এর কিছুদিন পরই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে হুনযাদী ও কাপিসট্রানো মৃত্যুবরণ করে। কয়েক মাস পরে জর্জ ব্রাঙ্কোভিটজ্ বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে সার্বীয়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশ ছিল হাঙ্গেরির সমর্থক, আরেক অংশ অটোমান সমর্থক। এরপর সফল অভিযানের মাধ্যমে মাহমুদ একে অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন, যা টিকে ছিল পরবর্তী পাঁচ শতক পর্যন্ত।

১৪৫৭ সালজুড়ে বেলগ্রেডের অসফল অভিযানের পর মাহমুদ আর কোথাও অগ্রসর হননি। এর বদলে আদ্রিয়ানোপলে নিজের প্রাসাদে থাকাই মনস্থির করেন সুলতান।

১৪৫৮ সালে সুলতান প্রথমবারের মতো গ্রিস অধিগ্রহণে অগ্রসর হন। এখানে বেশির ভাগ বাইজেন্টাইন শাসক শ্রেণী শরণার্থী হিসেবে মোরিয়ার দুই প্রান্তে পালাইয়োলগের দুই জীবিত বংশধর দিমেট্রিয়াস এবং থমাসের অধীনে বাস করত। করিন্থের ইসমুস অতিক্রম করে পুরো পশ্চিম মোরিয়া বরাবর সুলতানের বাহিনী এগিয়ে চলে। পশ্চিম মোরিয়ার বেশির ভাগ অংশ দখল

করে নিলেও করিন্থের প্রধান দুর্গ উত্তর মুখে ফিরতি যাত্রার আগে আক্রমণ করেননি। এখানকার অধিবাসীদের কাছে ইসলামে ধর্মান্তরিত না হয়েও আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করা হয়। প্রত্যাখিত হয়ে দুর্গের দেয়ালে কামানের গোলা ফেলা হলে প্রথম দুটি দেয়াল ছিদ্র হয়ে যায়। দুর্গবাসী আত্মসমর্পণ করলে দুই পালাইয়োলগ চুক্তিতে আসতে বাধ্য হয়। চুক্তি মোতাবেক কিছুটা জমির ওপর মালিকানা থাকলেও নিয়মিত কর প্রদানে বাধ্য করা হয়।

এরপর সুলতান এথেন্স ভ্রমণ করেন। দুই বছর পূর্বে তুর্কিরা এ শহর দখল করে নিয়েছিল। মাহমুদ বিশেষ করে দুর্গসমূহকে বেশ প্রশংসা করতেন। এথেন্সবাসীর প্রতি সুলতান ছিলেন বেশ উদার। নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা, কর মওকুফ প্রভৃতি সুবিধা দিলেও ল্যাটিন গির্জার ভাঙনে খুশি হয়ে সুলতান অর্থডক্স যাজক সম্প্রদায়কে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন।

১৪৬০ সালে মাহমুদ আরো একবার গ্রিসে পর্দাপণ করেন সৈন্যবাহিনী সহযোগে। দিমেট্রিয়াস প্রথমে সুলতানের কাছ থেকে পালিয়ে গেলেও পরবর্তীতে আত্মসমর্পণ করে। এরপর মাহমুদ টমাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে টমাস নিজের লোকদের তুর্কিদের হাতে রেখে পশ্চিমে পালিয়ে যায়।

এভাবে পুরো গ্রিক দ্বীপপুঞ্জের ওপর তুর্কিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল কিছু উপকূলীয় অঞ্চল রয়ে যায় ভেনেশীয়দের হাতে।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ নিজের শাসনাধীনে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পুনর্জীবন দিতে গিয়ে তুর্কি ইতিহাসবিদদের লেখা অনুযায়ী—এমন কাউকে জীবিত রাখেননি, বাইজেন্টাইন গ্রিকদের মাঝে যে নিজেকে রাজা হিসেবে দাবি করতে পারে। পালাইয়োলগদের পর এবার আসে কমনেনস্‌দের পালা। বিশিষ্ট কমনেন সম্রাট চতুর্থ জনের মৃত্যুর পর ছোট ভাই সম্রাট ডেভিড সুলতানের বিরুদ্ধে গিয়ে সুলতানের শত্রুদের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলে। এদের মাঝে ছিল ইউরোপীয় ভেনিস, জেনোয়া ও পোপতন্ত্র আর এশিয়াতে সুলতানের প্রধান শত্রু তুর্কমান রাজকুমার উজুন হাসান। হাসান মুসলিম হলেও খ্রিস্টান রক্ত বহন করে কমনেনদের সাথে বিবাহ সূত্রে আত্মীয়তা করেছে। পূর্ব আনাতোলিয়াতে অটোমানের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে হাসান। তার সাথে যুক্ত হয়েছে সিনোপ, কারামানিয়ার রাজকুমার ও খ্রিস্টান জর্জিয়ার রাজা।

ডেভিড উজুন হাসানের দূতের মাধ্যমে ইস্তাম্বুলে সুলতানের কাছে দাবি জানান পিতার আমলের কর মওকুফের জন্য। হাসান নিজেও অনেক কিছু দাবি করে বসে। ফলে মাহমুদ সিদ্ধান্ত নেন যে এবার সময় হয়েছে এ অপবিত্র মৈত্রীজোট ভেঙে দিয়ে আনাতোলিয়াতে অটোমানদের স্বার্থ রক্ষা করার।

১৪৬১ সালে সুলতান এশিয়াতে শাস্তি প্রদানমূলক আক্রমণ করতে অগ্রসর হন। স্থল এবং নৌ উভয় পথেই এ আক্রমণ পরিচালিত হয়। প্রথমে আমাট্রিস বন্দর দখল করে আলোচনার মাধ্যমে সিনোপ শহর নিরাপদ করেন। এরপর উজুন হাসানের অঞ্চলে প্রবেশ করেন। কিন্তু কারামানিয়ার মিত্রদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাননি হাসান। এর বদলে হাসানের খ্রিস্টান সিরিয়ার মা রাজকুমারী সারা সুলতানের কাছে নানা উপঢৌকন নিয়ে শহর রক্ষার জন্য এলেও মাহমুদ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে "মা, ইসলামের তরবারি রয়েছে আমার হাতে।"

এরপর সেনাবাহিনী নিয়ে সুলতান আঠারো দিন পর ডেভিডের অঞ্চলে প্রবেশ করেন। ডেভিড কোনো যোদ্ধা ছিল না। সম্রাট কনস্টানটাইনের মতো কোনো বীরত্বব্যঞ্জক কাজ না করেই রাজি হয়ে যায় সুলতানের আজ্ঞায়।

ফলাফলস্বরূপ গ্রিকদের প্রতি কোনো সম্মান না দেখিয়েই একটি শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সুলতান ট্রেবিজন্ড ভূমিতে কোনো বাধা ছাড়াই প্রবেশ করেন। শেষ সম্রাট পরিবার-পরিজন, কর্মচারীসহ এক বিশেষ জাহাজে করে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত হয়। সারাকে মধ্যস্থতার পুরস্কারস্বরূপ রত্ন উপহার দেন সুলতান। কিন্তু শহরবাসীর অবস্থা হয়ে পড়ে করুণ। নারী ও পুরুষেরা দাসে পরিণত হয়ে সুলতান ও তাঁর সভাসদের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়। ছেলেদেরকে জানিসারিস বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিপুলসংখ্যক পরিবার বাধ হয় নিজেদের সম্পত্তি ছেড়ে ইস্তাম্বুলে যেতে।

এর দুবছর পরে ডেভিড গোপনে উজুন হাসানের সাথে মিত্রতা করে অটোমানদের বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করলে সুলতানের ইস্তাম্বুলের দেয়ালের মাঝে অবস্থিত নতুন কারাগারে নিজের ভাই, সাত পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রসহ নিহত হয়। সুলতান এমনকি নির্দেশ দেন যে এদের মরদেহও যেন কবর না দিয়ে শিকারি কুকুর ও পাখিদেরকে খাওয়ানো হয়। এভাবে পুরো কমনেনস পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মাহমুদ এরপর কৃষ্ণ সাগরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসহ এশিয়া মাইনরের উত্তর উপকূলীয় অঞ্চলকে অটোমান শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। এরপর ১৪৬৪ সালে ইব্রাহিম বে-র মৃত্যুর চলমান বিবাদের সুযোগ নিয়ে সুলতান প্রায় সম্পূর্ণ কারামানিয়া দখল করে দেড়শ বছর পুরাতন অটোমান শত্রুর বিনাশ করেন। এর মাধ্যমেই সিলিসিয়া ও ভূমধ্যসাগরের এশীয় উপকূলে অটোমানদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়।

পূর্বাংশে নিজের নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষিত করে সুলতান এরপর পশ্চিমের দিকে নজর দেন। এখানে একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল পুরো বলকান দ্বীপপুঞ্জের অটোমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। দানিয়ুবের পেছনে উত্তর-পূর্বে ছিল ওয়ালাসিয়া। এর শাসক ছিলেন ইতিহাসখ্যাত নিষ্ঠুর এবং বর্বর ভ্লাদ ড্রাকুল।

এসব কারণে করপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও অটোমান প্রতিবেশীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সুলতান ড্রাকুলকে ছেড়ে দেন। কিন্তু ড্রাকুল ১৪৬১ সালে রাজা ম্যাথিয়াসের সাথে তুর্কিদের বিরুদ্ধে একজোট হয়। মাহমুদ ড্রাকুলকে কর ও অটোমান সেনাবাহিনীর জন্য ভ্লাচ সৈন্যসহ ইস্তাম্বুলের ডেকে পাঠান এবং নিজের সেনাবাহিনীর নেতাদেরকে নির্দেশ দেন যেন দানিয়ুবের তীরে ড্রাকুলের ওপর অতর্কিত হামলা করে আটক করা হয়। কিন্তু পাশার দান উল্টে যায় যখন ড্রাকুলের দেহরক্ষী তুর্কিদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে ও ড্রাকুলের নির্দেশে সুলতানের দূত এবং সেনাপ্রধান উভয়কে শূলে চড়ানো হয়। এরপর ড্রাকুল দানিয়ুব পার হয়ে বুলগেরিয়াতে অটোমান অঞ্চলে প্রবেশ করে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়।

এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে ওয়ালাসিয়া অভিমুখে রওনা হন। এ অভিযানে সুলতান ও তাঁর সেনাবাহিনী মরদেহের এক জঙ্গলে প্রবেশ করে যেখানে প্রায় বিশ হাজার বুলগেরীয় ও অটোমান অধিবাসীদের শূলে বিদ্ধ লাশ দেখতে পায় তারা। এই উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যায় ড্রাকুলের বর্বরতার মাধ্যমে আনন্দ লাভের চেষ্টার কথা। সুলতানের সেনাবাহিনী ভ্রাম্যমাণ গেরিলা যোদ্ধাদের কবলে পড়লেও শেষ পর্যন্ত শত্রুকে পরাজিত করে ভ্লাদ ড্রাকুলকে মোলাডাঙিয়াতে পায়। এর পূর্বে অবশ্য অটোমান সেনাপ্রধান দুইহাজার ভ্লাচের খণ্ডিত মস্তক সুলতানের পদতলে রাখে। এরপর ওয়ালাসিয়ার শাসন ভার গ্রহণ করে ড্রাকুলের ভাই রাদু। রাদুর সুদর্শন চেহারার কারণে সে সুলতানের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়। তার নিয়ন্ত্রণাধীনে ওয়ালাসিয়া প্রজারাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৪৬৩ সালে সুলতান বসনিয়ার দিকে দৃষ্টি দেন। বসনিয়াকে ঘাঁটি বানিয়ে সুলতান পশ্চিমে আরো অভিযান পরিচালনার মনস্থির করেন। এ সময় বসনিয়াতে রাজ্যপরিবারে শুধু নয়, ধর্মীয় দিকেও বিভিন্ন অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এক সময়ের অর্থড্রক্স হলে রোমান ক্যাথলিকে পরিণত হয়ে পোপের প্রতি ঝুঁকে পড়ে বসনিয়া। ১৪৬১ সাল থেকেই বসনিয়ার রাজা স্টিফেন সুলতানের কাছ থেকে আক্রমণ প্রত্যাশা করে আসছিল। সুলতানের আধিপত্য বিস্তারের তৃষ্ণা সম্পর্কে পোপকে আগে থেকেই অবগত করে দেয় স্টিফেন। পোপের সমর্থন ও সহায়তার আশায় স্টিফেন পোপকে এ-ও জানিয়ে দেয় যে বসনিয়া বিজয়ের পর সুলতান নির্ঘাত হাঙ্গেরি, ভেনিস এবং ইটালির অন্যান্য অংশও দখল করতে চাইবেন। এর ওপরে আবার রোম দখলের ইচ্ছাও সুলতানের বহুদিনের স্বপ্ন বলেও জানিয়ে দেন স্টিফেন।
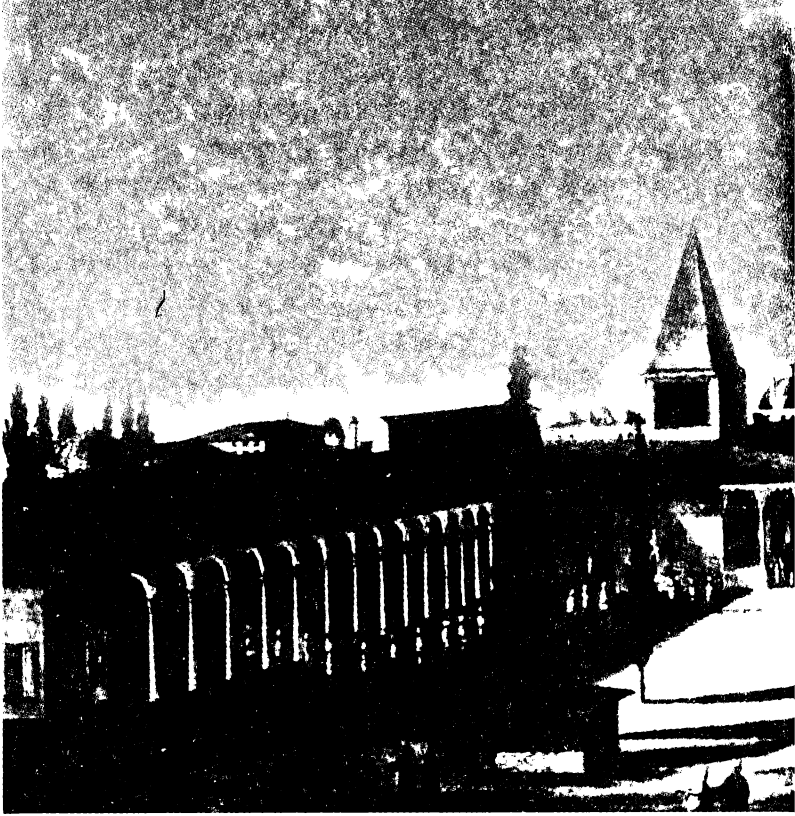
টপকাপি প্রসাদের দ্বিতীয় দরবার। দিওয়ান দরবার নামেও পরিচিত এটি।
এটির কিছু অংশ— বিশ্বাস করা হয় যে দ্বিতীয় মাহমুদ নির্মিত প্রথম প্রাসাদের অংশ।
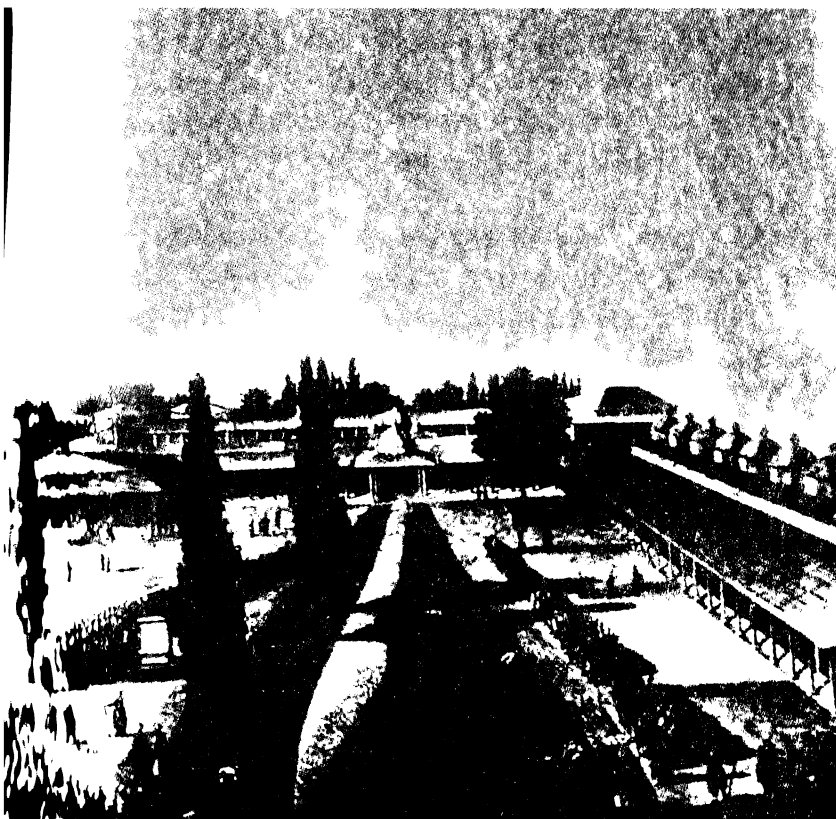
পোপ এর উত্তরে হাঙ্গেরির রাজাকে জোর করেন স্টিফেনের সাথে একজোট হয়ে তুর্কিদের বিপক্ষে কাজ করার জন্য। হাঙ্গেরির রাজা শর্ত দেয় স্টিফেন যেন অটোমানদের কর স্থগিত করে দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুলতান বসনিয়াতে সেনাবাহিনী পাঠান। বোবোভাটের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ আত্মসমর্পণ করলে এর অধিবাসীদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেন সুলতান। এক ভাগ রয়ে যায় শহরে, এক ভাগ বণ্টিত হয়ে যায় তাঁর পাশাদের মাঝে এবং এরপর প্রধান উজির মাহমুদ পাশাকে পাঠানো হয় স্টিফেনকে কয়েদ করার জন্য।

মাহমুদের নীতি ছিল জয় করে নেয়া অঞ্চলে কোনো শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি না রাখা। তাই পারস্যদেশীয় একজন ধর্মীয় লোকের সাথে আলোচনা করে বসনিয়ার শেষ রাজার মস্তক কর্তন করা হয়। ধর্মীয় লোকটি সুলতানের উপস্থিতিতে এ কাজ সমাধা করে অথবা এমনও হতে পারে যে সুলতান নিজেই তা করেছেন। এরপর বসনিয়াতে অটোমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। বিপুলসংখ্যক জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে।

এর বাইরে আলবেনিয়া বেশ কর্তৃত্বের সাথেই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। এখানে ইস্কান্দারবেগ হাঙ্গেরি, ভেনেশীয়া ও অন্যান্য ইটালিয় রাজ্যের উৎসাহ পেয়ে শাসন করে আসছে দ্বিতীয় মুরাদের সময় থেকে, প্রায় বিশ বছর আগে থেকে। সময়ের বিবর্তনে পশ্চিমা খ্রিস্টানদের কাছে প্রায় পৌরাণিক হিরোতে পরিণত হয়েছে ইস্কান্দার বেগ।

১৪৬৬ সালে সুলতান নিজে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আলবেনিয়াতে অগ্রসর হন। সুলতানের পূর্বেই সৈন্যরা দেশটিকে ঘেরাও করে নিলে সুলতান পাথুরে দুর্গ ক্রোইয়া অবরোধে অগ্রসর হন। কিন্তু এই কার্যক্রম খুবই ধীর গতিতে এগোতে থাকে। কেননা দুর্গের দেয়াল ছিল শক্ত এবং দুর্গবাসীর সাহস ছিল অসীম। এরই মাঝে ইস্কান্দার বেগ নিজের ভ্রাম্যমাণ সৈন্যদের নিয়ে অটোমানদের উত্ত্যক্ত করতে থাকে, রসদ নষ্ট করে বিভিন্ন ক্ষতি করতে থাকে। অবশেষে সুলতান অবরোধ কাজ একজন পাশার হাতে ন্যস্ত করে নিজে দূরাজোর দিকে চলে যান। কিন্তু পাশা শীঘ্রই দলবল নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

মাহমুদ পরের বছর আবার আক্রমণ করতে এলে দূরাজো দখল করে নেন। হাজার হাজার শরণার্থী ইটালি পালিয়ে যায়। কিন্তু ক্রোইয়া কিছুতেই সুলতানের দখলে আসছিল না। ১৪৬৭ সালে ইস্কান্দার বেগের মৃত্যুর পর গোত্রদের মাঝে বিভক্তি দেখা দেয়। এই সুযোগ নিয়ে সুলতান হেসে উঠেন "অবশেষে ইউরোপ এবং এশিয়া আমার হাতে এলো। অবোধ খ্রিস্টান। তরবারি এবং ঢাল উভয়ই হারিয়ে গেছে।"

এর পরই অটোমান সাম্রাজ্য ভেনিসের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যার ব্যাপ্তি ছিল ষোলো বছর।

১৪৭২ সালের শরতে নিজ জ্যোতিষির সাথে আলোচনা করে সুলতান মাহমুদ বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে এশিয়া অতিক্রম করে পূর্বে এগিয়ে যান। বসন্তে আরো পূর্বে এগিয়ে গিয়ে আরজিনজানে পৌঁছান। উজুন হাসান সুলতানের ঢেউয়ের মতো সেনাবাহিনী দেখে ইউফ্রেটিসের ওপর অববাহিকাতে পর্বতের আড়ালে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে গা-ঢাকা দেয়। এখানে সুলতান নিজের জেনারেলদের মাঝে প্রিয়তম হাস মুরাদ পাশাকে আক্রমণ শুরু করার নির্দেশ দেন। মুরাদ পাশার অধিকাংশ সৈন্য শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়ে। মুরাদ নিজে ইউফ্রেটিসের পানিতে ডুবে মারা যায়।

এই পরাজয়ে ও নিজের প্রিয়তম জেনারেলের মৃত্যুতে বিমর্ষ হয়ে সুলতান পিছু হটার নির্দেশ দেন। কিন্তু এর আগে নিজের জেনারেলদের সাহস বজায় রাখার জন্য সুলতান স্বপ্নে দেখতে পেয়েছেন তিনি উজুন হাসানের সাথে হাতাহাতি দ্বন্দ্বে হাসানের হৃৎপিণ্ড মাটিতে গেঁথে ফেলেছেন বলে জানান। বাস্তবে মাহমুদ আরজিনজানের পূর্বে পার্বত্য এলাকা দিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে যাওয়ার সময় উজুন হাসানের সাথে যুদ্ধ হয়। আট ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর শ্বেত ভেড়ার নেতা উজুন হাসান পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনীও নেতার পথ ধরে। সব মালামালসহ উজুন হাসানের পুরো তাঁবু অটোমানদের হাতে এসে পড়ে। সুলতান নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে তিন দিন কাটিয়ে বন্দিদের মৃত্যুবরণের দৃশ্য দেখেন। কিন্তু সুলতান ছিলেন শিল্পের সমঝদার। তাই পণ্ডিত ও কারিগরদের বাঁচিয়ে ইস্তাম্বুল পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৪৭৮ সালে উজুন হাসানের মৃত্যু ঘটে।

ইস্কান্দার বেগের মৃত্যুর পর সুলতান আবারো আলবেনিয়ার দিকে নজর দেন। সুলতানের বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন সুলেমান পাশা। বসনিয়ার নপুংসক সুলেমান স্কুটারি দুর্গের সামনে তাঁবু ফেলে। ছয় সপ্তাহ ধরে কামানের গোলা ফেলে দেয়াল ধূলি ধূসরিত করা হয়। এই দীর্ঘ সময়ে অটোমানদের হাজারো ক্ষতি হয়। ডজনখানেক জেনারেল মারা যায়, অসংখ্য সৈন্য মারা যায় তৃষ্ণায় একপ্রকার জ্বর হয়ে। অবশেষে সুলেমান পাশা অবরোধ তুলে নিয়ে কামান নিয়ে চলে যায়। কিন্তু আলবেনিয়াবাসী জানত যে সুলতান আবারো আসবেন। এবং তাই হয়। তিনি বছর পরে সুলতান আবারো 'ঈগলের বাসা' খ্যাত ক্রোইয়াতে আসেন। প্রায় বছরখানেক অবরুদ্ধ থাকার পর শহরটি সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরপর সুলতান স্কুটারির দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেন। ইতিমধ্যেই এর দুর্গ থেকে একটি দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ত আর তা হলো তুর্কিদের কৃত কর্মের জন্য আলবেনিয়ার গ্রামগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ছে। দুর্গের ভেতর শহরও বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়। তেলের মাঝে চুবানো ময়লা ন্যাকড়া মিসাইলের মতো শহরের ওপর এসে পড়ে। বৃদ্ধ এবং

শিশুদেরকে বাধ্য করা হয় ঘরের নিচে সেলারে আশ্রয় নিতে আর সামর্থ লোকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ছাদের আগুন নেভাতে। অনেক সময় আগুন যাতে না ছড়িয়ে পড়ে তাই ছাদ ভেঙে ফেলা হতো। তুর্কিরা দুটি বড় ধরনের ক্ষতি করলেও কোনো সফলতা না পেয়ে সুলতান সেনাবাহিনী নিয়ে পিছু হটার মনস্থির করেন। একটি বাহিনী রেখে যান অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য। কিছুদিন পরেই প্রায় বিচ্ছিন্ন এ অঞ্চলে জনগণ উপোস করতে থাকে। শুধু রুটি এবং পানি ছাড়া কোনো ধরনের মাংস এমনকি ইঁদুর, বিড়ালের মাংসও অপ্রতুল হয়ে পড়ে।

অবশেষে ১৪৭৯ সালে সুলতানের সাথে ভেনেশীয়রা শান্তিচুক্তিতে আসতে বাধ্য হয়। স্কুটারি, ক্রোইয়া, মোরিয়ার দক্ষিণে পার্বত্য উপত্যকাসহ ষোলো বছরের যুদ্ধে জয় করা বিভিন্ন অঞ্চল অটোমানদের ছেড়ে দেয় ভেনেশীয়া। বিপুল অঙ্কের করের বোঝা চাপে ভেনেশীয়াদের ঘাড়ে। এর পরিবর্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং ইস্তাম্বুলে তাদের নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় কনস্যুলেট স্থাপন করা হয়। আজিয়ান এবং ভূমধ্যসাগরের শক্তিশালী নৌশক্তিকে নিজের মতের পক্ষে আনতে বাধ্য করেন মাহমুদ। এর মাধ্যমে ইটালি আক্রমণের জন্য সমুদ্রপথ পরিষ্কার করেন সুলতান।

এই আক্রমণ শুরু হয় ১৪৮০ সালে। হঠাৎ আক্রমণের মাধ্যমে প্রচুর আগুন এবং রক্তের বিনিময়ে অটরানটো শহর দখল করে অটোমানরা। শহরের আট হাজার অধিবাসীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে প্রত্যাখ্যান করায়। ব্রিন্দিসি, লেসি, টারানটো প্রভৃতি জায়গায় আক্রমণ করলেও নেপলস্ শক্তিশালী বাহিনীর হাতে পরাজয় ঘটে তাদের। অটরানটোকে ঘাঁটি বানিয়ে ইটালিতে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেন সুলতান। কিন্তু এর অধিবাসীদের অসহযোগিতার ফলে ছোট একটি দুর্গ স্থাপন করেন কেবল। রটনা ছড়িয়ে পড়ে যে সুলতান নিজেই ইটালি আক্রমণ করতে আসছেন; তাই পোপ আভিগন্ন পালিয়ে যান। কিন্তু সুলতান এবং তাঁর সেনাবাহিনী ইটালি আক্রমণের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়। তাই অটোমানরা ইটালির মাটি ছেড়ে রোডস্ আইল্যান্ডে চলে যায়।

রোডস আইল্যান্ডের শেষ ক্রুসেডার যোদ্ধারা অনেক পূর্ব থেকেই আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা করে আসছিল। এদের নেতা ছিলেন পিয়েরে ডি আবুসন। নিজেদের রাজ্য রক্ষায় তাই তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল, তিন বছর ধরে বিভিন্ন রসদ এনে দুর্গে মজুদ করেছিল। এছাড়াও মিশর এবং তিউনিসিয়ার মুসলিম নেতাদের সাথে জোট বেঁধেছিল রোডস আইল্যান্ড। এসব দেখে মেসি পাশার নেতৃত্বে ১৪৭৯ সালে অশ্বারোহী সৈন্যদল রোডস আইল্যান্ড আক্রমণ করলেও সফল হতে পারেনি। এরপর বসন্তে আরো বড় প্রায় সত্তর

হাজার সৈন্য ও পঞ্চাশটি জাহাজ ভর্তি ভারী অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে মেসি পাশা।

কয়েক সপ্তাহ ধরে বোমা ফেলার পর জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে মূল আক্রমণ শুরু হয়। এর আগের দিন সারা দিন ধরে অটোমানরা যুদ্ধের বাজনা বাজায় নিজেদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে শত্রুকে মনোবলহীন করতে। এর উত্তরে আইল্যান্ডবাসীরাও গির্জায় ঘণ্টা বাজায়। এরপর ঢেউয়ের মতো অটোমান সৈন্যরা দুর্গপ্রাচীর ধ্বংস করে ইটালির টাওয়ারের চূড়ায় ওঠে অটোমান স্তম্ভ স্থাপন করে। এদের পেছনেই আসে দুই সারিতে জানিসারিসরা।

মেসি পাশা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে এটি তার দিন। ধ্বংসলীলা বন্ধ করে আদেশ দেন যে রোডস্-এর সম্পদ শুধু সুলতানের। কিন্তু এর ফলে সৈন্যদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব নষ্ট হয়ে যায়। এর মাঝে রোডস্ আইল্যান্ডের নাইটস্ সৈন্যরা অটোমানদের ওপর চড়াও হয়ে লাশের পাহাড় বানাতে থাকে। অবশেষে নাইট সৈন্যরা টাওয়ারের মাথায় ওঠে অটোমান স্ত স্ত মাটিতে ফেলে দেয়। এর ফলে বাকি অটোমান সৈন্যরাও সাহস হারিয়ে পালিয়ে যায়।

অবরোধ তুলে নেয়া হয়। অটোমান সৈন্যরা মারমারাতে একত্রিত হয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। রোডস্-এর শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু লাল জমিনের ওপর সেইন্টজনের সাদা ক্রসের বিজয় পতাকা বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে উড়তে থাকে। এখনকার মতো এক প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা বিজয় অভিযানের দিন শেষ হয়ে আসতে থাকে মাহমুদের।

॥ ১০ ॥

এক নতুন বিশ্বে ইসলামিক সাম্রাজ্য গড়ার উচ্ছাকাঙ্ক্ষা থেকে মাহমুদ বাইজেন্টাইন অঞ্চলকে শুধু বিস্তৃত করতে চাননি; বরঞ্চ আভ্যন্তরীণভাবে ও নতুন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রশাসন, আইন, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছেন। গাজীদের সমাজব্যবস্থা অবশেষে একটি কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক আকার লাভ করে।

এখানে মূলত একটি উচ্চ শ্রেণীর সুশৃঙ্খল আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সুলতান সর্বময় ক্ষমতা ভোগ করতেন। মাহমুদের কাজ ছিল তাঁর নিজের ক্ষমতার প্রতি হুমকিস্বরূপ যেকোনো কিছুকে বিনাশ, নিয়ন্ত্রণ অথবা পরিবর্তন করে ফেলা। রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থে ভ্রাতৃহন্তা বিচারকদের সম্মতি পেয়ে বসে সাম্রাজ্যজুড়ে।

অন্যান্য সময়ের তুলনায় মাহমুদের প্রধান উজির তাঁর রাজকীয় আজ্ঞা পালনের প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার

ক্ষমতা না থাকলেও পূর্বসূরি প্রধান উজিরদের তুলনায় মাহমুদ নিজের দায়িত্বে প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করত। পূর্বের সুলতানেরা নিজেদের যাযাবর পূর্বপুরুষদের সময় থেকে চলে আসা রীতি অনুযায়ী দিওয়ানদের সাথে আলোচনার অংশ নিতেন। কিন্তু মাহমুদ এ রীতিতে পরিবর্তন ঘটান। তিনি আলোচনায় অংশ নিতেন না। কিন্তু পর্দা ঘেরা একটি অংশে বসে ওপর থেকে সভাসদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একে বলা হতো "সুলতানের দৃষ্টি।"

এভাবে প্রধান উজির এভাবে সরকারের প্রধান রূপে আবির্ভূত হয়; এমনকি রাষ্ট্রের সীলমোহরও তার কাছে থাকত। সুলতানের সেনাপ্রধান হিসেবে প্রশাসনের সর্বত্র হুকুম জারির ক্ষমতা পায় প্রধান উজির। প্রশাসনের সকল কর্মচারী নিয়োগ ও কাজকর্মের ওপর নজরদারির ক্ষমতাও ছিল প্রধান উজিরের।

প্রধান উজিরের ক্ষমতার উৎসকে নামকরণ করা হয় "সাম্রাজ্যের স্তম্ভ" হিসেবে। এক্ষেত্রে ছিল চারটি স্তম্ভ। কোরান থেকে নেয়া এ চার স্তম্ভের ধারণায় প্রথম স্তম্ভ ছিলেন প্রধান উজির নিজে। তিনি সম্মানসূচক পাশা পদবি পেতেন। এছাড়াও নিজের পরিচয় চিহ্নে পাঁচ ঘোড়ার লেজের প্রতীক ব্যবহার করতেন। প্রধান উজিরের অধীনে থাকা তিনজন উজির পাশা হিসেবে তিন লেজের প্রতীক ব্যবহার করতেন। তুর্কি ভূমিতে বাসকারী যাযাবর পূর্বপুরুষদের স্মৃতিকে সম্মান জানাতেই এ ঘোড়ার লেজের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার হতো। রাষ্ট্রের তিন শাখার– সাধারণ, আইন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ দেখভাল করতেন এসব উজিরেরা। আর সরাসরি সুলতানের কাছেই তারা জবাবদিহি করতেন।

দ্বিতীয় স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত ছিল তারাই যারা ন্যায়বিচারের প্রশাসন দেখাশোনা করতেন। সেনাবাহিনীর বিচারকের কাজ ছিল অন্যান্য বিচারক নিয়োগ করা।

তৃতীয় স্তম্ভে ছিল প্রতিরক্ষাকারী হিসাবরক্ষক।

চতুর্থ স্তম্ভে ছিল রাষ্ট্রের সেক্রেটারি বা চ্যান্সেলর। যাদের কাজ ছিল সুলতানের বাণীকে কাগজের ওপর ফুটিয়ে তোলা, সুলতানের সীল দেয়া। অবশেষে ছিল আরো আঘা, সেনাপ্রধান প্রভৃতি শ্রেণী। এরা মূলত দুইভাগে ভাগ ছিল। জানিসারিসদের আঘা দেশের বাইরে সামরিক দায়িত্ব পালন করত আর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সুলতানের কোর্টের সাথে যুক্ত থাকত।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি লেখা হয়েছে "কানুন" নামক বইতে। এতে রাষ্ট্রের সকল প্রথা, নিয়ম-কানুন, প্রতিষ্ঠান, রাজস্ব, শাস্তি প্রভৃতি সব বিষয়ে লেখা হয়েছে।

এই বইতে মুসলিম নয় বরঞ্চ তুর্কি রাষ্ট্র ব্যবস্থাই প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্য কোরআনের আইন বা শরিয়ত মোতাবেক চলত। কিন্তু সাম্রাজ্যের ব্যাপকতা ও জটিলতা বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় আইনের।

একজন নিশান্জি। সাম্রাজ্যের স্তম্ভসমূহের চতুর্থজন। সুলতানের বাণীসমূহের উপর তার স্বাক্ষর প্রদান করে রাজকীয় সীল তৈরিই নিশান্জির দায়িত্ব ছিল।

প্রথম মুরাদ এই প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় মুরাদ একে আরেকটু এগিয়ে নেন। সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ একে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। কিন্তু শরিয়ত আইনকেও যথেষ্ট মান্য করতেন সুলতান। এছাড়া প্রথম প্রধান চার খলিফার বাণী সমূহকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং মান্য করতেন সুলতান। নিজের ক্ষেত্রেও যে কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে এ ব্যাপারে প্রধান মুফতির মতামত নিয়ে নিতেন সুলতান।

কানুন বইতে সুলতানের কোর্টের সকল নিয়ম-নীতিও লেখা থাকত।

মাহমুদ নিয়ম করেছিলেন যে কোর্টে চাকরিতে সকল কর্মচারীর পদমর্যাদা ও দায়িত্ব অনুযায়ী তাদের পোশাকের রং হবে। যেমন : উজিরের পোশাক হবে সবুজ, রাজ গৃহাধ্যক্ষ লাল, মুফতি সাদা, উলেমা সম্প্রদায়ের সদস্য বেগুনি, মোল্লা আকাশি নীল। বুটের রংও নিজস্ব গুরুত্ব বহন করত। সরকারি কর্মচারীরা পরত সবুজ, প্রাসাদের কর্মচারীরা লাল। রং ছাড়া পোশাকের ডিজাইনেরও গুরুত্ব ছিল। মাথার পাগড়ি বরাদ্দ ছিল মুসলিমের জন্য। কিন্তু অ-মুসলিমদেরকে লাল, কালো বা হলুদ রঙের মাথার বনেট পরতে হতো। তাদের জুতার রংও ভিন্ন হতো।

একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ নিজের পূর্বপুরুষদের প্রথা থেকে সরে এসেছিলেন। বাইজেন্টাইন রীতি অনুসরণ করেই এমনটা করেছিলেন সুলতান। মাহমুদের পূর্ববর্তী সুলতানেরা সাধারণ মানুষ। কর্মচারীদের সাথে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা, খাওয়া-দাওয়া করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ইউরোপ অভিযানের পর বাইজেন্টাইন প্রভাবে এসে সাধারণের কাছ থেকে সুলতানস্বরূপ দূরত্ব বজায় রাখা শুরু করে তাঁরা। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা দশজনে বেঁধে দিয়েছিলেন যারা একত্রে তাঁর সাথে টেবিলে বসে খাবার খেতে পারবে। কিন্তু মাহমুদ আরো এগিয়ে এ সংখ্যা শূন্যতে নামিয়ে আনেন। তিনি আদেশ জারি করেন যে কেউ তাঁর সাথে সাম্রাজ্যের জৌলুস সহভাগিতা করতে পারবে না। রাজরক্তের ক্ষেত্রে এ নিয়ম শিথিল হবে।

তৃতীয় পাহাড়ের ওপর নির্মাণ করা প্রথম রাজপ্রাসাদে সুলতান মাহমুদ কাঙ্ক্ষিত দূরত্ব আর গোপনীয়তা পাননি। এই চিন্তা থেকেই ১৪৬৫ সালে সেরাগিলো প্রাসাদ নির্মাণ কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর লাগার কথা থাকলেও সুলতানের তদারকি আর উদার বকশিশের ফলে এর তিন ভাগের এক ভাগ সময়ে এ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। পারস্য, আবর ও গ্রিক স্থাপত্যবিদেরা এ নকশা করে ছিল। প্রাসাদের দুর্গের মতো দেয়ালের ভেতরে ছিল দুটি উঠান, তিনটি গেট। চারপাশে ছিল সুন্দর বাগান, সম্ভব প্রতিটি গাছ ও ফল ছিল, পানি ছিল পরিষ্কার ও সুপেয়, গান গাওয়া ও খাবার জন্য উভয় ধরনের পাখির কলকালিতে মুখর থাকত বাগান। গৃহপালিত এবং বন্য সব ধরনের পশুরই দেখা মিলত এখানে। শীতকালে লোকচক্ষুর অন্তরালে সুলতান

এখানে আশ্রয় নিতেন। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে রাস্তায় বের হলেও কঠিন পাহারার ব্যবস্থা থাকত তাঁকে ঘিরে।

রাজপ্রাসাদ বিভক্ত ছিল প্রধানত দুটি অংশে, বাইরের অংশে দাপ্তরিক কাজ করা হতো। এ অংশেই সুলতানের দপ্তর আর দিওয়ানদের দপ্তর ছিল। আভ্যন্তরীণ অংশে ছিল সুলতানের সিংহাসন কক্ষ আর রাজকীয় বাসভবন। এখানে তাঁর নপুংসক ভৃত্যরাও থাকত। মাহমুদ নিজে পৃথক প্রাসাদে থাকতেই পছন্দ করতেন। ৩৭০ জন নপুংসকসহকারে এটাই ছিল তাঁর গৃহস্থালি।

সেরাগালিও প্রাসাদে তিনটা দরজা ছিল। প্রথমটির নাম ছিল বাব-ই-হুমায়ুন। এ দরজা সরাসরি শহরের সাথে যুক্ত ছিল। এর গায়ে খোদাই করা ছিল একটি বাণী "সুলতান মাহমুদ....মানুষের মাঝে ঈশ্বরের ছায়া এবং আত্মা, দুই মহাদেশ এবং দুই সমুদ্র, পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রভু, কনস্টান্টিনোপল শহর বিজয়ী বীর।" তুর্কিদের প্রথম দিককার একটি অভ্যাস ছিল প্রাসাদের দরজাকে আইন এবং ন্যায়বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা।

আঘা দ্বাররক্ষক ছিল প্রধান শ্বেত নপুংসক। তার কাজ ছিল বাইরের দুনিয়ার সাথে সুলতানের সেরাগালিও প্রাসাদের যোগাযোগ রক্ষা করা। তার অধীনে অন্যান্য শ্বেত নপুংসকরা কাজ করত বিভিন্ন দপ্তরে। প্রধান শ্বেত নপুংসকের বিপরীতে ছিল প্রধান কৃষ্ণ নপুংসক। যার কাজ ছিল নারীদের বাসভবন দেখাশোনা করা। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কাছ থেকেই খোঁজাদের ব্যবহার করা শেখে অটোমান সুলতানরা। খ্রিস্টান রাজ্যসমূহ থেকে এদেরকে আমদানি করা হতো।

প্রধান শ্বেত নপুংসক সুলতানের কোর্টের প্রায় ৩৫০ জন মানুষের দেখাশোনা করত। এসব কর্মচারী প্রধান উজির থেকে শুরু করে প্রাদেশিক গভর্নর, কর সংগ্রহকারী, বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী সকলেই ছিলেন প্রাক্তন খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত। এরা ছিল নাগরিক এবং সামরিক উভয় ক্ষেত্রের কর্মচারী। এই নিয়ম তৈরি করে গিয়েছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ। তাঁর পুত্র মাহমুদ একে আরো শক্তিশালী এবং ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটিয়েছেন।

বাস্তব দিক থেকে বলা যায় যদি মুসলিমরা সুলতানের ভৃত্য হতো তাহলে তারা এর সুযোগ নিত। তাদের আত্মীয়রা কর দিতে প্রত্যাখ্যান করত, স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করত। কিন্তু যদি খ্রিস্টান সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে আত্মীয়রা তাদের প্রতি হিংসাত্মক হয়ে শত্রুতে পরিণত হবে। ইস্তাম্বুল বেড়াতে গিয়ে ব্যারন ওয়েনচেসলেস লিখে গেছেন, "কনস্টান্টিনোপলের কোথাও অথবা পুরো তুর্কি ভূমিতে আমি কোনো পাশা দেখিনি বা বলতেও শুনিনি যে সে জন্মগতভাবেই তুর্কি। অন্যদিকে হয় তাদেরকে অপহরণ করা হয়েছে, নতুবা ধরে আনা হয়েছে অথবা জোরপূর্বক তুর্কি বানানো হয়েছে।"

ষোড়শ শতকের মুখ্য শ্বেত-নু-পুংসক ছিলেন রাজপ্রাসাদ স্কুলের প্রধান প্রশাসক এবং পরবর্তীতে সুলতান আদালতের অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে কর্মরত হন।

এই প্রক্রিয়াকে সফল করার জন্য সুলতান সেরাগলিও প্রাসাদে রাজকীয় বিদ্যালয় চালু করেন। মাহমুদ নিজে শিক্ষার কদর বুঝতেন এবং নাগরিক এবং উভয় ক্ষেত্রে নিজ সাম্রাজ্যের প্রসার ও উন্নতির জন্য শিক্ষিত কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এমন অটোমান সরকারি কর্মচারী তৈরি করা হবে যে যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক, বিশ্বস্ত মুসলমান এবং ষোড়শ শতকের ইটালির লেখকের কথানুযায়ী একজন বিদ্বান ব্যক্তি, সুন্দর বাচনভঙ্গি, সহবত এবং সৎ নীতিবোধের অধিকারী।"

অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে প্রধান উজিরেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধান শ্বেত নপুংসকের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বিদ্যালয় পরিচালিত হতো। এছাড়াও একদিকে রাজকীয় খাজানা ও অন্যদিকে প্রিভি কমিসারিয়েটের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকতো। বয়সানুযায়ী প্রথমে দুটি প্রিপারেটরি বিদ্যালয় এবং এর পর দুটি ভোকেশনাল ট্রেনিং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল। নিজের রাজত্বের শেষ দিকে মাহমুদ তৃতীয় আরেকটি ভোকেশনাল ট্রেনিং বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মেধার ওপর লক্ষ্য রেখে তাদেরকে সমর্থ, উদ্যোগী ও নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিজ নিজ বিষয় পছন্দ করে নিতে উৎসাহ দেয়া হতো। এই প্রাসাদীয় বিদ্যালয়ে অথবা রাষ্ট্রীয় দপ্তর সর্বত্র একটি নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হতো। প্রভুর প্রতি ছোট্ট একটি সেবাদানেও যেমন পুরস্কার মিলত তেমনি ভাবে ছোট্ট একটি ভুলের জন্যও বরাদ্দ ছিল শাস্তি।

ইসলামিক আইন এবং ধর্মতত্ত্ব ও কোরআন মেনে চলা ছাড়া প্রাসাদ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে মোটামুটিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। ধর্মের তুলনায় দেশ গঠন এবং সামরিক শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্বরোপ করা হতো। প্রথম দিকে উলেমা সম্প্রদায় থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও মাহমুদ ধীরে ধীরে নিজের কোর্ট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করতেন। এসব শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গ্রিক এবং ল্যাটিন সম্পর্কেও শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। তাই এ অটোমান রাষ্ট্রকে প্লেটোর রিপাবলিকের সাথে তুলনা করা হতো। এর ফলে যেসব বাইজেন্টাইন গ্রিক দেশ ছেড়ে ইটালি চলে গিয়েছিল, তারাও আবার দেশে ফিরে আসে।

প্রাসাদ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে কলা, শারীরিক চর্চা ও প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ের ভোকেশনাল ট্রেনিং অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলাবিদ্যার ক্ষেত্রে তুর্কি, আরবি এবং পারস্যের ভাষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশেষ ভাবে তুর্কি ভাষা শিখতেই হতো। আরবি ভাষার ব্যাকরণ, পারস্য সাহিত্যের কবিতা ও রোমাঞ্চ বিষয়েও জানতে হতো শিক্ষার্থীদেরকে। তুর্কি ইতিহাস ও গণিতের ক্ষেত্রে জ্যামিতি ও

পাটিগণিত শিখতে হতো। তুর্কি সংগীত ও আয়ত্ত করতে হতো। প্রাসাদে সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য প্রায় সংগীতায়োজন করা হতো। এছাড়া সূর্য ওঠার আগে আধা ঘণ্টা ও সূর্য ডোবার পরে আধা ঘণ্টা গান গেয়ে সুলতানকে সম্মান জানানোর নিয়ম ছিল।

শারীরিক শিক্ষার মধ্যে জিমন্যাস্টিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুলতানের বালক ভৃত্যরা হয়ে উঠত সুঠাম শক্তিশালী ও চটপটে। তীর ছোড়া, কুস্তি, তরবারি চালানো, বর্শা নিক্ষেপ, পোলোর প্রথম দিককার খেলা চর্চা করত এরা। ধীরে ধীরে ঘোড়ায় চড়াও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সবশেষে বলা যায় ব্যবসা বা হাতের বিদ্যার কথা; যা প্রতিটি জানিসারিসকে অবশ্যই শিখতেই হতো। সুলতানরা নিজেরাও তাই করতেন। সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ নিজে একজন দক্ষ বাগান পরিচর্যাকারী ছিলেন। নিজ হাতে অবসর সময়ে প্রাসাদের বাগানে তিনি শুধু ফুল এবং গাছপালা লাগাতেন না, এমনকি সবজির চাষও করতেন। এক্ষেত্রে একটি গল্পের কথা বলা যায়। একবার তিনি এত বড় একটি শসা ফলিয়েছেন যে গর্ববোধ করেছিলেন। কিন্তু শসাটি বাগান থেকে উধাও হয়ে যায়। সন্দেহের বশে নিজের এক মালিকে কেটে ফেলেন সুলতান আর শসার অবশিষ্টাংশ মালির পাকস্থলীতে দেখতে পান। এছাড়াও বালক ভৃত্যদেরকে সুলতানের পছন্দের খাবার ও পানীয় তৈরি, মাথার তাজ বানানো, চুল কাটা, দাড়ি কামানো প্রভৃতি শিখতে হতো।

রাজধানীর বাইরে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রশাসন মূলত সেনাবাহিনীর উন্নয়নে বেশি গুরুত্বারোপ করত। এর প্রধান হিসেবে সামরিক আঘা-রা আভ্যন্তরীণ আঘাদের তুলনায় ভিন্ন দায়িত্ব পালন করত। উলেমা থেকে বিচারক নিয়োগ দিতেন সুলতান। সামরিক উপাদানের শর্ত মেনে নিয়ে অটোমান প্রদেশসমূহ কঠোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকত। প্রধানত দুটি অংশ আনাতোলিয়া ও রুমেলিতে বিভক্ত এ সাম্রাজ্য দুই লেজবিশিষ্ট সম্মান পাওয়া পাশা-র অধীনে থাকত। এরা সামরিক শাসকদের মাধ্যমে কাজ করত। এরা ছিল এক লেজবিশিষ্ট সম্মান পাওয়া পাশা। সুলতানের বাহিনী, কর-সংক্রান্ত কাজ ও পুলিশ বাহিনীর দেখাশোনা করত এরা। মাহমুদের আমলে এ রকম পাশা এশিয়াতে ছিল বিশজন এবং ইউরোপে আটাশ জন। এসব প্রদেশ আবার সামন্তভূমিতে বিভক্ত থাকত। নিজের কৃষক ও তুর্কি বংশোদ্ভূত অশ্বারোহীদের ওপরেও অধিকার খাটাতে পারত এ প্রভুরা। সামরিক গভর্নরের এককথায় সৈন্য পাঠানোর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হতো এদের।

সুলতানের পাগড়ি নির্মাতা।

সুলতানের পদ (জুতা) আসবাব বহনকারী।

পুরো সাম্রাজ্যের মাঝে বিশাল কৃষিজমি থাকত সরাসরি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে। সামন্তভূমি প্রধান ছিল সিপাহি। এ প্রক্রিয়াকে বলা হতো তিমার। সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে তিমার প্রক্রিয়াকে আরো ব্যাপক হারে বর্ধিত করা হয়, যা ধীরে ধীরে সামরিক, কৃষি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়াকে জমি অনুসারে রাষ্ট্র, সিপাহি ও কৃষকেরা নিজ নিজ অধিকার ও দায়িত্ব ভাগ করে নিত। তবে জমির মালিক ছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অনুমোদন সাপেক্ষে সিপাহি কৃষকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কর সংগ্রহ করত তার সামরিক সেবা ও নিজের ঘোড়াসওয়ারদের বিনিময়ে। কৃষক-রায়া ভূমি চাষ করত, জমির লভাংশ ভোগ করত।

মাহমুদের রাজত্বকালে সিপাহি ও তাদের অশ্বারোহীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চল্লিশ হাজারে। এরা বেশির ভাগই সনাতন অস্ত্র যেমন তরবারি, বর্শা, বল্লম ব্যবহার করত। অটোমান সেনাবাহিনীর বিশাল অংশ ছিল এরাই। যদিও তারা সুলতানের নিজস্ব প্রাসাদ বাহিনীর তুলনায় ভিন্ন ছিল।

কিন্তু তারপরেও সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল জানিসারিসরাই। খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত জমিবিহীন যোদ্ধা। আধুনিক অস্ত্র এবং বর্ধিত বেতন-ভাতার মাধ্যমে মাহমুদের আমলে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দশ হাজার সৈন্যে। পূর্ব দিকে এরাই ছিল নতুন ধারণায় তৈরি একক সৈন্যদল। অন্যদিকে পশ্চিমেও এদের সমকক্ষ কেউ ছিল না।

সুলতান নিজে জানিসারিসদের সেনাপ্রধান নির্বাচিত করতেন। এরা সুলতান ছাড়া কারো অধীনে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল না। এভাবে তারা সুলতানের বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে তাঁর রক্ষাকবচের ভূমিকা পালন করত।

সাম্রাজ্যজুড়ে মাহমুদ পুরাতন শাসক শ্রেণীকে নির্মূল করে নিজের পছন্দমতো মন্ত্রী নির্বাচিত করতেন। ফলে জন্মগত কোনো সুবিধা নয়; বরঞ্চ মেধার জোরে সুবিধা আদায় করতে হতো সবাইকে। কোনো দাস হয়তো মেধার জোরে প্রধান উজিরে পরিণত হতো। আবার প্রধান উজির ও সুলতানের অসন্তুষ্টির ফলে নিজের পদ হারাত। মেধার পুরস্কারপ্রাপ্তির এ সামরিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পশ্চিমের খ্রিস্টান রাজ্যসমূহেও ছিল না। পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্বের অধীনে থাকা সকলে তাদের সহ-অটোমানদের কাছে ও আইনের চোখে ছিল এক সমান।

রাষ্ট্রের করপ্রাপ্তির প্রধান উৎস ছিল দখল করে নেয়া অ-মুসলিম, রায়া সম্প্রদায়। কৃষক সমাজ ও শহরের মানুষদের মাঝে এদের সংখ্যাই ছিল বেশি। মুসলিম ও ধর্মান্তরিত তুর্কিরা কর দিত না; কিন্তু তাদের অঞ্চলে যুদ্ধ হলে দিতে বাধ্য হতো। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সমুদ্রের ধারে বা জঙ্গলে বসবাসরত জনসাধারণ, রায়া হোক বা না হোক কর দেওয়ার হাত থেকে বেঁচে

যেত, যদি তারা স্বেচ্ছাশ্রম দিতে রাজি হতো। এছাড়াও কর আসত বিভিন্ন রাজ্য থেকে যেমন ওয়ালাসিয়া, মলতোভিয়া এবং রাগুসা প্রজাতন্ত্র থেকে। কিন্তু সাম্রাজ্যের কর প্রধানত আসত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা থেকে—ফেরি পারাপার, ওজন কর, লবণ, সাবান, মোমবাতির ওপর কর, প্রাকৃতিক সম্পদ, শুল্ক, রুপা, তামা, দস্তার খনিতে কাজ করা প্রভৃতি। এছাড়াও যখন সুলতানের হঠাৎ করে সেনাবাহিনীর জন্য বৃহৎ অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন হতো, তখন তিনি মুদ্রার মান কমিয়ে দিতেন। নতুন মুদ্রা গলিয়ে কম দামে পুরাতন মুদ্রা ক্রয় করতেন।

তবে সুলতান মাহমুদ দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে ও কর সংগ্রহ করে নিজের অভিযানের ব্যয় বহন করতেন। কিন্তু মূলত সুলতানের সমস্ত রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক স্থিরতা আসার পর ও দূরবর্তী অঞ্চলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ার পর বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন রাজ্যসমূহের মাঝে ঐক্য আসে। আভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন অ-মুসলিম বণিক বিশেষ করে গ্রিক, আর্মেনীয় এবং জিউরা ইটালিয় বণিকদের তুলনায় ভালো করতে থাকে।

এই বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধির ফলে শুধু দ্রুত উন্নতি করা ইস্তাম্বুল নয়, বরঞ্চ বার্সা, আড্রিয়ানোপল ও গালিপল্লী বন্দরও লাভ করতে থাকে।

বিজয়ী মাহমুদ নিজ দেশের সম্পদ উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির স্বার্থে সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করেছিলেন। নিজের শাসনকালের শুরু থেকেই প্রশাসনিক বিভাগ বিশেষ করে রাজকোষের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন তিনি। ফলে ব্যবসায়িক স্বার্থ চিন্তা করে সে মোতাবেক কর ব্যবস্থার যথাযথ সংস্কারও করেছিলেন। এসব বাস্তব বিষয়ে নিজের পিতাকেও অতিক্রম করে গেছেন মাহমুদ। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর পেছনে পিতার অবদানই ছিল বেশি। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা অর্জন করেছেন সুলতান মাহমুদ। ছয়টি ভাষার ওপর অর্নগল দক্ষতা ছিল তাঁর—তুর্কি, গ্রিক, আরবি, ল্যাটিন, পারস্য ও হিব্রু। এছাড়াও ইসলামিক ও গ্রিক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়েও ভালো দখল ছিল মেহমুদের।

পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় সংস্কৃতির প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা পোষণ করতেন সুলতান মাহমুদ। কনস্টান্টিনোপল জয় করে নেওয়ার পর নিজের কোর্টে বিপুলসংখ্যক ইটালিয় ও ল্যাটিন বিদ্বান ব্যক্তিদের নিয়ে আসেন সুলতান। নিজের জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাবার সাথে সাথে যে অঞ্চল তিনি জয় করার বাসনা করতেন তা সম্পর্কেও রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন এর মাধ্যমে। পশ্চিমের ইতিহাস, ভূগোল, সরকার ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, সামরিক কৌশল, ধর্মীয় বিশ্বাস, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারেন সুলতান। এ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহায়তায় বাণিজ্যিক ও অর্থনীতি প্রস্তুত করেন

তিনি। প্রাচীন সব পুঁথি জোগাড় করে সেগুলোকে গ্রিক ও তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করা হয় সুলতানের সুবিধার্থে।

নিজের রাজত্বের শেষ দিকে পশ্চিমা চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের সমঝদার হয়ে উঠেন সুলতান মাহমুদ। বেশ কয়েকজন ইটালিয় চিত্রশিল্পী সুলতানের দরবারে আসেন। এদের মধ্যে প্রধানত বলা যায় জেন্টিলি বেলিনির কথা। ১৪৭৯ সালে বেলিনি প্রায় পনেরো মাস ইস্তাম্বুলে কাটান। বেলিনি এখানে সুলতান ও দরবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের পোর্টেট আঁকেন। সেরাগলিও প্রাসাদের দেয়ালে ম্যুরালেও বিভিন্ন ছবি এঁকে সাজিয়ে দেন বেলিনি। তবে রেনেসাঁর সময়ে আঁকা এসব চিত্রের বেশির ভাগ তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বায়েজীদ খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয় মাহমুদের মৃত্যুর পর। শুধু সুলতানের পোর্টেটটি একজন বণিক কিনে নিলে পরবর্তীতে শতাব্দী পার হয়ে লন্ডন জাতীয় গ্যালারিতে স্থান পায় ছবিটি। মাহমুদ ব্রোঞ্জের ভাস্করদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। এদের মাঝে ফেরারার কনস্টাঞ্জোও ছিলেন।

কিন্তু মাহমুদ নিজে কোনো রেনেসাঁর রাজপুত্র ছিলেন না। তিনি শুধুমাত্র কট্টরবাদী, খ্রিস্টান সাম্রাজ্য জুড়ে অটোমানদের বিজয়গাঁথা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমের চেয়ে পূর্বের বিশেষ করে পারস্যের সংস্কৃতির প্রতি সুলতানের টান ছিল বেশি। পারস্যের শিয়া সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ থাকলেও নিজের দেশের সুন্নি সংস্কৃতির গোঁড়ামির কারণে সে ব্যাপারে বেশি দূর আগাতে পারেননি সুলতান।

তার পরেও পারসীদের প্রতি প্রথমে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এরপর প্রশাসনে সুলতানের দুর্বলতার কারণে তুর্কিরা খেপে উঠতে থাকে। অটোমান সাম্রাজ্যে পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি পারসীয় বাস করত ও লেখালেখি করত। অটোমান কবিরা পারসীয়দের অনুসরণ করে নিজেদের লেখা প্রস্তুত করত। যেমন ফেরদৌসি ও হাফিজ। সুলতান নিজেও প্রায় আশিটি কবিতা লিখে গেছেন। মাসিক বেতন-ভাতার মাধ্যমে কবি ও অন্যান্য লেখকদের সম্মানী প্রদান করতেন সুলতান। কিন্তু এই পরিবেশে বিজ্ঞানের তেমন একটা উন্নতি হয়নি। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্র বিবেচনার জন্য জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আগ্রহী ছিলেন মেহ্মুদ। চিকিৎসা বিজ্ঞানও ছিল খুবই অনুন্নত। সুলতানের নিজস্ব চিকিৎসক ছিল ইটালি থেকে আগত জিউ। এদের মাঝে প্রধানত ছিলেন ডোকাপো, যিনি ইয়াকুব পাশা নাম নিয়ে উজিরে পরিণত হয়ে ত্রিশ বছর ধরে সুলতানের সাথে থাকেন ও সমস্ত অভিযানে অংশ নেন। সুলতানের ওপর তার প্রভাব ছিল সীমাহীন। ভেনেশীয়রা প্রায় বিশ বছর ধরে অন্তত চৌদ্দবার সুলতানকে বিষ পান করানোর চেষ্টা করলেও ইয়াকুবের জন্য অসফল হয়েছিল।

মাহমুদের স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। বিশেষ করে ত্রিশের শুরুতেই বংশগতভাবে পাওয়া এক ধরনের আর্থাইটিসে আক্রান্ত হন তিনি। এর ফলে ঘোড়ার পিঠে চড়তে অসুবিধা হতো তাঁর। মাংস খেতে ভালোবাসতেন ও পানের আসক্তি থাকায় ধীরে ধীরে তিনি আরো পেট মোটা হয়ে উঠতে থাকেন। ধীরে ধীরে তীব্র পেটের ব্যথা ও গেটে বাতের ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে প্রাসাদ থেকে নড়াই বন্ধ হয়ে যায় সুলতানের। এর আগের সাম্প্রতিক অটোমান সুলতানেরা কেউই পঞ্চাশ বছরের ওপার যেতে পারেননি। ১৪৭৯ সালে মধ্য চল্লিশে এসে মাহমুদের পায়ে এমন একটি টিউমার ধরা পড়ে যা চিকিৎসকদেরকেও ধাঁধায় ফেলে দেয়।

১৪৮১ সালে সেনাবাহিনী নিয়ে এশিয়া পার হয়ে দক্ষিণে যাত্রা করেন সুলতান মাহমুদ। প্রথানুযায়ী গন্তব্য গোপন রাখা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে তীব্র বাতের ব্যথায় ও আর্থাইটিসের ব্যথায় আক্রান্ত হলে ব্যক্তিগত পারস্যের চিকিৎসক সুলতানকে ওষুধ দেয়। কিন্তু ওষুধ কোনো কাজে দেয় না আর এর মাত্রাও ছিল প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। ইয়াকুব পাশা যখন অবশেষে সুলতানের কাছে পৌঁছান, পরীক্ষা করে দেখতে পান যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর কিছুই করার ছিল না তখন। বিজয়ী মাহমুদ ১৪৮১ সালের মে মাসের ৪ তারিখে দুপুরের নামাজের সময় মৃত্যুবরণ করেন।

'বৃহৎ ঈগলের মৃত্যু হয়েছে',–এভাবেই এক পত্রবাহক ভেনিসে সুলতানের মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ করে। পশ্চিমা বিশ্ব পূর্বের ভয়ের কাছ থেকে মুক্তি লাভ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বস্তুত সুলতান মাহমুদ এক প্রজন্মের অভিযানে সাম্রাজ্যের সীমা ততটা বাড়াতে পারেননি। কিন্তু একজন বিজেতা হিসেবে এক বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুসংহত করেছেন, একজন রাষ্ট্রনেতা হিসেবে এক নতুন ও দীর্ঘস্থায়ী ইসলামিক রাষ্ট্রের কাঠামো গঠন করেছেন। আর এসব কারণেই মধ্য যুগের ইতিহাসে এক অনন্য শাসকের উদাহরণ হয়ে আছেন।

অধ্যায় তিন

সাম্রাজ্যের মধ্যবিন্দু

॥ ১১ ॥

ষোড়শ শতাব্দী সাক্ষী হয়ে আছে অটোমান সুলতানের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান সুলেমানের; যিনি ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের প্রপৌত্র। সুলতান সুলেমান অটোমান সাম্রাজ্যের সম্মান এবং প্রতিপত্তিকে ক্ষমতার শীর্ষ চূড়ায় নিয়ে যান যা বিজয়ী বীর সুলতান মাহমুদ নিজেও কখনো কল্পনা করেননি।

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বায়েজীদ ও রাজকুমার জেমের মাঝে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু জানিসারিসদের সমর্থনে ভ্রাতৃহন্তার নীতির মাধ্যমে দ্বিতীয় বায়েজীদ পিতার শূন্য আসন পূরণ করে।

রাজকুমার জেমের মৃত্যুর আগে এবং পরে প্রায় পুরোটা সময় বায়েজীদ ব্যস্ত ছিলেন ইউরোপীয় কূটনীতি নিয়ে। সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদ সকল প্রকার ক্রুসেডের যবনিকাপাত ঘটাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। আর এ লক্ষ্যে পিতার মতোই অটোমান নৌশক্তিকে বাড়ানোর জন্য বড় আকারের জাহাজ নির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ভূমধ্যসাগরে নৌশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে ভেনিসের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করার বাসনা ছিল সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদের। ইতিমধ্যে তাঁর নৌ ও স্থলবাহিনী গ্রিসের বিভিন্ন ভূমিও দখল করে নেয়।

১৫০৩ সালে সুলতান ও ভেনেশীয়ার মাঝে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়। এর ফলে এক ধরনের সাম্যাবস্থা বিরাজমান হয়। একই সময়ে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিমরা “সমুদ্র গাজী” হিসেবে অটোমানদের স্বাগত জানায়। শুধু সামরিক নয়, বরঞ্চ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের দিকেও নজর ছিল সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদের। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ইটালীর বণিকদের সাথে লাভজনক ব্যবসা করে অটোমানরা। নিজের রাজত্বে আরো বিপুলসংখ্যক জিউদের আসনে উৎসাহিত করেন সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদ।

একই সময়ে এশিয়াতে অটোমানরা যুদ্ধ করছিল তুর্কমান যাযাবরদের বিরুদ্ধে। মোটমাট ছয়টি সফল অভিযানের মাধ্যমে সিরিয়ার মামলুক সুলতানের ওপর অটোমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তার বিনিময়ে অটোমান সীমান্ত মামলুকদের হাতে চলে যায়।

কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির মাধ্যমে তুর্কমানদের ওপর কর আরোপিত হয়, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের পূর্বের গোত্রীয় স্বাধীনতা খর্ব হয় ও কৃষক সমাজের ওপরও অটোমান নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তুর্কমানরা লাল টুপি পরিহিত হয়ে কিজিলবাশ নামধারণ করে এবং ১৫০২ সালে এক নতুন নেতা নিজেকে যে পারস্যের শাহ হিসেবে পরিচিতি দিত, ইসমাইলের অধীনে রাজনৈতিক ও আত্মিক স্বাধীনতা লাভে একত্রিত হয়। উজুন হাসানও তার গোত্র শ্বেত ভেড়ার আদর্শ অনুসরণ করে ইসমাইল ভেনিসের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলে। ইসমাইলের নাম নিয়ে বিপ্লবী দল বার্সার দেয়াল পর্যন্ত আক্রমণ করে। আর এ যুদ্ধে সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদের প্রধান উজির আলী পাশা নিহত হয়।

ইসমাইল মহান সুফি হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। পূর্ব ও দক্ষিণ আনাতোলিয়া জুড়ে তার বিকল্প ধারার মতবাদ (Hetcrodox) জনপ্রিয়তা লাভ করে। সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদ নিজেও সুফি মতবাদের প্রতি সমর্থন দেখালেও নিজের সীমান্তে কোনো বিদেশি রাজা একে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করবে তা বরদাস্ত করতে পারেননি। তাই অটোমান সেনাবাহিনী ইসমাইলের বিরোধিতা করলেও যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে পারেনি। অন্যদিকে ইসমাইলের আবির্ভাব অটোমান রাজবংশের মাঝে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব গড়ে তোলে। সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র সেলিম ছিল তার দাদা সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের ন্যায় বলশালী ও যুদ্ধবাজ। কিন্তু সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদ পছন্দ করতেন দ্বিতীয় পুত্র আহমেদকে, যার প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল অসামান্য।

বায়েজীদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা শুনে সেলিম ইস্তাম্বুলে এসে জানিসারিসদের মাঝে নিজের সমর্থন আদায় করে নেয়। কিন্তু বায়েজীদ পুত্র সেলিমকে হটিয়ে নিজের কর্মচারীদের সমর্থন নিয়ে আহমেদকে সিংহাসনে বসাতে চান। সেলিম পালিয়ে ক্রিমিয়াতে গভর্নর পুত্র ও ভবিষ্যৎ মহান সুলতান সুলেমানের কাছে চলে যান। এখানে সেলিম সেনাবাহিনী গঠন করে কৃষ্ণ সাগরের উত্তর দিক হয়ে আড্রিয়ানোপল অবরোধ করেন। সেলিম এর পর জানিসারিসদের সাথে নিয়ে ইস্তাম্বুলে এলে সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদ দক্ষতা হস্তান্তরে রাজি হয়ে যান ও অবসর নিয়ে নিজের জন্মস্থান ডেমোটিকার উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু পৌঁছানোর পূর্বে পথিমধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হতে পারে পুত্র সেলিমের কথানুযায়ীই হয়তো তাকে বিষ পান করানো হয়েছিল।

অটোমান সাম্রাজ্যের সীমানা।

Taganrog
SEA OF AZOV
Kuban R.
SEA
Batum
Trebizond
TREBIZOND
MINGRELIA
GEORGIA
Tiflis
Kura R.
DAGHESTAN
CASPIAN SEA
KARABAGH
Aras R.
Erivan
Erzurum
ARMENIA
AZERBAIJAN
Tabriz
Erzinjan
KARA-KOYUNLU
L. Van
Bitlis
ERETNA
Kayseri
AK-KOYUNLU
KURDISTAN
Malatya
DULKADIR
Mardin
Urfa
Mosul
MESOPOTAMIA
Adana
Alexandretta
Aleppo
Antioch
SYRIA
R. Tigris
R. Euphrates
LURISTAN
Baghdad
LEBANON
Beirut
Acre
Haifa
Jaffa
Palestine
Jerusal
Basra
KUWAIT
EL HASA
Suez
Sinai
HEJAZ

এভাবে সুলতান প্রথম সেলিমের রাজত্বকাল। ভয়ানক নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। সিংহাসনে বসার পর সুলতান সেলিম প্রথম যে কাজটি করেন তা হলো নিজের দু'ভাইকে ধনুকের রশি দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। শুধু তাই নয়, কামরা থেকে কান্নার চিৎকার শুনতে পেয়ে নিজের অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকেও হত্যা করেন। নিজের সিংহাসন নিরাপদ করে এরপর সুলতান সেনাবাহিনীকে এশিয়াতে পাঠিয়ে ইউরোপে যাত্রা করেন।

ধর্মীয় উন্মাদ স্বভাবের সুলতান নিজের রাজ্য থেকে শিয়া মতবাদ উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর প্রধান শত্রু ছিল পারস্যের শাহ ইসমাইল। ইসমাইলের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করার পূর্বে আনাতোলিয়াতে ইসমাইলের ধর্মীয় অনুসারী প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করেন সেলিম।

যাত্রার প্রাক্কালে সুলতান প্রথম সেলিম বিভিন্ন ভাবে ইসমাইলকে উসকানি দিতে চাইলেও ইসমাইল শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের কথাই বলতে থাকে। অবশেষে চালদেরানে দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হলে সেলিম বিজয়ী হন। তাবরিজ শহর দখল করে নির্বিচারে বন্দি হত্যা করলেও ইস্তাম্বুলের ব্যবসা ও অটোমান স্থাপত্যবিদ্যাকে এগিয়ে নিয়ে কারিগরদের প্রাণে বাঁচিয়ে ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর আরো শহর ও ভূখণ্ড দখল করে পূর্ব আনাতোলিয়ার মালভূমি দখল করে এশিয়াতে শক্তির ভারসাম্য স্থাপন করেন সুলতান সেলিম।

পারস্যের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সিল্ক ব্যবসা বন্ধ করে দেন। এই ব্যবসাই ছিল দেশটির প্রধান রপ্তানির উৎস।

পারস্যে নিজের বিজয় সুনিশ্চিত করার পর সুলতান মামলুকের দিকে দৃষ্টি দেন। মামলুকবাসী অবশ্য অটোমানদের সমর্থন প্রদান করে। কেননা একদিকে ছিল ইসমাইল হুমকি ও অন্যদিকে নৌপথে পর্তুগিজরা তাদের অঞ্চলে অনুপ্রবেশ শুরু করেছিল। তাই অটোমানদের কাছ থেকে কাঠ ও অন্যান্য উপাদান নিয়ে জাহাজ তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মামলুকরা। কিন্তু এরপর সেলিমের সেনাবাহিনী সিরিয়ার সীমান্তে প্রবেশ শুরু করলে মামলুকদের বৃদ্ধ রাজা চুপ করে বসে না থেকে মিশর থেকে উত্তরে সৈন্য নিয়ে রওনা হয়। এ ঘটনায় সেলিম আলেপ্পোর বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে রওনা হয়; পথিমধ্যে মামলুক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে একে একে দামাস্কাস, বৈরুত ও গাজা দখল করে নেন। এরপর মহানবীর সমাধি ও জেরুজালেমে আব্রাহামের প্রস্তরখণ্ডে তীর্থযাত্রা করেন সেলিম।

জয় করে নেয়া বিভিন্ন শহরে অটোমান গভর্নরদেরকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করে মিশর সীমান্তে এসে থেমে যান সুলতান সেলিম। তাঁর সাথে ছিল মামলুক রাজার পরাজিত সৈন্যরাও আব্বাসীয় খলিফা। এদের সাথে নিয়ে সুলতান মামলুক রাজার উত্তরাধিকারী তুমান বে-কে পত্র লিখে জানিয়ে দেন যে খলিফার মতানুসারে সুলতান সেলিম এখন মামলুক রাজ্যসমূহের প্রভু।

কিন্তু তূমান বে আত্মসমর্পণ করতে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেকে মামলুক সুলতান রূপে ঘোষণা করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান সেলিম সিনাই মরুভূমি পার হয়ে প্রাথমিক একটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এরপর খলিফাকে কায়রোতে মিশরের জনগণকে ভয় না পেয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে পাঠান। এর পরের দিন শুক্রবারের নামাজে সুলতান সেলিমের নাম উচ্চারণ করা হয়। এর পরের কয়েক দিন কায়রো ও এর আশপাশের যুদ্ধে তূমান বে পরাজিত হয় ও তাকে শহরের দরজায় হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

সেলিম কায়রোতে ছয় মাস অতিবাহিত করে মিশরের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। এরপর ১৫১৭ সালের গভর্নর জেনারেলের হাতে শাসনভার অর্পণ করে পুনরায় ইস্তাম্বুলে ফিরে যান।

এই অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যে কায়রো থেকে মহানবীর পরিচ্ছদ ও স্তম্ভ ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আর এর মাধ্যমে সুলতান মক্কা, মদিনা ও হজ্বে যাওয়ার পথসমূহ সাধারণভাবে ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব পেয়ে যান। এর মাধ্যমে সুলতান নিজেকে ইসলামের প্রধান বলে দাবি করা শুরু করেন। পূর্বে মামলুক সুলতানরা এ দাবি করত। এভাবে সুলতান সেলিম সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী প্রভুতে পরিণত হন। তাত্ত্বিকভাবে বাকি সবাই তাঁর শাসনাতলে প্রজা হয়ে যায়।

এর দুইবছর পরে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে সুলতান মারা যান। জীবিত থাকাকালীন বিশাল শরীর। নিষ্ঠুর চরিত্র, ভয় সৃষ্টিকারী বড় বড় চোখের সুলতান সেলিম মানবজীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিলেন।

এ কারণে সুলতান সেলিমের প্রধান উজিরদের জীবন ও কর্মজীবন ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। মোট প্রধান উজিরদের মাঝে সাতজন অন্যান্য কর্মচারী ও জেনারেলসহ মৃত্যুবরণ করেন সুলতানের নির্দেশে। এই কারণে প্রধান উজিরদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল নিজেদের শেষ ইচ্ছাপত্র সাথে নিয়ে ঘোরা; কেননা সুলতানের মর্জি হলেই তাদের প্রাণ চলে যেত।

চরিত্রের এতসব নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও সুলতান সেলিম ছিলেন শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি। সাহিত্যের অনুরাগী ও কবিতার মেধা ছিল তাঁর। স্বাধীনভাবে বিদ্বান ব্যক্তিদের দেখভাল করতেন সুলতান। নিজের সাথে যুদ্ধের সময়েও ইতিহাসবিদ ও কবিদের সাথে নিয়ে যেতেন।

মোটের ওপরে তিনি একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। ইসলামিক এশিয়া ও খ্রিস্টান ইউরোপে নিজের পূর্বপুরুষদের জয় করা সাম্রাজ্যের শক্তির ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি এক দশকেরও কম সময়ে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দ্বিগুণ করেছেন।
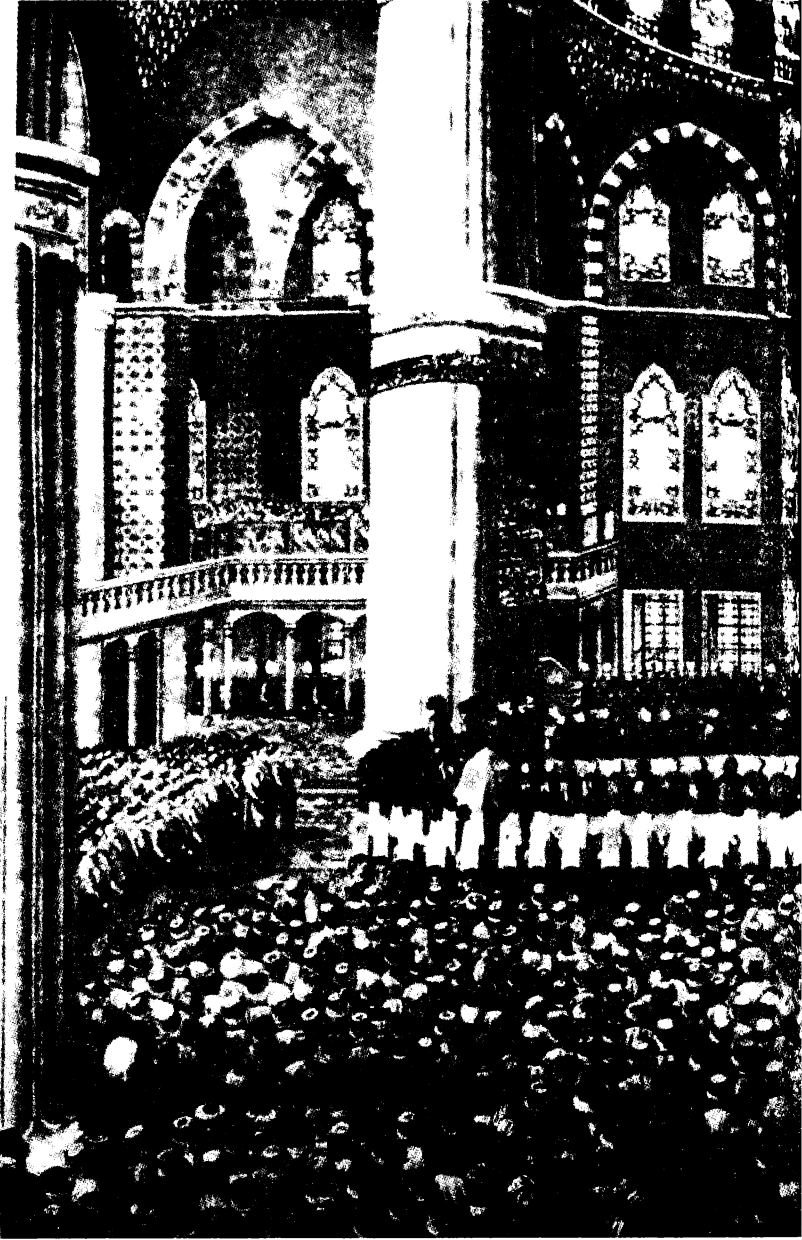
সুলতান আহমেদ মসজিদে (নীল) নবীজির জন্মদিন উৎসব উদ্‌যাপনের চিত্র। এছাড়া এর আভ্যন্তরীণ নকশা ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে এ চিত্রে।

॥ ১২ ॥
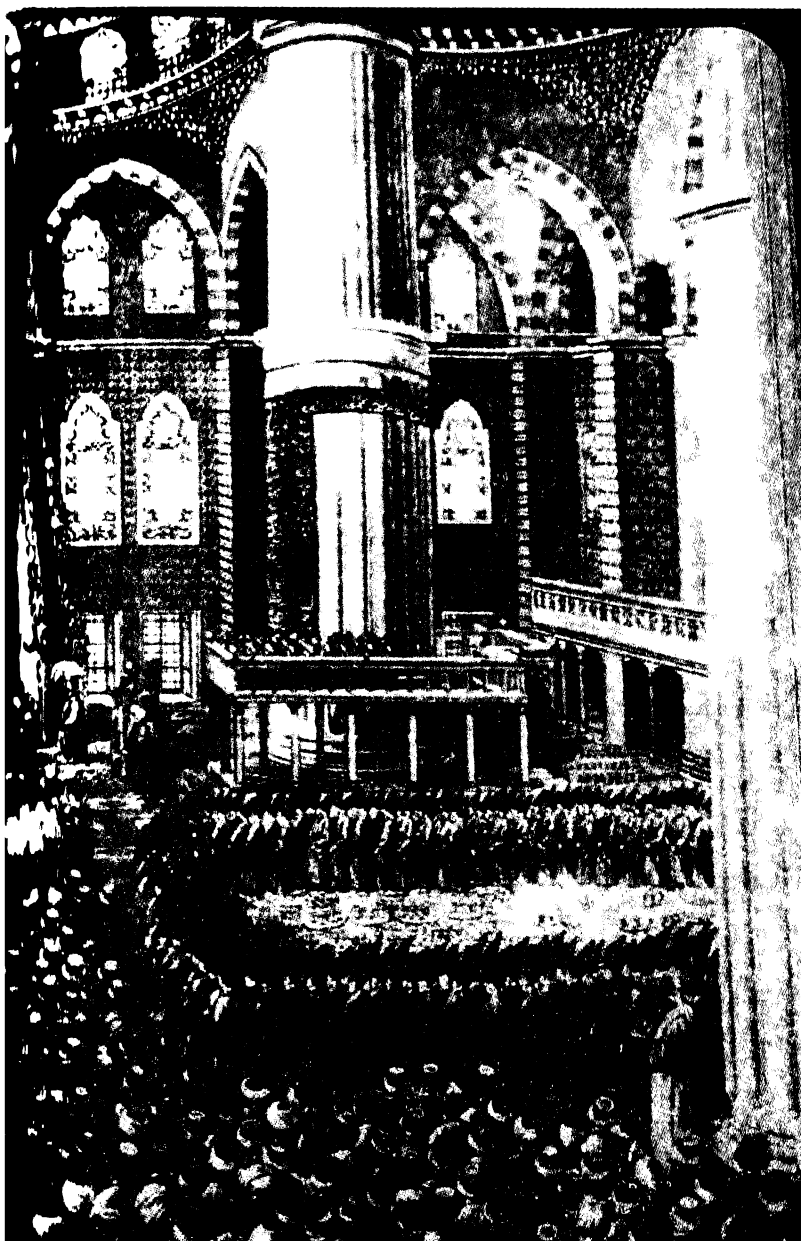
কাকতালীয়ভাবে অটোমান সালতানাতে সুলেমানের অভিষেক এমন এক সময়ে ঘটে যখন ইউরোপের সভ্যতাতেও নতুন এক দিক উন্মোচিত হয়েছিল। রেনেসাঁর সোনালি আলো এসে ইউরোপ থেকে মধ্যযুগীয় অন্ধকার ও মৃতপ্রায় সামন্তবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহকে হটিয়ে দেয়। ব্যক্তিগত ক্ষমতার স্পর্শে অসাধারণ সব নেতার কল্যাণে সভ্য সব শক্তির উত্থান ঘটে এ সময়ে ইউরোপে। তাই ষোড়শ শতক হচ্ছে পঞ্চম চার্লস অষ্টম হেনরি, টিউডর এবং দ্বিতীয় সলেমান" নামে খ্যাত ছাব্বিশ বছর বয়সী সুলতান সুলেমানের সময়।

পশ্চিমে সুলতান সুলেমান হয়ে উঠেছিলেন খ্রিস্টান শক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। আর ইসলামিক পূর্বে মহাগৌরবই ছিল তাঁর ভাগ্যলিপি। দশম অটোমান সুলতান হিসেবে মুসলিমদের চোখে দশ সংখ্যার সকল আশীর্বাদ বহন করছিলেন তিনি– মানুষের হাত-পায়ের দশ আঙুল– দশ অনুভূতি, কোরআনের দশ অংশ, পেন্টাটিউকের দশ আজ্ঞা, নবীর দশ শিষ্য ইসলামিয় স্বর্গের দশ আকাশ এবং পথপ্রদর্শক দশ আত্মা। প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতিটি শতকের শুরুতে একজন মহামানব জন্মগ্রহণ করেন, যিনি নিজের আলোয় সবাইকে আলোকিত করেন। আর ষোড়শ শতক তাই স্বর্গের দেবদূত সুলতান সুলেমানের।

কনস্টান্টিনোপলের পতন ও সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের বিভিন্ন বিজয় অভিযানের পর পশ্চিমা বিশ্ব তুর্কিদের রুখতে বিভিন্ন কৌশল ভাবতে থাকে। সামরিকভাবেই নয়, বরঞ্চ কূটনৈতিকভাবে এ চিন্তা শুরু করে তারা। ইটালিয়ান রাষ্ট্রসমূহের মাঝে কূটনীতির ক্ষেত্রে অটোমান আক্রমণের হুমকি, গোপন অটোমান মৈত্রী জোট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে কাজ করে।

ক্রুসেডীয় গাঁথায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে পবিত্র শহর কোলন পর্যন্ত অগ্রসর হবে। তারপর এক মহান নেতা পোপ নয়, তাদেরকে বিতাড়িত করবে। যখন পঞ্চশ চার্লস পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হন, মনে করা হতে থাকে যে তিনিই সে নেতা।

পঞ্চম চার্লসের প্রধান শত্রু ছিল ফ্রান্সের প্রথম ফ্রান্সিস। চার্লসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে পুরো পশ্চিম খ্রিস্টান রাজ্যসমূহকে একত্রিত করা। কিন্তু এই মনোবাসনা পূরণের পথে ফ্রান্স ছিল একমাত্র বাধা। প্রধান দুটি খ্রিস্টান শক্তির মাঝে ক্ষমতার এই দ্বন্দ্ব মুসলিম তুর্কিকে শুধু সাধারণ শত্রু নয়, বরঞ্চ সম্ভাবনাময় মিত্রতে পরিণত করে।

ফ্রান্সিস ঠিক সে কাজটিই করে। প্রথম দিকে পোপের কথানুযায়ী তুর্কিদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনা করলেও শীঘ্রই হাবসবুর্গ সাম্রাজ্য, রাজা পঞ্চম চার্লসের বিরুদ্ধে তুর্কিদের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলে ফ্রান্সিস। উভয়ের শত্রুই

ছিল এই হাবসবুর্গ সাম্রাজ্য। প্রথম দিকে ফ্রান্সিস এ মৈত্রী জোট গোপনে রাখলেও নানা উত্থান-পতন ও সম্পর্কের উন্নতি অবনতির–পরও জোট টিকে ছিল পরবর্তী তিনশ বছর পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক শক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে চলার জন্য অটোমানরা এক ধরনের গোয়েন্দা কার্যক্রমের উন্নতি ঘটিয়েছিল। এর মাধ্যমে সুলতান সুলেমান পশ্চিমা ইউরোপের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক খবর লাভ করতেন। অটোমানদের প্রধান তথ্য সরবরাহকারী ছিল ভেনেশীয়। সুলতানের কোর্টে তাদের নিয়মিত কূটনৈতিক যাতায়াত ছিল। একই ভাবে সুলতানের চরিত্র ও কার্যবিধি সম্পর্কে পশ্চিমে সংবাদ প্রেরণ করত তারা।

ইস্তাম্বুলের প্রাসাদ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করা সুলতান সুলেমান তরুণ বয়স থেকেই সভ্য-ভদ্র ছিলেন, কোর্টের নিয়ম-কানুন পালন করতেন। ইস্তাম্বুল ও আড্রিয়ানোপলের জনগণও ছিলেন তাঁর প্রতি স্নেহশীল ও শ্রদ্ধাশীল।

এছাড়াও তরুণ বয়সেই তিনটি প্রদেশের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সুলতান প্রশাসনিক বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে ছিলেন। এভাবেই বাস্তব মেধাসম্পন্ন হয়ে একজন দেশনেতায় পরিণত হয়েছিলেন সুলতান। সংস্কৃতিমনা সুলতান রেনেসাঁর সময়ে জন্মগ্রহণ করে এর যোগ্য নেতা হয়ে উঠেছিলেন। ধর্মীয় দিক থেকেও তিনি ছিলেন সহনশীল। দয়াশীল স্বভাবের সুলতানের মাঝে পিতার মতো ধর্ম উন্মাদনা ছিল না। নিজের গাজী পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সুলতান নিজের রাজত্বকালের শুরু থেকেই পবিত্র যোদ্ধা হিসেবে নিজের সামরিক শক্তিকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার প্রতি বদ্ধপরিকর ছিলেন। সুলতান সুলেমান ইস্কান্দারের ন্যায় পূর্ব ও পশ্চিমের ভূমি ও মানুষকে একত্রিত করার উচ্ছাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। বলতে গেলে প্রায় একটি বিশ্ব সাম্রাজ্যের পিছু করতে করতে সুলতান সুলেমান বর্তমান অটোমান অঞ্চল পার হয়ে মধ্য ইউরোপের ঠিক মাঝখানে প্রবেশ শুরু করেন।

এখানে এসে সুলতান সম্রাট চার্লসের অঞ্চলসমূহে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা ও পরাজিত করার মাধ্যমে দখল কাজের সম্মুখীন হয়।

সম্রাটের বিরুদ্ধে সামরিক ও নৌ-ক্ষেত্রে আক্রমণ পরিচালনা করতে গিয়ে হাঙ্গেরি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুলতান সুলেমানের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যে হয়ে দাঁড়ায় বেলগ্রেড এবং রোডস্ আইল্যান্ড অর্জন করা, যা বিজয়ী বীর মাহমুদও পারেননি।

হাবসবুর্গ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাঝে হাঙ্গেরির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বেলগ্রেড শহর দখল করার জন্য সুলতান একটি সংক্ষিপ্ত অভিযানের মাধ্যমে শহরটিকে ঘিরে ধরে ভারী গোলাবর্ষণের নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কে

নিজের ডায়েরিতে সুলতান লিখে গেছেন "শত্রুরা শহরের প্রতিরক্ষা কাজ ছেড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সিটাডেলে পালিয়ে যায়।" শহরের দেয়ালের নিচে রাখা মাইন বিস্ফোরণ হলে দুর্গের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। হাঙ্গেরিয় সরকার কোনো সাহায্যই করেনি নিজের লোকদের। এরপর জানিসারিসদের হাতে বেলগ্রেড শহরের দুর্গ রক্ষার ভার দিয়ে সুলতান ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন বিজয়ীর বেশে। এরপর আরো চারটি বছর কেটে যায় পুনরায় অভিযান পরিচালনা করতে।

এরপর মধ্য ইউরোপ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পূর্ব ভূমধ্য সাগরের দিকে দৃষ্টি দেন সুলতান এখানে ইস্তাম্বুল ও নতুন অটোমান অঞ্চল সিরিয়া ও মিশরের মাঝে অবস্থিত অটোমান সমুদ্র যোগাযোগ ব্যবস্থার মাঝে অবস্থিত রোডস্ আইল্যান্ড এই অঞ্চলের পেশাদার জলদস্যুরা আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে অটোমান বাণিজ্যের পথে নিয়মিত হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। এছাড়াও মিশরে কাঠ ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে যাওয়া তুর্কি জাহাজসমূহে আক্রমণ, সুয়েজ হয়ে মক্কায় তীর্থযাত্রায় বাধা, সিরিয়াতে অটোমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবে উসকানি ও সর্মথন প্রদান করতে থাকে রোডস আইল্যান্ড।

এতসব কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান সুলেমান রোডস আইল্যান্ড দখলে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণে পাঠান প্রায় চারশ জাহাজের এক বিশাল বহর। এছাড়াও শত হাজার সৈন্যের সেনাবাহিনী নিয়ে সুলতান নিজে এশিয়া মাইনরের উচ্চভূমি পার হয়ে আইল্যান্ডমুখী উপকূলে এগিয়ে যান।

রোডস্ আইলান্ডের নাইটদের নতুন নেতা ছিলেন ভিলিয়ারস অ্যাডাম, কর্মঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং সাহসী একজন মানুষ; যিনি খ্রিস্টান বিশ্বাসের প্রতি পুরোপুরি উৎসর্গীকৃত। কোরআনের ঐতিহ্য অনুযায়ী সুলতান আক্রমণ করার পূর্বে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব করেন অ্যাডামের কাছে। এর উত্তরে অ্যাডাম নিজের দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন শুধু।

এ দুর্গে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় সাতশ নাইট সৈন্য এসে জড়ো হয়। রোডসে্ জড়ো হওয়া এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যা। এর পাশাপাশি অ্যাডাম ক্রেট থেকে পাঁচশ তীরন্দাজ নিয়ে আসেন জাহাজের মালবাহকের ছদ্মবেশে।

কিন্তু যেহেতু এটি একটি অবরোধ আক্রমণ হতে যাচ্ছে, তাই গোলন্দাজ সৈন্যরাই হয়ে ওঠে প্রধান। তুর্কি প্রকৌশলীরা বেশ বিখ্যাত ছিল এবং তাদের গোলন্দাজ বাহিনীও ছিল বিশ্বসেরা। এর ওপরে আবার রোডস্ আইল্যান্ডে সুলেমানের ইচ্ছা ছিল গান পাউডারের মাধ্যমে বিপুল হারে মাইন বিস্ফোরণ করা।

জাহাজবহর এসে পৌঁছালে তুর্কিরা নিজেদের প্রকৌশলীদের তীরে নামিয়ে দেয়, তারা এক মাস ধরে পরিদর্শন করে নিজেদের ব্যাটারির জন্য জায়গা

নির্বাচন করে, জুলাইয়ের শেষে ১৫২২ সালে সুলতানের সেনাবাহিনী প্রধান পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে দেয়ালের পাশে অবস্থান নেয়। এভাবে দক্ষিণমুখী হয়ে দুর্গ ঘিরে ধরে তুর্কি বাহিনী। এর পরের দিন শুরু হয় ভয়ানক গোলাবর্ষণ। এক মাস ধরে এভাবে পাল্টাপাল্টি গোলাবর্ষণ চলতে থাকে।

কিন্তু এরই মাঝে তুর্কি বাহিনী দেয়ালের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য ও দেয়ালে মাইন পুঁতে রাখার জন্য গর্ত ও টানেল তৈরি করে চলে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতে এই কাজ মোটামুটি শেষ হয়। যখন প্রয়োজনীয় সৈন্য পার হওয়ার মতো দেয়ালের নিচে গর্ত করার জন্য টানেল তৈরি হয়। কিন্তু রোডস্ আইল্যান্ডে-ও একজন ভেনেশীয় দক্ষ মাইন বিশেষজ্ঞ ছিল। যার সাহায্যে নাইটেরাও টানেল তৈরি করে। বেশির ভাগ সময় দেখা যায় তুর্কিদের ও নাইটদের টানেল একে অন্যের প্রায় পাশাপাশি বা এক চুল পরিমাণ দূরত্ব দিয়ে গেছে।

সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখে সিরিজ আক্রমণ শুরু করে তুর্কিরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। ছয় ঘণ্টাব্যাপী এ ধর্ম-উন্মাদনাময় যুদ্ধের কথা ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। তুর্কিদের মনোবল দমে যায়; শীতকালও আসন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সুলতান আর কোনো আক্রমণের সাহস করেননি।

কিন্তু নাইটরাও হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। তুর্কিদের তুলনায় তাদের ক্ষয়-ক্ষতি কম হলেও তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল। অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ কমে এসেছিল। মোটের ওপরে রোডস্ আইল্যান্ডের অনেকেই সম্মান বাঁচিয়ে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে আত্মসমর্পণের কথা বলতে থাকে। কেননা মুসলিম বিশ্বে এ সময়ে অটোমানদের হারানোর মতো আর কোনো শক্তি ছিল না। তদুপরিসমূহ পথেও অটোমানদের শক্তি দিনে দিনেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আধুনিক গোলন্দাজ বাহিনীর বদৌলতে অটোমান সেনাবাহিনী হয়ে উঠেছিল অপরাজেয়। কিন্তু ভাবুক প্রকৃতির অ্যাডাম ক্রুসেডের রোমান্টিক স্বপ্ন দেখতে থাকে। তাই আবারো অবিশ্বাসী তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করে খ্রিস্টানদের বিজয় সুনিশ্চিত করার কথা ভাবতে থাকে অ্যাডাম।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখে সুলতান শহরের বাইরে একটি গির্জার টাওয়ারের ওপর আত্মসমর্পণের বিষয়ও আশয় নিয়ে কথা বলার উদ্দেশ্যে সাদা পতাকা উত্তোলন করেন। এর উত্তরে অ্যাডাম কাউন্সিলের সভা ডাকেন ও সবার সম্মতিক্রমে সাদা পাতাকা উত্তোলিত হলে তিন দিনের যুদ্ধবিরতি হয়। সুলতান দূত মারফত নিজের কথা ব্যক্ত করেন। যার মধ্যে ছিল, অধিবাসীদের মাঝে যারা দেশ ত্যাগ করতে চায়, তারা বহনযোগ্য সম্পত্তি নিয়ে যেতে পারবে, যারা দেশে থেকে যেতে চায় তারা বাড়িঘর ও সম্পত্তি, ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে ও পাঁচ বছর পর্যন্ত করের আওতামুক্ত থাকবে।

নানা বির্তকের পর কাউন্সিলের সভাসদবৃন্দ একমত হয়ে সুলতানের দাবি মেনে নেয়।

এভাবে বড়দিনের সময়ে ১৪৫ দিনের অবরোধ শেষে রোডস্ দখলীকরণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে শহরে তুর্কিরা প্রবেশ করার পর অ্যাডাম সুলতানের কাছে নতি স্বীকার করেন। সুলতান যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন তার প্রতি। এরপর ১৫২৩ সালে পহেলা জানুয়ারি অ্যাডাম চিরতরে রোডস্ আইল্যান্ড ছেড়ে চলে যান। এর মাধ্যমে আজিয়ান ও ভূমধ্যসাগরে তুর্কিদের নৌপথের হুমকি অপসারিত হয়।

॥ ১৩ ॥

সফল দুটি অভিযান শেষ করার পর তরুণ সুলতান সুলেমান তৃতীয় অভিযান শুরু করার পূর্বে তিনটি গ্রীষ্ম পার করে দেন অবকাশ যাপনের মাধ্যমে। তবে এর মাঝে নিজের সরকারের আভ্যন্তরীণ উন্নতি নিয়ে কাজ করেন তিনি। সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথমবারের মতো আড্রিয়ানোপল ভ্রমণ করে দাবা খেলায় মেতে উঠেন সুলতান। কিন্তু এরই পাশাপাশি মিশরে চলমান অটোমান গভর্নরের বিদ্রোহ নিয়েও মাথা ঘামান। নিজের প্রধান উজির ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠান কায়রোতে বিদ্রোহ দমন করে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য।

ইস্তাম্বুলে ফিরে আসার পর আবার এক শ্রেণীর বিদ্রোহ জানিসারিসদের মোকাবেলা করতে হয় সুলতানকে। এসব অবাধ্য ও নানা ধরনের সুবিধাভোগী জানিসারিসরা প্রতিবছরে অভিযান করতে উৎসাহী ছিল। এর ফলে তাদের যুদ্ধ মনোভাবের প্রশান্তিসহ লুটের সম্ভাবনাও থাকত। এই সমস্যা অনেক দিন ধরে এক সুলতানের রাজত্ব থেকে আরেক সুলতানের রাজত্বকালে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। যুদ্ধ ছাড়া শান্তির সময়ে অলস সময় কাটিয়ে জানিসারিসরা ধীরে ধীরে ভয়ংকর লোলুপ হয়ে উঠতে থাকে।

১৫২৫ সালের বসন্তে এসে জানিসারিসরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়। জিউদের বাসভবসন ও অন্যান্য উচ্চপর্দস্থ কর্মচারীদের বাসভবন তছনছ করে দেয়। এদের একটি দল সুলতানের সামনাসামনি লড়তে গেলে সুলতান নিজের হাতে তিনজনকে হত্যা করেন, কিন্তু বাকিরা তাঁর প্রাণ সংশয় করতে চাইলে সুলতান সরে যান। এরপর কঠোর হাতে এ বিদ্রোহ দমন করেন জানিসারিসদের আঘাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে। এছাড়াও ইব্রাহিম পাশাকে কায়রো থেকে ডেকে প্রধান জেনারেল পদে নিয়োগ দিয়ে ও পরের বছরই হাঙ্গেরিতে অভিযান চালানোর নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ প্রশমিত করেন সুলতান।

সুলতান সুলেমানের রাজত্বকালে ইব্রাহিম পাশা একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। খ্রিস্টান গ্রিক বংশোদ্ভূত ইব্রাহিম নিজেকে সুলেমানের ন্যায় একই বছরে ও একই সপ্তাহে জন্মগ্রহণকারী রূপে দাবি করত। এক গরিব বিধবার কাছে বড় হওয়া ও লেখাপড়া শেখা ইব্রাহিম সুলতান সুলেমানের ব্যক্তিগত বালক ভৃত্য থেকে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়।

সুলতানের সাথে একই বাসভবনে বাস করত ও একই সাথে খাবার খেত ইব্রাহিম পাশা। এছাড়াও আমোদ-প্রমোদসহ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সব পরিকল্পনা সুলতানের সহচর ছিল ইব্রাহিম পাশা।

বিশাল খরচ ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইব্রাহিম পাশার বিবাহ দেন সুলতান ও পাশার বধূকে নিজের ভগ্নীরূপে গ্রহণ করেন। এত দ্রুত ইব্রাহিম পাশা ক্ষমতা লাভ করেছিল যে নিজেও খানিকটা সচেতন হয়ে একবার সুলতানকে অনুরোধ করে যেন তাকে এতটা উচ্চপদ না দেয়া হয়। কিন্তু সুলতান ও বিষয়ে হেসে উত্তর দেন যে তাঁর রাজত্বকালে ইব্রাহিম পাশার কোনো ভয় নেই, যে অভিযোগই আসুক না কেন। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে একজন ইতিহাসবিদ এ সম্পর্কে লিখে গেছেন যে, "রাজার অবস্থা, যিনি মানুষ এবং পরিবর্তনশীল এবং তাঁর প্রিয় পাত্ররা যারা অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ, এসবই সুলেমানকে প্রতিজ্ঞা ভাঙার পেছনে ও ইব্রাহিমের বিশ্বস্ততা ও সততা হারানোর পেছনে দায়ী।"

জানিসারিসদের বিদ্রোহের কারণে হয়তো সুলতান সুলেমান তড়িঘড়ি করে হাঙ্গেরি হাবসবুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এর পেছনে আরেকটি কারণও ছিল। সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসকে আটক করলে পর ফ্রান্সিস মাদ্রিদের কারাগার থেকে গোপনে সুলতানকে এক পত্র লেখে ১৫২৫ সালে। এক দূতের জুতার সোলের সাথে আটকে পাঠানো এই পত্র সুলতানের মনোবাসনার সাথে খাপে খাপে মিলে যায়।

বেলগ্রেড শহরের পতনের পর থেকেই হাঙ্গেরিয় ও তুর্কিদের মাঝে সীমান্তে অবিরাম সংঘর্ষ চলে আসছে। এভাবে ১৫২৬ সালের এপ্রিল মাসের ২৩ তারিখে শত হাজার সৈন্যের দল নিয়ে সুলতান সুলেমান তাঁর নির্দেশে বানানো সাভা ও দ্রাভার ব্রিজ অতিক্রম করে দক্ষিণে অগ্রসর হয়। এই সৈন্যদলের অর্ধেক ছিল নিয়মিত সৈন্য, জানিসারিস ও গোলন্দাজ বাহিনী ও বাকি অর্ধেক ছিল অনিয়মিত কেবল যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হওয়া সৈন্য। সুলতান সুলেমান ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করে সকলকে একত্রিত করে নিজে মধ্যমণি হয়ে এগিয়ে চলেন সভাসদদের নিয়ে।

পথিমধ্যে সৈন্যদের মোকাবেলা করতে হয় বৃষ্টি, বন্যাসহ গ্রীষ্মের প্রতিকূল আবহাওয়ার। কিন্তু পুরো যাত্রাজুড়ে যখনি কোনো সমস্যার উদ্রেগ হয়েছে,

সুলতান সুলেমান ইব্রাহিম পাশার ওপর নির্ভর করেছেন আত্মবিশ্বাসের সাথে। কিন্তু সৈন্যরা বেলগ্রেডের কাছে পৌঁছালে দেখা যায় সাভার সেতু তুলে ফেলে দানিয়ুবের উত্তর ও দক্ষিণ মুখে শত্রুরা অবস্থান নিয়েছে। সুলেমান ইব্রাহিম পাশাকে নির্দেশ দেন শহর ও এর দুর্গসমূহ দখল করতে। কিছু সংখ্যক সংঘর্ষের শেষে ইব্রাহিম এ কাজে সফলতা লাভ করে।

এরপর সুলেমান ও তাঁর সৈন্যদল দ্রাভা নদীর দক্ষিণে নদী বরাবর এগিয়ে চলেন। কিন্তু একের এক এক সীমান্ত দুর্গ তুর্কিরা দখল করে নেওয়ায় ও রসদের অভাবে হাঙ্গেরিয়রা একত্রিত হয়ে কোনো আক্রমণ পরিকল্পনা করতে পারেনি। ইসেক-এর অধিবাসীরা প্রায় নিজেদের ইচ্ছাতেই সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করলে সুলতান নৌকা দিয়ে সেতু বানানোর নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মত দেন যে এ কাজে অন্তত তিন মাস লেগে যাবে। কিন্তু প্রধান উজিরের বুদ্ধিমত্তার ফলে তিন দিনে সম্পন্ন হয় কাজ। সৈন্যরা এর ওপর দিয়ে পার হওয়ার সাথে সাথে সেতুটি ধ্বংস করে দেয়া হয় সুলতানের নির্দেশে। এতে করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থেকে যুদ্ধ করবে সৈন্যরা' পালিয়ে বা পিছিয়ে আসার কোনো মনোবৃত্তি থাকবে না তাদের মাঝে।

হাঙ্গেরিয়রা এই ফাঁকে মোহাকের সমভূমিতে নিজেদের বাহিনী জড়ো করে। কিন্তু এতে তেমন একটা সুবিধা করতে পারে না হাঙ্গেরিয়রা। কেননা প্রোটেস্ট্যান্ট ডায়েটদের মাঝে অনেকেই সুলতান নয়, বরঞ্চ পোপকে নিজেদের বড় শত্রু হিসেবে বিবেচনা করত। এর ফলে ডায়েট অভ ওয়ার্মস ও ডায়েট অভ স্পেয়ার বেলগ্রেড শহর রক্ষার্থে মোহাকে সৈন্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

তাই যুদ্ধক্ষেত্রে হাঙ্গেরিয় সেনাপ্রধান বৃদা পর্যন্ত পিছিয়ে তুর্কিদের ও তাদের অনুসরণ করানোর পরিকল্পনা করে। কিন্তু হাঙ্গেরিয়দের বেশির ভাগই অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে তুর্কিদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ সামরিক বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকে।

যুদ্ধনীতির মতো যুদ্ধ কৌশলে ক্ষেত্রে ও অধৈর্য হয়ে দানিয়ুবের দক্ষিণ প্রান্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যদল রাজা লুইসের নেতৃত্বে সরাসরি তুর্কি লাইনের মাঝখানে আঘাত হানে। এতে সফল হয়ে হাঙ্গেরির সৈন্যরা দল বেঁধে আক্রমণ করে। কিন্তু এটি ছিল তুর্কিদের রচিত ছলনা। তুর্কিরা তাদের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনে পাহাড়ের মাঝে নিজেদের প্রধান সৈন্যদের লুকিয়ে রেখেছিল। এর ফলে অগ্রগামী হাঙ্গেরিয় সৈন্যরা সরাসরি জানিসারিস ও সুলতানের সৈন্যদলের হাতে গিয়ে পড়ে। ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হয়। এভাবে মাত্র দেড় ঘণ্টার মাঝে যুদ্ধে জয় লাভ করে তুর্কিরা।

হাঙ্গেরির রাজা যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন। যেহেতু তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না; তাই তাঁর রাজ্যেরও তাঁর সাথেই অবসান ঘটে।

সুলেমান রাজার মৃত্যুতে নিজের ভাব প্রকাশ করেন এভাবে—"আল্লাহ তাঁকে দয়া করুন আর তাদেরকে শাস্তি দেন; যারা তাঁর অনভিজ্ঞতার ফলে তাঁকে কুপথে পরিচালিত করেছে। জীবন এবং রাজত্বের স্বাদ গ্রহণের সময় এভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে; এটা আমার কখনোই ইচ্ছা ছিল না।"

এই যুদ্ধ জয়ের ফলে ইউরোপের মাঝে পরবর্তী দুই শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কিরা প্রধান শক্তি হিসেবে রাজত্ব করে। সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে সুলতান বুদাতে প্রবেশ করেন।

বুদা শহরজুড়ে আগুন লাগিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। শুধু রাজপ্রাসাদে সুলতান অবস্থান নেওয়ায়, প্রাসাদটি রক্ষা পায়। এখানে ইব্রাহিম পাশার সৈন্যদের কাছ থেকে সুলতান তাঁর সম্পদসমূহ গ্রহণ করেন। এর মাঝে ছিল ম্যাথিয়াসের ইউরোপ বিখ্যাত লাইব্রেরি; ডায়ানা, অ্যাপোলো ও হারকিউলিসের ব্রোঞ্জের মূর্তি ও বিজয়ী বীর সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের ফেলে যাওয়া দুটি বিশাল কামান।

এর পর সংগীত, শিকার ও আমোদ-প্রমোদ মেতে উঠেন সুলতান। গ্রীষ্মকাল থেকেই তাঁর সৈন্যরা দানিয়ুবের প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে যুদ্ধ করে আসছে। আর এখন শীতকাল আসন্ন হওয়ায় ও প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় নতুন জয় করা এ দেশ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও আনাতোলিয়াতে সুলতানের উপস্থিতি জরুরি হয়ে পড়ায় সুলতান শহর পুড়িয়ে দেওয়ার পর সৈন্যদের নিয়ে নদীর দক্ষিণ পাড় দিয়ে ঘরের দিকে যাত্রা করেন।

কিন্তু সুলতানের ছেড়ে যাওয়া হাঙ্গেরিতে রাজনৈতিক ও রাজবংশীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ঐ শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে আর্চডিউক ফার্দিনান্দ, সম্রাট পঞ্চম চার্লসের ভাই এবং রাজা লুইসের ভগ্নিপতি। তার বিরোধি হিসেবে আবির্ভাব ঘটে ট্রান্সসিলভানিয়ার শাসক রাজকুমার জন।

কিন্তু উভয়ের পরিকল্পনা সফল হওয়ার পেছনে প্রয়োজন পড়ে তুর্কি সহায়তার। এক্ষেত্রে জন ইস্তাম্বুলে দূত পাঠানোর পর সুলতান তার সাথে একটি চুক্তি করেন। এ চুক্তি মোতাবেক জন সুলতানের প্রজা-রাজায় পরিণত হয়ে বার্ষিক কর প্রদানে সম্মত হয়।

অন্যদিকে ফার্দিনান্দও ইস্তাম্বুলে দূত পাঠালে পর সুলতান তাদের দাবিতে ক্ষুব্ধ হয়ে সকলকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

এরপর সুলতান দানিয়ুব উপত্যকায় জনের সাহায্যার্থে তৃতীয় একটি অভিযানের পরিকল্পনা করেন। জার্মানি গাথা রচিত হয় এ উপলক্ষ্যে—

হাঙ্গেরি থেকে গেলেন
রাজা সরে;
পৌছালেন অস্ট্রিয়ায়

সুলতান প্রথম সুলেমান–ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ।

দিনের শেষে;
ব্যাভারিয়া হয়ে গেল
একেবারে হাতের কাছে;
এখান থেকে পৌছাবেন
অন্য কোনো রাজ্যে;
আর হতে পারে
শীঘ্রই সম্ভবত পৌছে যাবেন রাইনে।

১৫২৯ সালের মে মাসের ১০ তারিখে ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে পূর্বের তুলনায় বড় এক সেনাবাহিনী নিয়ে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করেন সুলতান সুলেমান। এরপর মোহাকের ভূমিতে জন এসে জড়ো হয় ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতানকে অভিবাদন জানাতে। সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখে সুলতান ভিয়েনার দেয়ালের কাছে পৌছান। শহরবাসী অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই দিগন্তজুড়ে পুড়ে যাওয়া গ্রামসমূহে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়েছিল। এর একটু পরেই দেয়ালজুড়ে মুসলিমদের সাদা তাঁবু দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে।

ভিয়েনার প্রতিরক্ষার জন্য ফার্দিনান্দ যথাযথ সৈন্য জড়ো করতে অসমর্থ হয়। আর তাই সৈন্য জোগাড়ের উদ্দেশ্যে ফার্দিনান্দ ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে থাকেন। অস্ট্রিয়াতে প্রতি দশজনের একজন সৈন্যদলে নাম লেখায়। কিন্তু এটি যথার্থ ছিল না। এছাড়াও জার্মানির রাজকুমার ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে ফার্দিনান্দকে। ফার্দিনান্দ ডায়েট অব স্পেয়ারেও সাহায্যের আকুতি জানালে শেষ পর্যন্ত প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকরা একত্রিত হয়ে সম্মতি প্রদান করে। এই কাজে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। এরই মাঝে বৃষ্টির কারণে সুলতানের বাহিনী পৌঁছাতে দেরি করে বিধায় তুর্কি আক্রমণের মাত্র তিন দিন আগে প্রায় বারো থেকে বিশ হাজারে উন্নীত হয় ভিয়েনার প্রতিরক্ষা সৈন্য সংখ্যা। এদের নেতৃত্বে ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইটালিয় সাহসী কাউন্ট নিকোলাস ভন সাম।

খুব দ্রুত কিন্তু দক্ষতার সাথে ভিয়েনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। শহরের মধ্যযুগীয় দেয়াল ছিল মাত্র ছয় ফিট পুরু; এর পাশাপাশি নতুন করে বিশ ফিট উঁচু দেয়াল তৈরি করা হয়। দেয়ালের গায়ে লাগোয়া বাড়িঘর ধ্বংস করে ফেলা হয়। এছাড়াও শত্রুর সম্ভাব্য নিশানা ধ্বংস করার জন্য কামানের রেঞ্জের আওতায় পড়ায় প্রায় আটশ বাড়িঘর নষ্ট করে ফেলা হয়। এর মাঝে শহর হাসপাতাল, গির্জা, আশ্রম, প্রাসাদ সবই ছিল। বিভিন্ন বাড়িঘরের ওপর থেকে দাহ্য ছাদ সরিয়ে ফেলা হয়। বৃদ্ধ লোক, মহিলা ও শিশুদেরকে শহরের

বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। যদিও পথিমধ্যে এদের বেশির ভাগই শক্রুদের হাতে পড়ে। এরপর যখন তুর্কিরা অবরোধ করে তখনো ফার্দিনান্দ ভিয়েনার বাইরে জার্মানিতে সৈন্য সংগ্রহের কাজ করছিল।

ভিয়েনাবাসীর ভাগ্যবশত বৃষ্টির কারণে সুলতান বাধ্য হয়েছিলেন ভারী অস্ত্রে সজ্জিত গোলন্দাজ বাহিনীকে পেছনে ফেলে আসতে। সুলতান নিজের সাথে হালকা কামান নিয়ে এসে মাইনের ওপর ভরসা রেখেছিলেন। গর্বভরে প্রচার করেছিলেন যে মাত্র তিন দিনের মাঝে সেন্ট মাইকেলের বার্ষিক উৎসবের সময়ে ভিয়েনাতে সকালের নাশতা করবেন; এমনভাবে শহরটি ধ্বংস করবেন যেন এটির কোনো কালে অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে সেন্ট মাইকেলের পর্ব দিনে অবিরাম বর্ষণের ফলে তুর্কিরা তাদের হালকা তাঁবুতে থেকে নাস্তানাবুদ হতে থাকে শুধু। এক বন্দিকে দিয়ে সুলতানের কাছে ভিয়েনা থেকে খবর পাঠানো হয় যে তাঁর নাশতা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাই দেয়ালের ওপর থেকে আসা গুলির আওয়াজেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তুর্কি সৈন্যদের মাঝে বন্দুকধারীরা এতটাই দক্ষ ছিল যে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে কেউই মাথা তুলতে পারছিল না দেয়ালের ওপাশে। তীরন্দাজরা যত্রতত্র এমনভাবে তীর মারছিল যে শহরবাসীর রাস্তায় বের হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বরঞ্চ স্মারক চিহ্ন হিসেবে দামি কাপড় এমনকি মুক্তা পর্যন্ত লাগানো তীর সংগ্রহ শুরু করে দেয় ভিয়েনাবাসী। এছাড়া মাইন ফাটিয়ে ও দেয়ালের গায়ে ছিদ্র করতে থাকে তুর্কিরা। কিন্তু ভিয়েনার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের সাহস এতে কিছুমাত্র কমে না, বৈ বাড়তে থাকে।

পুরো যুদ্ধ সুলতান সুলেমান নিজের কার্পেটে মোড়া দামি রত্ন দিয়ে সাজানো তাঁবু থেকে জরিপ করতে থাকেন। এখানে খ্রিস্টান বন্দিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তুর্কি কাপড় ও মুদ্রা উপহার দিয়ে শহরে ফেরত পাঠান সুলতান শহরবাসীর কাছে নানা হুমকি অথবা প্রতিজ্ঞাসমূহ প্রচার করার জন্য। কিন্তু এতে কোনো ফল হয় না উপরন্তু শহরবাসী "সুলতান মানুষ নয়, শয়তান" নামে গান জুড়ে দেয়।

অক্টোবর মাসের ১২ তারিখে সন্ধ্যায় সুলতানের তাঁবুতে যুদ্ধ কমিটির সভায় অধিকাংশের মত নিয়ে ইব্রাহিম পাশা জানায় যে অবরোধ কাজ তুলে নিলেই ভালো হবে। কেননা শীত এসে গেছে, সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে, রসদ কমে যাচ্ছে। বিস্তর আলোচনার পর চতুর্থ ও সবশেষ বড় একটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এই আক্রমণ শুরু হয় জানিসারিসরা ও সুলতানের সেনাবাহিনীর বাছাই করা সৈন্যরা অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে

গেলেও ভিয়েনার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাঙতে পারে না তারা। বরঞ্চ তুর্কিরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

এভাবে মধ্য অক্টোবরে এসে শেষ আক্রমণটি ব্যর্থ হয়। সুলতান সুলেমান অবরোধ তুলে নিয়ে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন। তুর্কি সৈন্যরা নিজেদের তাঁবু ও বন্দিদের আগুনে পুড়িয়ে দেয়। শুধু কম বয়সী বন্দি যারা দাস বাজারে বিক্রিযোগ্য; তারাই প্রাণে বেঁচে যায়। ভিয়েনাতে বিজয়ের ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে এত দিন পর।

প্রথমবারের মতো সুলতান সুলেমান পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু বুদাতে নিজের পাঁচ পুত্রের মুসলমানী করেন জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং এমন এক ভাব দেখাতে থাকেন, যেন, তিনি অস্ট্রিয়া নয় বরঞ্চ ফার্দিনান্দকে পরাজিত করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভীরু ফার্দিনান্দ তাঁর সামনে আসারই সাহস পায়নি।

বিশ্বের চোখে সুলতানের মুখ রক্ষা হয় যখন ইস্তাম্বুলে ফার্দিনান্দ দ্বিতীয়বারের মতো দূত পাঠিয়ে সুলতানের কাছে আবেদন করে বার্ষিক করের বিনিময়ে তাকে হাঙ্গেরির রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে ও জন-কে পরিত্যাগ করতে।

কিন্তু সুলতান এখনো সম্রাট চার্লসের মুণ্ডপাতের মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। ফলে ১৫৩২ সালের এপ্রিল মাসের ২৬ তারিখে সুলতান আবারো সেনা ও নৌবাহিনী নিয়ে দানিয়ুবের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে বেলগ্রেড পৌঁছানোর পূর্বে ফার্দিনান্দ আবারো শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কর প্রদান ও শর্তসাপেক্ষে জনকে স্বীকৃতি দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও সুলতান বুঝিয়ে দেন যে তাঁর প্রদান শত্রু সম্রাট চার্লস। সুলতান চার্লসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উত্তরে বলেন "চার্লস অনেক দিন আগেই তুর্কি প্রতিরোধের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আমিই সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি। যদি তিনি মহৎ হৃদয়ের হয়ে থাকেন, তাহলে বলো যুদ্ধক্ষেত্রে আমার জন্য অপেক্ষা করতে। এবং তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। যাই হোক যদি তিনি অপেক্ষা করতে রাজি না হন তাহলে বলো আমার সাম্রাজ্যে কর প্রেরণ করতে।"

এইবার সম্রাট নিজের জার্মান অঞ্চলে ফিরে গিয়ে তুর্কিরা আগে কখনো মোকাবেলা করেনি; এই বড় সেনাবাহিনী জড়ো করে। খ্রিস্টান এবং ইসলামের মাঝে এটি একটি মহাকাব্যিক যুদ্ধ হতে যাচ্ছে; এই চেতনা থেকে সৈন্যরা একত্রিত হয় তুর্কিদের বিরুদ্ধে। ১৫৩২ সালের জুন মাসে ন্যুরেমবার্গে সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতির চুক্তির মাধ্যমে ক্যাথলিক সম্রাট সমর্থনের বিনিময়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে মৈত্রী করেন।

এবারে সুলতান সুলেমান পূর্বের মতো সরাসরি ভিয়েনার দিকে না গিয়ে একদল অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনী পাঠিয়ে দেন শহরে সুলতানের আগমন ঘোষণা করার জন্য। আর সুলতান নিজে সেনাবাহিনী নিয়ে আরো দক্ষিণে উন্মুক্ত গ্রাম্য অঞ্চলে এগিয়ে যান। এখানে শহর থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণে কঠিন বাধার মুখোমুখি হন সুলতান। ক্রোয়েশীয় সেনাপ্রধান নিকোলাস। এর ফলে সুলতানের অগ্রযাত্রা বিলম্বিত হয়।

তুর্কি সৈন্যরা শহরের প্রতিরক্ষা দেয়াল ভেঙে দেয়ার জন্যে বারো বার পদক্ষেপ নিলেও ভিয়েনার সৈন্যরা কঠোর হাতে আক্রমণ প্রতিহত করে। তুর্কিদের পুঁতে রাখা মাইনেরও বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলা হয়। তুর্কিদের পরিখাগুলো পানিতে ভেসে যায়। তার পরেও ভিয়েনার সৈন্যরা আত্মসমর্পণে তীব্র প্রতিবাদ জানালে মুখরক্ষার জন্য ইব্রাহিম পাশা ভিয়েনার সৈন্যদের বীরত্বের প্রশংসা করে কাগজের ওপর আত্মসমর্পণে রাজি করান।

এভাবে করে তুর্কিদের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের অপচয় হয় আর আবহাওয়া আরো খারাপতর হতে থাকে। সুলেমান তখনো ভিয়েনাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাই এ কথা প্রচার করে দেন যে তিনি শহর নয়; স্বয়ং সম্রাটকেই খুঁজছেন। কিন্তু চার্লস এসময় দুইশ মাইল দূরে রাতিসবনে সুরক্ষিত দুর্গে ছিলেন। তাই সুলতান সম্রাটের শক্তিশালী পাহারার চিন্তা করে নিজের বাড়ির পথ ধরেন। নিজেকে তৃপ্ত করার জন্য পথিমধ্যে বিশাল আকারের ধ্বংসযজ্ঞ চালান সুলতান ও তাঁর বাহিনী।

অবশেষে সময় আসে দুপক্ষের মাঝে সমঝোতা করে শান্তি স্থাপন করার। ফার্দিনান্দের সাথে সুলতান পিতা পুত্রের সম্পর্ক স্থাপন করে গর্ব বজায় রাখেন। হাঙ্গেরি এবং এর দুর্গসমূহ জন ও ফার্দিনান্দের মাঝে ভাগ হয়ে উভয়ে নিজ নিজ অংশের রাজা হয়ে শাসন করা শুরু করে।

এই ঘটনা ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সুলতান সুলেমান ভিয়েনা থেকে ইউরোপের মাঝে আর অগ্রসর হতে পারেননি। এই ব্যর্থতার পেছনে ইউরোপীয় সৈন্যদের দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা যেমন কাজ করেছে তেমনি পরিবেশ ও আবহাওয়াও বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। সাতশ মাইলব্যাপী ছিল বসফরাস থেকে ইউরোপ পর্যন্ত সুলতানের যোগাযোগ ব্যবস্থা, দানিয়ুব উপত্যকার বৈরী আবহাওয়া, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান সুলতানের অভিযানের ব্যর্থতার পেছনে দায়ী।

অন্যদিকে ইউরোপীয় সৈন্যরাও তুর্কি সৈন্যদের সুশৃঙ্খলতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। কেননা কোনো বর্বর গোত্রীয় সৈন্য নয়; বরঞ্চ পশ্চিমের আধুনিক সেনাবাহিনীর সমস্ত গুণাগুণ ছিল তুর্কি বাহিনীর মাঝে।

॥ ১৪ ॥

তরুণ সুলতান সুলেমান সিংহাসনে অধিগ্রহণের পর কার্ডিনাল হোলস্ রাজা অষ্টম হেনরির কাছে তাঁর সম্পর্কে এক পত্রে লিখে যে, "সুলতান সুলেমান মাত্র পঁচিশ বছর বয়সী এবং সুবিবেচক, কিন্তু এ ব্যাপারে ভয় আছে যে সে তাঁর পিতার মতো হতে পারে।" দোজে্ তার দূতকে লিখেছিল, "সুলতান বেশ তরুণ, শক্তিশালী এবং খ্রিস্টান জাতির প্রতি বিদ্বেষী।"

এ ধরনের মন্তব্য ব্যতীত সুলেমানের সুখ্যাতি ছিল বেশ অল্প। কিন্তু তার পরেই সুলতানের অভিযানসমূহ পর্যালোচনা করে যুদ্ধ নীতির ওপর তাঁর দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়।

ভেনিসের সাথে সুলতানের কোর্টের নিয়মিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সকল বিদেশি দূত নিয়মিত সুলতানের কোর্টের খবরাখবর ইউরোপে পাচার করত।

আস্তে আস্তে কনস্টান্টিনোপল শহরে বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। ফ্রেঞ্চ, হাঙ্গেরি, ক্রোয়েশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের দূতেরাও আসতে থাকে। এদের মাধ্যমেও বিদেশি পর্যটকদের ও লেখকদের মাধ্যমে পশ্চিমা খ্রিস্টান বিশ্ব তুর্কিদের সম্পর্কে ধীরে ধীরে সব সত্য আবিষ্কার করতে থাকে। তুর্কিদের জীবনধারা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রথা, রীতিনীতি যা ছিল বর্বর ঐতিহ্য ও নিয়মধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রাজপ্রাসাদের মধ্যে সুলতান সুলেমান এমন এক জীবন-যাপন করতেন যা প্রায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মতো সুশৃঙ্খল ও ক্রুটিহীন ছিল আর ভাসেইলেসের ফরাসি রাজাদের মতোই ছিল তুলনার দিক দিয়ে।

সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর পরই কাফতান (লম্বা এক ধরনের পোশাক) পরিয়ে দেয়া হতো সুলতানকে। পছন্দসই ভৃত্যের হাতে কাপড় পরে এক পকেটে বিশটি স্বর্ণমুদ্রা ও অন্য পকেটে হাজার রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে দিন শুরু হতো সুলতানের। বালক ভৃত্যরা লম্বা ট্রেনের মতো করে লাইন ধরে সুলতানের তিন বেলার খাবার নিয়ে আসত। সুদৃশ্য পোর্সেলিন ও রুপার পাত্রে পরিবেশনকৃত খাবার সম্ভাব্য বিষ চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে পাশে একজন ডাক্তার নিয়ে একাকী খেতেন সুলতান।

প্রায় প্রতি রাতে ভিন্ন ভিন্ন শোবার রুমে নিদ্রা যেতেন সুলতান নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে।

দিনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতেন সরকারি কর্মচারী আর দর্শনার্থীর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে। অবসর সময়ে মহাবীর আলেকজান্ডারের ওপর লেখা বই, ধর্মীয় বা দর্শন নিয়ে লেখা বই, সংগীত শুনে সময় কাটাতেন সুলতান। এছাড়াও প্রিয় কোনো সভাসদ বা সঙ্গীর সাথে প্রাসাদের উদ্যানে সময় কাটাতেন ভালোবাসতেন সুলতান সুলেমান।

সুলতানের স্নানাগারের অভূতপূর্ব দৃশ্য।

এছাড়াও সর্বসাধারণের সামনে আয়োজিত যে কোনো অনুষ্ঠানে বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন ও শান-শওকত পছন্দ করতেন সুলতান সুলেমান। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় তিন সপ্তাহব্যাপী জাঁকজমকভাবে পালন করা হয় সুলতানের পাঁচ পুত্রের সুন্নতের অনুষ্ঠান। এছাড়াও প্রধান উজির ইব্রাহিম পাশার বিবাহেও দুহাত ভরে খরচের মাধ্যমে বিপুল আয়োজন করেন সুলতান সুলেমান।

প্রধান উজির ইব্রাহিম পাশাকে সাথে নিয়ে ১৫৩৬ সালে ক্ষমতার শেষ দিন পর্যন্ত কূটনৈতিক কাজ পরিচালনা করেছেন সুলতান সুলেমান। পূর্ব-পুরুষদের কোনো এক প্রাদেশিক গভর্নর বা সেনা-বিচারকদের মধ্য থেকে প্রধান উজির নির্বাচিত করার রীতি থেকে বের হয়ে সুলতান নিজের প্রাসাদ কর্মচারী ইব্রাহিম পাশাকে প্রধান উজিরে হিসেবে নিয়োগ দেন। বিদেশি শাসক ও তাদের দূতদের মাঝেও ইব্রাহিম পাশার পদমর্যাদা ও প্রভাব ছিল অনেক শক্তিশালী। ফ্রান্সিস এবং ফার্দিনান্দ উভয়েই ব্যক্তিগতভাবে ইব্রাহিম পাশাকে পত্র লিখত। এমনকি কনস্টান্টিনোপলে আগত যেকোনো বিদেশি দূতদের আদেশ দেয়া হতো ইব্রাহিম পাশার সাথে প্রথমেই যোগাযোগ করার জন্য।

সুলতান সুলেমান এবং ইব্রাহিম পাশা একে অন্যের প্রতিরূপ হয়ে অটোমান সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। ইউরোপে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হাবসবুর্গ ও ফ্রান্সের সাথে মৈত্রী জোটের মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি পরিকল্পনা করেন সুলতান। অন্যদিকে ইউরোপের সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ায় ইব্রাহিম পাশা কৌশল ও ছোটখাটো সব বিষয়ে মনিবের দৃষ্টি খুলে দিতে সাহায্য করে। অটোমান ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে পশ্চিমের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ইব্রাহিম পাশা।

ইব্রাহিম পাশার সবশেষ অর্জনে ছিল তার বন্ধু প্রথম ফ্রান্সিসের সাথে আলোচনা, ড্রাফট ও স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৫৩৫ সাথে একটি শান্তিচুক্তি স্থাপন করা। এতে করে তুর্কিরা যতটুকু কর দিত ততটুকু কর সুলতানকে প্রদানের মাধ্যমে ফরাসিরা অটোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যবসা করার অধিকার পায়। একই ভাবে তুর্কিরাও ফ্রান্সে সমানাধিকার পায়। এর মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরে ভেনিসের একচ্ছিত্র আধিপত্যের অবসান হয়। সব ধরনের খ্রিস্টান জাহাজসমূহকে বাধ্য করা হয় ফরাসি পতাকা উত্তোলন করে সমুদ্রযাত্রা করতে।

এই শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বিদেশি শক্তিসমূহ সন্ধি শর্তে আত্মসমর্পণ করে অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে। এভাবে ফ্রাঙ্কো-তুর্কি মৈত্রী জোটের মাধ্যমে ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে সুলতানের সুবিধানুযায়ী শক্তির ভারসাম্য স্থাপিত হয়।

দিন দিন সুলতান সুলেমান ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে ইসলামি আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আরো অনুরক্ত হয়ে পড়েন। নতুন কোনো আইনি প্রক্রিয়ার গঠন না করে; বরঞ্চ নতুন সময়ানুযায়ী পুরোনোকে আধুনিকায়নে আগ্রহী ছিলেন সুলতান সুলেমান।

জটিল প্রথা এবং অনুশীলনকে তিনি সুস্পষ্ট ও সহজ করে তোলেন। অটোমান সরকারের প্রধান দুটি ভিত্তির ওপর নির্ভর করে তিনি এক্ষেত্রে—শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ ধর্মনিরপেক্ষ এবং কার্যনির্বাহী প্রতিষ্ঠান; এবং মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহ, ধর্মীয় এবং বিধান সভা। সুলতানের একচ্ছত্র শাসনাতলে এ দুই প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে চলে।

শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে ছিল সুলতান, তাঁর পরিবর, সুলতানের কোর্টের কর্মচারী, সরকারের কার্যনির্বাহী কর্মচারী, সেনাবাহিনী আর তরুণদের বড় একটি অংশ, যাদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছিল উপরোক্ত অফিসসমূহে ও সুলতানের দরবারে কাজ করার জন্য। এদের প্রায় সবাই ছিল খ্রিস্টান বা খ্রিস্টান বংশোদ্ভুত পিতা-মাতার সন্তান ও সুলতানের দাস।

অন্যদিকে এ প্রশাসনের সমান্তরালে মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হতো শুধু মুসলমান বংশোদ্ভুতদের নিয়ে। বিচারক, আইনজীবী, ধর্ম ব্যাখ্যাকারী, হুজুর, অধ্যাপক, এরা সবাই শরিয়তভিত্তিক আইনের ধারক বাহক ছিল।

পবিত্র শরিয়ত আইনকে অবজ্ঞা বা পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা ছিল না সুলতানের। একজন সত্যকারের মুসলমান হিসেবে এ ধরনের কোনো অভিপ্রায়ও ছিল না তাঁর। কিন্তু পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে পাল্লা দিয়ে ধর্মের ব্যবহারে পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন সুলতান। শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপের খ্রিস্টান অঞ্চলসমূহ দখল করলেও ধীরে ধীরে এশিয়ার পুরাতন কিছু ইসলামি শহর যেমন দামাস্কাস, বাগদাদ, কায়রোসহ মক্কা-মদিনার অভিভাবকত্ব লাভ করেন সুলতান। পুরো মুসলিম বিশ্ব সুলতান সুলেমানকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিলে সাম্রাজ্যে মুসলিম বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এই কারণে বিধান সভায় নতুন ধারার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ কারণে নিয়োগপ্রাপ্ত বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ববিদ ও বিচারক সুলতানকে পথ দেখাতে থাকেন যে শরিয়ত আইনের কতটা সুলতান পরিবর্তন করতে পারবেন।

শরিয়ত আইন ব্যতীত সুলতানের শাসনকাজে 'কানুন' ছিল একমাত্র বিধান সভার অস্ত্র। আর এক্ষেত্রে সুলতান জমির স্বত্ব ভোগ ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্যের সামন্তপ্রথার পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেন। কেননা তাঁর পূর্ব-পুরুষদের সময় থেকেই খ্রিস্টান ও মুসলিম প্রজাদের মধ্যে এই দুই ক্ষেত্রে পার্থক্য ও দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল।
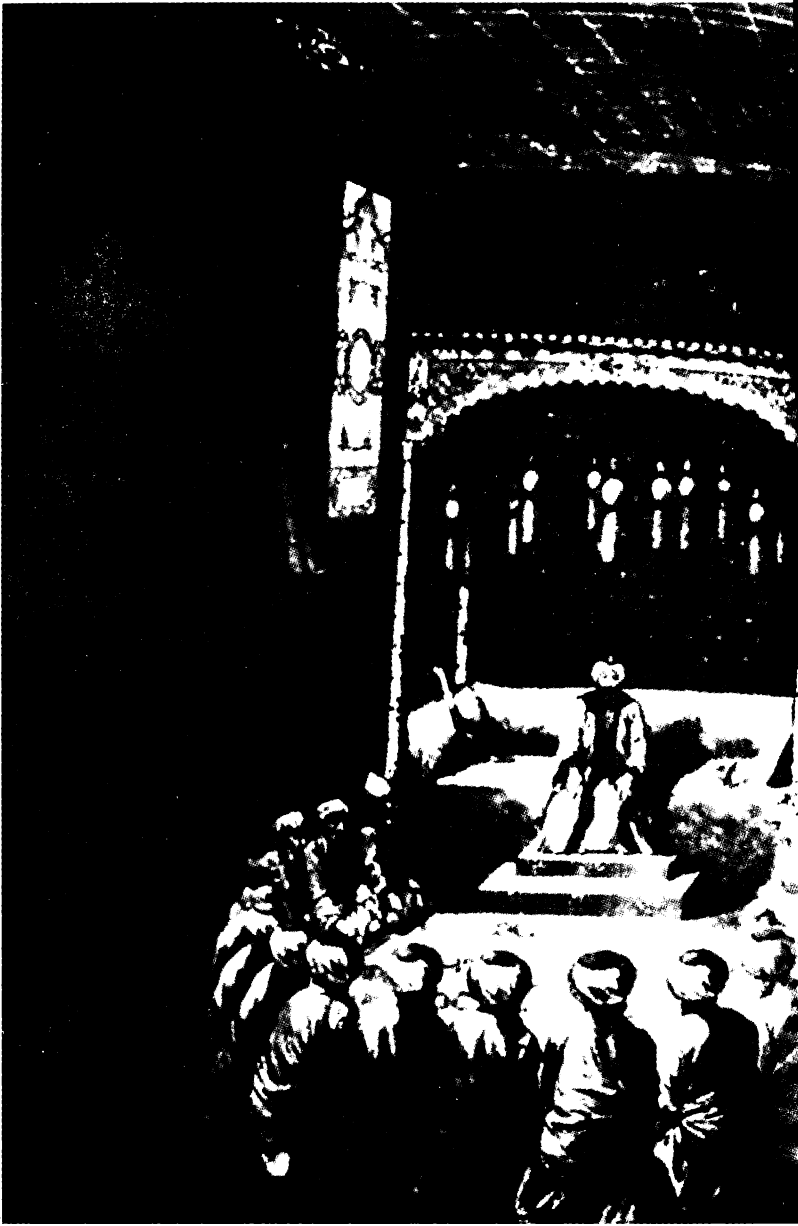
সিংহাসন কক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান।
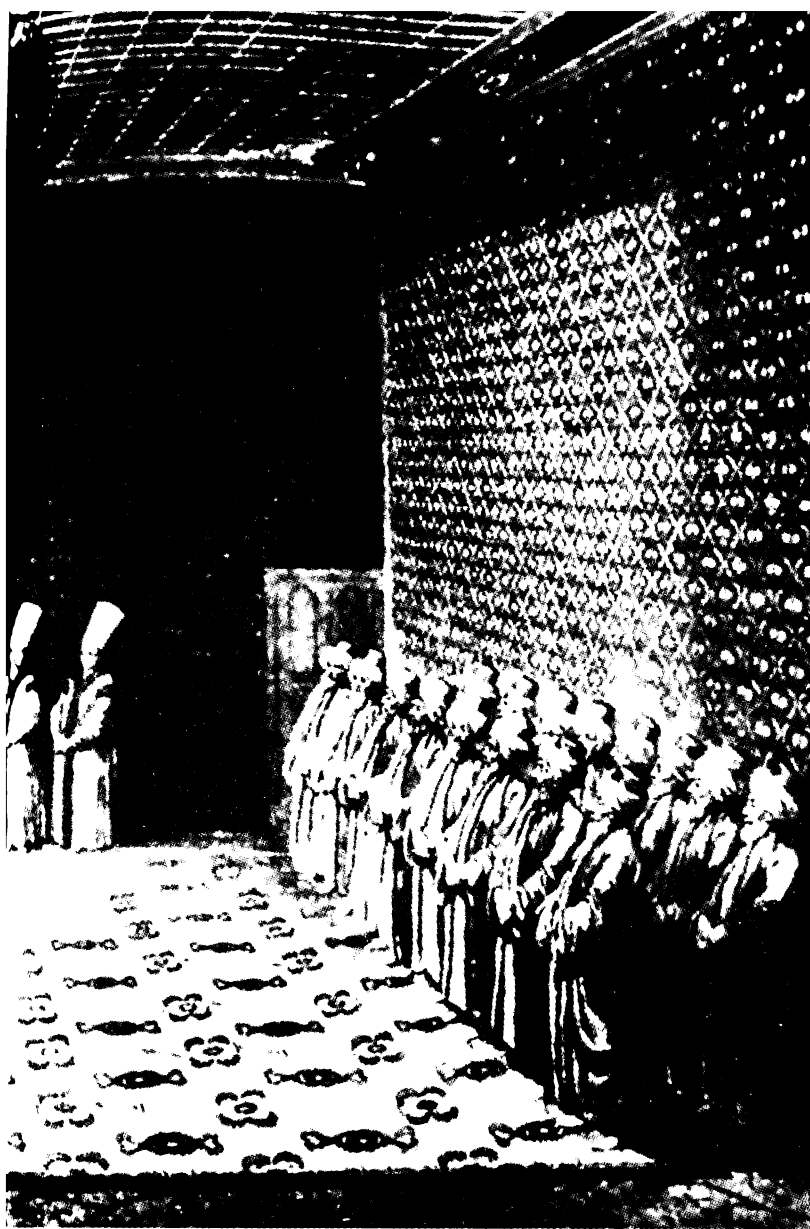
নিজের পুনঃসংস্কারের কাজের ক্ষেত্রে সুলতান রায়াদের অবস্থার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন—খ্রিস্টান কৃষক যারা সিপাহিদের জমি চাষ করত।

এক্ষেত্রে সমসাময়িক একজন লেখক লিখে গেছেন, "আমি এমন অনেক হাঙ্গেরিয় দেখেছি যারা নিজেদের ঘর পুড়িয়ে দিয়ে ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও চাষের যন্ত্রপাতি নিয়ে তুর্কিদের অধিকৃত অঞ্চলে চলে গেছে। ভেনেশীয়দের তুলনায় বরঞ্চ অটোমান শাসক তাদের কাছে পছন্দ ছিল।"

সুলেমান 'কানুন' রীতির ক্ষেত্রে অপরাধী ও পুলিশদের জন্যও নতুন আইন সংযোজিত হয়, শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া পূর্বের তুলনায় উদার হয়ে যায়। দাপ্তরিক শাস্তি হিসেবে বিভিন্ন অপরাধের জন্য জরিমানা প্রদানের শাস্তি নির্ধারিত হয়।

শরিয়ত আইনের করারোপ ব্যতীত সুলেমানের কর ধার্য করার নীতির পরিসর ও ব্যাপ্তি বেড়ে যায়। গৃহস্থালির ক্ষেত্রে অবিবাহিত এবং বিবাহ করতে ইচ্ছুক উভয়ের ওপর কর আরোপ করা হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুলেমান বিপুল সংখ্যক নতুন আইন প্রবর্তন করেন। এতে বাজার সমাজ, মজুরি এবং দাস, খুচরা এবং পাইকারি ব্যবসাসহ খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া ও বিক্রির ওপর বিস্তারিত প্রক্রিয়া সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন, প্রাণী, খনি, ব্যবসার লাভ, আমদানি রপ্তানির ওপর লাভ প্রভৃতি সবকিছুর ওপর কর আরোপ করা হয়। এ ধরনের পণ্য কর ব্যতীত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের মালিকানাধীন সম্পত্তির ওপরও করারোপ করা হয়। এতে অবশ্য এ ধরনের জনগোষ্ঠীর রোষানাল বেড়ে যায়।

আর্থিকভাবে অটোমান সাম্রাজ্য দিনে দিনেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সুলতানের নিজের অঞ্চল ও দখলীকৃত অঞ্চল সমূহ থেকে প্রাপ্ত করের কারণে রাজকোষ ক্রমেই পূর্ণ হয়ে সমসাময়িক খ্রিস্টান রাজাদেরকে অতিক্রম করেছিল।

এত সব কিছুর পরেও সুলতানের সকল পুনঃসংস্কার কাজ যথাযথভাবে প্রয়োগের অভাবে সফল হতে পারেনি। কেননা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন সুলতান। ফলে রাজধানীর বাইরে তাঁর বিশাল অঞ্চলের প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্তিগতভাবে শোনার বা বোঝার উপায় ছিল না সুলতানের।

বিশেষ করে মুসলিম প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে নিজের সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন সুলতান সুলেমান। প্রধান মুফতি বা উলেমা প্রধানকে প্রায় প্রধান উজিরের সমমানের সম্মান প্রদানের মাধ্যমে প্রধান মুফতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ ও বিধান সভা এবং কার্যনির্বাহী অংশের মাঝে শক্তির ভারসাম্য স্থাপন করেন সুলতান। এছাড়াও সকল উলেমাকে বিশেষ

সুবিধার আওতায় আনা হয়; যা অবশ্য পরবর্তীতে বিভিন্ন সমস্যাও তৈরি করেছিল। এরা কর প্রদান করত না এবং জমি-জমার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ-দখলের অধিকার পেত।

সুলেমান 'উলেমা'দের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করেন। এগুলোর খরচ দেয়া হতো বিভিন্ন ধর্মীয় ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আর এসব বিদ্যালয় মসজিদের সাথে বানানো হতো। বিজয়ী বীর মাহমুদের মতো সুলতান সুলেমানও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিতে বিশাল ভূমিকা রাখেন। তাঁর আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা শুধু রাজধানীতে চৌদ্দতে উন্নীত হয়। এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি ইসলামের নীতিসমূহের ভিত্তি শেখানো হতো।

এরপর শিক্ষার্থীরা চাইলে বা মেধা থাকলে আটটি প্রধান মসজিদের লাগোয়া তৈরি আটটি মাদ্রাসায় পড়তে পারত তারা। এগুলোকে বলা হতো জ্ঞানের অষ্টম স্বর্গ। এখানে দশটি বিষয়ে পড়ানো হতো। এছাড়াও আরো উচ্চ মাদ্রাসা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে ইমাম বা শিক্ষক হতো।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর এই স্বর্ণযুগে জন্মগ্রহণ করা সুলতান সুলেমান ছিলেন ইসলামের খলিফা। তাঁর চরিত্রে একই সাথে পূর্বের পবিত্র রাজকীয় ভাব ও পশ্চিমের মতো রাজকুমারসুলভ আভিজাত্য ছিল। সুলেমান ইস্তাম্বুলকে প্রকৃতই একটি রাজধানী রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই যত তাঁর অভিযান সফল হয় ও করপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়; ততই উন্নত স্থাপত্যবিদ্যার অনুসরণ করে গোলাকৃতি সব গম্বুজ ও মিনারের সমন্বয়ে সুদৃশ্য সব মসজিদ তৈরি হতে থাকে; যা আজ তাঁর মৃত্যুর চার শতক পরেও অবিকৃত আছে। সুলতান মাহমুদ বাইজেন্টাইন রীতি অনুসরণ করে যে স্থাপত্যরীতির সূচনা করেছিলেন সুলেমানের সময়ে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে।

এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন ইতিহাসখ্যাত স্থাপত্যবিদ মীরমার সিনান। আনাতোলিয়া থেকে আগত খ্রিস্টান পাথুরে কারিগরের সন্তান সিনান তরুণ বয়সে জানিসারিস হিসেবে ও সামরিক প্রকৌশলী হিসেবে সুলতানের সাথে বিভিন্ন অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে সুলতানের কাছে প্রধান রাজকীয় স্থাপত্যবিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে আসেন তিনি। এরপর ষোড়শ শতকের সভ্যতার রীতি অনুযায়ী সুশ্রী ও সুশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন মসজিদ। সমাধি স্থাপনা গড়ে তোলেন সিনান। এদের মাঝে অসাধারণ শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রসিদ্ধ সুলতান সুলেমানের নিজস্ব রাজকীয় মসজিদ 'সুলেমানিয়ে'। সুলতানের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সিনান কনস্টান্টিনোপল শহরকে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে সত্যিকারের অনুঘটক হিসেবে গড়ে তোলে।

গোল্ডেন ইন থেকে সুলমানিয়ে মসজিদের দৃশ্য।

এই সময়ে অটোমান দালানের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার জন্য পূর্ব থেকে নকশাবিদকে আনা হতো। উজ্জ্বল ফুলের নকশাসমৃদ্ধ সিরামিক টাইলস্ দিয়ে দেয়াল বানানো হতো। পূর্বে পারস্য থেকে আনা হলেও এ উদ্দেশ্যে পরে তাবরিজ থেকেই আনা হতো এ টাইলস।

সুলতান মাহমুদের সময়কাল থেকেই সাহিত্যে পারস্য প্রভাব ছিল স্পষ্ট। এ রীতি সুলেমানের সময়ও বজায় থাকে। সুলতান সুলেমান কবিতার বিশেষ সমঝদার ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ক্ল্যাসিক অটোমান পদ্যরীতি নতুন মাত্রায় উচ্চস্থান লাভ করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহকে লিপিবদ্ধ করার জন্য রাজকীয়ভাবে পদ্য বিশারদদের নিয়োগ দিতেন সুলতান।

॥ ১৫ ॥

সুলতান সুলেমান নিজের অভিযান পরিচালনার কৌশল পরিবর্তন করেন। মধ্য ইউরোপে অভিযান আর না বাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে নিজের রাজত্বকে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠা করেই তৃপ্ত থাকেন। এরপর এশিয়াতে নিজের রাজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারস্যের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন সুলতান সুলেমান।

১৫১৮ সালে খায়েরিদ্দীন বারবারোসা ভূমধ্যসাগরে তুর্কিদের নৌ-সেনাপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৫৩৩ সালে সুলতান সুলেমান বারবারোসার কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেন। এ সময় খ্রিস্টান বা তুর্কিদের নৌ সীমা কোরোনে অনধিকার প্রবেশ শুরু করে। সুলতান সামরিক ও নৌ-সেনাবাহিনী পাঠিয়েও ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা এ বন্দর ছেড়ে চলে গেলেও সুলতান উপলব্ধি করতে পারেন যে, স্থলপথে অভিযান পরিচালনা ব্যস্ত থাকার ফলে তাঁর নৌবাহিনী পশ্চিমের নৌবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তড়িৎ পদক্ষেপে নৌবাহিনীকে পুনরায় ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন সুলতান। কেননা এ সময় পারস্যে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করেন সুলতান। এছাড়াও তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজ্যের নিরাপত্তার কথা ভেবে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে উঠেন সুলতান। আর এ কারণেই বারবারোসার কাছে দূত পাঠিয়ে ইস্তাম্বুলে তার উপস্থিতি কাম্য করেন সুলতান। বারবারোসা প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য, আফ্রিকান বিভিন্ন পশু ও দামি কাপড়, সুলতানের হারেমের জন্য যুবতী মেয়েসহ বিপুল উপঢৌকন নিয়ে সুলতানের সাথে দেখা করেন। এরপর সুলতান বারবারোসাকে প্রধান অ্যাডমিরাল বানিয়ে তাঁর অধীনে ১৮ জন যুদ্ধজাহাজের এর ক্যাপ্টেন নিয়োগ দান করেন। তারা সকলে রাজ্যের জাহাজ ঘাটে গিয়ে নির্মাণকাজের তদারিক ও অগ্রগতি দেখাশোনা করা শুরু করে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে মাত্র শীতের

ঋতুতেই সুলতানের নৌবাহিনী পুনরায় ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আফ্রিকার উপকূলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ভূমধ্যসাগরে তুর্কি ও ফ্রান্সের মাঝে মৈত্রী জোটের ক্ষেত্রে বারবারোসা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তার মতে, এ মৈত্রী জোট স্প্যানিশ নৌবাহিনীকে পরাজিত করার শক্তি রাখত। কেননা সুলতান নিজেও রাজা চার্লসকে পরাস্ত করার জন্য স্থলপথে নয়, বরঞ্চ নৌপথে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করেন। এই কারণে প্রতিরক্ষার জন্য তুর্ক ফ্রেঞ্চ শান্তিচুক্তি গঠিত হয়।

১৫৩৪ সালে পারস্যের বিরুদ্ধে সুলতানের যাত্রার কিছুদিন আগেই বারবারোসা নিজের জাহাজবহর নিয়ে দার্দেনালেস হয়ে ভূমধ্যসাগরে রওনা হয়ে যায়।

বারবারোসা দক্ষিণমুখী হয়ে ইটালির বন্দরসমূহ দখলে অগ্রগামী হয়। কিন্তু তার প্রধান তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল তিউনিসিয়া দখল করা। কিন্তু বারবারোসার আক্রমণের কথা জানতে পেরে তিউনিসিয়ার রাজা পূর্বে'ই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে বিনা বাধায় অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে তিউনিসিয়া। এর মাধ্যমে তুর্কিদের কৌশলগত অবস্থান দৃঢ় হয়ে ওঠে।

সম্রাট চার্লস এ ঘটনার সাথে সাথে সচকিত হয়ে উঠেন এবং নিজের দূত পাঠিয়ে তিউনিসিয়ার পলাতক রাজাকে সাহায্য করার জন্য পাঠান। যেন তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিউনিসিয়া। এতে কাজ না হলে সম্রাট মনস্থির করেন বারবারোসাকে ঘুষ দেওয়ার অথবা হত্যা করার। কিন্তু বারবারোসা এ ষড়যন্ত্র জানতে পেরে বরঞ্চ চার্লসের দূতকেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

ফলে বাধ্য হয়ে সম্রাট চার্লস আদ্রে ডোরিয়ার নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনী প্রস্তুত করেন সুলতান সুলেমানের বিরুদ্ধে। ১৫৩৫ সালে স্প্যানির্য়াড, জার্মান ও ইটালিয়ানদের সহযোগে গঠিত এ বাহিনী কার্থেজের ধ্বংসাবশেষের কাছে একত্রিত হয়। চার্লসের বাহিনী তিউনিসের প্রবেশদ্বার কয়েক দিন অবরুদ্ধ করে রাখতে পারলেও তুর্কি বাহিনীর কাছে হেরে যায় শেষ পর্যন্ত। বারবারোসা তিউনিস ও আলজিয়ার মধ্যবর্তী বোনে নামক জায়গায় সংরক্ষিত নৌ সেনা পাঠিয়ে সম্রাট চার্লসের স্থলবাহিনীর সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

কিন্তু তিউনিউ শহরের মাঝে কিছু বন্দি মুক্ত হয়ে আস্ত্রাগার দখল করে তুর্কিদের পরাজিত করে। এরপর এসব খ্রিস্টান সৈন্যের সহায়তায় সম্রাট চার্লস শহরে প্রবেশ করে তিন দিন ব্যাপী শহরজুড়ে লুটপাট, হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণের পর ধ্বংসলীলা চালায় সম্রাটের সৈন্যরা। এরপর সম্রাট তাঁর প্রজা হিসেবে পুনরায় তিউনিসিয়ার রাজা মূলে হাসানকে সিংহাসনে বসান।

অটোমান সাম্রাজ্যের সীমানা ।

MACEDONIA
Angora
A N A T O L I A
Izmir
Alexandretta
CILICIA
Antioch
Hama
Homs
SYRIA
Amman
BARCA
Cairo
Suez
Sinai
EGYPT
Nile R.
Ma'an
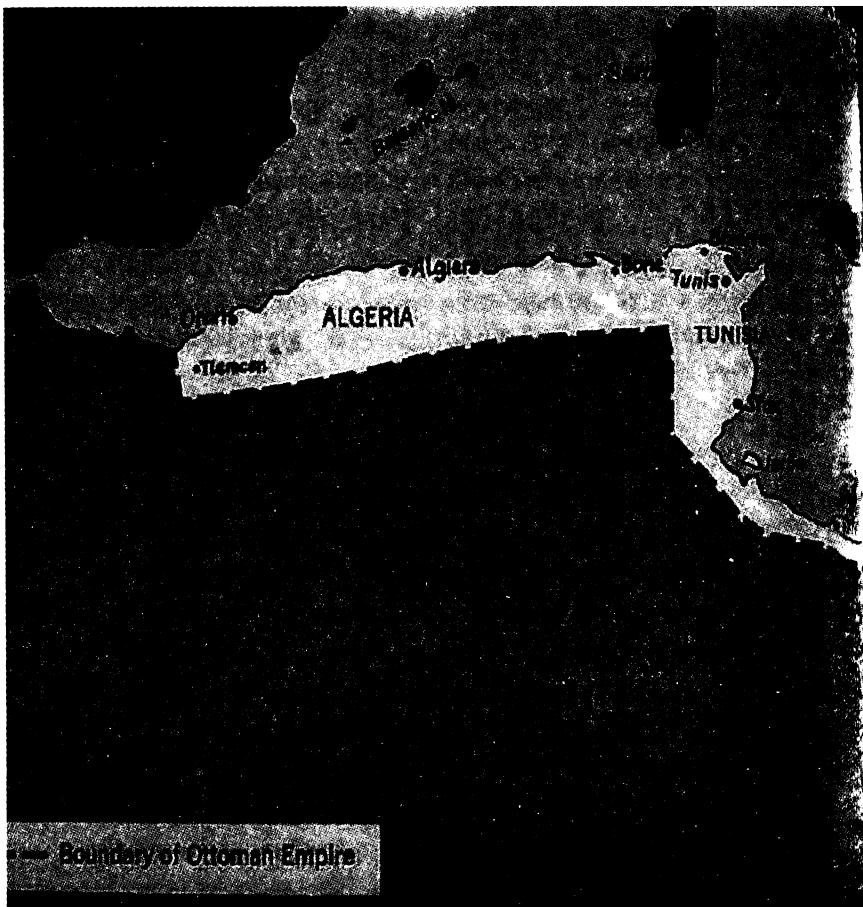
কিন্তু এ ধরনের কোনো ভাগ্যই বারবারোসাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। এই ঘটনার সাথে সাথেই বারবারোসা নিজের হাজার সৈন্য নিয়ে বোনেতে ফিরে যায়; নিজের সংরক্ষিত সৈন্যদের সাথে একত্রিত হয়। নিজের কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বারবারোসা জাহাজবহর ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে বোনে ত্যাগ করে। কোনো পশ্চাদবন নয় বরঞ্চ সম্রাট চার্লসের নিজের ভূমি বালিয়েরিক দ্বীপ আক্রমণের লক্ষ্যে অগ্রসর হয় বারবারোসা।

কিন্তু বিফল মনোরথে ১৫৩৬ সালে ইস্তাম্বুলে এসে হাজির হয়। এর কিছুদিন পূর্বে সুলতান বাগদাদ থেকে ফিরে পুনরায় বারবারোসাকে দুইশ জাহাজ বহরের নির্মাণের আদেশ দেন ইটালি আক্রমণের জন্য। শহরের শহরের জাহাজ ও অস্ত্রাগার আবারো সরগরম হয়ে ওঠে।

১৫৩৭ সালে বারবারোসা নিজের জাহাজ বহর নিয়ে গোল্ডেন হর্ন ত্যাগ করে ইটালির দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের উদ্দেশ্য। এটি একটি যৌথ আক্রমণের পরিকল্পনার অংশ ছিল। সুলতান সুলেমান নিজের নেতৃত্বে স্থলবাহিনী নিয়ে আলবেনিয়া পার হয়ে উত্তর ইটালির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু স্থলপথে আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কেননা রাজা ফ্রান্সিস, তার স্বভাবসুলভ কারণে চুক্তি ভঙ্গ করে সম্রাট চার্লসের সাথে যুদ্ধ বিরতির জন্য আলোচনা শুরু করে।

এই কারণে বর্তমানে আলবেনিয়ায় থাকা সুলতান নিজের বাহিনীকে ভেনিসের উদ্দেশ্যে নিয়ে যান। কেননা ভেনিসের দ্বীপ নিয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। এছাড়াও তুর্কীদের ফ্রান্সপ্রীতি দেখে ভেনিস প্রকাশ্যে নানা শত্রুতা করে আসছিল তুর্কি জাহাজদের সাথে। কর্ফুতে গালিপল্লীর গভর্নরের জাহাজ আটক করে সবাইকে মেরে ফেলে ভেনেশীয়রা। কেবল একজন তরুণ প্রাণে বেঁচে প্রধান উজিরের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ করলে সুলতান তৎক্ষণাৎ কর্ফু দখলের নির্দেশ দান করেন। কিন্তু তুর্কি সেনাবাহিনী কর্ফুতে প্রবেশ করে গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিলেও দুর্গসমূহ দখল করতে ব্যর্থ হয়। শীত আসন্ন হওয়ায় পিছু হটতে বাধ্য হয় তুর্কীবাহিনী।

এই পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে বারবারোসা। নিজের নৌবাহিনী নিয়ে আজিয়ান সাগর গিয়ে ভেনিসের দ্বীপসমূহকে তছনছ করে দেয়। দ্বীপের অধিবাসীদের বন্দি করে, নৌযানসমূহকে জব্দ করে এবং হুমকি দিয়ে অটোমান সুলতানকে বিপুল অঙ্কের বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করে। এরপর বিজয়ীর বেশে ইস্তাম্বুল ফিরে আসে বারবারোসা। এ সম্পর্কে তুর্কি ইতিহাসবিদ হাজী খলিফা লিখে গেছেন—" কাপড় অর্থ, হাজার তরুণী মেয়ে ও পনেরশ বালক—প্রায় চারশ হাজার

সমমূল্যের স্বর্ণ; যা প্রায় তার নিজের সম্পদের–সমান।" এই মানের সম্পদ নিয়ে ফেরায়' বারবারোসা নিজেও বেশ ভালো পুরস্কারে ভূষিত হন।

খ্রিস্টান শক্তিসমূহের কাছে বারবারোসা হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফলে আরো একবার পোপতন্ত্র, ভেনিস ও সম্রাট চার্লস একত্রিত হয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ডোরিয়ার নেতৃত্বে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত নৌবাহনী বারবারোসা তথা তুর্কি নৌশক্তিকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে যাত্রা প্রস্তুত করে।

খ্রিস্টান জলেযানসমূহের বহর কর্ফুতে জড়ো হয়। এ সময়ে কৌশলগত সুবিধার কারণে বারবারোসা আর্তা'র উপসাগরে আশ্রয় খুঁজে নেয়।

বারবারোসার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, নিজের নিরাপদ বন্দর ত্যাগ করার নোঙ্গর ছেড়ে। অন্যদিকে ডোরিয়া তুর্কি বাহিনী সম্পর্কে সচেতন ছিল। ডোরিয়ার একমাত্র সুযোগ ছিল তার স্থলবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে কামানের গোলা মেরে তুর্কী বাহিনীকে ধূলিসাৎ করে দেয়া।

কিন্তু এর ধরনের আক্রমণের ক্ষেত্রে বারবারোসার জানিসারিস বাহিনীর শক্তির কথা চিন্তা করে এ পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়।

পরবর্তীতে নানা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটলেও ১৫৩৮ সালে খ্রিস্টান শক্তি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এর একটি কারণ ছিল এ রকম–মিশ্র একটি বড় নৌবাহিনীকে ঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেনি আন্দ্রে ডোরিয়া। অন্যদিকে বলা যায়, প্রতিটি বাহিনীর কমান্ডারদের পারস্পরিক রাজনৈতিক সমঝোতার অভাব। বিশেষ করে ভেনেশীয়রা আক্রমণে আগ্রহী ছিল। অন্যদিকে স্প্যানিয়ার্ডরা কিভাবে ক্ষয়-ক্ষতি কম রাখা যায়, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। অন্যদিকে বলা যায়, সম্রাট চার্লসের স্বার্থ লুকিয়ে ছিল পশ্চিম ভূমধ্যসারে। তাই পূর্ব ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধ নিয়ে তাঁর তভটা মাথাব্যথা ছিল না। তাই আবারো খ্রিস্টান শক্তি একত্রিত হতে ব্যর্থ হয়; বারবারোসার কর্মদক্ষতায় তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ বৃদ্ধি হয়, যা পরবর্তী প্রজন্মেও টিকে ছিল।

ভেনিস তুর্কিদের সাথে শান্তিচুক্তি করতে রাজি হয়। ফলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তে তুর্কিদের বাধা দেওয়ার কেউ থাকেনা ১৫৪১ সালে বারবারোসার অনুপস্থিতিতে সম্রাট পঞ্চম চার্লস নিজের খ্রিস্টান মিত্রদের নিয়ে আলজেরিয়া আক্রমণ করলেও হারিকেনের কবলে পড়ে নাস্তানাবুদ হওয়া ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না।

পুরো সমুদ্র ভূমি চলে যায় চার্লসের শত্রু ফ্রাঙ্কো তুর্কি মৈত্রী জোটের হাতে। ১৫৪৩ সালে সুলতান আরেকবার বারবারোসাকে দক্ষিণে পাঠান। বারবারোসা আবারো সিসিলি ও নেপলস্ বিধ্বস্ত করে দেয়। সারা রোমজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তুর্কি শহর গিয়ে থামে

মার্সেইলেসে। এখানে সদর দপ্তর বানানোর জন্য তুলন বন্দর দেয়া হয় বারবারোসাকে।

বন্দরে নেমে বারবারোসা দেখতে পান অভূতপূর্ব সব দৃশ্য। মাথায় পাগড়ি পরা মুসলিমরা বিভিন্ন ডেকের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে আর ফ্রেঞ্চ ক্যাথলিক ইটালীয়, জার্মান এমনকি ফ্রেঞ্চদেরকে শিকলে বেঁধে দাস হিসেবে অত্যাচার করা হচ্ছে। এরই মাঝে আবার যে কোনো মুসলিম শহরের মতো মুয়াজিনরা মসজিদে আজান দিচ্ছে।

প্রথম ফ্রান্সিস নিস্ বন্দরে আক্রমণ করার জন্য বারবারোসার সাহায্য কামনা করে। ফলে শীঘ্রই শহরটি তুর্কি গোলান্দাজ বাহিনী দখল করে নেয়। এর গভর্নরও অবশেষে আত্মসমর্পণ করে। তারপর শহর লুণ্ঠন করে আগুন জ্বালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। ১৫৫৪ সালে ফ্রান্সিস তুর্কি নৌবাহিনী ও এর প্রধান অ্যাডমিরাল বারবারোসাকে প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন প্রদান করে ইস্তাম্বুল ছেড়ে চলে যায়।

এটি ছিল বারবারোসার শেষ অভিযান। এর দুবছর পরে বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের ইস্তাম্বুলের প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। সারা মুসলিম বিশ্ব শোকের মাতম তুলে। “সমুদ্রপ্রধান মারা গেছেন।”

॥ ১৬ ॥

পারস্য তুর্কিদের ঐতিহাসিক শত্রু শুধু রাজনৈতিক বা জাতীয়ভাবে নয়; ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এ শত্রুতা বিরাজমান ছিল। তুর্কিরা ছিল সুন্নি, অন্যদিকে পারস্যবাসী ছিল শিয়া মতাবলম্বী। সুলতান সেলিমের শাসনকালে চান্ডেরানের যুদ্ধ জয়ের ফলে রাজা শাহ ইসমাইলির সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় দুরাজ্যের। কিন্তু সুলতান সেলিমের মৃত্যুর পর সুলতান সুলেমান হুমকি দেখাতে পিছপা হয়নি। ইতিমধ্যে শাহ ইসমাইলির মৃত্যুর পর দশ বছর বয়সী পুত্র থামাস অভিষিক্ত হয়। তুর্কিদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে থামাস্ বাগদাদের গভর্নরকে হত্যা করে শাহদের উত্তরাধিকারীকে নিয়োগ দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান সুলেমান গালিপল্লীতে আটক থাকা বেশ কিছুসংখ্যক বন্দি হত্যার নির্দেন দেন। সব কিছু দেখে শুনে প্রধান উজির ইব্রাহিম পাশাকে পাঠিয়ে দেন তাঁর পূর্বে গিয়ে এশিয়া অভিযানের পথ প্রস্তুত করতে।

এটিই ছিল ইব্রাহিমের শেষ অভিযান–সফলতার সাথে তুর্কিদের হাতে বিভিন্ন দুর্গের পতন ঘটানোর পর ১৫৩৪ সালের গ্রীষ্মে তাবরিজে প্রবেশ করে ইব্রাহিম পাশা। যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যায় তাবরিজের শাহ্। এরপর চার মাস ধরে পর্বত ও পাথুরে, শুষ্ক জমি দিয়ে ভ্রমণ করে আসা সুলতান

সুলেমান প্রধান উজিরের সাথে একত্রিত হন নিজের বাহিনী নিয়ে। অক্টোবর মাসে যৌথ এই বাহিনী কঠোর পরিশ্রম করে দক্ষিণে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

অবশেষে ১৫৩৪ সালের নভেম্বর মাসে সুলেমান বাগদাদের পবিত্র শহরে প্রবেশ করেন এবং পারস্যের শিয়াদের হাত থেকে শহর মুক্ত করেন। এরপর সুলতান মহান সুন্নি ইমাম আবু হানিফার দেহাবশেষ মাটি থেকে তুলে তৎক্ষণাৎ একটি সমাধি স্থান নির্মাণ করে এই পবিত্র পুরুষকে সমাহিত করেন ও এই স্থানকে তীর্থস্থানে পরিণত করেন।

এরপর ১৫৩৫ সালের বসন্তে সুলতান সুলেমান বাগদাদ ত্যাগ করে সহজতর একটি রাস্তা দিয়ে তাবরিজে পৌঁছান। এখানে কয়েক মাস থাকার পর শহর ত্যাগ করার পূর্বে শহরটি পুরোপুরিভাবে লুট করে নিয়ে যান। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজধানী থেকে এত দূরে এই শহর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। ১৫৩৬ সালের জানুয়ারিতে বিজয়ীর বেশে ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করেন সুলতান সুলেমান।

পারস্যে প্রথম অভিযানের মাধ্যমে ইব্রাহিম পাশার বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি বাজতে থাকে। এত বছরের মাঝে তার কিছু শত্রুও তৈরি হয়; যারা ইব্রাহিম পাশার সম্পদ, ক্ষমতা প্রভাব প্রভৃতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সুলতানের আগমনের পূর্বেই তাবরিজ দখল করে নেওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তার মাঝে। নিজেকে তিনি সুলতান হিসেবে দেখার মনোবাসনা লালন করতে থাকেন; পাশাপাশি প্রধান কমান্ডার। কিছু কিছু কুর্দি গোত্র প্রধানের ক্ষেত্রে পূর্বে এমনটা দেখা গেলেও অটোমান সুলতান সুলেমান একে অবিশ্বস্ততা হিসেবে দেখার একটি প্রয়াস ছিল। অন্যদিকে এ উপাধির জন্য প্রধান কোষাধ্যক্ষও লালায়িত ছিল।

ফলাফলস্বরূপ উভয়ের মাঝে ঝগড়া ও তা মৃত্যুতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে প্রধান কোষাধ্যক্ষ ইস্কান্দারের বিরুদ্ধে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও জনগণের অর্থ নষ্ট করার অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ইস্কান্দার কাগজ-কলম চেয়ে এ ষড়যন্ত্র প্রভুর বিরুদ্ধে ইব্রাহিম পাশার কৃতকর্ম হিসেবে উল্লেখ করে যায়।

একজন মৃত্যু পথযাত্রীরা শেষ বাক্য ও নিজের রাশিয়ান উপপত্নীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে; যে কি না ইব্রাহিম পাশা ও সুলতানের নৈকট্যে ঈর্ষান্বিত ছিল; সুলতান এক রাতে প্রধান উজিরকে প্রাসাদে ডেকে রাতের খাবার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। পরদিন ভোরবেলা প্রধান উজিরের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরিচয় চিহ্নহীনভাবে সমাধিস্থ করা হয় ইব্রাহিম পাশাকে।
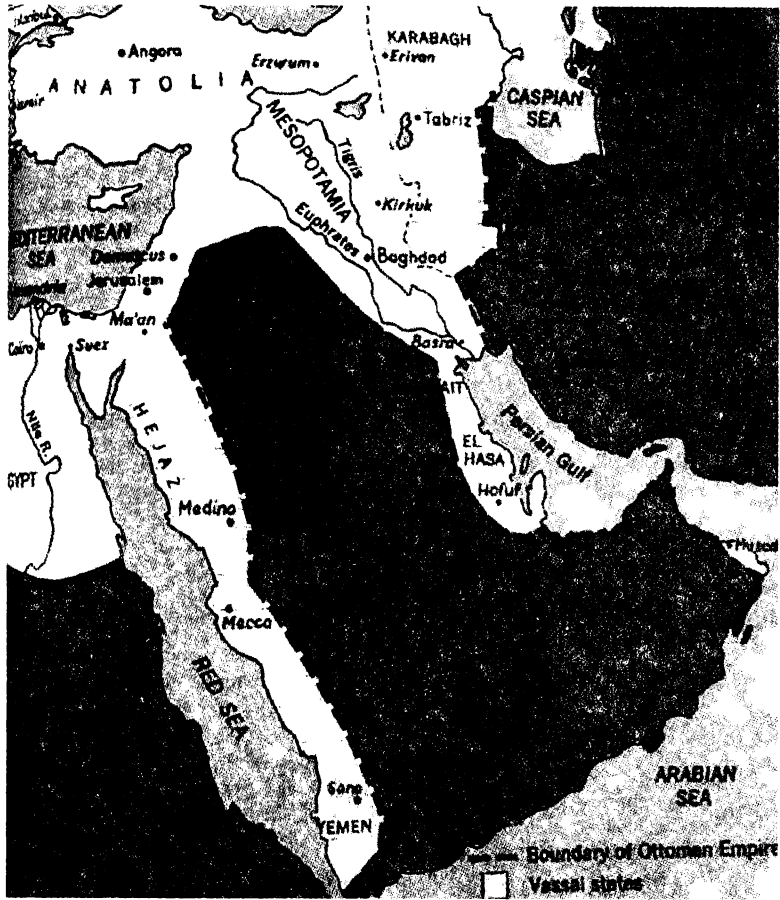
অটোমান সাম্রাজ্য সীমানা।

প্রায় এক দশক কেটে যাওয়ার পর সুলতান পুনরায় পারস্য অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেন। ১৫৪০ সালে রাজা জনের মৃত্যু হলে হাঙ্গেরি পুনরায় পশ্চিমের নজরে পড়ে। জন ও হাঙ্গেরির যৌথ রাজা ফার্দিনান্দের মাঝে চুক্তি হয়েছিল যে, যে কারো মৃত্যু হলে অপরজন সবটুকু অংশ পেয়ে যাবে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় জন পোলান্ডের রাজার কন্যা ইসাবেলাকে বিবাহ করে ছিল ও জন সিগিসমুন্ড নামে পুত্রসন্তানের জনক হয়েছিল। জনের মৃত্যুর পর এ শিশু রাজা হাঙ্গেরির অধিকারত্ব দাবি করে। সিগিসমুন্ডের হয়ে মার্তিনুজ্জী সুলতান সুলেমানের সাহায্য প্রার্থনা করে ফার্দিনান্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। সুলতান বার্ষিক করের বিনিময়ে জন সিগিসমুন্ডকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হন। তার পূর্বে দূত পাঠিয়ে শিশুর জন্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

১৫৪১ সালের গ্রীষ্মে বূদাতে প্রবেশ করেন সুলতান। এরপর ইসাবেলার শিশুপুত্রের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের পর মাতা-পুত্রকে ট্রান্সসিলভ্যানিয়ার লিপ্পাতে পাঠিয়ে দেয়া হয় ও যথাযথ সময়ে জনকে হাঙ্গেরির দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত দেশজুড়ে অটোমান দখলদারিত্বের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে বূদা এবং এর আশপাশের সমস্ত অঞ্চল একজন পাশার দায়িত্বে তুর্কি প্রদেশে পরিণত হয়, অঞ্চলের গির্জাসমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়।

এর মাধ্যমে ভিয়েনার নিরাপত্তা নিয়ে অস্ট্রিয়াবাসী নিশ্চিত হয়ে ওঠে। ফার্দিনান্দ শান্তি চুক্তির উদ্দেশ্যে সুলতানের তাঁবুতে দূত পাঠায়। সুলতানের জ্যোতির্বিদ্যার কথা মাথায় রেখে এমন এক ঘড়ি উপঢৌকন পাঠানো হয় যা কেবল সময়ই বলল না, এমনকি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাস, বছর, সূর্যের গতি, চন্দ্রের গতি, গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে সব ছিল এই ঘড়িতে। কিন্তু এসব কিছুই ফার্দিনান্দের অতি আবদার মেনে নিতে সুলতানকে প্ররোচিত করেনি।

সুলতান সুলেমান ১৫৪৩ সালের বসন্তে হাঙ্গেরির উদ্দেশে যাত্রা করেন। সংক্ষিপ্ত একটি অবরোধের মাধ্যমে। গ্রান নগর দখল করে বূদার তুর্কি পাশার দায়িত্বে ছেড়ে দেন। এর পর সেনাবাহিনী বাকি কাজ সমাপ্ত করে ও পরবর্তী দেড়শ বছর পর্যন্ত হাঙ্গেরি অটোমান সাম্রাজ্যেরভুক্ত হয়ে যায়।

এভাবে দানিয়ুবে সুলতানের বিজয়যাত্রা সমাপ্ত হয়। এখন সময় এসেছে শান্তি নিয়ে আলোচনা করার। এই সুযোগে হাবসবুর্গ ভ্রাতৃদ্বয় ফার্দিনান্দ ও চার্লস বূদার তুর্কির পাশার সাথে আলোচনা করে ইস্তাম্বুলে দূত পাঠায়।

এই প্রচেষ্টার ফল পেতে পেতে কেটে যায় তিনটি বছর। অবশেষে ১৫৪৭ সালে আদ্রিয়ানোপলে পাঁচ বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে আরো একমত পোষণ করে সম্রাট চার্লস, রাজা ফার্দিনান্দ, ফ্রান্সের রাজা, ভেনিস এবং পোপ তৃতীয় পল।

ঠিক সময়মতোই যখন সুলতান সুলেমান ১৫৪৮ সালে পারস্যে দ্বিতীয় অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন; এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এরপর পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ঝুলতে থাকা সুলতান সুলেমান আবারো হাঙ্গেরির বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন। কেননা আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি পাঁচ বছর পর্যন্তও টিকে থাকতে পারেনি। এত দীর্ঘ সময় ফার্দিনান্দ নিজের অংশ নিয়ে তৃপ্ত থাকতে রাজি হয় না। অন্যদিকে বিধবা রানী ইসাবেলা ও নিজের শিশুপুত্রকে প্রস্তুত করতে থাকে তার অংশের জন্য। এদের ওপর আবার সন্ন্যাসী মার্তিনুজ্জী প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতে থাকে।

সুলতানের বিরুদ্ধে ফার্দিনান্দ ও তার নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্তিনুজ্জী ইসাবেলাকে রাজি করায় শিশু রাজার অংশ ফার্দিনান্দকে দিয়ে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য। এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ বসফরাসে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় মার্তিনুজ্জীকে। অন্যদিকে সুলতানের সৈন্যদল শিপ্পা দখল করে নেয়।

দুবছর পর কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে মার্তিনুজ্জী ফার্দিনান্দকে সাথে নিয়ে শিপ্পা দখল ও তাকে সমর্পণ করে সুলতানের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা চালায়। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে ফার্দিনান্দের সৈন্যরা হত্যা করে মার্তিনুজ্জীকে। মৃত্যুকালে তার শরীরে সৃষ্টি হয় তেষট্টিটি ক্ষত।

এরপর ১৫৫২ সালে তুর্কি সৈন্যরা আবারো দেশটিতে প্রবেশ করে তুর্কি দখলকৃত অঞ্চল বাড়িয়ে নেয়। কিন্তু শরতে পরাজয়ের ফলে তুর্কি বাহিনীর বিজয় রথে শ্লথ ভাব আসে।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করে ১৫৫৩ সালে সুলতান সুলেমান তৃতীয় ও শেষবারের মতো পারস্য অভিযানে অগ্রসর হন। কয়েকটি অঞ্চলে পারস্য সৈন্যরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে দেয় যে, পারস্য সৈন্যরা টরাসে প্রবেশপথ আটকে সিরিয়াকে হুমকির মাঝে ফেলে দিয়েছে। এ সময় সুলতান সুলেমান প্রস্তুত হয়ে উঠেন যথাযথ প্রতিউত্তর প্রদানের জন্য।

আলেপ্পাতে শীতকাল কাটিয়ে সুলতান ও তাঁর সৈন্যরা বসন্তে রওনা দেয়। এরপর ইউফ্রেটিসের ওপর অববাহিকা পার হয়ে পারস্য ভূমিতে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে পূর্বের যে কোনো আক্রমণের চেয়ে বেশি ক্ষয়-ক্ষতি করতে থাকে তুর্কিসৈন্যরা। সুলতানের বাহিনীর শক্তিমত্তা দেখে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে পারস্য বাহিনী খোলা ময়দানে তুর্কিদের সাথে মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয় এবং তুর্কিদের হাত থেকে দখলকৃত অঞ্চল মুক্ত করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অবশেষে ১৫৫৪ সালে যুদ্ধবিরতি ও এর পরের বছর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পারস্য ও অটোমান সুলতানের মাঝে।

এ রকমটাই ছিল সুলতান সুলেমানের এশিয়া অভিযান। যদিও তিনি মধ্য ইউরোপের অন্তস্থল, পারস্যের একেবারে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। কিন্তু পূর্বে অটোমান সাম্রাজ্য বাগদাদ, নিম্ন মেসোপটেমিয়া, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের প্রবেশমুখ এবং পারস্য উপসাগরের খানিকটা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে সুলতান সুলেমানের রাজত্বে কালে।

পারস্য অভিযানের প্রথম তিনটি তে সুলতানের প্রিয় প্রধান উজির ইব্রাহিম পাশা'র কর্মদক্ষতা কাজে লেগেছিল। অন্যদিকে তৃতীয় অভিযানের মুখ্য পরামর্শদাতা ছিলেন সুলতানের প্রিয়তমা রোজেলানা, ইউক্রোনিয়ান পিতার সন্তান রোজেলানা নিজের হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও সুশ্রী দেহ সৌষ্ঠব দিয়ে সুলতানকে সহজেই প্রভাবিত করে ফেলেন। এছাড়া ও সুলতানের সন্তানের জননী হয়ে ১৫৪১ সালে আইনগত ভাবেই স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে সেরাগলিও রাজপ্রাসাদে বসবাস করা শুরু করেন রোজেলানা।

এর আগে আর কোনো নারী সেরাগলিওতে থাকার সুযোগ পায়নি আগে। রোজেলানা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এ রাজপ্রাসাদেই ছিলেন।

অবশেষে ইব্রাহিম পাশার মৃত্যুর সাত বছর পরে রোজেলানা ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করেন প্রধান উজির হিসেবে রুস্তম পাশার নিয়োগদানের মাধ্যমে। রুস্তম পাশার সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দেন সুলতান ও রোজেলানা। এরপর প্রধান উজিরের হাতে সরকার পরিচালনার ভার ছেড়ে দিয়ে অনেকটা নির্ভর হয়ে পড়েন সুলতান। আর এই সুযোগে রোজেলানা ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু চরিত্রের সকল সহিষ্ণুতা ও নীতিবোধ সত্ত্বেও সুলতান সুলেমানের মাঝে ঠাণ্ডা মাথার নিষ্ঠুর একজন মানুষও বাস করত, যে কিনা নিজ শত্রুকে হটিয়ে দিতে কোনো কিছুতেই কার্পণ্য করত না। এ ব্যাপার কী করা যায়, সে ব্যাপারে রোজেলানায়ভালো ভাবেই জানতেন। রোজেলানা সুলতানকে তিনজন পুত্রসন্তান সেলিম, বায়েজীদ ও জাহাঙ্গীর উপহার দেন। যাদের মাঝে সেলিমকে সিংহাসনে আসীন হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন রোজেলানা। কিন্তু সুলতান সুলেমান তাঁর প্রধান পত্নী গুলবাহারের বড় সন্তান মুস্তাফাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চেয়েছিলেন। জানিসারিসরাও পিতার উত্তরসূরি হিসেবে মুস্তাফাকেও পছন্দ করত।

পারস্যে তৃতীয় অভিযানের পূর্বে সুলতান সুলেমান সৈন্যদের নেতৃত্বদানের জন্য প্রধান উজির রুস্তম পাশাকে ডেকে পাঠান। কিন্তু দূত মারফত রুস্তম পাশা খবর পাঠান যে, জানিসারিসরা বয়স্ক সুলতানের অধীনে নয়; বরঞ্চ মুস্তাফার নেতৃত্ব যুদ্ধ করতে চায়। এ ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে রোজেলানা সুলতানের মনের মাঝে মুস্তাফার নামে পিতৃহত্যা ও ক্ষমতা গ্রহণের ষড়যন্ত্রের বীজ ঢুকিয়ে দেয়। যেমনটা করেছিলেন পূর্ববর্তী সুলতান সেলিম, পিতা সুলতান দ্বিতীয় বায়েজীদের বিরুদ্ধে।

সুলতান প্রথম সুলেমান (১৫২০-৬৬), যাঁর শাসনামল অটোমান সাম্রাজ্যেকে শীর্ষচুড়ায় নিয়ে যায়। পূর্ণ প্রতিকৃতির পেছনে দিকে দেখা যাচ্ছে সুলেমানিয়ে মসজিদ।

এরপর নিজের কর্তব্য স্থির করার জন্য সুলতান মুফতি, ইসলামের শেখের কাছে যান। মুফতির কাছ থেকে "এক্ষেত্রে মৃত্যুই শ্রেয়" নামে শাস্তির বিধান পেয়ে সুলতান নিজের পুত্রকে ডেকে পাঠান আমাসিয়া থেকে। এক্ষেত্রে মুস্তাফা পড়ে যায় উভয় সংকটে। যদি সে রাগান্বিত হয়ে পিতাকে মোকাবেলা করত চাইত, তাহলেও বিপদ ছিল, আবার এ ঘটনা থেকে পালিয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হতো। আর তাই সাহসের সাথে পিতার সম্মুখে যাওয়াই মনস্থির করে মুস্তাফা।

পিতার তাঁবুতে প্রবেশ করা মাত্রই সুলতানের বাছাই করা কয়েকজন সৈন্য ঘিরে ধরে মুস্তাফাকে। বীরত্বের সাথে লড়েও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে মুস্তাফা।

কাপড়ে বেঁধে তার মৃতদেহ সেনাবাহিনীর তাঁবুর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্ষোভে ও হতাশায় ভেঙে পড়লেও প্রিয় নেতার মৃত্যুতে শক্তিহীন জানিসারিসরা কিছুই করতে পারে না।

এরপর তিন বছরের মাথায় রোজেলানা নিজে মৃত্যুবরণ করেন। তবে মৃত্যুর আগে সালতানাতে তাঁর দুই পুত্র সেলিম অথবা বায়েজীদ যে কোনো একজনের অভিষেক নিশ্চিত করে যান। ছোট পুত্র জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

সেলিম ও বায়েজীদ, একে অন্যকে অসম্ভব ঘৃণা করতেন। তাই পিতা সুলেমান সাম্রাজ্যের দুই অংশে দুজনকে পৃথক কাজের ভার দেন। কিন্তু কয়েক বছরেই মধ্যে দুই ভাইয়ের মাঝে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। পিতার বাহিনীর সাহায্য নিয়ে সেলিম ১৫৫৯ সালে বায়েজীদকে কন্যার কাছে পরাজিত করেন।

এরপর বায়েজীদ তাঁর চার পুত্র ও ছোট কিন্তু শক্তিশালী ও দক্ষ একদল সৈনিক নিয়ে পারস্যের থামাসে শাহর অধীনে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু প্রথম দিকে পারস্পরিক উপঢৌকনের বিনিময়ে বায়েজীদকে আশ্রয় দিলেও পরবর্তীতে অটোমান সেনাবাহিনীর সাথে আপোস করতে বাধ্য হয় শাহ। বিপুল পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বায়েজীদকে ইস্তাম্বুল থেকে আগত পেশাদার হত্যাকারীর হাতে তুলে দেয়া হয়।

এরপর বায়েজীদের চার পুত্র ও বার্সাতে থেকে যাওয়া পঞ্চম শিশুপুত্রও পিতার মতো একই ভাগ্য বরণ করে।

এভাবে সেলিমের পথে সিংহাসন বসার সমস্ত বাধা দূর হয়। একই সাথে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের ঘণ্টাও বেজে ওঠে।

॥ ১৭ ॥

পূর্ব দিকে সুলতান সুলেমানের বিজয় অভিযানসমূহের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। ১৫৩৮ সালে বারবারোসার নেতৃত্বে

অটোমান বাহিনী যখন পঞ্চম চার্লসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সে সময় সুয়েজ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত মিশরের পাশা সুলেমানের নেতৃত্বে আরো একটি অটোমান জাহাজ বহর যাত্রা শুরু করে ভারত মহাসাগরের উদ্দেশে। এ অঞ্চলে পর্তুগিজ বণিকরা ভয়ংকর রকম আধিপত্য বিরাজ করেছিল।

গুজরাতের মুসলিম শাসক বাহাদুর শাহ্ ও মোঘল সম্রাট হুমায়ুন উভয় পক্ষই পর্তুগিজ বিতাড়নে চিন্তিত হয়ে উঠেন।

সুলতান সুলেমান যথেষ্ট সহমর্মিতার সাথে উভয় মুসলমানের বক্তব্য শোনেন। আর ক্রুশের বিপক্ষে চন্দ্রের আধিপত্য তুলে ধরাকে নিজের দায়িত্ব হিসেবে মনে করতেন। অন্যদিকে অটোমান বাণিজ্যের পথে বাধা দিয়েও সুলতানের শত্রুতে পরিণত হয় পর্তুগিজরা। তারা হরমুজ দখল করে পারস্য উপসাগরে প্রবেশপথ আটকে রেখেছিল। একই ভাবে এডেন দখল করে লোহিত সাগর দখল করতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল পর্তুগিজরা। এছাড়াও তিউনিসে আটক খ্রিস্টান রাজার সাহায্যোর্থে নৌবাহিনী পাঠায় তারা। ফলে ক্রোধান্বিত সুলতান এশিয়া অভিযানের মনস্থির করেন।

কিন্তু মিশরের সুলেমান পাশা বয়সের ভারে এতটাই কাবু ছিলেন যে চারজন লোকের সাহায্য লাগাত নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে। কিন্তু তার যুদ্ধজাহাজ বহর ছিল সত্তুরটি জাহাজ, স্থলবাহিনী ও জানিসারিসদের সমন্বয়ে গঠিত অত্যন্ত দক্ষ ও তৎপর। সুর্তরাং লোহিত সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে তুর্কি জাহাজ বহর। এডেনে পৌঁছে এর শাসক শেখকে হত্যা করে শহর লুট করে এ অঞ্চলকে তুর্কি সানজাকে পরিণত করে সুলেমান পাশা।

কিন্তু এরপর সুলতানের আদেশ অনুযায়ী পর্তুগিজদের পিছু ধাওয়া না করে অনুকূল বাতাস পেয়ে পশ্চিম ভারতীয় উপকূলে যাত্রা করেন সুলেমান পাশা। এখানে জিউ দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করে পর্তুগিজদের দুর্গ বরাবর কামান তাক করেন পাশা। দুর্গের সৈন্যরা সাহসের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করে।

তুর্কিদের কাছে খবর পৌঁছায় যে গোয়ার বন্দরে পর্তুগিজ জাহাজ বহর তৈরি হচ্ছে। তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এই সময়ে এসে সুলেমান পাশা কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে মক্কায় তীর্থ যাত্রায় গমন করেন। পুরস্কারস্বরূপ সুলতানের উজিরদের মাঝে দিওয়ান পদ লাভ করেন। কিন্তু এর পরে পূর্ব ভারতের উপকূলে তুর্কিরা আর আসেনি।

কিন্তু তারপরেও সুলতান ও পর্তুগিজদের মাঝে প্রতিযোগিতা লেগেই ছিল। হারমুজ প্রণালি আটকে রেখে পারস্য উপসাগরে অটোমান বাণিজ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পর্তুগিজরা। ১৫৫১ সালে এদের হটাতে পিরিরেইজের নেতৃত্বে ত্রিশটি জাহাজের এক বহর পাঠান সুলতান। পিরিরেইজ গালিপল্লীতে জন্মগ্রহণ করা একজন নাবিক ছিলেন। এ বন্দর সম্পর্কে তুর্কি

ইতিহাসবিদ লিখে গেছেন যে, "এখানকার ছেলেমেয়েরা জলের মাঝে কুমিরের ন্যায় বড় হয়ে ওঠে। নৌকাই তাদের দোলনা।" বাস্তবিক সমুদ্র অভিজ্ঞতার মাঝে বড় হয়ে উঠায় পিরি একজন দক্ষ ভূগোলবিদ ছিলেন। আজিয়ান ভূমধ্যসাগর ও আমেরিকার একটি অংশসহ পৃথিবী প্রথম দিককার মানচিত্র তৈরি করেছিলেন তিনি। যুদ্ধের ময়দানে ওমানের মাস্কাট দখল করে হরমুজের আশপাশের অঞ্চলের ক্ষতি করলেও এর দুর্গ দখল করতে পারেননি পিরি।

এরপর তিনটি বড় জাহাজ ভর্তি মূল্যবান সম্পদসহ পর্তুগিজদের চোখের আড়ালে যেতে চাইলে একটি জাহাজ হারান তিনি। কিন্তু মিশরে নামার সাথে সাথেই অটোমান বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে কায়ারোতে মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর মুরাদ বে-কে এ দায়িত্ব দেয়া হলে সেও ব্যর্থ হলে পর আরেক অভিজ্ঞ সমুদ্র পুরুষ সিরি আলী রেইসকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনিও বিখ্যাত একজন লেখক ছিলেন। গণিত, জাহাজবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও কবিতা সম্পর্কে জ্ঞান ছিল তাঁর। তাঁর পোশাকি নাম ছিল কাতিবি রুমী।

হারিকেনের কবলে পড়ে কোনো মতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া সিরি গুজরাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে বাড়ি পৌঁছান। নিজের অভিজ্ঞতা, আরবি ও পারস্য উৎস থেকে পাওয়া জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ভারত মহাসাগর সম্পর্কে দরকারি সব তথ্য লিখে গেছেন তিনি। কিন্তু এসব সমুদ্রে সুলতান সুলেমান আর কখনোই আসেননি।

পূর্ব সুয়োজে আরো একটি সংক্ষিপ্ত অভিযান করেছিলেন সুলতান সুলেমান। মিশরে অটোমানদের জয়ের পর থেকে এর খ্রিস্টান শক্তিরা পর্তুগিজদের সাহায্যে কামনা করে আসছিল তুর্কিদের বিরুদ্ধে। এর উত্তরে ১৫৪০ সালে ভাস্কো-দা-গামার পুত্রের নেতৃত্বে পর্তুগিজরা আবিসিনিয়াতে সেনাবাহিনী পাঠায়। কাকতালীয় এ সময় এখানকার ক্ষমতায় ছিল তরুণ রাজা ক্লডিয়াস। পর্তুগিজদের সাথে নিয়ে ক্লডিয়াসের এই অভিযান হারিয়ে দেয়ার জন্য ১৫৫৭ সালে সুলতান সুলেমান লোহিত সাগরের দুর্গ মাসাওয়া দখল করে নেন। ক্লডিয়াস পালিয়ে যায় ও দুইবছর পর যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। আর কখনোই এই পর্বত ভূমি মুসলিম প্রতিবেশীদের কোনো হুমকির কারণ হয়নি।

বারবারোসার মৃত্যুর পর ভূমধ্যসাগরে ড্রাগুত সুলতানের জাহাজ বহরের প্রধান অ্যাডমিরাল হিসেবে নিয়োগ পায়। প্রথমেই জেরুজালেমের সেন্ট জন নাইটদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় ড্রাগুত ১৫৫১ সালে। এখানে নাইটদের পরাজিত করে ত্রিপোলী দখল করে এর গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত হয় ড্রাগুত।

১৫৫৮ সালে সম্রাট পঞ্চম চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী ও পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ ত্রিপোলী পুনর্দখলের জন্য মেসিনাতে বৃহৎ এক খ্রিস্টান সৈন্য বহর প্রস্তুত করে। কিন্তু তাকে বিস্মিত করে বিশাল এক অটোমান বহর এসে

পড়ে সময়মতো। গোল্ডেন হর্নে আগত অটোমান বহর দেখে আতঙ্কিত হয়ে খ্রিস্টান যোদ্ধারা ইটালিতে বাড়ির পথ ধরে। এই পরাজয়ে সমস্ত খ্রিস্টান শক্তিসমূহের মাথা নিচু হয়ে পড়ে। এরপর দ্রাগুত তার বাহিনী নিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালি হয়ে আটলান্টিকে পাড়ি জমায়।

এর ফলে খ্রিস্টানদের শক্তিশালী দখলে থাকা মাল্টায় প্রবেশের পথ খুলে যায়। ভূমধ্যসাগরে রাজত্ব করার জন্য সর্বশেষ এ বাধা অতিক্রম করার জন্য সুলতান সুলেমানকে কন্যা মিরিমাহ্ চাপ দিতে থাকে।

কিন্তু সত্তুর বছর বয়সী বৃদ্ধ সুলতান সুলেমান একা মাল্টার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে সাহস না পেয়ে নৌবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেন তরুণ প্রধান অ্যাডমিরাল পায়েল পাশা ও স্থলবাহিনীর দায়িত্ব দেন মুস্তাফা পাশার ওপর।

কিন্তু ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ করার ওপর দ্রাগুতের দক্ষতার ওপর সুলতান বিশেষভাবে ভরসা করেন। আর তাই দ্রাগুত ও উলুজ আলীকে এ অভিযানের পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

তাদের প্রধান শত্রু নাইটদের সেনাপ্রধান জ্যা দে লা ভ্যালে, একজন পরিশ্রমী ও উন্মাদ খ্রিস্ট বিশ্বাসী যোদ্ধা। সুলেমানের সাথে একই বছরে জন্মগ্রহণ করা ভ্যালে একজন দক্ষ সেনাপ্রধান ও একই সাথে ধর্মপ্রাণ নেতা।

দুর্গবেষ্টিত শহর মাল্টাতে প্রধান বন্দর মার্সা। তুর্কিদের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে এখানে অবস্থিত সেন্ট অ্যাঞ্জোলো ও সেন্ট মাইকেল দুর্গের পাশাপাশি নতুন দুর্গ সেন্ট এলমো তৈরি করা হয়। এই নতুন দুর্গের নকশা এমন হয় যে প্রধান বন্দর, মধ্য পোতাশ্রয় বা মার্সা মাস্কেট উভয়কেই নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হবে।

১৫৬৫ সালের মে মাসের ১৮ তারিখে মাল্টায় দিগন্তে শত্রুবহর দেখা দেয়। কিন্তু অভিযানের প্রথম থেকে সুলতানের অনুপস্থিতিতে পায়েল ও মুস্তাফা পাশার মাঝে বিভিন্ন মতভেদ দেখা দিতে থাকে। পায়েল পাশার দাবি অনুযায়ী জাহাজ বহরের নিরাপদ নোঙ্গরের সেন্ট এলমোকে প্রথমেই অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দুই সপ্তাহ পরে আসে দ্রাগুত।

মাত্র একশো জন নাইট নিজেদের জান বাজি রেখে হাজার হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। তাদের গোলান্দাজ বাহিনীর দক্ষতার জন্য তুর্কিরা ক্ষতির বেশি। কিন্তু তুর্কিরা যেমন ভাবে এ অভিযানকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছে; তেমনিভাবে খ্রিস্টানরাও ভ্যালের কথানুযায়ী শহরের শেষতম পাথরটি সুরক্ষিত থাকা পর্যন্ত ও যীশুর প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত ছিল।

এই সময়ে এসে দ্রাগুত নিজেদের ভুলের কারণ পর্যালোচনা করে মুস্তাফার সাথে পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা করতে বসেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ

খ্রিস্টানদের ছোড়া কামানের গোলার টুকরা এসে ড্রাগুতের মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি। নেতার মৃত্যুতে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় মুস্তাফা কাপড় দিয়ে ড্রাগুতের মৃতদেহ ঢেকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায়।

দুর্গের ভেতরে মাত্র নয়জন নাইট জীবিত ছিল যখন সেন্ট এলমোর পতন ঘটে। কিন্তু তুর্কিরা হারায় হাজারো প্রাণ। মুস্তাফা এরপর নাইটদের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিলে ভ্যালে অপমানজনক ভাবে উত্তর দেয় যে; জানিসারিদের লাশের পাহাড় গড়ে তোলার অভিপ্রায় আছে তার। ফলে মুস্তাফা বিজয়ী বীর সুলতান মাহমুদের ন্যায় আশিটি পাহাড়ের বহর প্রধান পোতাশ্রয়ের মাঝখানে পাঠিয়ে দেয়।

নাইটরা দুর্গদ্বয়ের ফটক বন্ধ করে দেয়। সমুদ্রের পাড়ের পানিতে উলঙ্গ মাল্টাবাসী, যারা বড় হয়েছে পানিতে, তাদের সাথে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করে অটোমান তুর্কিরা।

এরপর প্রায় দুই মাসব্যাপী মাল্টার প্রধান পোতাশ্রয় লক্ষ্য করে তুর্কিরা বিভিন্ন আক্রমণ চালায়। বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেও খ্রিস্টানদের তুলনায় তুর্কিরা ক্ষয়-ক্ষতি শিকার করছিল বেশি। প্রয়োজনীয় রসদ, অস্ত্রের অভাব, চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতায় জ্বর ও ডিসেনট্রিতে আক্রান্ত হয় তুর্কি সৈন্যরা। এছাড়াও সেপ্টেম্বর মাস চলে আসে। ফলে আবহাওয়াও হয়ে ওঠে প্রতিকূল। সব মিলিয়ে নৌ ও স্থলবাহিনীর সেনাপ্রধানের মাঝে নতুন করে মতভেদের আশঙ্কা তীব্রতর হয়ে ওঠে।

মুস্তাফা পাশা প্রয়োজন হলে শীতকাল দ্বীপে কাটাতে রাজি হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরাইখানা ও নিরাপদ বন্দর ব্যতীত এ জায়গায় পায়েল পাশা নিজের যুদ্ধজাহাজসমূহকে রাখতে রাজি হয় না।

কিন্তু হঠাৎ করে সিসিলি থেকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে খ্রিস্টান জাহাজের আগমনে ও পায়েল পাশা প্রতি-আক্রমণ বা বাধা না দেয়াতে মুস্তাফা পাশা নিজের সৈন্য নিয়ে স্থান ত্যাগে রাজি হয়ে যায়।

ফলে তুর্কি যুদ্ধজাহাজ বহর হাজার মাইল দূরত্বে বসফরাসে ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর সেনাবাহিনী মাত্র এক-চতুর্থাংশ প্রাণে বেঁচে ছিল। সুলতানের ব্যবহারের প্রতি ভীত হয়ে উভয় বাহিনী প্রধান নিজেদের আগে দূত মারফত খবর পাঠাতে মনস্থির করলেও, সুলতান আদেশ দেন যে অন্ধকারের পূর্বে এ বহর ইস্তাম্বুলে পৌঁছাতে পারবে না।

খ্রিস্টানদের দ্বিতীয় এ পরাজয়ে সুলতান সুলেমান ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মূলত এর মাধ্যমেই পুরো ভূমধ্যসাগরের ওপর অটোমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতানের প্রচেষ্টার ইতি ঘটে।

এই ব্যর্থতায় তিক্ততার সাথে বলে উঠেন সুলতান শুধু আমি সাথে থাকলেই আমার সেনাবাহিনী বিজয় লাভ করে।'

এটিই ছিল প্রকৃত সত্য। কেননা যৌথ ও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণের অভাবে মাল্টাতে অটোমান বাহিনী পরাজিত হয়। অথচ তরুণ বয়সে এই খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধে রোডস্ আইল্যান্ডে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন সুলতান সুলেমান কিন্তু নিজের জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন সুলতান।

মূলত রোজেলানার মৃত্যুর পর থেকে ব্যক্তিগত জীবনে একাকী হয়ে পড়া সুলতান জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। পরিচিতজনেরা দেখতে পায় স্বভাবসুলভ উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে সুলতানের রাজকীয় তনু। বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়া সুলতানকে কোনো বিজয়ের সংবাদই আর আনন্দিত করতে পারে না। তার ওপরে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন সুলতান সুলেমান। প্রায় সময়েই অজ্ঞান হয়ে পড়া নিত্য ব্যাপারে পরিণত হয়। সবাই বুঝতে পারে মৃত্যু বুঝি আসন্ন।

শেষ দিকে এসে কুসংস্কারপ্রবণ হয়ে উঠেন সুলতান। বালকদের সমবেত কণ্ঠে সংগীত ও বাজনা উপভোগপ্রিয় সুলতান পরকালে শাস্তির ভয়ে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ভেঙে আগুনে নিক্ষেপ করেন। রুপার তৈজসপত্র ছেড়ে মাটিতে বসে খাবার খেতেন। শহরের মাঝে সর্বত্র ওয়াইনের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। যেহেতু মদ্যপান বিষয়ে নবীজির নিষেধ রয়েছে। কিন্তু খাদ্যভ্যাসের হঠাৎ এ পরিবর্তন রোগ-ভোগ এমনকি মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে বিধায় দিওয়ান আদেশ দেন যে সপ্তাহে একবার সমুদ্র গেটে প্রয়োজনীয় ওয়াইন রেখে যাবে অ-মুসলিমদের জন্য।

কিন্তু মাল্টাতে নৌবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি কিছুতেই ম্লান হয়নি সুলতানের মন থেকে। ফলে বয়স এবং দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও আরেকটি সর্বশেষ বিজয়ের মাধ্যমেই কেবল অটোমান হস্ত প্রদর্শন হতে পারে। তাই পরবর্তী বসন্তে ব্যক্তিগতভাবে মাল্টা অভিযানের পরিকল্পনা করে আপাতত আবারো হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার মনস্থির করেন সুলতান সুলেমান। কেননা ফার্দিনান্দের উত্তরসূরি দ্বিতীয় ম্যাক্সিমিলান সুলতানকে কর দিতে অবহেলা শুরু করেছিল।

১৫৬৬ সালে পহেলা মে, ইস্তাম্বুল থেকে শেষবারের মতো বৃহৎ সেনাবাহিনী নিয়ে সুলতান সপ্তমবারের মতো হাঙ্গেরি আক্রমণ যাত্রা শুরু করেন। এটি ছিল সুলতানের ত্রয়োদশ অভিযান। চির পরিচিত দানিয়ুবের বন্যায় সুলতানের তাঁবু ভেসে গেলে প্রধান উজিরের তাঁবুতে উঠেন সুলতান। সেমলিনে এসে তরুণ জন সিগিসমুন্ডের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন সুলতান, যাকে শিশু বয়সেই হাঙ্গেরির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন তিনি পুত্রের মতো স্নেহে।

সেমলিন থেকে সুলতান সিগ্রেটে তুর্কিদের পুরাতন শত্রু কাউন্ট নিকোলাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মাত্র কিছুদিন পূর্বেই নিকোলাস সুলতানের প্রিয় এক সানজাক্ বেঁকে হত্যা করে সমস্ত সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে।

এরপর সিগেট-এর দুর্গে পৌঁছে দেখা যায়, স্বভাবসুলভ অবাধ্যতার বশে নিকোলাস দুর্গের ওপর ক্রুশ ঝুলিয়ে রেখেছে। শহরে পরাজয়ের পর দুর্গে আশ্রয় নেয়া নিকোলাস কালো পতাকা ঝুলিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। এ ধরনের বীরত্বে অভিভূত হলেও বিলম্ব হওয়ায় সুলতান সুলেমান নিকোলাসকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রত্যাখিত হন উত্তরে। এরপর সুলতানের আদেশে দুই সপ্তাহ পরিশ্রম করে দুর্গের নিচে মাইন ফিট করে সুলতানের সৈন্যরা বিপুল ধ্বংসলীলার মাধ্যমে মাইনটি বিস্ফোরিত হয়; দেয়াল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে।

কিন্তু সুলতান সুলেমান এ বিজয় দেখে যেতে পারেননি। এ রাতেই নিজের তাঁবুতে মৃত্যুবরণ করেন। হতে পারে উত্তেজনা সহ্য করতে না পারায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান তিনি। প্রধান উজির এ সংবাদ গোপন করে যায়। এমনকি এ উদ্দেশ্যে সুলতানের চিকিৎসকেও শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। ফলে যুদ্ধ বিজয় অর্জন পর্যন্ত চলতেই থাকে। তুর্কি সৈন্যরা আরো চার দিন ধরে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করে যায়। পুরো দুর্গ ধ্বংস হয়ে গেলেও একটি টাওয়ার ও নিকোলাস নিজের ছয়শ জীবিত সঙ্গীসহ রয়ে যায়। জানিসারিসরা যখন নিকোলাসের ওপর আক্রমণ করে, বৃহৎ মর্টার দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকে নিকোলাস। এরপর প্রায় খালি হাতে নিকোলাস মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সাথিদের নিয়ে তুর্কীদের সাথে লড়ে যায়। আর দুর্ভাগ্যবশত ছয়শ জন জীবিতের মাঝে মাত্র একজন শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে ছিল। নিকোলাসের শেষ কাজ ছিল টাওয়ারের নিচে একটি গুলির ম্যাগাজিনের ফিউজ জ্বালিয়ে রেখে যাওয়া। বিস্ফোরিত হয়ে প্রায় তিন হাজার তুর্কি মৃত্যুবরণ করে এর ফলে।

প্রধান উজির সোকুলুর মূল উদ্দেশ্যে ছিল সুলতানের পুত্র সেলিমকে নির্ঝঞ্ঝাটে সিংহাসনে বসানো। তাই খুব দ্রুত দূত পাঠিয়ে আনাতোলিয়াতে পিতার মৃত্যু সংবাদ দেয়া হয় তাকে। সেলিম এ সংবাদ গোপন করে রাখে আরো কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত। এর মাঝে সরকারি ও রাজকীয় কাজ পূর্বের মতোই চলতে থাকে; যেন বা সুলতান জীবিত আছেন। বিভিন্ন রাজ্যে সুলতানের নামে বিজয়ের সংবাদ পাঠিয়ে দেয়া হয়। পদোন্নতি, শূন্য পদে নিয়োগদান সবই চলতে থাকে পূর্বের মতো। সুলতান সুলেমানের অস্ত্রসহ নাড়িভূড়িকে কবর দিয়ে দেহ সুগন্ধি বস্তু দ্বারা ঢেকে দিয়ে পর্দা ঘেরা শিবিকা বা ডুলিতে বহন করে নিয়ে যাও নিজের গৃহে।

শুধু যখন সোকুলু জানতে পারে যে রাজুকুমার সেলিম সিংহাসন উপবেশনের জন্য ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন তখনি সৈন্যদের জানানো হয় যে তাদের সুলতান মৃত্যুবরণ করেছেন।

বেলগ্রেডের কাছে বনের বাইরে থেমে যায় সৈন্যরা। তারপর কোরআনের বাণী পড়া হয় মৃতের উদ্দেশ্য। সৈন্যরা নিয়মমতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে শোকের মাতম তুলে। প্রধান উজির এদের মাঝ দিয়ে হেঁটে গিয়ে মনে করিয়ে দেয় সুলতানের বীরত্বগাঁথা। এর পর ইস্তাম্বুলে নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনামতো সুলেমানিয়ে মসজিদ সমাহিত করা হয় সুলতান সুলেমানকে।

এভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের তাঁবুতে নিজের সৈন্যদের মাঝে মৃত্যু ঘটে অটোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সফল সুলতান সুলেমানের। এর ফলে মুসলিমদের চোখে পবিত্র যোদ্ধার মতো শহীদের শ্রদ্ধা লাভ করেন তিনি।

এটি ছিল একটি যোগ্য সমাপ্তি। পূর্ণ বয়সে, বিজয়ী অভিযানে মৃত্যু ঘটে সুলতানের, যিনি সারা জীবন মহান একটি সামরিক সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। বিজয়ী ও কর্মতৎপর সুলেমান এ সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করেছেন। নিরাপত্তা দিয়েছেন। আইন প্রণেতা হিসেবে এ সাম্রাজ্যেকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও নিজের মানবীয় নীতির মাধ্যমে সরকার ব্যবস্থাকে করেছেন আলোকিত। দেশনায়ক বা রাষ্ট্রনেতা হিসেবে পেয়েছেন বিশ্ব শক্তিকে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা। অটোমান সুলেমানদের মাঝে দশমতম ও মহান সুলতান হিসেবে সাম্রাজ্যকে শক্তি ও সম্মানের এমন এক চূড়ায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন, যা অজেয়।

কিন্তু তার সমস্ত অর্জনে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে পরবর্তীতে পানির নিচে তলিয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে ভগ্নদশা থেকে পতনের দিকে চলে যায়।

অধ্যায় চার

পতনের বীজ বপন

॥ ১৮ ॥

রেনেসাঁর বরপুত্র হিসেবে, একজন মহান তুর্কি সুলতান সুলেমান এমন মহতী ও জৌলুসভাবে জীবন-যাপন করতেন, যা সে সময়কার খ্রিস্টান পশ্চিমা সভ্যতাকেও হার মানিয়েছিল। সুলতান সুলেমানের নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন ছিল অভূতপূর্ব, তেমনি অন্যদের বিচার করার ক্ষেত্রেও তাঁর নীতিবোধ ছিল ত্রুটিহীন। নিজের রাজকীয় কর্মপদে পছন্দসই প্রার্থীদের নিয়োগ দিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর প্রধান উজিরদের মাঝে অন্তত দুজন খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত, যারা তাঁর রাজত্বকালের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে কাজ করেছে, নিজেদের গুণাবলি দ্বারা অটোমান সাম্রাজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ইব্রাহিম পাশা একজন গ্রিক, কূটনীতিবিদ ও সামরিক নেতা হিসেবে ছিলেন অসাধারণ; অন্যদিকে রুস্তম পাশা একজন বুলগেরিয়ান, নিজের অর্থনৈতিক জ্ঞানের দক্ষতা দিয়ে অটোমান খাজানাকে বৃদ্ধি করেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সুলতান সুলেমান নিজেই এমন দুটি ঘটনার পক্ষপাত করেছেন, যা সাম্রাজ্যের ভাগে দুর্ভাগ্যের কালি লেপন করেছে।

সুলতানের মানবিক দিক হেরে গেছে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে। সুলতান নিজের বড় পুত্র মুস্তাফা ও ছোট পুত্র বায়েজীদের মৃত্যু পরোয়ানায় সম্মতি দিয়েছিলেন। অথচ এই দুই পুত্রের সমস্ত গুণ ছিল পিতার মতোই সাম্রাজ্যের পরিচালনা ও বিস্তৃতি ঘটানোর। নিজের অন্ধদৃষ্টি ও ক্ষমার অযোগ্য কর্মের মাধ্যমে সুলতান সুলেমান অটোমান রাজবংশজুড়ে চলতে থাকা ভ্রাতৃহন্তা রীতিকে আরো ভয়ংকর পথে নিয়ে গেছেন। নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন পুত্র সেলিমকে। যার মাধ্যমে রোপিত হয় অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ।

সুলতান দ্বিতীয় সেলিম (১৫৬৬-৭৪), সুলেমানে'র ঠিক পরবর্তী সুলতান মদ্যপ হিসেবে যিনি পরিচিত ছিলেন।

রোজেলানার প্রতি নিজের বিবেচনাবোধবর্জিত অনুরাগের কারণে সুলতান সুলেমান তাঁর সারা জীবনের কাজকে অপাত্রে দান করে গেছেন। এমনকি এ বিষয়েও সন্দেহ আছে যে সেলিম সত্যিই সুলতানপুত্র কিনা অথচ হতে পারে তার স্লাভ মায়ের কোন অবৈধ পরিণতি।

খাটো ও ভারী শরীরের সেলিমের মাঝে সুলতান সুলেমানের কোনো বৈশিষ্ট্যই ছিল না। এমনকি সুলতান হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ ও প্রজাদের কাছ থেকে সম্মান লাভে ব্যর্থ হন তিনি। রাষ্ট্র পরিচালনা, তরবারির চমকানি; এসব কিছুতেই আগ্রহ ছিল না সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের। সেরাগলিও প্রাসাদে ভবিষ্যৎ কোনো চিন্তা ব্যতীত মদ্যপান ও কবিতা রচনায় দিন গুজরান করতেন তিনি।

অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি সুলতানের অনাগ্রহ মন্দের ভালো হিসেবে কাজ করেছে অটোমান সাম্রাজ্যে। সোকুলু পাশাকে সম্মানপূর্বক এই দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করেন সুলতান দ্বিতীয় সেলিম। শুধু তাই নয়, নিজের কন্যার বিবাহ দেন সোকুলু পাশার সাথে। মোটের ওপর সুলতান সুলেমানের প্রধান উজির নিয়োগদানের ওপর যথেষ্ট আস্থা ছিল সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের। এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের প্রথাই তৈরি হয়ে যায় যে, যুগে যুগে দুর্বল শাসকদের রক্ষা করতে সুদক্ষ প্রধান উজিরদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে অটোমান সাম্রাজ্যে। সোকুলুর হস্তক্ষেপে সুলেমানের তৈরি করা রাজনৈতিক কোনো পরিবর্তন আসার সুযোগ পায় না।

সোকুলু পাশা ছিলেন কর্মদক্ষ ও উচ্ছাকাঙ্ক্ষী একজন মানুষ। প্রথমত, হাঙ্গেরিতে সুলেমানের অভিযান শেষ করে ১৫৬৮ সালে হাবসবুর্গ সম্রাটের সাথে সম্মানসূচক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে সাম্যব্যস্থা ফিরিয়ে আনে সোকুলু। পরবর্তীতে সোকুলু অটোমান সেনাবাহিনীকে নতুন দিকে চালিত করে—রাশিয়া। প্রথম দিকে রাশিয়াকে তুর্কিরা কোনো হুমকি মনে না করায় ১৪৯২ সাল থেকে অটোমান দখলকৃত অঞ্চলে অবাধে বাণিজ্য অধিকার পেয়েছিল রাশিয়া। এরপর ভয়ংকর আইভানের আবির্ভাব ঘটে। ১৫৪৭ সালে ভার হিসেবে রাশিয়াকে সাম্রাজ্যে পরিণত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মেতে ওঠে আইভান।

দক্ষিণে সাম্রাজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য ক্রিমিয়ান উপকূলে হামলা করে সরাসরি অটোমান অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে আইভান। এ পর্যায়ে এসে সোকুলু সচেতন হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় দিকেই এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কেননা মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে মক্কা ও মদিনার নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল সুলতানের দায়িত্ব। অন্যদিকে আইভান ক্রিমিয়া দখল করে তুর্কিস্তানের মুসলমানের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছে। আবার

পারস্য সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ায় তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ীসহ সকল প্রকার চলাচলের সুযোগ হারায় মুসলিমরা।

সাম্রাজ্যের সম্পদ ও সামর্থ্যের ওপর ভরসা করে সোকুলু দক্ষিণে রাশিয়া ও এর বিস্তৃতি কাজকর্মকে রুখে দিতে পরিকল্পনা তৈরি করে। খাল খননের চিন্তা করে সোকুলু। যার মাধ্যমে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরকে এক করা যাবে। এর মাধ্যমে ককেশাস অঞ্চল ও তাবরিজের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়াতে পৌঁছানোর পথ খুলে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৌশলগত দিকে এ পথ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয় উঠবে যে মুসলিমদেরকে আইভান আর অবজ্ঞা করতে পারবে না। এ ধরনের একটি খালের পরিকল্পনা সোকুলুর প্রায় আঠারো শতক পূর্বে আকেজান্ডার দ্য গ্রেটের জেনারেল সেলুকাস নিকেটার কল্পনা করেছিলেন।

আগ্রহের সাথে কাজ শুরু করে সোকুলু। এ লক্ষ্যে ১৫৬৮ সালে বৃহৎ তুর্কি বাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হয় ডন অভিমুখে, যেখান থেকে স্থানীয় তাতারদের নিয়ে তুর্কি বাহিনী খাল খনন কাজ শুরু করবে।

প্রাথমিক কাজ শেষ হলেও ষোড়শ শতাব্দীর প্রকৌশল ও প্রয়োগিক জ্ঞান কাজে লাগিয়েও খনন কাজ চার ভাগের তিন ভাগ শেষ হওয়ার পরে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে ভলগার তীরে তুর্কিবাহিনী আটকা পড়ে মনোবল হারিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনচেতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রিমিয়ার খান, ডেভলেট ঘিরাই, নিজের অঞ্চলে সুলতানের বাহিনীকে অনুপ্রবেশের উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এ সময় রাতের পরিধিও কমে যায়—গ্রীষ্মে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা রাত থাকতো। নিদ্রার অভাব যা কাজেও প্রভাব ফেলবে, এ ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে ওঠে ডেভলেট। ফেরার পথে কৃষ্ণ সাগরে ঝড়ের মুখে পড়ে বহু অটোমান সেনা প্রাণ হারায়। সব মিলিয়ে সোকুলুর ডন ভলগা পরিকল্পনা কল্পনাই থেকে যায়।

এরপর আইভান ইস্তাম্বুলে দূত প্রেরণ করলে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয় উভয় রাজ্যের মাঝে।

কিন্তু পূর্ব দিকে বাণিজ্য করার ভূত নামেনি সোকুলুর মাথা থেকে। এ লক্ষ্যে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে সংযোগ করার জন্য সুয়েজ খালের পরিকল্পনা করে সোকুলু।

ইতিমধ্যে দক্ষিণে তিউনিসের দিকেও দৃষ্টি দেয় সোকুলু। পূর্বের মতোই স্পেনকে অটোমানদের প্রধান শত্রু বিবেচনা করে ফ্রেঞ্চদের সহায়তায় ভূমধ্যসাগর থেকে স্প্যানিয়ার্ডদের হটাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সোকুলু। এ কারণে ইসলামের রক্ষাকারী হিসেবে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে গ্রানাডার মুরদের সাহায্য প্রদানে রাজি হয়ে যায় সোকুলু।

কিন্তু এ পর্যায়ে এসে প্রথমবারের মতো সুলতান সেলিম নিজের দুই তোষামোদকারী পর্তুগিজ ব্যবসায়ী যোসেফ নাসি ও সুলতানের প্রিয়পাত্র লালা মুস্তাফার প্ররোচনায় তুলা, চিনি ও উন্নত মানের ওয়াইনের জন্য বিখ্যাত ভেনেশীয় দ্বীপ সাইপ্রাস দখলে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। আর এ লক্ষ্যে ভেনিসের সিনেট বাধা দিলে ১৫৭০ সালে সোকুলু যে সেনাবাহিনী মুরদের সাহায্যে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত রেখেছিল সে বাহিনীকে সাইপ্রাস আক্রমণে পাঠিয়ে দেন।

বেশ কিছুদিন ধরেই ভেনেশীয়রা নিজেদের ভূমধ্যসাগরীয় এ অঞ্চলের দিকে তেমন দৃষ্টি দেয়নি, ফলে এর জনসংখ্যার প্রায় বেশির ভাগ গ্রিক অর্থডক্স কৃষক সমাজ, যারা দাস হিসেবে ফ্রাঙ্কিশদের পদতলে পিষ্ট হয়ে বরঞ্চ তুর্কিদের বাহিনীতে যোগদান আগ্রহী হয়ে ওঠে। সুলতান সেলিমতো এক ফরমান জারির মাধ্যমে নিজের লোকদের সাবধান করে দেন যেন এ অঞ্চলের লোকদের কোনো অত্যাচার না করা হয় ও সম্পত্তিতেও হাত না দেয়া হয়।

লালা মুস্তাফা ও পায়েল পাশার নেতৃত্বে অটোমান বাহিনী ১৫৭০ সালে সাইপ্রাসে অবতরণ করে। পৌঁছানোর পর অটোমানরা স্থানীয়দের সাথে বিশেষ ভাবে ভালো ব্যবহার করার ফলে গ্রিক কৃষকরাও তাদের খাবার জোগান দেয়ার পাশাপাশি দ্বীপের রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সম্পর্কেও তথ্য দেয়।

অটোমান বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য ছিল ভেনেশীয় দুর্গ নিকোসিয়া ও ফামাগুস্তা দখল করা। ভেনেশীয়রা পূর্ব থেকেই তুর্কি আক্রমণ ঠেকাতে আধুনিক প্রকৌশলীর মাধ্যমে নিজেদের দুর্গের দেয়াল শক্তিশালী করে নেয়। কিন্তু মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যেই নিকোসিয়া তুর্কিদের হাতে আত্মসমর্পণ করে। শহর লুটপাট করে ক্যাথেড্রালকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়।

এরপর বসন্তে ফামাগুস্তা আক্রমণ করা হলে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে তিন মাস পর্যন্ত টিকে থাকে দুর্গটি। নিজেদের অশ্বারোহী বাহিনী পার করার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেঞ্চ ঘোড়ার জন্য তুর্কিবাহিনী একের পর এক মাইন ফাটিয়ে দুর্গের দেয়াল গর্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাহসের সাথে প্রতিহত করে ভেনেশীয়রা। তুর্কিদের আক্রমণ ঠেকাতে তারা এমন এক গাছ যা এ অঞ্চলেই পাওয়া যায়, জ্বালিয়ে দেয়। এ জ্বলন্ত গাছ থেকে এক ধরনের বিষময় গন্ধ বের হতে থাকে। কিন্তু ভেনেশীয়দের খাবার মজুদ শেষ হয়ে যায়। ফলে ঘোড়া, গাধা, কুকুর এমন সব পশুর খাবার খেয়ে দিন গুজরান করতে থাকে তারা। শেষ পর্যন্ত নিজেদের কাছ মাত্র সাত ব্যারেল পাউডার অবশিষ্ট থাকায় তুর্কিদের কাছে সম্মানজনক শর্তে আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কোনো পথ খোলা থাকে না।

লালা মুস্তাফা শর্তসমূহে রাজি হয়ে যায়, যার মাধ্যমে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের স্বাধীনতা রক্ষার পথ খোলা থাকে। কিন্তু ফামাগুস্তার গভর্নর

ব্রাগাজিনো মুস্তাফার সাথে দেখা করতে গেলে বাক-বিতণ্ডা বেধে যায় উভয়ের মাঝে। এরপর শিকল দিয়ে সারারাত বন্দি করে রাখা হয় ব্রাগাজিনাকে। পরদিন সকালে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে ফামাগুস্তার প্রধান চত্বরে ব্রাগাজিনোকে জীবিত জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

এর দুইবছর পর এক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ভেনিস এ দ্বীপটি সুলতানকে সমর্পণ করে। অটোমান রাষ্ট্রকে এর জমিসমূহ দিয়ে দেয়া হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এছাড়াও মধ্য আনাতোলিয়া থেকে বিপুল সংখ্যক জনগণকে এখানে এসে শূন্য জমিতে চাষ-বাসের জন্য স্থাপন করা হয়।

১৫৭১ সালে তুর্কিদের বিরুদ্ধে পোপতন্ত্র, স্পেন এবং ভেনিস একত্রিত করে মৈত্রী জোট গড়ে তোলে। বিভিন্ন ইটালীয় রাষ্ট্র ও মাল্টা থেকে আগত নাইটদের সমন্বয়ে অস্ট্রিয়ার ডন জনের নেতৃত্বে নৌবাহিনী যুদ্ধবহরের প্রস্তুতি নেয়। জনের নেতৃত্বে প্রায় ত্রিশ হাজার যুদ্ধবাজ সৈনিক ছিল। ভেনিস থেকে আগত এমন সব যুদ্ধ জাহাজ ছিল, যা এর আগে ভূমধ্যসাগরে আর দেখা যায়নি।

তুর্কি যুদ্ধজাহাজ বহরের নেতৃত্বে ছিল মুহসীনজাদে আলী পাশা।

১৫৭১ সালে ত্রি-মৈত্রী বাহিনী কর্ফুতে পৌঁছালে ফামাগুস্তাতে তুর্কি বাহিনীর কৃতকর্ম সম্পর্কে জানতে পারে ডন জন। ফলে আগুনে ঘি পড়ার মতো করে প্রতিশোধ উন্মত্ত হয়ে ওঠে খ্রিস্টান সৈন্যরা।

তুর্কি প্রধান অ্যাডমিরাল আলী পাশা ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী। উপসাগরের মাথায় খ্রিস্টান জাহাজ বহর দেখার সাথে সাথেই বিভিন্ন মত সত্ত্বেও তাৎক্ষণিক আক্রমণের নির্দেশ দেন। নিজের ক্লান্ত যোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে জয় করা খ্রিস্টান শহরের সংখ্যা মনে করিয়ে দেয়া হয়।

ফলে নতুন করে যুদ্ধযাত্রার জন্য তুর্কি জাহাজ বহর লেপান্তো উপসাগরে নিজেদের নিরাপদ নোঙ্গর স্থান ছেড়ে রওনা হয়। ইউরোপের ইতিহাসে এটিই ছিল শেষ ক্রুসেড।

১৫৭১ সালের অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে রবিবারে জাহাজজুড়ে ডন জন সমবেত প্রার্থনা শেষ করার সাথে সাথে দিগন্তজুড়ে দেখা দেয় তুর্কি জাহাজ বহর।

যুদ্ধের গঠন দিয়ে সাজানো হয় উভয় দিকে যুদ্ধ জাহাজসমূহকে। প্রথম দিকে উভয় দিকেই সমস্ত নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। একে অন্যকে পরীক্ষা করতে থাকে উভয় পক্ষ। বৃহৎ কামানের গোলা ছুড়ে দেওয়ার মাধ্যমে যুদ্ধের সূচনা করে খ্রিস্টান পক্ষ। ক্রমান্বয়ে তিনটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

ডান পাশে তুর্কিরা শত্রুদেরকে তীরের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। প্রতিপক্ষ হিসেবে ভেনেশীয়রা উপকূলেই শত্রুদের খতম করতে থাকে। উভয় পক্ষের কমান্ডারগণও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

কিন্তু মধ্যিখানে হতে থাকে প্রধান যুদ্ধ। যেখানে উভয় বাহিনী নিজ নিজ জাহাজ নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে। লা রিয়েল এবং সুলতানা। দুঘণ্টাব্যাপী ভয়ংকর যুদ্ধ চলে এখানে। কিন্তু দক্ষ গোলান্দাজ বাহিনী থাকায় এ যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টান অ্যাডমিরাল জয়ের দিকে এগিযে যেতে থাকে। এরপর ডন জন নিজ বোর্ডিং পার্টি নিয়ে আলী পাশার জাহাজ সুলতানের নেমে যায়। কিন্তু বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেও কপালে বুলেটের আঘাতে মৃত্যু হয় আলী পাশার। নিজের শত্রুকে শ্রদ্ধা করত ডন জন। বর্শার মাথায় করে লা রিয়েল ঝুলিয়ে দেয়া হয় আলী পাশার ছিন্ন মস্তক।

অটোমান যুদ্ধ পতাকা নামিয়ে ফেলে জাহাজসমূহ দখল করা হয়। তুর্কিরা পুনরায় তা দখল করতে চাইলেও ব্যর্থ হয়। আরো তিন ঘণ্টাব্যাপী দুর্ধর্ষ যুদ্ধের পর লেপান্তের যুদ্ধে খ্রিস্টানদের যুদ্ধ জয় নিশ্চিত হয়। প্রায় দুইশ ত্রিশটি অটোমান যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয় বা দখল করে নেয়া হয়।

বাঁ দিকে যুদ্ধ করা তুর্কিরা অবশ্য আরো একদিন যুদ্ধ করে যায়। উলুজ আলী দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে জিয়ান আন্দ্রে ডোরিয়ার সাথে যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানরাই জয় ছিনিয়ে নেয়, যা পরবর্তীতে "ডন কুইক্সোট" গ্রন্থে স্মরণ করা হয়।

খ্রিস্টানদের এ জয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে ইউরোপ। পোপ পঞ্চম পিউস দৈবভাবে ঠিক আলী পাশার মৃত্যু মুহূর্তেই খবর পেলেও পরবর্তীতে দূত মুখে নিশ্চিত হন।

ভেনিস ও স্পেনও যথাযথ এ উপসংহারে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত হয়। পরবর্তী বহু শতাব্দীজুড়ে লেপান্তোর এই বীরত্বগাথা নিয়ে রচিত হয় গান, কবিতা রূপকথা, শব্দমালা।

ইউরোপজুড়ে যখন আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে অটোমান রাজধানী ইস্তাম্বুলে জুড়ে হতাশা শুরু হয়। তিন দিন পর্যন্ত উপবাস ও নামাজ শেষে সুলতান সেলিম তাঁর অধীনে থাকা সব অঞ্চলে ভেনেশীয় ও স্প্যানিয়ার্ডদের নির্বিচারে হত্যার আদেশ দান করে। এর আগে এত বড় পরাজয় আর দেখেনি অটোমান তুর্কিরা। কিন্তু সোকুলু দক্ষতার সাথে সুলতানের দৃষ্টিকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়।

এরপর বছরের শেষ দিকে উলুজ আলী, যার নাম পরিবর্তন করে সুলতান রাখেন কিলিজ; অর্থ তরবারি প্রায় আশিটি জলযান নিয়ে গোল্ডেন হর্নে যাত্রা করে। পায়েল পাশা এবং সুলতান সেলিম এতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। সেলিম

নিজের ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দসহ রাজপ্রাসাদ সেরাগলিওর বাগানের একাংশে জাহাজ মেরামতের জায়গা করে দিলে পুরাতনের বদলে নতুন যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত হয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ বেঁচে যাওয়া সৈন্য ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ছড়িয়ে থাকা তুর্কি নৌসেনাদের নিয়ে যাত্রা করে কিলিজ।

এভাবে ১৫৭২ সালের বসন্তে পুনরায় সমুদ্রে রাজত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে অটোমান জাহাজ বহর। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে তারা এতটাই উন্নতি করেছিল, যা এ সময়কার খ্রিস্টান শক্তিসমূহের তুলনায় উন্নত ছিল।

তুর্কি বহর দেখে দমে যাওয়া ভেনেশীয়দের মাঝে আবার অটোমান অঞ্চলে বাণিজ্য করার সুযোগের আর্জি ওঠে। তাই ভেনেশীয় মন্ত্রী ইস্তাম্বুলে গিয়ে প্রধান উজিরের কাছে এক ধরনের সমঝোতার প্রস্তাব দিলে সোকুলু উত্তর দেয় "আমাদের এবং তোমাদের ক্ষতির মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তোমাদের সাইপ্রাস দখল করে আমরা তোমাদের একটি বাহু কেটে ফেলেছি। কিন্তু আমাদের নৌবাহিনীকে পরাজিত করে তোমরা আমাদের দাড়ি কামিয়ে দিয়েছ হয়তো। কেটে ফেলা বাহু আর কখনো নতুন করে হবে না। কিন্তু কামানো দাড়ি পূর্বের তুলনায় শক্ত হয়ে গজাবে।"

ফ্রান্সের রাজা নবম চার্লসও একই ভাবে শান্তিচুক্তির জন্য আলোচনার ডাক দিলে অবশ্য সক্রিয় সমর্থন লাভ করে। খ্রিস্টানরা যদিও লেপান্তোর যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল কিন্তু এরপরই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজ নিজ বন্দরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার পরেও এ বিজয় মানসিক ও নৈতিকভাবে উচ্চ আসনে বসায় খ্রিস্টানদের। কনস্টান্টিনোপলের পরাজয়ের পর থেকে পশ্চিমে যে তুর্কি জুজু ভর করেছিল, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

তুর্কিদের সম্মানের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন মোড় ছিল। কিন্তু সুলেমানের সাম্রাজ্যের শক্তি তখন পর্যন্ত পূর্বের মতো উচ্চতাতেই ছিল। সোকুলুর নেতৃত্বে একই ভাবে কেটে যায় আর বিশটি বছর।

সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু স্পেন। উভয়ের মাঝে গলার কাটাস্বরূপ অবস্থান তিউনিসের। ডন জনের নেতৃত্বে তুর্কিরা লেপান্তোর যুদ্ধের পর পরই তিউনিস ও হারায়। এর পরের বছরই কিলিজ আলী লেপান্তোর চেয়েও বহুগুণ বেশি শক্তি নিয়ে ফিরে আসেন। পরিপূর্ণভাবে চিরদিনের মতো অধিকার করে তিউনিস। এর সাথে লা গোলেটা দুর্গ, যা স্পেনের অধীনে ছিল বহুকাল ধরে।

১৫৭৮ সালে মরক্কোতেও তুর্কি প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে তুর্কি সাহায্য কামনা করে ফোজের শরীক। তুর্কিরা খুশি মনেই এ সাহায্য করে। ফলাফলে পর্তুগালের বিপক্ষে বৃহৎ একটি যুদ্ধেও জয়লাভ করে তুর্কিরা।

তিউনিস দখলের কিছুদিন পার হতে না হতেই মারা যান সুলতান সেলিম। কুসংস্কারে বিশ্বাসী সেলিম নিজের শেষ দেখতে পেয়েছিলেন

ধূমকেতুর আবির্ভাবে, কনস্টান্টিনোপলে ভয়ংকর ভূমিকম্পে, মক্কার পবিত্র ভূমিতে বন্যায় আর সবকিছুর ওপর সেরাগলিও প্রাসাদের রান্নাঘরে আগুন লেগে যায়। যার ফলে ওয়াইনের ভাঁড়ার ঘর পুড়ে যায়। চিন্তিত সুলতান তুর্কি স্নানঘরে ভ্রমণ করতে যান পুরো এক বোতল সাইপ্রাস ওয়াইন পান করে। স্নানঘরের নির্মাণকাজ মাত্রই শেষ হয়েছিল। তখনো ভালো করে শুকায়ওনি। মদ্যপ সুলতান মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে জ্বরে আক্রান্ত হন। এভাবে তুর্কি সুলতানের জীবনাবসান হয়।

সেলিমের রাজত্বকাল কোনো সুফল বয়ে আনেনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুও হয়েছে অসময়ে। মাহমুদ সোকুলু সেলিমের পুত্র তৃতীয় মুরাদের অভিষেক নিশ্চিত করে। কিন্তু মুরাদ সোকুলুর ক্ষমতাকে কর্তন করে আর এভাবে সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি কিছু সময়ের জন্য সুলেমানের সময়কার মতো স্থির ও শান্তিপূর্ণ হয়।

ইস্তাম্বুলে পৌঁছে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ক্লান্ত ম্যাগনেসিয়ার গভর্নর মুরাদ প্রথমেই নির্দেশ দেন নিজের পাঁচ ভাইকে হত্যা করার। মুরাদ তাঁর পিতার মতো ওয়াইন আসক্ত ছিল না। ওপরন্তু সুলতান হিসেবে তাঁর জারীকৃত প্রথম ফরমান ছিল ওয়াইন পানের বিরুদ্ধে। একশ্রেণীর জানিসারিস এ ঘোষণার বিদ্রোহ করলে পুনরায় তাদেরকে ওয়াইন পানের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু কোনো প্রকার ভায়োলেন্স সৃষ্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি বহাল থাকে।

মুরাদের নিজস্ব কিছু বদভ্যাস ছিল। ধনলিপ্সা ও কামুকতা ছিল এদের মধ্যে বিশেষ দুটি। উন্মাদের মতোই নারী ও স্বর্ণপ্রীতি ছিল তাঁর। সুলেমানের মৃত্যুর পর থেকে রাজ্যের ধন-সম্পদ সপ্তম টাওয়ারে থাকত। এ দুর্গের একটি টাওয়ারে ছিল স্বর্ণ, আরেকটিতে রুপা, তৃতীয়টিতে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত প্লেট, মণি-মুক্তা, চতুর্থটিতে মূল্যবান প্রাচীন জিনিসের সংগ্রহ, পঞ্চমটিতে পারস্য ও মিশর থেকে আনা প্রাচীন দ্রব্য, ষষ্ঠটি ছিল অস্ত্রাগার ও সপ্তমটি পূর্ণ ছিল রাষ্ট্রীয় কাগজাদিতে। দ্বিতীয় সেলিম নিজস্ব খাজানাতে প্রায় সব সরিয়ে ফেলায় সপ্তম টাওয়ার মূলত কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু তৃতীয় মুরাদ তাঁর থেকে আরো এক ধাপে এগিয়ে তিনটি তালা সংযোগে গঠিত বিশেষ ভল্ট তৈরি করান সম্পদ রক্ষার্থে। আর নিজের পুরো রাজত্বকালজুড়ে এর ওপর নিদ্রা যেতেন। বছরে মাত্র চারবার নতুন সম্পদ রাখার জন্যই এ তালাসমূহ খোলা হতো।

মুরাদ নিজের চারপাশে রাখতেন অসংখ্য তোষামোদকারী। আর সাম্রাজ্যের চার স্তম্ভের ন্যায় চার নারী মুরাদের সমগ্র জীবন শাসন করে। প্রথম জন ছিলেন তাঁর মা। দ্বিতীয় জন ছিলেন তাঁর ভগিনী, সোকুলুর স্ত্রী। আরেক জন ছিলেন একজন ভেনেশীয় নারী ও সুলতানের বড় পুত্র মাহমুদের মাতা,

সাফিয়ে। সাফিয়ের আকর্ষণ থেকে সুলতানের মনোযোগ হটাতে তাঁর মা এক রাতে দুতিনজন রমণী উপভোগের অনুমতি দান করেন সুলতানকে। এর ফলে দেখা যায় ইস্তাম্বুলের দাস মার্কেটে যুবতী মেয়েদের দাম বেড়ে যায়।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ নারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে জানা ফিদা। এ নারীক সুলতানের মা মৃত্যুকালে হারেমের প্রধান নির্বাচন করে যায়। আর যেহেতু সুলতানের মা নিজে তাঁর সাথে বিছানায় যেতে পারত না তাই সমষ্টিগতভাবে অন্যদের দিয়ে রাজ্যের ব্যাপারে সুলতানের ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালাত তারা। কিন্তু তারপরেও সাফিয়ের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। সুলতানের ওপর নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে সেন্ট মার্ক আক্রমণ প্রতিহত করা, ভেনিসের জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুবিধাদি আদায় করে দেয় সাফিয়ে।

নারীর মতোই স্বর্ণ মূল্যবান ছিল মুরাদের কাছে। ফলে ঘুষ দেয়া-নেয়ার প্রক্রিয়া শীঘ্রই এমন এক অবস্থাতে পৌঁছে যে সমস্ত দাপ্তরিক পদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে প্রভাব ও পূর্ব থেকে স্বর্ণের মাধ্যমে নিশ্চয়তা আদায় করা যেত। এমনকি নির্দিষ্ট পরিমাণের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে সুলতানকেও খরিদ করা যেত। এ কাজে সর্বত উৎসাহ জোগায় সুলতানের প্রিয় পাত্র শেমশি পাশা। শেমশি নিজেকে সেলজুকদের বংশধর দাবি করত। সুতরাং অটোমানরা ছিল তার শত্রু। তার জীবনীকারের লেখাতে পাওয়া যায় যে, এক উপলক্ষে নিজের মুখে স্বীকার করে শেমশি, "শেষ পর্যন্ত এই অটোমান হাউসে দাঁড়িয়ে আমি আমার বংশকে প্রতিশোধ নিয়ে দিতে পেরেছি। যেভাবে তারা আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে, সেভাবে আমিও এর ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করছি।"

লালা মুস্তাফা পাশার মতো শেমশি পাশাও সোকুলুর শত্রু ছিল। শেমশিকে দুর্নীতির পথ থেকে ফেরাতে পারেননি সোকুলু। মুরাদের অভিষেকের পর চার বছর পর্যন্ত টিকে ছিলেন তিনি।

১৫৭৮ সালে মুস্তাফা পাশার নেতৃত্বে অটোমান বাহিনী জর্জিয়ার বৃহৎ অংশ দখল করে নেয়।

এভাবে করে দাখেস্তানে অনুপ্রবেশ করে কাস্পিয়ানের তীরে পৌঁছে যায় অটোমান বাহিনী। কিন্তু পারস্য বাহিনী ধীরে ধীরে শক্ত হাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললে এ যুদ্ধ গড়ায় পরবর্তী বারো বছর পর্যন্ত। এরই মাঝে পারস্যের বিরুদ্ধে কার্জে শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তোলে অটোমান বাহিনী।

কিন্তু জর্জিয়া, আজারবাইজান, তাবরিজ প্রভৃতি দখলীকৃত অঞ্চলসমূহ ধরে রাখা ছিল কষ্টসাধ্য। এখানকার বেশির ভাগ জনগণ ছিল শিয়া অনুসারী ও এ উদ্দেশ্যে পারস্যের অনুগত। মোটের ওপর পরোক্ষভাবে শাহর শাসন ও কেন্দ্রীয়ভাবে সুলতানের শাসন কায়েমে তৎপর হয় অটোমান বাহিনী। কেননা ইস্তাম্বুল থেকে দূরত্ব বেশি হওয়ায় যাতায়াত ও রসদ পৌঁছানোতে সমস্যা

ছিল। এ সমস্ত কারণে সোকুলু স্থলপথে এ ধরনের সামরিক অভিযানের বিরোধি ছিলেন।

ইতিমধ্যে রাজদরবারে সোকুলুর শত্রুরা মেতে ওঠে তার বিরুদ্ধে। প্রথমত, বিভিন্ন অজুহাতে তার কাছের বন্ধুদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অবশেষে সোকুলু নিজেও তার প্রাসাদে দরবেশের বেশে আসা আততায়ীর ছুরির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন।

ঠিক মৃত্যুর পূর্বে সন্ধ্যাতেই সোকুলুকে কসোভোর যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতান প্রথম মুরাদকে হত্যার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি চিৎকার করে উত্তর দেন, "ঈশ্বর আমাকেও একইভাবে মৃত্যু দিন।" তাই-ই ঘটে। তার মৃত্যুতে এক ভেনেশীয় দূত লিখে গেছেন, "মাহমুদ সোকুলুর সাথে তুর্কি গুণাবলিসমূহ ও সমাধিতে ডুবে গেছে।"

॥ ১৯ ॥

অটোমান সাম্রাজ্য পুরোটাই বির্বতিত হয়েছিল সুলতানের সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের পতন চূড়ান্ত করে। সুলতানের দায়িত্বে অবহেলা, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মনোযোগের অভাব, সরকারের দায়িত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতিসমূহের মাঝে সামঞ্জস্যের অভাব প্রভৃতি সব কিছুতেই সাম্রাজ্যের বিদায় ঘণ্টা বাজতে থাকে। এর মাধ্যমে কিছু সময়ের জন্য হলেও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অটোমান সাম্রাজ্য তার প্রধান যে লক্ষ্য ইউরোপে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ তা থেকে সরে এসেছে। এর মাধ্যমে অটোমান তুর্কিরা সম্পদ আহরণের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করতে পারত। কিন্তু এ সুযোগ কমে আসায় শত্রু না পেয়ে নিজেরাই নিজেদের মাঝে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। জমির অভাবে শহর অথবা গ্রামাঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

জমি পুনঃসংস্কারের ক্ষেত্রে সুলেমানের উদ্যোগের ভুলসমূহও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সময়ের সাথে সাথে দেখা দেয় যে, প্রধান জমির বণ্টন মূলত রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় তুর্কি অভিযানের অভাবে কৃষকদের ওপর করের বোঝা চেপে বসে। অন্যদিকে আধুনিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে সিপাহিদের গুরুত্ব কমে যায়। ধীরে ধীরে দেখা যায় যেসব অভিযানে কষ্ট ও বিপদ আছে, কিন্তু বস্তুগত লাভের সম্ভাবনা কম, সেসব অভিযানে সিপাহিরা আর আগ্রহ পেত না।

রাজধানীতে সরকারি কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। পূর্বে মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সুলতানের বাছাই করা খ্রিস্টানরাই প্রাসাদের কাজে নিয়োগ পেত। কিন্তু ধীরে ধীর শহরে বেড়ে

উঠা কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী মুসলিম প্রভাব খাটিয়ে, ঘুষ দিয়ে এ পদ পেত। শুধু তাই নয়, নিজের উত্তরাধিকারীদের দিয়ে যেতে পারত এ পদ।

অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ক্ষেত্রে এ সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে আস্তে আস্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রথমেই ছিল কৃষিজমির তুলনায় জনসংখ্যা বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, দাম বেড়ে যায়। সবকিছুর মূল্য বেড়ে যাওয়ায় অটোমান রৌপ্য মুদ্রার মান কমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে অটোমান সরকার ১৫৮৪ সালে এর মুদ্রার মানকে ইচ্ছামতো কমিয়ে দেয়। স্বর্ণ মুদ্রার মান পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। রৌপ্য কয়েন গলিয়ে ধাতু মিশিয়ে পাতলা এক ধরনের কয়েন তৈরি করা হয়, যা ছিল (একজন সমসাময়িক তুর্কি ইতিহাসবিদদের ভাষায়) "আমন্ড গাছের পাতার মতো হালকা ও শিশিরের বিন্দুর মতোই মূল্যহীন।" সংকট এতটাই গভীর হয়ে ওঠে যে সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা প্রদানেও সমস্যা দেখা দেয়। ফল বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ঠেকানো দায় হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ষোড়শ শতাব্দীজুড়ে সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ইউরোপে সাম্রাজ্যের আর বিস্তৃতি না ঘটায় উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বসতি স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয়। শুধু সাইপ্রাস বিজয়ের পর এ ধরনের একটি সম্ভাবনা দেখা দিলেও আর কোনো উৎস দেখা যায়নি।

বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দেখা দেয় বেকার সমস্যা। ফলে গৃহহীন জমিহীন এসব কৃষকরা দিন দিন ঝুঁকে পড়ে বিভিন্ন অন্যায় কাজে। দেশজুড়ে দেখা দেয় মূল্যবৃদ্ধি, পণ্যে ভেজাল মেশানো, মুদ্রা জাল করা, ফটকাবাজি, চড়া সুদের ব্যবসা ও অতিরিক্ত সুদের কারবার।

রাজ খাজানা শূন্য হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর এর পুরো বোঝা চেপে বসে কৃষকদের ওপর। নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের মাঝে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব প্রকট হয়ে পড়ে। এর ফলে বিভিন্ন দপ্তরে সামরিক, নাগরিক যাই হোক না কেন, শুরু হয় ঘুষ লেনদেন। এছাড়া বিভিন্ন বেআইনি পথে কৃষকদের ওপর অত্যাচার ও পীড়ন শুরু হয়।

অন্যান্যদের মতো বিচার বিভাগের কর্মীরাও হয়ে পড়ে দূনীতিগ্রস্ত। সুলতানের বিভিন্ন আদেশকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করত বিচারকেরা। আবার বেশি অর্থের বিনিময়ে চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগ পেত। এ রকম বিভিন্ন কাজে কৃষকরা বাধ্য হয়ে অনেক সময় প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ হারে সুদ নিত। আর এ অর্থ ফেরত দিতে না পেরে দাসে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তাদের।

সামন্তবাদী সিপাহিদের স্থান পূরণে সরকার বাধ্য হয় নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। এ কারণে পূর্বের মতো শুধু খ্রিস্টান বংশোদ্ভূতদের দিয়ে জানিসারিস বা সুলতানের নিজস্ব বাহিনী গঠনে সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণে প্রথমবারের মতো মুসলিম প্রজাদের মধ্য থেকে নিয়োগদান শুরু হয়। এ ধরনের নতুন মিশ্র বাহিনী গঠনে দলগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নিয়মানুবর্তিতা দলীয় সৌহার্দ্য প্রভৃতি সবকিছুতে বিস্তর সমস্যা দেখা দেয়।

এদিকে আবার জানিসারিসরা ইতিমধ্যে ব্যারাকে সময় না কাটিয়ে অলসতা দূর করতে বিভিন্ন পণ্যের কারিগর হিসেবে কাজ শুরু করে। এর ফলে প্রথমবারের মতো ব্যবসায় যুক্ত হয়ে এরা ইস্তাম্বুলের শহুরে শ্রেণীর সাথে মেশার সুযোগ পায়। আর এভাবে দলীয় শৃঙ্খলা ভুলে যুদ্ধের আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে থাকে। এর সাথে আরো যুক্ত হয় সুলেমানের আমল থেকে। তারা এভাবে উত্তরাধিকারের চিন্তাভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সুলতান চতুর্থ মুরাদের সময় জানিসারিস ও সুলতানের অন্যান্য গৃহস্থালির কাজে শুধু খ্রিস্টান দাসদের নিয়োগের প্রথা বাতিল হয়ে যায়।

ষোড়শ শতকের পর থেকে জানিসারিসরা তাদের প্রভু সুলতানের মতোই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। ১৫৮৯ সালে সুলতান তৃতীয় মুরাদের সময় ভয়ংকর সমস্যার উদ্রেগ করে এ বাহিনী। দলে দলে গিয়ে হাজির হয় সেরাগলিও প্রাসাদে। নিজেদের বেতন-ভাতায় ব্যবহৃত মুদ্রাতে জাল করার জন্য দিওয়ানের ওপর চড়াও হয় তারা।

এরপর ১৫৯৩ সালে সুলতানের নিয়মিত প্রহরি অশ্বারোহী বাহিনী বিদ্রোহ করে। এদের ঠেকাতে গিয়ে জানিসারিসরা আবারো শৃঙ্খলিত হয়। আর এভাবে দুবাহিনীর মাঝে গড়ে ওঠে শত্রুতা। এরকমভাবে সাম্রাজ্যজুড়ে জানিসারিস ও সুলতানের বাহিনী দিন দিন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এমনকি প্রজা রাজ্য মলদোভিয়াতে জানিসারিসরা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগদানে বাধ্য করে। গভর্নর হিসেবে এর প্রধানকেও অবশ্য তারাই পরবর্তীতে স্বার্থ রক্ষা না হওয়ায় ইস্তাম্বুলে হত্যা করে।

১৫৯৬ সালের পর আনাতোলিয়াতে আরো জটিল এক সমস্যার উদ্ভব হয়। জেলালিস নামে নতুন বিদ্রোহী দলের উন্মেষ ঘটে। প্রাদেশিক সেনাবাহিনী হিসেবে স্কোনরা অস্ত্র বহন করত। জেলালিসদের সাথে এদের সখ্য গড়ে ওঠে। শান্তির সময়ে কোনো কাজ না থাকায় সেকানরা বেতন পেত না আর এভাবে ডাকাতি ও রাহাজানিতে মত্ত হয়ে ওঠে এরা।

সেকান, জেলালিস, তুর্কমান কুর্দি, সিপাহি ও সাজাপ্রাপ্ত ইউরোপীয় পলাতক সৈন্য সবাই একত্রে মিলে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।
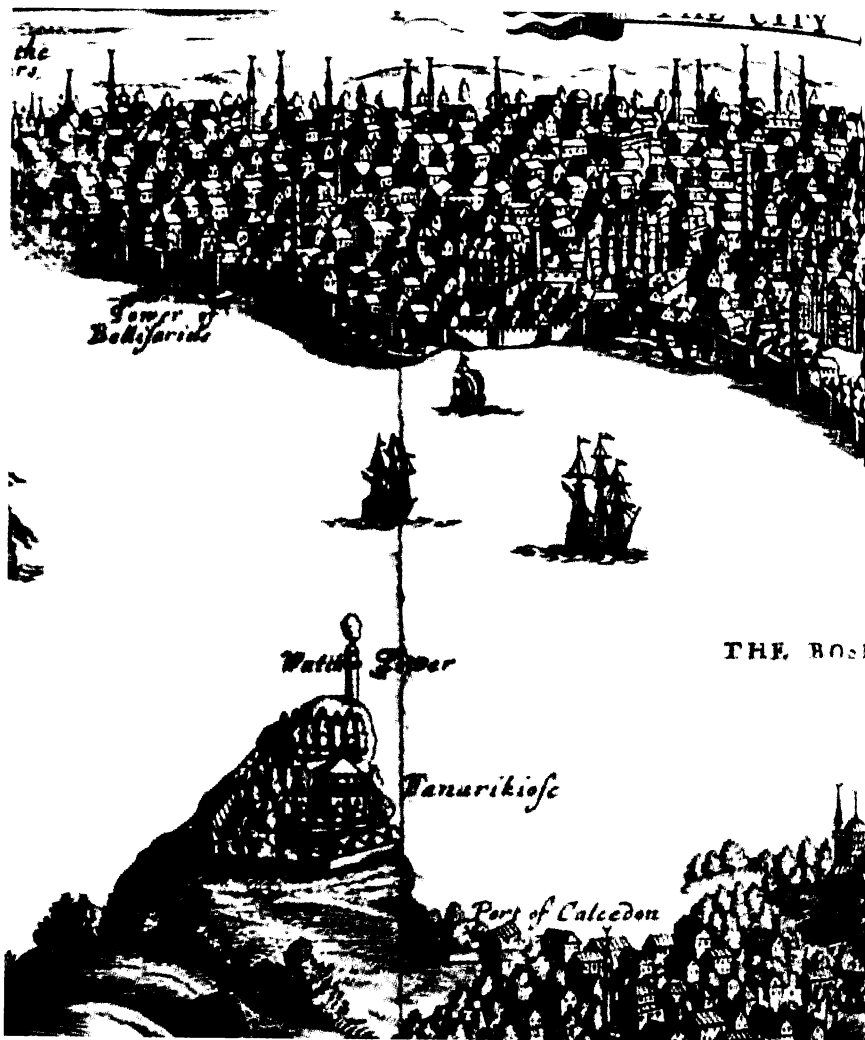
সপ্তদশ শতকের ইস্তাম্বুলের চিত্র। এশীয় তীরভূমি থেকে শুরু এ দেশের মধ্যখানে বসফরাস।

Constantine's Palace
Custom house
HARBOUR
GALATA
Point of the Serraglio
Magazine
Tophana
THRACE
Scutari
Maiden Tower
Tower or of Leand
CANAL OF THE
BLACK SEA
Scutari

এদের বিরুদ্ধে সরকার দুজন কমান্ডার পাঠালে বরঞ্চ এরাও বিদ্রোহীদের সাথে মিশে দল গড়ে তোলে ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। মধ্য আনাতোলিয়ার শহরসমূহকে কর প্রদানে বাধ্য করে এরা বিশাল বড় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। সরকার পুনরায় এদের দমনে বাহিনী পাঠালে উর্ফা দুর্গ হতে প্রতিরোধ করে বিদ্রোহী দল। বিদ্রোহী নেতা কারার মৃত্যু হলে তার ভ্রাতার নেতৃত্বে আনাতোলিয়া জুড়ে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এই ডেলি হাসানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় কৃষকরা ঘরবাড়ি ছেড়ে দলে দলে দেশ ছাড়ে। ধনী আনাতোলীয়ারা ইস্তাম্বুলে, রুমেলি ক্রিমিয়াতে চলে যায়।

এরপর কেন্দ্রীয় গভর্নরের হস্তক্ষেপে ডেলি হাসানকে বসনিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করে এ অবস্থা খানিকটা প্রশমিত হয়। কিন্তু এখানেও সে তার বাহিনী নিয়ে ইউরোপে সমস্যা করলে অবশেষে ১৬০৩ সালে দানিয়ুবের তীরে হাঙ্গেরির বাহিনীর কাছে সমাপ্তি ঘটে এ বিদ্রোহী নেতার।

আনাতোলিয়াতে সমস্যা লেগেই থাকে। কৃষিকাজ না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কৃষকদের জমি সামরিক নেতারা বেদখল করে নেয়। পশু পালনের জন্য খামার গড়ে তুললে আনাতোলিয়া জুড়ে কৃষিকাজের ধরন বদলে যায়।

জেলালিসদের বিদ্রোহের কারণে পুনরায় পারস্য আক্রমণের প্রচেষ্টা নষ্ট হয় অটোমান সরকারের। এই সুযোগে ১৬০৩ সালে শাহ আব্বাস তাবরিজ দখল করে নেয় ও অটোমান দুর্গ কার্জ দখল করে নেয়। পাঁচ বছরের মধ্যে তুর্কি অধিকৃত বিভিন্ন পারস্য ভূমি পুনর্দখল করে ককেশাস অঞ্চলে অটোমান নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দেয় শাহ আব্বাস। ১৬১২ সালে এক শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুর্কিরা ১৫৯০ সালে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পাওয়া বেশ কয়েকটি ভূখণ্ডের মালিকানা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

এরই মাঝে অটোমান সিংহাসনে অভিষেক ঘটে সুলতান প্রথম আহমেদের। সুলতান তৃতীয় মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় মাহমুদ অটোমান ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভ্রাতৃহন্তার আত্মত্যাগের ঘটনা ঘটিয়ে নিজের উনিশ জন ভাইকে হত্যা করে। এমনকি হারেমে গর্ভবতী অবস্থায় থাকা ভাইদের প্রিয় দাসিদেরও বস্তাবন্দি করে বসফরাসে নিক্ষেপ করা হয়। যেন তারা সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে কাউকে জন্ম দিতে না পারে।

সুলতান তৃতীয় মাহমুদ ছিলেন প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে অভিজ্ঞতা লাভ করা শেষ সুলতান। এর পর থেকে সব রাজকুমারকে প্রায় খাঁচাস্বরূপ সেরাগলিও রাজপ্রাসাদে দিন কাটাতে হতো বিদ্রোহের ভয়ে।

মাহমুদের ওপর তাঁর ভেনেশীয়া মা সুলতানা ভালিদে'র প্রভাব ছিল বেশি। প্রভাব বলয় থেকে পুত্রকে হারানোর ভয়ে তিনি মাহমুদকে ইস্তাম্বুলের বাইরে যেতে না দিয়ে নারীসঙ্গের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন।

কিন্তু ১৫৯৬ সালে সুলতান মাহমুদ ইউরোপে যাত্রা করেন সেনাবাহিনী নিয়ে।

অটোমান বাহিনী আরলার্ড অবরোধ ও দখল করে নেয়। কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতায় ভীত হয়ে সুলতান পশ্চাদপসরণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু যুদ্ধকালীন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের পর নবীজির স্তম্ভ হাতে নিয়ে বাহিনীর সাথে থাকতে মনস্থির করেন। হাওয়া বইতে থাকে উল্টো দিকে। শত্রুর ঘাঁটিতে হামলা করতে গিয়ে খ্রিস্টানরা নিজেদের শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলে। তুর্কিরা এ সুযোগে চড়াও হয়ে বিনাশ করে ফেলে তাদের।

খ্রিস্টানদের এ পরাজয়ে ত্রিশ হাজারের বেশি জার্মান ও হাঙ্গেরীয় সেনা নিহত হয়। বিভিন্ন লুণ্ঠনদ্রব্যের মাঝে নিখুঁত কারুকাজের একশটি কামানও লাভ করে তুর্কিরা। তুর্কিরা এ জয়ের সুবাদে উত্তর দানিয়ুবের প্রায় বেশির ভাগ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়। আরো কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখতে সমর্থ হয় তারা।

বিজয়ের বেশে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন সুলতান মাহমুদ। আবারো হারেমে আনন্দ শয্যায় মেতে ওঠে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করেন ভেনেশীয় মায়ের ওপর। ১৬০৩ সালে অক্টোবরের শেষ দিকে এক দরবেশের আগমন ঘটে সুলতানের রাজদরবারে। দরবেশ ভবিষ্যৎ বাণী করে যে, পঞ্চান্ন দিন পরে এক বিপর্যয় নেমে আসবে সুলতানের ওপর। আর নিয়তির পরিহাসে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে ঠিক পঞ্চান্ন দিন পরেই মৃত্যুবরণ করেন সুলতান তৃতীয় মাহমুদ।

কিশোর আহমেদ পিতার শূন্যস্থান পূরণ করেন। কিন্তু ভ্রাতৃহন্তা থেকে বিরত থাকেন। কারণ তাঁর তাই মুস্তাফা ছিল উন্মাদ। আহমেদ ছিলেন প্রথম অটোমান সুলতান, যিনি সিংহাসনে বসার পর সুন্নত করিয়েছেন।

ছোটবেলাতেই আহমেদের মাঝে বলশালী ও মাথা গরমের সুলতানসুলভ আগুন দেখা যায়। যখন তাঁর প্রধান উজির খাজানা থেকে অতিরিক্ত অর্থ না পেয়ে হাঙ্গেরিতে আক্রমণ করতে প্রত্যাখ্যান করে, সুলতান তাকে এক সংবাদে জানান : "নিজের জীবনের মায়া থাকলে এখনি অগ্রসর হোন।" জানিসারিস ও সিপাহিরা নিজেদের বেতন-ভাতা নিয়ে বিদ্রোহ করে সুলতান তৎক্ষণাৎ উচ্চপদস্থদের ডেকে পাঠান। এক নিরবতার পরে সুলতানের কাছে অপরাধীদের নাম বলা হলে তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যুদণ্ড জারি করেন আহমেদ।

একই ভাবে ১৬০৬ সালের মে মাসে দিওয়ানের ওপর চড়াও হন তিনি। পারস্য অভিযানের জন্য স্কুটারিতে সৈন্যরা জড়ো হলেও সুলতান এ অভিযান স্থগিত করার আদেশ দেন। নিরবতার পর প্রধান মুফতি বলে উঠেন ইতিমধ্যে অটোমানদের ঘোড়ার লেজবহুল স্তম্ভ এশিয়ার তীরে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে।

পুরো পৃথিবী যেন দেখতে পায়। এখন পিছিয়ে আসা অসম্মানের ব্যাপার হবে। সুলতান এরপর ফরহাদ পাশার নেতৃত্বে সীমিত অভিযানের আদেশ দান করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ ও রসদ না থাকায় জানিসারিসরা বিদ্রোহ করে বসে।

নিজের রাজত্বকালে সুলতান আহমেদ একার উদ্যোগে তেমন কোনো কিছুই করেননি। খামখেয়ালী ও বিবেচনার অভাব থাকায় সৎ উপদেষ্টা নিয়োগে ব্যর্থ হন এবং হারেমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সবসময় প্রধান উজির পরিবর্তন করতেন। সুলতানের কাছের মানুষেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করত তাঁকে। বিশেষ করে বলা যায় কৃষ্ণ খোঁজাদের প্রধানের কথা। সমসাময়িক এক ইটালিয়ের মতে, "কেউ জানতই না যে সত্যিকারের শাসক কে।" অন্যদিকে হারেম, তার দুর্নীতির হস্ত প্রসার করে সবখানে। সুলতানের পরিবারের নারীদের সাথে নিজের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা প্রিয় পাত্রদের বিবাহ হওয়ার রীতি গড়ে ওঠে। রাজদরবারে এ আত্মীয়রা বিভিন্ন ধরনের উৎপীড়নের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে থাকে। এর ফলে সাম্রাজ্যের সরকারি কাজের অবনতি ঘটতে থাকে।

১৬১৭ সালে সাতাশ বছর বয়সে সুলতান প্রথম আহমেদের মৃত্যু ঘটে।

এরপর অটোমান ইতিহাসের চতুর্দশ প্রজন্ম পরে প্রথমবারের মতো পিতার পর পুত্র নয়, অপ্রকৃতিস্থ প্রথম মুস্তাফা ভ্রাতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বসফরাসের মাছেদের খাবার হিসেবে রুটির টুকরার বদলে স্বর্ণ মুদ্রা ছুড়ে দিতেন সুলতান মুস্তাফা। দিওয়ানের হস্তক্ষেপে এ অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটান।

এর পূর্বে জীবিত অবস্থায় সুলতান আহমেদ দুবার ভ্রাতৃহত্যা করতে গিয়েও থেমে যান। প্রথমবার, হত্যাচেষ্টার পূর্ব রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন আহমেদ। দ্বিতীয়বার প্রাসাদের বাগানে প্রহরী নিয়ে মুস্তাফা হেঁটে বেড়ানোর সময়ে তীর এবং ধনুক হাতে তুলে নেন সুলতান আহমেদ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাত ও কাঠের পেশিতে ব্যথা অনুভব করায় এ প্রচেষ্টা বাতিল হয়।

সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে মুস্তাফার অযোগ্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে আবারো তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। সিংহাসনে অভিষেক ঘটে আহমেদের চৌদ্দ বছর বয়সী পুত্র ওসমানের।

কিশোর ওসমান স্বপ্ন দেখতেন নিজের পূর্বপুরুষ সুলেমানের মতো মার্শাল আর্টে দক্ষতা লাভ করবেন। বাহু চালনায় দক্ষ ছিলেন তিনি আর প্রায়ই যুদ্ধবন্দি বা নিজের বালক ভৃত্যদের ওপর তীর-ধনুকের নিশানা অনুশীলন করতেন। যদিও উভয় বিদেশি সীমান্তে শান্তি বিরাজ করছিল তার পরেও মন্ত্রিপরিষদের বাধা সত্ত্বেও পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দেন ওসমান।

প্রাথমিকভাবে বিজয়ের পর ১৬২১ সালে, সুলেমানের সময়ের পর থেকে সবচেয়ে বড় হিসেবে বৃহৎ এক বাহিনী গঠন করেন ওসমান। যাত্রাপথ ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। নদীর ওপর সেতু নির্মাণ কাজেও বাধা আসে বিভিন্নভাবে। তুর্কি বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে করে শত্রুর সামনে পড়ার হাত থেকে।

এভাবে পরাজয় স্বীকার করে ইস্তাম্বুলে ফিরতে বাধ্য হয় সুলতান ও তাঁর বাহিনী। ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রচুর।

তরুণ ওসমান শীঘ্রই জানিসারিদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একে যুদ্ধের ব্যর্থতার দায়ভার ছিল তাদের আর ওপরে রাজকোষ খালি হয়ে যাওয়ায় আশানুরূপ বেতন-ভাতা পেত না তারা।

আস্তে আস্তে সাম্রাজ্যের জন্য জানিসারিসরা হুমকি হয়ে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে শক্ত বাহুর ওপর ভিত্তি কর সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল; তারাই বিশৃঙ্খল ও লোভী হয়ে যুদ্ধক্ষমতা হারাতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিদেশি সৈন্যরা আধুনিক অস্ত্রের মুখে জানিসারিসদের অক্ষমতা ও ভীরুতা নিয়ে পরিহাস করতে থাকে। অন্যদিকে রাজধানী ইস্তাম্বুলে একের পর এক অযোগ্য সুলতানদের আবির্ভাবে ও সেরাগালিওর দুর্নীতির ফলে জানিসারিসরা শক্তিশালী ক্ষমতা অর্জন করে ও রাজদ্রোহ ঘটাতে থাকে।

জানিসারিসদের শায়েস্তা করার জন্য আঠারো বছর বয়সী সুলতান ওসমান এশিয়া সীমান্ত থেকে সাহসী এবং যুদ্ধবাজ গভর্নর দিলাওয়ার পাশাকে ডেকে পাঠান। সুলতানের আদেশে বৃহৎ এশীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলার তোড়জোড় শুরু হয় নতুন মিলিশিয়া হিসেবে কাজ করার জন্য। এদের মাঝে ছিল কুর্দি ও অন্যান্য যুদ্ধ মনোভাবাপন্ন গোত্রীয় লোক। প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর সুলতান এশিয়ার উদ্দেশ্য রওনা হয়ে আবার রাজধানীতে ফিরে আসার মনস্থির করেন। যার মাধ্যমে জানিসারিস ও সিপাহিদের দমন করা সম্ভব হবে মনে করা হয়।

এই অভিযানের ঢালস্বরূপ ১৬২২ সালের বসন্তে ঘোষণা করা হয় যে সুলতান ব্যক্তিগত তীর্থ যাত্রায় মক্কা যাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বয়সে তরুণ ও অনভিজ্ঞ হওয়ায় ওসমান এ ধরনের অভিযানের জন্য কঠোর গোপনীয়তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর মন্ত্রিপরিষদও এ পরিকল্পনার সাথে পুরোপুরি একমত ছিল না। এমনকি প্রধান মুফতি নিজেও এ অভিযানের ও সুলতানের মক্কা গমনের বিরোধিতা করে। জানিসারিসও সিপাহিরাও পূর্বেই এ সম্পর্কে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে ওঠে যখন এশিয়া পার হয়ে রাজকীয় তাঁবু নিয়ে যেতে বলা হয়। বস্তুত সুলতান নিজের সাথে সমস্ত মণি-মুক্তা ও সম্পদ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন।

এতে করে জানিসারিসরা একত্রে বিদ্রোহ করার মনস্থির করে। হিপোদ্রোমে একত্রে জড়ো হয়ে সুলতানের কাছে মন্ত্রিপরিষদ আত্মসমর্পণের দাবি জানায়। সুলতান প্রত্যাখ্যান করলে তারা প্রধান উজির ও মন্ত্রীদের প্রাসাদে ঢুকে পড়েও লুটপাট শুরু করে।

সুলতান এশিয়া অভিযান বাতিল করার প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে ক্ষান্ত করে তাদের। কিন্তু জানিসারিসরা সেরাগলিওতে ঢুকে পড়ে। এখানে সুলতান নিজের প্রতি বিশ্বস্ত কোনো বাহিনী প্রস্তুত রাখেননি। বরঞ্চ বাগানের মালিরাই ছিল প্রাসাদের প্রহরী। ফলে উত্তেজনার বশে সৈন্যরা সুলতানকে আক্রমণের পাঁয়তারা করতে থাকে।

দুর্বৃত্তের দল প্রাঙনে জড়ো হলে কেউ একজন চিৎকার করে বলে ওঠে, "আমরা মুস্তাফাকে সুলতান হিসেবে চাই।!" সাথে সাথে বাকিরাও এতে গলা মেলায়। প্রাসাদের সবখানে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয় মুস্তাফাকে। হারেমের দরজায় এসে বাধা পেলে সৈন্যরা এর ছাদের একটি অংশ ভেঙে ফেলে। এরপর পাগল মুস্তাফাকে একটি ভল্টে দুজন নিগ্রো দাসের সাথে সময় কাটানো অবস্থায় খুঁজে পায় সৈন্যরা। এখানে তিন দিন ধরে খাবার ও পানিবিহীন দিন কাটিয়ে ছিলেন মুস্তাফা। এরপর সৈন্যরা মুস্তাফাকে খাবার পানি এনে দিয়ে অবরোধ করে ফেলে। প্রধান উজির ও কৃষ্ণ খোঁজা প্রধান বাধা দিতে আসলে তাদের ছিঁড়ে টুকরা টুকরো করে ফেলে বিদ্রোহী দল।

মুস্তাফার মাতা সুলতানা ভালিদে তাঁর দায়িত্ব নিয়ে তৎক্ষণাৎ মুস্তাফার নামে নতুন সরকার গঠন করেন

ইতিমধ্যে সৈন্যরা ওসমানকে খুঁজতে থাকে। পলাতক অবস্থায় পাওয়া যায় ওসমানকে। পরনে ছিল সামান্য অন্তর্বাস। মাথার পাগড়ি খুলে ফেলে অপমানজনকভাবে জানিসারিসদের ব্যারাকে ঘোরানো হয় তাকে। পথিমধ্যে প্রিয় প্রধান উজিরের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তিনি চিৎকার করে বলে উঠেন, "সে সরল। যদি আমি তার উপদেশ মেনে চলতাম। আমার ওপর এই দুর্ভাগ্য কখনোই আসত না।"

এরপর কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানিসারিসদের কাছে জানতে চান "তোমরা আমাকে নিয়ে কী করতে চাও? তোমরা জানিসারিসরা নিজেদের সাথে সাথে সাম্রাজ্যের পতনও ডেকে আনছো, এরপর বিদ্রোহী দলের নেতার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেন, "আমাকে ক্ষমা করো যদি আমি না জেনে তোমাদের প্রতি অন্যায় করে থাকি। গতকাল পর্যন্ত আমি ছিলাম সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আজ আমি শূন্য। আমার উদাহরণ স্মরণ রেখো। এই পৃথিবীতে তুমিও একই ভাগ্য বরণ করবে।"

এরপর সবাই সম্মিলিত চিৎকার করে ওসমানের শাসন ও বংশ অস্বীকার করলে সবাই মিলে তাকে সপ্তম টাওয়ারের কারাগারে নিয়ে যায়। এরপর ক্লান্ত

হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পর দাউদ পাশা ও আরো তিনজন বর্ববের মতো জাগিয়ে তোলে তাঁকে। তারপর ওসমানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা।

বয়সে তরুণ ও শক্তিশালী হওয়ায় ওসমান দক্ষতার সাথে লড়ে তাদের সাথে। কিন্তু তারপর যুদ্ধ-কুঠার দিয়ে আঘাত করা হলে মারা যান ওসমান। এরপর ওসমানের একটি কান কেটে সুলতানা ভালিদেকে দেখানো হয়। ভালিদে এ হত্যার আদেশ দিয়েছিল। সেদিনই সন্ধ্যায় সমাহিত করা হয় সুলতান ওসমানকে। রো'র ভাষ্যমতে, "প্রথম সম্রাট যার ওপরে তারা হাত তুলেছিল; একটি দুর্ভাগ্যের চিহ্ন, যা তাদের পতন ডেকে আনে।"

॥ ২০ ॥

ওসমানকে হত্যা করার পরপরই জানিসারিস ও সিপাহিরা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় ভুগতে থাকে। অযৌক্তিকভাবে যতটা দ্রুত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সবাই; সেরকমই যত্নের সাথে মৃত রাজার জন্য অনুতাপ শুরু করে সবাই। প্রাথমিক জনরোষ স্তিমিত হওয়ার পরপরই অপদার্থ সুলতানের অধীনে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবার মনে শঙ্কা জাগে। ধীরে ধীরে সত্য উন্মোচিত হয় ও মুস্তাফার মনেও ওসমানের হত্যাকারীদের শাস্তির আদেশ দেন তিনি। কিন্তু তারপরই পাগলামীর বশে ওসমানের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে তাঁকে খুঁজতে থাকেন মুস্তাফা। রাজত্বে শাসনের ভার থেকে মুক্তি কামনা করলেও পনেরো মাস পর্যন্ত সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

অরাজকতা এতই বেড়ে যায় রাজ্যজুড়ে যে স্যার থমাস রো'র বাণী সত্য বলে প্রতীয়মান হয় ঃ "এর বেশি আমি কিছুই বলতে পারি না যে অসুস্থতা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে ধ্বংস অনিবার্য। প্রতিদিন আমরা পরিবর্তনের আশা করছি। জ্ঞানীরা জাহাজের হাল ধরতে প্রত্যাখ্যান করছে। আর বোকার দল সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে পাথুরে রাস্তাতে। যদিও বা কোনো সমর্থ ব্যক্তি এর সুযোগ নিতে চায়; এর থেকে সহজ শিকার আর হয় না পৃথিবীতে।"

ফলে সরকারের কার্যকর হাত হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে একজন নারী। সুলতানা ভালিদে। রাজকর্মচারীরা এ ব্যাপারে মতবিভক্ত থাকলেও পুত্রের সিংহাসনের চালক হয়ে উঠেন এই নারী। দুর্নীতির ক্ষেত্রে দাপ্তরিক পদসমূহ হয়ে ওঠে এই দুই শ্রেণীর হাতের পুতুল। অর্থ ও ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হতে থাকে কর্মপদ। মন্ত্রিপরিষদের সাথে ঘুষের মাধ্যমে পদোন্নতির হিড়িক পড়ে যায়। জানিসারিস ও সিপাহি উভয়ের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি পায়। দায়ুদ পাশার নামে সৈন্যরা ওসমানের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেয়। ফলে একের পর এক প্রধান উজির পরিবর্তন হতে থাকে।

শিবিরে অবস্থানকালীন সুলতানের জানিসারিস প্রহরী ।

জানিসারিস অফিসারদ্বয় মনোগ্রাহী পরিচ্ছদ আর শিরস্ত্রাণ সম্পর্কে অটোমানদের আগ্রহ সম্পর্কে যে কোন ক্ষীণ সন্দেহও দুর করে দিবে এই ছবি।

দায়ুদ পাশার পরে আসেন হুসেন পাশা। পাচক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা হুসেন পরবর্তীতে মিশরের গভর্নর হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করে। কর্মস্থলে দুবারের প্রতিবারেই সিপাহিদের বিরুদ্ধে জানিসারিসদের ব্যবহার করে হুসেন। জানিসারিসদেরকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা জানানোর অর্থে রেশন দিত এই পাশা। অবশেষে একদিন সুলতানের স্টোর খুলে ধরে জানিসারিসদের সামনে। ইচ্ছেমতো মাংস, মোমবাতি নেয়ার সুযোগ দেয়া হয় তাদেরকে। অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে সিপাহিরা বিদ্রোহ করে যে সেরাগলিওতে সব স্বর্ণ ও রৌপ্যর জলযান গলিয়ে ফেলেছে। ইস্তাম্বুলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে অবিরাম লুণ্ঠন, গুম, হত্যা, গৃহে আগুন দেয়া। যেন বা শহরটি কোনো বিদেশি শক্তি অবরোধ করেছে।

এরপর জানিসারিস ও সিপাহিরা একত্রে সুলতানা ও হুসেনের বিপক্ষে শোর তুললে জনসমক্ষে জিজ্ঞেস করা হয় কাকে জনগণ প্রধান উজির হিসেবে চায়। এতে একমত না হলে সুলতানের নার্সের স্বামীকে প্রধান উজির পদে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু একজন গাধাচালককে আয়া সোফিয়ার মুয়াজ্জেন নিয়োগ করায় এবারের প্রধান উজিরকেও পদচ্যুত করা হয়। এরপর তৃতীয় প্রধান উজিরকেও সৈন্য প্রধানেরা দুর্নীতি করে পদচ্যুত করলে পুনরায় হুসেনের আসার সুযোগ ঘটে।

অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে যখন এশিয়াতে বিদ্রোহ শুরু হয়। আর্জুরামের গভর্নর মাহমুদ পাশা ছিলেন জানিসারিসদের জন্মশত্রু এবং ওসমানের এশিয়া অভিযানের উৎসাহদাতা। নিজের বাহিনী নিয়ে মধ্য ও পূর্ব আনাতোলিয়ার নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনে মাহমুদ পাশা।

ইস্তাম্বুলে উলেমা সম্প্রদায় বিদ্রোহের চেষ্টা করলে আইন ও সামরিক জনগণ মিলে নতুন প্রধান উজির হিসেবে সৎ হিসেবে বিখ্যাত আলী পাশাকে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর অপ্রকৃতিস্থ মুস্তাফাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বললে, সাদরেই সিংহাসন ছেড়ে দেন মুস্তাফা।

এরপর ওসমানের ছোট ভাই মুরাদ, সত্যিকারের উত্তরাধিকারী সিংহাসনে আসীন হন। জানিসরাসির ও সিপাহি উভয় পক্ষই একযোগে মেনে নেয় নতুন সুলতানকে।

১৬২৩ সালে সুলতান চতুর্থ মুরাদ ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করেন। চৌদ্দ বছর বয়সী বালক, ভারী দেহ সত্ত্বেও, ভালো দেহাবয়ব ও প্রাণবন্ত স্বভাবের সুলতানের আগমনে সবার মাঝে প্রশান্তি নেমে আসে। নতুন করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অটোমান সাম্রাজ্য। শক্তিশালী নতুন সুলতানের অধীনে আরো একজন অতীতের গৌরব পুনরুদ্ধারের আশার বীজ রোপিত হয় সবার মাঝে।

ঠিক এই মুহূর্তে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রয়োজন অত্যাচারী সামরিক বাহিনী ও আমলাদের মোকাবেলা করার জন্য এরকমই অত্যাচারী একজন শাসক। আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনবেন যিনি। পরিণত বয়সে সম্রাট চতুর্থ মুরাদ এভাবেই নিজের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের জাদু শক্তির বলে হয়ে উঠেন—একজন অটোমান হিরো। দরবারের প্রিয়পাত্র ও সচেতন অটোমান লেখক ও ভ্রমণকারী ইভলিয়া চেলেবি'র মতে, "মুরাদ ছিলেন অটোমান সুলতানদের মাঝে সবচেয়ে নিষ্ঠুর।"

তরুণ সুলতান আয়ুব মসজিদে গিয়ে শাসক হিসেবে ঈশ্বর ও জনগণের কাছে নিজের সার্থকতার জন্য প্রার্থনা করে সেরাগলিওর দিকে অগ্রসর হন। এরপর রীতি অনুযায়ী রাজকোষের দিকে এগিয়ে যান সুলতান। কিন্তু শূন্য রাজখাজানা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন সুলতান। প্রতিজ্ঞা করে উঠেন, "ইনশাআল্লাহ! হে ঈশ্বর যারা এই রাজকোষ শূন্য করেছে তাদের সম্পত্তির মাধ্যমেই আমি এটি আবার পূর্ণ করে তুলব। আর আরো পঞ্চাশটি রাজকোষ সংযুক্ত করব।"

বিদেশি দূতেরাও নতুন করে ঋণদানে অস্বীকার করে। অথচ পূর্বে এরাই বার্ষিক কর প্রদান করত। যাই হোক সুলতান মুরাদ নিজের সম্পত্তি থেকে ৩,০৪০ ব্যাগ অর্থ জানিসারিসদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

এর পরেও প্রায় এক দশক কেটে যাওয়ার পর রাজ্যের পরিচালনার ভার নিজের হাতে নেয়ার মতো উপযুক্ত বয়সী হয়ে উঠেন সুলতান মুরাদ। গ্রিক-বংশীয় মাতা কোসেম শক্তসমর্থ ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে তোলেন সুলতানকে। কিন্তু সৈন্যদের ও দাপ্তরিক দুর্নীতি বন্ধে সফল হতে পারেননি। বিদেশে এশিয়া মাইনর গৃহযুদ্ধ আর বিদ্রোহে ক্ষত-বিক্ষত। পারস্য বাহিনী পুনরায় বাগদাদ ও রিভান দখল করে নিয়েছে। লেবাননে চলছে গোত্রীয় বিদ্রোহ। ক্রিমিয়ার তাতারেরা বিদ্রোহ করে বসেছে। কোজাক বাহিনী কৃষ্ণ সাগরের উপকূল, বসফরাসে অনুপ্রবেশ করে খোদ রাজধানীর জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। এত কিছুর পরেও রাজকর্মচারীদের একটি অংশ বয়সন্ধি থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনার বিষয়াদি ও ঘটনাক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দৃষ্টি গঠনে সাহায্য করে সুলতানকে।

বলশালী তরুণ সুলতানের ছিল ভ্রুকুটি আর ভয়ংকর দৃষ্টির অভিব্যক্তি। ইভ্লিয়ার মতে তিনি ছিলেন "অ্যাথলেটিক, সুগঠিত দেহের অধিকারী। শত্রুরা তাঁকে অসম্ভব ভয় ও শ্রদ্ধা করত।"

সুলতানের শারীরিক শক্তি প্রায় পৌরাণিক গাঁথার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ার চেয়েও দ্রুত তীর ছুড়তে পারতেন সুলতান।

বন্দুকের গুলির চেয়েও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা এ তীর চার ইঞ্চি পুরু ধাতুর পাতকেও ফুটো করে ফেলতে পারত। বহুদূরে বর্শা ছোড়াতেও এতটা দক্ষ ছিলেন যে একবার এক মাইল দূরে অবস্থিত মিনারের ওপর বসা দাঁড়কাককে হত্যা করেছিলেন সুলতান। ঘোড়সওয়ার হিসেবেও সুদক্ষ সুলতান পূর্ণ গতিতে ছুটে চলা এক ঘোড়ার ওপর থেকে আরেক ঘোড়ার ওপর লাফ দিতে পারতেন। পেশিশক্তিতে বলীয়ান সুলতান ছিলেন একজন অবিসংবাদিত মুষ্টিযোদ্ধা। "ঠিক মহানবী মোহাম্মদের মতোই।" একবার খেলাচ্ছলে স্বয়ং ইভ্লিয়াকে বন্দির মতো বেঁধে ফেলেন সুলতান। ইভ্লিয়ার ভাষায়, "একটা ঈগলের মতোই আমার বেল্ট দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলেন সুলতান। তারপর মাথার ওপর তুলে বাচ্চার মতোই ঘোরাতে থাকেন।" অবশেষে হাসির মাধ্যমে এ খেলার শেষ হয় ও ইভ্লিয়াকে আটচল্লিশটা স্বর্ণ টুকরা উপহার দেন সুলতান।

কিন্তু এ ধরনের খেলা শীঘ্রই ভয়ংকর দিকে মোড় নেয়। ১৬৩২ সালে সিপাহিরা একত্রিত হয়ে হিপোড্রোমে বিদ্রোহ করে। তিন দিন ধরে দোকানপাট ও ঘরবাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ রাখে সবাই ভয়ে। এ সময়ে সেরাগলিও প্রাসাদের দরজা-জানালাও বন্ধ রাখা হয়। বিদ্রোহীরা এ সময় সতেরোজন নির্দিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উদ্দেশ্যে গালমন্দ করতে থাকে। এদের মধ্যে সুলতানের ভগ্নিপতী ও প্রধান উজির হাফিজ পাশা ও প্রধান মুফতির নাম ছিল। দিওয়ানদের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আসার সময় পাথর ছুড়ে ঘোড়া থেকে নামতে বাধ্য করা হয় হাফিজ পাশাকে।

এরপর প্রহরীদের পাহারায় সুলতানের কাছে পৌঁছে নিজের কর্মপদে ইস্তফা দিয়ে রাজকীয় সীলমোহর সুলতানের কাছে ফেরত দিয়ে নৌকাযোগে স্কুটারিতে চলে যায় হাফিজ পাশা।

বিদ্রোহীরা এরপর দ্বিতীয় রাজদরবারে জড়ো হয়ে সুলতানকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে যেন তাদের সামনে দিওয়ানদের সভা অনুষ্ঠান করা হয়। সুলতান হেঁটে সৈন্যদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের দাবি-দাওয়া শোনেন। সৈন্যরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে সতেরোজন বিশ্বাসঘাতককে দাবি করতে থাকে। নচেৎ ভয়ংকর সমস্যার হুমকি দেয় তারা। মুরাদ নিজের সম্মানসূচক স্বরে প্রতিউত্তরে জানান, "আমার কথা শোনার কোনো যোগ্যতাই নেই তোমাদের। কেন আমাকে এখানে ডেকেছো?" এরপর সৈন্যদের প্রহরায় সে স্থান ত্যাগ করেন সুলতান।

এরপর নবনিযুক্ত প্রধান উজির রেজেব পাশা তরুণ সুলতানকে সৈন্যদের দাবি মিটিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানায়। সুলতান হাফিজের উদ্দেশ্যে নদীতীরে লোক পাঠিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জানিসারিস ও সিপাহিদের

উদ্দেশ্যে বলেন যে, খলিফাদের পবিত্র সম্মান তাদের রক্ত-পিপাসু দাবি দ্বারা কলঙ্কিত না করতে।

হাফিজ সুলতানের সামনে এসে আর্জি জানায় যেন সুলতান নিজের হাতে তাকে হত্যা না করে, বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দেন। তাহলে তার নিষ্কলুষ রক্তে তাদের মাথা নত হবে ও হাফিজ শহীদের সম্মান পাবে পরপারে। ভূমি চুম্বন করে প্রার্থনা করে হত্যাকারীর দিকে অগ্রসর হয় হাফিজ। মাথায় বাড়ি মেরে ফেলে দেয়া হয় হাফিজকে। অন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরি দিয়ে সতেরোটি ক্ষত তৈরি করে দেয় হাফিজের দেহে। এরপর একজন জানিসারিস বুকের ওপর বসে মাথা কেটে ফেলে তার।...লিওর একজন ভৃত্য এসে সবুজ কাপড়ে আচ্ছাদন করে দেয় হাফিজের মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য।

সুলতান বন্ধুর বীরত্বে চোখের পানিতে ভেসে গিয়ে প্রাসাদের দরজায় উচ্ছৃঙ্খল জনতার উদ্দেশ্যে বলে উঠেন, "যদি ঈশ্বর চান, তোমরা জঘন্য হত্যাকারীরা ভয়ংকর পরিণতি বরণ করবে, তোমরা যারা ঈশ্বরকেও ভয় পাও না আর নবীজির সামনে লজ্জা করো না।"

সুলতানের বাক্যকে হালকাভাবে নিয়ে প্রধান মুফতিকেও তার পদ থেকে বহিষ্কার করে বিদ্রোহীরা। কিন্তু কিছু সময়ের মাঝেই পূর্বের মতো জানিসারিস ও সিপাহিদের মাঝে আভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয়। এছাড়াও চরমপন্থীদের দস্যুতার বিভীষিকায় হতবাক হয়ে শান্তিকামী সৈন্যরা নিজেদের তরবারি নিয়ে সুলতানের পাশে এসে জড়ো হয়।

মুরাদ, নিগৃহীত হয়ে প্রতিশোধের তৃষ্ণায় ও ওসমানের মতো একই ভাগ্য বরণের ভয়ে "মারো নয়তো মরো"-র নীতি গ্রহণ করেন। আর এর সবকিছুর পেছনে রেজেব পাশার ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেন সুলতান; যে কিনা হাফিজ পাশাকে হটিয়ে প্রধান উজির হয়েছে।

একদিন সকালে দিওয়ানদের সভা থেকে ফেরার পর রাজ গৃহাধ্যক্ষ রাজপ্রাসাদে ডেকে নিয়ে আসে রেজেব পাশাকে। এখানে সুলতানের দেখা পাবে ভাবলেও কৃষ্ণ খোঁজাদের দেখতে পায় পাশা। পার্শ্ববর্তী রুমের দিকে ইশারা পেয়ে তৎক্ষণাৎ এক ধরনের ভয়ে, ব্যথায় আক্রান্ত পাশা ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। সুলতানের আদেশ শুনতে পায় পাশা, "এখানে আসো, খোঁড়া বিদ্রোহী!" "আচমনের জন্য পানি প্রার্থনা করো অবিশ্বাসী!" রেজেব কিছু বলার আগেই সুলতান আদেশ দেন, "বিলম্ব ব্যতীত বিশ্বাসঘাতকের মাথা কেটে ফেলে দাও।" আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করা হয়। মৃতদেহটিও সেই মুহূর্তে প্রাসাদের দরজার বাইরে ফেলে দেয়া হয়। এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে ভীত হয়ে বিদ্রোহীর দল ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। এভাবেই পাশার দান উল্টে দেন সুলতান।

গালাতা বন্দরে অবস্থিত কফি পানের উন্মুক্ত মঞ্চ। দূরে দেখা যাচ্ছে
সুলেমানিয়ে মসজিদ, এর ডানদিকে জলের প্রণালী ও বাম দিকে আগুন স্তম্ভ।

বসফরাস ও গোল্ডেন হর্ন-এর জংশনের মাঝে অবস্থিত ইস্তাম্বুলের তোফানে (আর্সেনাল) স্কোয়ারের একটি সাধারণ ক্যাফে। বিশেষভাবে দর্শনীয় বামদিকের কফির পাত্র, ডানদিকের পাইপের তাক ও বাম পাশে বসা প্রথম ব্যক্তির পাশে জলধারা।

রেজেবের শেষ নিঃশ্বাসের সাথে সাথে সুলতান চতুর্থ মুরাদের শাসনকাল উজিরের বিষ দৃষ্টি ও মায়ের অভিভাবকত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে সত্যিকারের পথ চলা শুরু করে। প্রশাসনিক অরাজকতা প্রশমিত করে এরপর সুলতান নজর দেন সামরিক বাহিনীর দিকে। এ উদ্দেশ্যে বসফরাসের তীরে সাধারণ দিওয়ানদের সঙ্গে উন্মুক্ত মণ্ডপে সভায় বসেন সুলতান। সিংহাসনে আসীন সুলতান, পার্শ্বে বিশ্বস্ত প্রহরীদল, প্রথম সারির বিচারকেরা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আর দুজন সামরিক নেতা যারা বিদ্রোহের সময় সুলতানের সমর্থন করেছিল, প্রধান মুফতিসহযোগে শুরু হয় সভা। সিপাহিদের প্রতিনিধিবর্গকে ডেকে পাঠানো হয়। এরপর সামনে উপস্থিত জানিসারিসদের সাথে কথা বলেন সুলতান। কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিসারিসদের বিশ্বস্ত ভৃত্য ও প্রভুর প্রতি অন্ধভাবে অনুগত উল্লেখ করে সুলতান তাদের নির্দেশ দেন বিদ্রোহের পথ পরিহার করতে। উত্তরে চিৎকার করে নিজেদের বিশ্বস্ততা ঘোষণা করে জানিসারিসরা "আমরা মহাপ্রভুর দাস আমরা বিদ্রোহীদের সমর্থন করি না, তাঁর শত্রু আমাদেরও শত্রু।" হাতে হাতে কোরআন নিয়ে শপথ করে জানিসরারিসরা।

এরপর সিপাহিদের বয়োবৃদ্ধ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে সুলতান বলেন, "সিপাহিরা তোমাদেরকে ন্যায়বিচার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া কঠিন। তোমরা চল্লিশ হাজারের প্রত্যেকেই নিজস্ব অফিস চাও, যেখানে পুরো সাম্রাজ্যে আছে প্রায় পাঁচশোর মতো। তোমাদের চাহিদা সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে গেছে, একে শূন্য করে দিয়েছে। বাহিনীর বড়দের বা জ্ঞানীদের কথা না শুনে জনগণকে পীড়ন করো তোমরা। ধর্মীয় ভিত্তি নষ্ট করে অরাজকতা আর বিদ্রোহে নাম লিখিয়েছো নিজেদের।"

এর প্রতিবাদে সিপাহিদের প্রতিনিধিরা বলে ওঠে যে ব্যক্তিগতভাবে তারা সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলেও বাহিনী সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের ক্ষমতার বাইরে।

সুলতান তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে ন্যায়বিচার বিক্রি করে সাম্রাজ্যের প্রজাদের পীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। উত্তরে সিপাহিরা কর সংগ্রহে ভায়োলেন্সের উল্লেখ করে। এশিয়া থেকে আগত এক বিচারক এ পর্যায়ে নিজের তরবারি বের করে অগ্নিদৃষ্টি হেনে সুলতানকে বলে, "আমার সুলতান, এসব পীড়নের বিরুদ্ধে খড়গ হচ্ছে একমাত্র ওষুধ।" এরপর একটি বিধান জারি হয়, যেখানে নিপীড়নের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সকলে স্বাক্ষর করে।

এভাবে মুরাদের নিজস্ব ভয়ের শাসনামল সামরিক অরাজকতার অবসান ঘটায়। এরপর মুরাদের নির্দেশে সুদক্ষ গোয়েন্দা ও সৈন্যরা সারা ইস্তাম্বুল চষে

ফেলে বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহের নেতাদের ঘটনাস্থলেই তরবারি বা ধনুকের ছিলা দিয়ে হত্যা করে বসফরাসে ফেলে দেয় লাশ। যেন এত দ্রুত তা পরিষ্কার হয়ে যায় যে জনসমাগম না হয়। প্রদেশসমূহ জুড়েও একই ভাবে রক্তপ্রবাহ বয়ে যায়। সৈন্যরা নেতাদের হারিয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

অন্য যে কোনো পূর্বতন সুলতানের তুলনায় ভয়ংকর হয়ে ওঠে মুরাদ। যিনি নিজে দিনে বা রাতে, বেশে বা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন সৈন্যদের মাঝে। বেআইনি সমাবেশ ভেঙে দিয়ে তাঁর পুলিশি নীতিকে অগ্রাহ্যকারীকে নিজ হাতে শাস্তি দি"তন। পরবর্তীতে সাম্রাজ্যের সব ক্যাফে আর ওয়াইনের দোকানও বন্ধ করে দেন সুলতান, যেন জনগণ একত্রিত হতে বা বিদ্রোহের বীজ না ছড়াতে পারে। এছাড়া টোবাক্যোকেও বেআইনি ঘোষণা করেন। যদি এমন কাউকে পাওয়া যেত যে রাতের বেলা পাইপ টানছে, কফি পান করছে, ওয়াইনসহ ধরা পড়ত; তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ ফাঁসি দেয়া হতো আর মৃতদেহ রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেয়া হতো অন্যদের শিক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

ধীরে ধীরে সময় যত গড়িয়ে চলে মুরাদের রক্তপিপাসা ততই বেড়ে চলে। প্রথম দিকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিলেও পরবর্তীতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে অভিযোগ না থাকলেও বা কম প্রমাণিত হলেও মৃত্যুদণ্ড দিতেন সুলতান। এভাবে দুর্নীতি দমন করতে গিয়ে মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন মুরাদ। হত্যা করার জন্যই আচরণে সব জায়গাতে সৃষ্টি হয় শীতল ও ভীতিকর এক নীরবতা। বোবা ভৃত্যের ন্যায় কেউ কথা না বললেও ভাষা ফুটতে থাকে তাদের চোখের পাতায়, ঠোঁটের নড়াচড়ায়, দাঁতের কিড়মিড়ে।

মুরাদের নিষ্ঠুরতা পৌরাণিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

মাঝ নদীতে আনন্দ-নৃত্যগীতে রত একদল মহিলার শব্দে সুলতানের বিরক্তি উৎপাদন হওয়ায় তাদের সবাইকে ধরে পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। নিজের একজন চিকিৎসককে তারই অফিসের ওভারডোজ গিয়ে মৃত্যুবরণে বাধ্য করেন সুলতান। ভুলবশত সুলতানার পুত্র প্রসবের সংবাদ আনায় এক সংবাদ বাহককে পঙ্গু বানিয়ে দেন সুলতান, কেননা সুলতানা কন্যা প্রসব করেছিলেন। নিজের প্রধান বাজনাবাদকের মস্তক কেটে ফেলেছিলেন সুলতান। তার অপরাধ ছিল পারস্যের গান গাওয়া। একজন প্রিয় দরবেশ সুলতানকে দক্ষ কসাইকারী হিসেবে আখ্যায়িত করায়, সুলতান হেসে উত্তর দেন, "প্রতিশোধ ধূসর হতে পারে। কিন্তু জরাগ্রস্ত হয় না।" এটা বলা হয় যে মাত্র পাঁচ বছরে সুলতান মুরাদ পঁচিশ হাজার মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দেন। এদের অনেকেই আবার তাঁর নিজের হাতে মৃত্যুবরণ করে।

এতদসত্ত্বেও মুরাদের শাসনামল রাজ্যকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। তিনি শুধু কোনো ব্যক্তিকেই শাসন করতেন না, বরঞ্চ অপরাধ

প্রমাণিত হলে উপরওয়ালাদেরও ছাড়তেন না। ফলে স্থানীয় ছোটখাটো স্বৈরশাসকেরা নির্মূল হয়ে যায়। এভাবে লৌহ শাসনামলে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যারাকে নিয়মশৃঙ্খলা ফিরে আসে, রাজদরবারে ন্যায়বিচার। সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করেন সুলতান। সাম্রাজ্যের কর সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে সৎভাবে প্রশাসনিক কাজ চলতে থাকে। প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সিপাহিদের বাড়তি সুবিধাসমূহ বাতিল করা হয়। সামন্ত প্রভুদের পীড়ন সংস্কার করে কৃষকদের জন্য বৈধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

মোটের ওপর মুরাদের ক্ষমাবিহীন সামরিক শক্তির ব্যবহারের ফলে এশিয়াতে অটোমান সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। বসফরাস পার হয়ে মুরাদের প্রথম অভিযান ছিল সংক্ষিপ্ত। বার্সাতে অগ্রসর হওয়ার সময়ে রাস্তার বেহাল দশা দেখে তৎক্ষণাৎ ফাঁসি দেন নিকোমিডিয়ার বিচারককে। এর ফলে ইস্তাম্বুলে উলেমা সম্প্রদায় খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এরপর দ্রুত ইস্তাম্বুলে ফিরে এসে প্রধান মুফতির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন সুলতান। এশিয়া মাইনরে বিদ্রোহের চূড়ান্ত পতন ঘটে পাঁচ বছর পরে। কিন্তু নেতা আবাজাকে ছেড়ে দেন সুলতান। বসনিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে আব্যজাকে ইস্তাম্বুলে ডেকে পাঠানো হয় আজ হিসেবে কাজ করার জন্য। কিন্তু শত্রুদের প্ররোচনায় সুলতান তার প্রতি রুষ্ট হয়ে অবশেষে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। অবশেষে ১৬৩৫ সালের বসন্তে প্রথম এশিয়া অভিযানে বের হন সুলতান। নিজের এশীয় অঞ্চলে পরিদর্শনকালে প্রতিটি যাত্রা বিরতি সুলতানের কসাই চরিত্রের সাক্ষী হয়ে থাকে। নিজের কর্মচারীদের মাঝে দুর্নীতিগ্রস্ত বা অযোগ্য সকলকে বিনাশ করেন সুলতান। এরপর পারস্যদের দখল থেকে রিভানকে মুক্ত করতে অগ্রসর হন সুলতান। মুরাদের নিয়ম-নীতি ছিল কঠোর। কিন্তু জেনারেল হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা আদায় করে নেন সুলতান। নিজে ব্যক্তিগতভাবে সৈন্যদের কষ্ট সহভাগিতা করতেন সুলতান। নিজের বাহিনীর কাছ থেকে বিক্রম প্রত্যাশা করে সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন স্বর্ণ ও রৌপ্যের থলে দিয়ে। "প্রসন্নতা নয় আমরা নেকড়েরা, তোমাদের ডানা ছড়ানোর সময় এসে গেছে আমার ঈগলেরা।"

রিভান জয় করে ইস্তাম্বুলে বিজয়ীর রথ প্রস্তুতের আদেশ দেন সুলতান। এছাড়াও নিজের দুই ভ্রাতাকে হত্যার নির্দেশ দেন সুলতান। সিংহাসনে আরোহণের সময় নয়; কিন্তু এই বিজয়লগ্নে এটিকে অসংগত মনে হয় না সুলতানের কাছে। তিনি আশা করতে থাকেন যে ভ্রাতৃহন্তার কান্না বিজয়ের গৌরব আনন্দে ঢাকা পড়ে যাবে। শবাধারীদের মশালের আলো শহরের উৎসবের আলোর নিচে ঢেকে যাবে।

এরপর ১৬৩৮ সালে গ্রীষ্মের শুরুতে সুলতান দ্বিতীয় ও শেষ অভিযানে বের হন। স্কুটারির উচ্চতায় রাজকীয় সাত ঘোড়ার লেজবিশিষ্ট প্রতীক প্রদর্শন করেন সুলতান। এর উদ্দেশ্য ছিল বাগদাদ শহর পুনর্দখল করা। এক্ষেত্রে একটি ঐতিহ্য ছিল যে সুলতান সুলেমান যেহেতু এটিকে প্রথম অটোমানদের সাথে সংযুক্ত করেন; তাই একজন সুলতানই ব্যক্তিগতভাবে একে দখল করতে পারবেন। বন্দুকধারী সৈন্যরা শহরকে শক্তহাতে প্রতিরক্ষা করলেও চল্লিশ দিনের অবরোধের শেষে সুলতান সুলেমানের রোডস বিজয়ের পর্বদিনে—বাগদাদ শহর দখল করে সুলতান মুরাদ। নিজের হাতে মশাল নিয়ে সৈন্যদের সামনে উদাহরণ হয়ে যখন একজন পারস্য দৈত্যকৃতি সৈন্য সাহসী তুর্কিকে তার সাথে যুদ্ধে আহ্বান করে, সুলতান নিজে এগিয়ে যান। তরবারির এক কোপে মাথা থেকে চিবুক পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলেন নিজের শত্রুর। সুলতানের আদেশে সৈন্য ও সাধারণ নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যার মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করেন সুলতান চতুর্থ মুরাদ।

দ্বিতীয়বারের মতো বিজয়ীর বেশে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন সুলতান। এবার শহরে প্রবেশ করেন কাঁধে চিতা বাঘের চামড়া ও পারস্য যুদ্ধবর্ম পরিহিত অবস্থায়। বাইশজন পারসীয় গোত্রপ্রধানকে শিকলে বেঁধে রাজকীয় শকটের পা-দানির সাথে আটকে দেয়া হয়। কিছুদিন পরেই পারসীয়দের সাথে শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়—যেমনটা হয়েছিল শত বছর পূর্বে সুলতান সুলেমানের সময়ে—আবারো গাজী ঐতিহ্য অনুযায়ী একজন অটোমান সুলতান শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগতভাবে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুরাদ বাগদাদ থেকে ফেরার পরই আলবেনিয়ার বিদ্রোহ নিয়ে, অটোমান নৌশক্তির পুনর্জাগরণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এছাড়াও ভেনিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। নিয়মিত বেতনভুক্ত, পুরোপুরি পেশাদার সৈন্যবাহিনী গঠনের পরিকল্পনাও ছিল সুলতানের।

কিন্তু ১৬৪০ সালের শুরুতেই মৃত্যুবরণ করেন সুলতান। (ছবি—৩১২)

মৃত্যুর আগে সুলতানের শেষ নির্দেশ ছিল, তাঁর জীবিত ভাই ও সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে জীবিত পুরুষ ইব্রাহিমের মৃত্যু। সুলতানা ভালিদের হস্তক্ষেপে এ প্রক্রিয়া ক্ষান্ত হয়। যদিও সুলতানকে জানানো হয় যে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ দেখতে চান সুলতান। কিন্তু সেবকদের বাধায় আবার বিছানায় শুয়ে পড়েন। সুলতান চতুর্থ মুরাদের মৃত্যু হয় মৃতের জন্য প্রার্থনার মাঝে, ইমামের উপস্থিতিতে।

এরপর অটোমান সাম্রাজ্য আবারো বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের মাঝে পড়ে। সেরাগলিওতে কার্যত বন্দিদশা ও ভয়ের মাঝে বড় হওয়া ইব্রাহিমের চরিত্রে পিতার সমস্ত নিষ্ঠুরতা দেখা গেলেও গুণের কোনো ছায়া দেখা যায়নি। দায়িত্ববিমুখ,

ইন্দ্রিয়পরায়ণ, হঠাৎ করে রেগে যাওয়া, অধার্মিক, লোভী চরিত্রের ইব্রাহিম পুরোপুরিভাবে হারেম ও বিভিন্ন জাগতিক সুখের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হতেন।

শহরের স্নানাগারসমূহে তাঁর আনন্দের জন্য সুন্দরীদের ধরে নিয়ে আসা হতো। পছন্দের নারীরা বাজার থেকে অর্থ পরিশোধ না করেই যা ইচ্ছে নিতে পারত। শহরের গহনার দোকান ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা সুলতানের বিশেষ মুহূর্তের আবদার মেটানোর জন্য প্রস্তুত থাকত। আর যেসব নারী দিনের আলোতে কেনাকাটা করতে পছন্দ করত না, মালিকেরা তাদের জন্য সারারাত দোকান খোলা রাখত। বিশেষ একজন উপপত্নীর ইচ্ছাতে সুলতান দাড়িতে রত্ন লাগিয়ে জনসমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। এরকম আরেকজনের পছন্দে খুব দামি একটি ঘোড়ার গাড়ি বানানো হয়েছিল। যার পুরোটাই ছিল দামি পাথরে মোড়া।

সুলতানের নিজের ছিল সুগন্ধি ও পশমের নেশা। আম্বার ও পশমের জন্য প্রজাদের ওপর কর ধার্য করেছিলেন সুলতান। এক্ষেত্রে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এক বৃদ্ধ নারী, যে কিনা রাতে হারেমের নারীদের মাঝে পূর্বতন এক রাজকুমারের গল্প বলত, যে রাজকুমার শুধু নিজের পোশাকেই নয়, বরঞ্চ সোফা, মেঝে এমনকি দেয়ালের লাইন পর্যন্ত পশমে মুড়ে রাখত। সুলতান সারা রাত নিজেকে সেই রাজকুমার হিসেবে কল্পনা করে পরদিন সকালেই দিওয়ানকে আদেশ দেন সাম্রাজ্যের সব প্রদেশ থেকে যেন পশম সংগ্রহ করা হয়। উলেমা, নাগরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের ওপরেও একই নির্দেশ জারি হয়।

ইব্রাহিমের প্রথম প্রধান উজির ছিল কারা মুস্তাফা। বাগদাদ বিজয়ী কারা সুলতানকে আন্তরিকভাবে বুঝিয়ে সুলতানের খরচের মাত্রা কমাতে চাইত। আর্থিক ব্যাপারে শৃঙ্খলা এনে হারেমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুলতানকে বাঁচাতে চাইত। হারেমের দুর্নীতি পূর্বের মতোই দাপ্তরিক কর্মচারীদের ঘুষ দেয়া-নেয়ার রীতি ফিরিয়ে আনে। একবার কারা মুস্তাফাকে হারেমের নারী কর্মচারী হারেমের ব্যবহারের জন্য পাঁচশ গাড়ি জ্বালানি কাঠ আনার নির্দেশ দেয়। কারা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সুলতান দিওয়ানের সেশনে উপস্থিত হয়ে এ ব্যর্থতার কারণ দর্শাতে বলেন কারাকে। কাঠ পাঠিয়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে কারা কেটে পড়েন "আমার সুলতান, এটা কী প্রয়োজন ছিল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বাদ দিয়ে মাত্র পাঁচশ গাড়ি জ্বালানি কাঠ নিয়ে ব্যস্ত হতে হলো আমাকে? কেন আপনি আমাকে জ্বালানি কাঠ নিয়ে প্রশ্ন করছেন? কেন প্রজাদের অবস্থা, সীমান্তের খবর আর রাজকোষ নিয়ে নয়?"

প্রধান মুফতি সুলতানের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রধান উজিরকে সতর্ক করে দিলে পর কারা মুস্তাফা উত্তরে বলে "অবশ্যই এটা দায়িত্ব যে আমি তাঁকে সত্যিটা বলব। আমার তাঁকে তোষামোদ করতেই হবে? একজন দাসের মতো বাঁচার চেয়ে মৃত্যুই আমার কাছে শ্রেয়।"

এর পরেই সুলতানের প্রিয় একজন কর্মচারীর নামে নালিশ করলে মৃত্যু ঘটে কারা মুস্তাফার। কিন্তু অন্যদের মতো সহজে নয়। নিজের আততায়ীর সাথে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করে যান কারা মুস্তাফা মৃত্যুর পূর্বে।

এরপর প্রধান উজির পদে আসেন সুলতানজাদে পাশা। প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য তোষামোদে যে নিজেকে ব্যস্ত রাখত সব সময়। সুলতানের প্রশ্নের উত্তরে একদিন সুলতানজাদে পাশা বলে, "আপনি খলিফা। পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। আপনার আনন্দ মেটায় যে ইচ্ছা তা স্বর্গ থেকে আসা প্রত্যাদেশ। আপনার আদেশ, যদি তারা অযৌক্তিক হয়-ও, এর অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা আছে যা আপনার এই দাসের বোধগম্য হবে না।"

সুলতান ইব্রাহিমের এহেন লঘু অভ্যাসের কারণে তাঁর সেনাবাহিনীর কাছে জনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ হন তিনি। এ সময় যোগ্য নেতার অধীনে সাম্রাজ্যের নামে যুদ্ধ করছিল তারা। প্রথম কাজ ছিল আজবকে পুনর্দখল করা, যা কোজাকদের হাতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রিমিয়ার তাতারদের সহযোগিতায় তুর্কিরা এ শহরকে অবরোধ করলেও কঠিন প্রতিরোধের মুখে জানিসারিসরা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এরপরপরই শত হাজার তাতারে নিয়মিত তুর্কি বাহিনীর সাথে একজোট হয়ে দ্বিতীয়বার শহর অবরোধ করে ও কোজাকরা শহরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে পালিয়ে যায়।

জার, কোজাকদের সহায়তা করতে প্রত্যাখ্যান করে। উপরন্তু ইব্রাহিমের কাছে দূত পাঠিয়ে রাশিয়া ও পারস্যের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রস্তাব করে। কিন্তু এরপরেও তাতার ও কোজাকদের মাঝে সীমান্ত যুদ্ধ চলতেই থাকে। ক্রিমিয়ার খান সুলতানের চেয়েও বেশি বিমুখ ছিলেন রাশিয়ানদের প্রতি। তাই বন্ধুত্বের আভাসে সুলতানকে জানানো হয়, "যদি আমরা তাদেরকে নিঃশ্বাস ফেলার সময় দিই তাহলে তারা আনাতোলিয়া দখল করে ফেলবে। আমি দিওয়ানের কাছে অনেকবার দূত পাঠিয়ে জানিয়েছি যে প্রতিবেশীত্বের মাঝে দুটি বিষয় আছে, যা অবহেলা করা ঠিক হবে না। আমাদের এগুলো দখল করে নেয়াই পরিণামদর্শীর মতো কাজ হবে। এখন রাশিয়া এদের প্রভুত্ব নিয়ে যাবে।"

তুর্কিদের দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ক্রিট দ্বীপের বিরুদ্ধে। মাল্টা বাহিনী তুর্কি জাহাজের ওপর হামলা চালায়। এতে মক্কাগামী তীর্থযাত্রী, মিশরগামী দামি মালামাল ছিল। এছাড়াও ক্রিট ছিল কৃষ্ণ খোঁজার সম্পত্তি, যে কিনা দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় মৃত্যুবরণ করে। এছাড়াও এ জাহাজে হারেমের একজন গুরুত্বপূর্ণ নারী ছিল। দামি গহনা ও পোশাক পরিহিত এ নারীর কোলে ছিল শিশুপত্র যে কিনা হয়তো সুলতানপুত্র ছিল। (কিন্তু সম্ভাবনা বেশি যে এ পুত্র ছিল সুলতানের পুত্রের সৎভাই, ভবিষ্যৎ চতুর্থ মাহমুদ)।

সুলতান চতুর্থ মুরাদ (১৬২৩-৪০)।

এই দখলের কথা শুনে সুলতান রেগে ফেটে পড়েন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে নিজের সাম্রাজ্যের সব খ্রিস্টানকে নির্বিচারে হত্যার কথা ভাবেন সুলতান। কিছুটা শান্ত হয়ে নির্দেশ দেন যেন সকল খ্রিস্টান কূটনৈতিককে তাদের গৃহে আবদ্ধ রাখা হয় ও ফ্রাঙ্কিশ ব্যবসায়ীদের দপ্তর বন্ধ করে দেয়া হয়। মাল্টা শাসন করছে ফরাসিরা, এ কারণে ফ্রান্সে আঘাত করার পরিকল্পনা করেন সুলতান। কিন্তু প্রধান উজির সুলতানকে ফ্রান্স নয়, বরঞ্চ ক্রিট দ্বীপ আক্রমণের পরামর্শ দেয়। এ দ্বীপ ছিল ভেনেশীয়দের কাছে শেষ গ্রিক ভূমি। আর এ দ্বীপ তুর্কিদের হাতে এলে আজিয়ানের দক্ষিণে কার্যকর একটি বাধা হিসেবে গড়ে উঠবে।

এভাবে ১৬৪৫ সালে তুর্কি যুদ্ধজাহাজসমূহ অতর্কিত হামলার মাধ্যমে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই দ্বীপের পশ্চিমে ক্যানিয়া দখল করে নেয়। পরের বছর রেটিমো দখল করতে পারলেও রাজধানী ক্যান্ডিয়া দখলের জন্য অবরোধ গড়ায় বিশ বছরে—ট্রয় অবরোধের জন্য এর অর্ধেক সময় লেগেছিল।

ইতিমধ্যে ভেনিসের সাথে সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে দেশে সুলতানের বিরুদ্ধে জনরোষ বাড়তে থাকে। জানিসারিস আর সিপাহিরা কেবল নয়, উলেমা আর মুফতি সম্প্রদায়ও এতে কণ্ঠ মেলায়। সালতানাতে পরিবর্তনের সময় আসে। বিদ্রোহীরা প্রধান উজিরের পদচ্যুতি নিশ্চিত করে তার পদে নিজেদের নির্বাচিত লোককে নিয়োগ দেয়। বিদ্রোহীরা এরপর রাজপ্রাসাদ ঘিরে ধরে। সুলতান উচ্চপদস্থ লোক পাঠিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গের আদেশ দিলে জানিসারিসদের সমর্থনে তারা এসে হাজির হয়।

সুলতানের কাছে তিনটি দাবি পেশ করা হয় দপ্তরে বিক্রি-বাটা অর্থাৎ দূর্নীত দমন করা; প্রিয় সুলতানাদের অপসারণ ও তৃতীয় ছিল পদচ্যুত প্রধান উজিরের মৃত্যুদণ্ড। পরের দিনই প্রধান উজিরকে তার গোপন আস্তানা থেকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। এরপর সৈন্যদের ইচ্ছায় তাদের সামনে হাজির হতে অস্বীকৃতি জানায় সুলতান। তখন সৈন্যদের মাঝে থেকে একটি প্রতিনিধি দল সুলতানা ভালিদের সাথে দেখা করতে যায়। কালো মাথার কাপড় ও পাগড়ি পরিহিত দুই কৃষ্ণ খোঁজাকে সাথে নিয়ে প্রতিনিধিদলের সাথে দেখা করে সুলতানা ভালিদে। সৈন্যদের দাবি তার কাছে জানানো হয়। সুলতানকে সরিয়ে তাঁর স্থলে সাত বছর বয়সী মাহমুদের অভিষেক দাবি করে সৈন্যরা।

এরপর সুলতানা খারাপ মন্ত্রীদের কবলে পড়া সুলতানের দায়িত্ব পালনের পুনরায় সুযোগ প্রার্থনা করে। আর এ কাজে উলেমা ও প্রধান উজিরের অভিভাবকত্বও কামনা করে। আনাতোলিয়ার প্রধান বিচারক এই বলে সুলতানাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে সমস্যা সমাধানের বাইরে চলে গেছে। সুলতান কোনো যৌক্তিক পরামর্শে কান দেন না। বিভিন্ন পদে দুর্নীতি সব সীমা

ছাড়িয়ে গেছে। আয়া সোফিয়ার পবিত্র আজানের ধ্বনি হারিয়ে গেছে প্রাসাদের ভোগ-লালসার নৃত্য গীতের শব্দে। আইনের পথ থেকে চ্যুত হওয়া সুলতান নিরীহদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। বাজার লুটপাট হয়ে যাচ্ছে আর সুলতানের পছন্দের দাসেরা অটোমান বিশ্ব শাসন করছে।

কিন্তু কেমন করে একজন সাত বছরের বালক সাম্রাজ্য শাসন করবে এর উত্তরে বিচারক বলে, একজন অপ্রকৃতিস্থ শাসক যে কিনা কোনো কারণ ছাড়া হত্যা, দুর্নীতি আর বিভিন্ন ন্যক্কারজনক কাজে সাম্রাজ্যকে কলুষিত করছে, তাঁর তুলনায় একজন জ্ঞানী প্রধান উজির এ বালকের অধীনে রাজ্য শাসন করবে।

অবশেষে সুলতানা দাবি মেনে নিয়ে উত্তরে বলে "ঠিক আছে। তবে তাই হোক। আমি আমার পৌত্র মাহমুদকে মেনে নিচ্ছি। তাঁর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দাও।" সমস্বরে আনন্দ চিৎকার করে ওঠে সবাই। এরপর রাজদরবারের আঘাদের প্রহরায় বালক রাজকুমারকে সাম্রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরা একে একে এসে অভিবাদন জানিয়ে যায়। বালক আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, তাই ভিড় না ঘটিয়ে এ কাজ সমাধা করা হয়।

এরপর উজির ও উলেমারা একত্রিত হয়ে সুলতান ইব্রাহিমের কাছে উপস্থিত হয়। রুমেলির বিচারক ইব্রাহিমকে জানিয়ে দেয়, "আমার সুলতান, উলেমা এবং প্রধান কর্তাব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে।"

ইব্রাহিম চিৎকার করে উঠেন, "বিশ্বাসঘাতক! আমি কি তোমার সুলতান নই? এর অর্থ কী?

মুফতি সাহসের সাথে উত্তর দেয়, "আপনি আর সুলতান নন। ন্যায়বিচার আর পবিত্রতাকে পদদলিত করে আপনি পৃথিবী ধ্বংস করেছেন। অরাজকতা আর খেলাধুলায় বছর পার করেছেন। আমোদ-আহ্লাদে রাজকোষ অপচয় করেছেন। আপনার বদলে দুর্নীতি আর নিষ্ঠুরতাই পৃথিবী শাসন করেছেন।"

এর পরেও কেন তিনি সিংহাসন ছাড়বেন, এর উত্তরে ইব্রাহিমকে জানানো হয় যে, পূর্বপুরুষদের দেখানো পথে না চলে ইব্রাহিম নিজেই এ পদের অযোগ্য করে তুলেছে নিজেকে।

এরপর আবারো এই ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাক্যবান বর্ষণ করে ইব্রাহিম, একে তাঁর ভাগ্যলিপি ও ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে মেনে নিয়ে সেরাগলিওর কারাগারে গমন করে।

তার পরেও তাঁর ভাগ্য-নিষ্পত্তির জন্য বিদ্রোহী সিপাহিরা চিৎকার করে উঠলে প্রধান উজির ও অন্যান্যরা মুফতির কাছ থেকে ইব্রাহিমকে হত্যার জন্য ফতোয়া দাবি করে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরে মুফতি বলে ওঠে, "হ্যাঁ। ইসলামি আইনানুসারে যদি দুজন খলিফা থাকে, একজনকে মেরে ফেলো। মুফতি ও প্রধান উজির ইব্রাহিমের কক্ষে হত্যাকারী পাঠায়। বিচারকেরা জানালা দিয়ে দেখতে পায় কোরআন পাঠরত ইব্রাহিমকে। এরপর প্রধান ঘাতক যে কিনা তাঁর আদেশ পালন করত কোনো একসময়, ইব্রাহিম বলে উঠেন, "এমন কেউ কি নেই যে কিনা আমার রুটি খেয়েছে আর আমার ওপর দয়া দেখিয়ে আমাকে নিরাপত্তা দেবে? এরা আমাকে হত্যা করতে এসেছে। দয়া করো! দয়া করো!" এরপর অভিশাপ আর শাপ-শাপান্ত করতে থাকেন ইব্রাহিম।

এভাবে ১৬৪৮ সালে অটোমান ইতিহাসে দ্বিতীয়বার রাজহত্যার ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয়বারের মতো একটি শিশুকে সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু এই সংকটের সময় এ সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যের জন্য সত্য হিসেবে প্রতিপাদ্য হয়। শাসকের ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর ক্ষতি পুষিয়ে রাষ্ট্র আবার তার মৌলিক গঠন ফিরে পায়। উলেমার কণ্ঠ ধার করে মুসলিম প্রতিষ্ঠানসমূহ ধর্মের নামে আইনগত কাঠামো নিশ্চিত করে। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণে কাজ করা শুরু করে।

অসাধারণ সব প্রধান উজিরদের উন্মেষ ঘটে সঠিক সময়ে। একটি নির্দিষ্ট কপরুলাস পরিবার থেকে আগত উজিরদের এই বংশ বালক সুলতানকে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করতে থাকে।

ধর্মীয় এবং নৈর্ব্যক্তিক, উভয় মৌলিক প্রতিষ্ঠান মিলে মিশে পুনরায় সফলভাবে অটোমান রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত করে। সতেরো শতকের বাকি সময়টুকু জুড়ে অটোমান ধ্বংস এভাবে রুখে দেয়া সম্ভব হয়। এবং সাম্রাজ্য পুনরায় শক্তি ও সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হয়।

॥ ২১ ॥

শেষ মহান অটোমান সুলতান সুলেমানের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময় কেটে গেছে। দেশে এ সময় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে দিন কেটেছে। ইউরোপের জন্য এ সময়ে কোনো অটোমান অভিযান ঘটেনি। কিন্তু একইভাবে অটোমানরাও কোনরূপ হুমকির মাঝে পড়েনি। কেননা ইউরোপ নিজেই এ সময় ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত ছিল; এ সময়ে এসে নতুন করে খ্রিস্টান শক্তির সাথে এক ধরনের সমঝোতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তুর্কিদের। এর চিহ্ন ছিল নিশ্চিতভাবে ১৬০৬ সালে স্বাক্ষরিত "Treaty of Esituatorok অটোমান ও হাবসবুর্গগ সাম্রাজ্যের মাঝে।"

পূর্বে এ ধরনের চুক্তি সুলতান মঞ্জুর করতেন শুধু নিজের সুবিধামতো এবং নিজের শত্রুর প্রতি এক ধরনের অনুগ্রহস্বরূপ। এতে তাঁর শত্রু এমনকি ইস্তাম্বুলে

দূত পাঠাতে বাধ্য হতো। পূর্বে খ্রিস্টান সম্রাটদের সাথে করা চুক্তিসমূহ শুরু হতো এভাবে "চিরবিজয়ী সুলতান অনুগ্রহপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করছেন, পরাজিত ও অবিশ্বাসী ভিয়েনার রাজার প্রতি। এবারই প্রথমবারের মতো দুই শক্তির মাঝে সমতার চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। স্পষ্ট করে লেখা হয়, "সম্রাট এবং সুলতান" সমান ব্যবহার পাবে।" পূর্বে সুলতান হাবসর্বুগ সম্রাটকে মামুলিভাবে "স্পেনের রাজা" হিসেবে বিবেচনা করতেন। এখন ইউরোপের সাধারণ কূটনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁকে সমান মর্যাদা দিয়ে কাইজার উপাধি মেনে নিয়েছেন। এখন আর কোনো প্রজাসত্ব রইল না। অস্ট্রিয়া পূর্বে যে বার্ষিক কর প্রদান করত সুলতানকে তা রহিত করে, সীমিত অর্থ একবারে প্রদান ও পরে তা দূতদের মাঝে ইচ্ছাকৃত উহার আদান-প্রদানে পরিণত হয়।

এই চুক্তি অন্যান্য যুদ্ধবিরতি চুক্তির তুলনায় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হয়েছিল। ভূখণ্ডের মাঝে আরলাড, গ্রান ও কানিসা দুর্গ তুর্কিরা রাখে। হাঙ্গেরিতে অটোমান শাসিত অঞ্চলসমূহও রাখা হয়। কিন্তু পুরাতন হাঙ্গেরিতে করপ্রাপ্তির অংশ ছেড়ে দেয় তুর্কিরা। এমনকি ট্রানসিলভানিয়ার রাজকুমার অনেকাংশেই দাসত্বমুক্তি লাভ করে। অটোমান সেনাবাহিনীর প্রতি অবমাননাস্বরূপ এ চুক্তির মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে নতুন কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা হয়। আন্তর্জাতিক আইনের নীতি ও সনদের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তুর্কিরা। এছাড়া অটোমান অভিযানের সীমাবদ্ধতা ও হাবসবুর্গ শক্তির স্বীকৃতি জানায় তুর্কিরা। পূর্বে সুলতানের প্রজা হিসেবে বিভিন্ন গোত্রীয় বা ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদানের মাধ্যমে অর্ধ-স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা ভোগ করত। এ রীতিতে বিদেশি শক্তিদেরকেও আলিঙ্গন করা শুরু হয়। বিশেষ করে বণিকদেরকে। চার্টারে নিজ নিজ কূটনৈতিক ও উপদেষ্টাদের মাধ্যমে এরা বিভিন্ন ধরনের সুবিধা ভোগ করা শুরু করে। অন্য কথায় বলা যায়, "সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পণ।" অধ্যাপক টয়েনবি লিখে গেছেন, "ওসমানীয়রা পশ্চিমা বাণিজ্যিক উপনিবেশকে এমনভাবেই বিবেচনা করত, যেমনটা করত তাদের পূর্বপুরুষরা অন্য জায়গার অচেনা অধিবাসীদের। এদের কাছে থেকে প্রয়োজনীয় বা জাঁকজমকের জন্য নানা জিনিস কিনত তারা; যেগুলো তারা নিজেরা উপাদান করতে পারত না।"

সতেরো শতকজুড়ে এভাবেই সাম্রাজ্যের বৈদেশিক সম্পর্কের চরিত্র ও আকার পরিবর্তিত হয়।

এর আগে এ ধরনের সুবিধা ভোগ করত ফ্রান্স সুলেমানের আমলে ১৫৩৫ সালে। দুই পক্ষবিশিষ্ট এ চুক্তিটি ছিল বেশ শক্তিশালী।

১৫৭৯ সালে সুলতান তৃতীয় মুরাদের শাসনামলে ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় হেনরি ভেবে দেখলেন যে তাঁদের সম্পর্ক আরো মজবুত করা দরকার। এ

উপলক্ষে পূর্বের চেয়ে উচ্চ পদমর্যাদার ফরাসি দূত পাঠান ইস্তাম্বুলে। ব্যারস ডি জারমিনি নামে এ এজেন্ট দিওয়ানের বিশ্বাস অর্জন করে তুর্ক-ফ্রেঞ্চ মৈত্রী আরো পাকাপোক্ত করে। এছাড়াও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে শর্তাধীন সন্ধি নিশ্চিত করে সব কূটনৈতিককে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় ফ্রান্সকে। এছাড়াও জেরুজালেম, সিনাইসহ অটোমান সাম্রাজ্যে উপস্থিত ভেনেশীয় বাদে সকল খ্রিস্টানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এ চুক্তির মাধ্যমে।

রাজনৈতিক প্রভাব ব্যতিরেকে দুর্নীতির এই যুগে উজিরেরা, প্রাসাদ ও সামরিক কর্তাব্যক্তিরা, হারেম ও অন্য সবখানে উপস্থিত সুলতানের প্রিয়ভাজনেরা এ চুক্তির মাধ্যমে আগত বিদেশি কর ও অর্থে যথেচ্ছ সংগ্রহ ও ব্যবহার করত। ফ্রেঞ্চ শর্তাধীন সন্ধির নবায়নের দুই বছরের মাথাতেই বস্তুত সুলতান এ সত্য প্রতিষ্ঠা করেন যে, নিরাপত্তার খাতিরে সবাইকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত পোর্তে নগরী।

নির্দিষ্ট করে এক্ষেত্রে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডের রানি এলিজাবেথের কথা। তাঁর দাবি ছিল যে ফ্রেঞ্চ পতাকা নয়, ইংল্যাণ্ডের পতাকা বহন করে এর জাহাজসমূহ চলাচল করবে। এছাড়াও অটোমান সাম্রাজ্যের মাঝে ইংরেজদের নৌযানের স্বাধীনতা ও বাণিজ্য করতে দেয়া হবে। ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে ভেনেশীয়দের সাথে যোগাযোগ করে ইংরেজ জাহাজসমূহ ভূমধ্যসাগরে অনুপ্রবেশ করলেও তুর্কিরা নৌ-ক্ষমতা লাভ করলে তারা সরে যায়। এর বদলে পর্তুগিজরা কেপ পথের উন্নতি করলে ইংরেজরা নেদারল্যান্ডস চলে যায়। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে রানি পর্তুগাল দখল করে নিলে নেদারল্যান্ডস বিদ্রোহ করে আর এ সুযোগ নষ্ট হয়।

মোটের ওপরে স্পেনে দাঙ্গা বেড়ে গেলে এটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে তুর্কিদের সাথে মৈত্রী গড়ে তুললে ভূমধ্যসাগরে স্পেনের প্রভাব রুখে দেয়া যাবে।

এ লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দুজন বণিক, রাজকুমার স্যার এডওয়ার্ড অসবর্ন এবং তার সহকর্মী রিচার্ড স্ট্যাপার উদ্যোগ নেয়। ১৫৭৫ সালে দুজন প্রতিনিধি পাঠায় ইস্তাম্বুলে। তাদের মাঝে একজন আঠারো মাস ইস্তাম্বুলে থেকে সুলতানের কাছ থেকে অসবর্ণের দাবির প্রতি সমর্থন আদায় করে। এ দাবি ছিল অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বার্থের পাশাপাশি লেভান্তের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা। ১৫৭৮ সালে উইলিয়াম হারবর্ন প্রথম ইংরেজ কূটনীতিক হিসেবে ইস্তাম্বুলে যাত্রা করে।

পোর্তে শহরে পা দেওয়ার কিছুদিনের মাঝে কূটনৈতিক বুদ্ধিতে বলীয়ান উইলিয়াম তুর্কি অঞ্চলে ব্যবসার স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা আদায় করে নেয়। সুলতান মুরাদ ও রানি এলিজাবেথের মাঝে পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে এ ব্যাপার চূড়ান্ত হয় ও এরপর ১৫৮০ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইউরোপীয় অটোমান কূটনৈতিক আদান-প্রদান।

এ চুক্তির মাধ্যমে সুলতান রানি এলিজাবেথকে "প্রখ্যাত এলিজাবেথ, জিসাসের প্রকৃত ভক্ত... চিরস্থায়ী আনন্দ, গৌরবের মহান ইংল্যান্ডের উত্তরাধিকারী, উল্লেখ করে জ্ঞাত করেন যে সাম্রাজ্যের অঞ্চলে ইংল্যান্ড থেকে আগত ব্যক্তি আসতে পারবে। নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পারবে। কেউ তাদের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস করবে না। অন্যান্য খ্রিস্টান বণিকদের মতোই কাউকে বিরক্ত না করে ব্যবসাও করতে পারবে।

চূড়ান্ত চুক্তিপত্রে আরো স্পষ্ট করে বলা হয় যে, যদি কোনো ইংরেজ বন্দি হয়, তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেয়া হবে। আইনানুযায়ী শুল্ক বাদে আর কোনো কর দিতে হবে না; নিজেদের জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারবে কোনো সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য; বিক্রি মূল্য দিয়ে কোনো ইংরেজ দাসকে মুক্ত করতে পারবে; ঝড় বা জাহাজ ভেঙে যাওয়ার মতো কোনো দুর্ঘটনায় তুর্কি জাহাজ ইংরেজ জাহাজসমূহকে সাহায্য করবে এবং কোন বাধা ছাড়াই নাবিকেরা রসদ, খাবার কিনতে পারবে। এরপর হারবর্ন ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে রাণির কাছে ও নিজের বণিক প্রভুর কাছে চুক্তির উন্নতি নিয়ে প্রতিবেদন পেশ করে।

কিন্তু ইংরেজদের সাথে এ চুক্তির পরপরই ফরাসিরা খেপে ওঠে। এর মাধ্যমে ফরাসিদের সাথে করা সকল জাহাজ এমনকি ইংরেজ জাহাজ ও ফরাসি পতাকা তলে তুর্কি জল সীমান্তে ব্যবসা করার চুক্তির বরখেলাপ হয়।

এই সময়ে তুর্কিদের বিশেষভাবে পশ্চিমাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রয়োজন ছিল। পারস্যের সাথে যুদ্ধের কারণে এক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এ চাহিদার উত্তরে জারমিনি, ফ্রেঞ্চ কূটনীতিক না-বোধক উত্তর দেয়। কেননা গৃহযুদ্ধের ফলে ফ্রান্সেও এক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে ইংল্যান্ড তুর্কিদেরকে অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন কাঁচামাল যেমন লোহা, স্টিল, টিন, দস্তা প্রভৃতি দিতে প্রস্তুত ছিল। মোটের ওপর সুলতান রাণি এলিজাবেথের মাঝে স্পেনের বিরুদ্ধে নিজের সম্ভাব্য মিত্রের দেখা পেয়েছিলেন।

ইংল্যান্ডে ফিরে এসে হারবর্ন তার কাজের ক্ষেত্রে মূল্যবান সমর্থন লাভ করে। এর ফলাফলস্বরূপ অসবর্ণ ও তার দলের পক্ষ থেকে তুর্কি সুলতানের কাছে দাপ্তরিক একটি আবেদনপত্রে এই সময়কার সাধারণ একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের খসড়া পাঠানো হয়। এই আবেদন মঞ্জুর করা হলে তুর্কি অঞ্চলে ১৫৮১ সালের সেপ্টেম্বরে সাত বছরের জন্য ইংরেজদের ব্যবসার অধিকার নিশ্চিত হয়। এর মাধ্যমে লেভান্ত কোম্পানি দ্য "কোম্পানি অভ তুর্কি ম্যারচান্টস" স্থাপিত হয়। কিন্তু রাণি এলিজাবেথ ব্যক্তিগতভাবে হারবর্নের ইস্তাম্বুলে প্রথম যাত্রার খরচ বহন করতে রাজি থাকলেও, একটি স্থায়ী কূটনৈতিক মিশন

প্রতিষ্ঠা করা ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন তর্কের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে কোম্পানি মিশনের খরচ চালাবে। অবশেষে ১৫৮২ সালের নভেম্বরে সুলতানের রাজদরবারে উইলিয়াম হারবর্নকে প্রথম ইংরেজ কূটনীতিক হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। একই সাথে রাজ প্রতিনিধি ও বাণিজ্যিক এজেন্টের উভয় দায়িত্ব বর্তায় তার ওপরে।

"সুসান অব লন্ডন" নামে লম্বা একটি জাহাজে করে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসে হারবর্ন। তীরে দাঁড়িয়ে ছিল এক স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী সৈন্য। ঢাক ও বাদ্যের আনন্দ সংগীতের মাঝে তারা বরণ করে নেয় হারবর্নকে। পাশাদের মাঝে বিভিন্ন উপহার বিলিয়ে দেয়ার পর আরো উপহার ও রাণি এলিজাবেথের কাছ থেকে আনা এক পত্র নিয়ে উলুজ আলীর সাথে মিলিত হয় হারবর্ন।

এরপর সুলতানের প্রাসাদে ১৫০ পদ খাবারসহ আনন্দ আয়োজনে করা হয় হারবর্ন ও তার দলের জন্য। পান করার জন্য ছিল "গোলাপ জল, চিনি ও মসলার একত্রিত সংমিশ্রণ" কিন্তু হারবর্নের প্রতি এই সম্ভাষণে ক্ষিপ্ত হয়ে জারমিনি তাকে "বণিকদের মামুলি বেতনভুক" হিসেবে আখ্যায়িত করে। এমনকি যদি ইংরেজ জাহাজসমূহ নিজেদের পাতাকাতলে চলাচল করে তাহলে ফ্রাঙ্কো-তার্কিশ মৈত্রী জোট ভেঙে দেওয়ার ও হুমকি দেয়া হয়।

ভেনেশীয় কূটনীতিক মোরোসিনি প্রধান উজিরকে ঘুষপূর্বক বোঝাবার চেষ্টা করে যে, তুর্কি ব্যবসায় ইংরেজদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে তুর্কিদের শুল্কের ওপর তা খারাপ প্রভাব ফেলবে।

কিন্তু প্রধান উজির জারমিনিকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেয় যে "এই ধরনের অবনতির মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। এছাড়াও আরো জানিয়ে দেয় যে শান্তিকামী সকলের জন্য পোর্তে উন্মুক্ত।

হারবর্ন পেশাগত দায়িত্বকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। জারমিনির সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়া চরিত্রের বিপরীতে হারবর্নের ছিল স্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।

শীঘ্রই স্থগিত হওয়া সন্ধিশর্তে আত্মসমপর্নকে নবায়ন করে ফেলে হারবর্ন। দেশপ্রেমিক হিসেবে নিজের দেশের মহত্ত্ব তুলে ধরার দিকে সব সময় উৎসাহী ছিল হারবর্ন।

ফ্রান্সের তুলনায় ইংল্যান্ড একটু বেশি সুবিধা পেয়েছিল কার্যক্ষেত্রে। ইংল্যান্ডের সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পণ বাণিজ্যিক সুবিধাদির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ফরাসিরা সকল খ্রিস্টান ও চার্চের নিরাপত্তাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিল। অথচ এমন একটা সময় আসে যখন সুলতান মুফতির মাধ্যমে ধর্মীয়ভাবে প্ররোচিত হয়ে ইস্তাম্বুলের সকল গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। জারমিনির প্রতিবাদ ও অর্থডক্স গ্রিকদের চাঁদাদানের মাধ্যমে এ হুমকি রহিত হলেও

গালাটাতে তিনটি গির্জা বন্ধ করে দেয়া হয়। বিচার বিভাগীয় উপহার প্রদানের মাধ্যমেই শুধু এ গির্জাসমূহ পুনরায় খুলে দেয়া হয়। কিন্তু জারমিনির পরবর্তী কূটনীতিক বিতর্ক উসকে দেয়; প্রধান গির্জায় রাজকীয় প্রতিনিধির জন্য সংরক্ষিত জায়গা বলপূর্বক দখল করে। কিন্তু এতে করে প্রধান উজির গির্জাটি বন্ধ করে দেয়। আর এই নতুন দূতের ইংরেজ বৈরীতার সন্ধান পেয়ে হারবর্ন আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দেয় যে, "আমার মনে হয় না, আমাকে পদচ্যুত করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী সে।"

কিন্তু উভয় ইউরোপীয় শক্তির জন্য এই বর্তমান সুযোগ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনে। এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নৌশক্তির যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে অটোমান সাম্রাজ্য আর বিবাদে বা যুদ্ধে জড়াতে চায় না।

রাজা ফিলিপ তাঁর আটলান্টিক বন্দরে বৃহৎ বড় স্প্যানিশ রণপোতবহর তৈরি করেন ইংল্যান্ড আক্রমণ করার জন্য। পোর্তে এ সময় হারবর্নের নৌ সহায়তার প্রার্থনায় নম্রভাবে বোবা বনে থাকে।

এদিকে ফ্রান্সও রাজা চতুর্থ হেনরির জন্য যে কিনা তাঁর আভ্যন্তরীণ ক্যাথলিক শত্রু গাইসেসের বিরুদ্ধে লড়ছেন, তুর্কি সাহায্য কামনা করতে থাকে। গাইসেস কে আবার সাহায্য করছে স্পেনের ফিলিপ। সুলতান তাই রাণি এলিজাবেথ ও রাজা হেনরি উভয়কেই স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উৎসাহিত করতে থাকে ও তুর্কি সাহায্যের প্রত্যাশা বেড়ে যায় সকলের।

এভাবেই সবাই আশা করতে থাকে যে প্রতিমাপূজারী স্পেনের বিরুদ্ধে তুর্কিরা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স উভয়কে সাহায্য করবে। এডওয়ার্ড বারটন, রাণির মন্ত্রিপরিষদের কাছে এমনটাই পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলেও বাস্তবে সুলতানের কৃপণতা অথবা রাজকোষের সত্যিকারের বেহাল অবস্থার কারণে এ রকম তুর্কি রণপোতবহরের পরিকল্পনা আলোর মুখ দেখেনি।

১৫৯৫ সালে সুলতান তৃতীয় মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করলে রাণি এলিজাবেথ রাজদরবারে নিয়মিত দেন-দরবার করতে থাকে নিজের ক্যাথলিক শত্রুর বিরুদ্ধে তুর্কি সমর্থন তৈরি করতে। এ উদ্দেশ্যে জাহাজ ভর্তি করে উল ও বিভিন্ন ধরনের কাপড় পাঠানো হয়। কিন্তু সবচেয়ে অভূতপূর্ব ছিল piece de resistance নামে একটি বাদ্যযন্ত্র। এ যন্ত্র তার মৌলিক নকশা ও অদ্বিতীয়তার জন্য বিখ্যাত হয়ে পড়ে। এর নির্মাতাই এ যন্ত্রকে ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসেন। থমাস ডালাম। সুলতান বিমোহিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে কৃত্রিম ঝোপের মাঝে বানানো, কালো পাখির দল, যেগুলো গানের শেষে পাখাও নাড়াতো।

তবে মাহমুদ সবচেয়ে চমকিত হয়ে উঠেন ডালাম ও তার যন্ত্রকে বহন করে নিয়ে আসা জাহাজ "হেক্টর" দেখে। গোল্ডেন হর্নে ভিড় ভর্তি দশনার্থীদের

মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে এ জলযান। ভেনেশীয় কূটনীতিক ভীত হয়ে ভাবতে বসে যায় যে খ্রিস্টানদের জন্য এ প্রভাব ক্ষতিকর হবে। কেননা তুর্কিরা যা জানত না সেদিকে তাদেরও দৃষ্টি খুলে যাবে। কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। ষোড়শ শতাব্দী শেষ হওয়ার পর, উলুজ আলীর মৃত্যুর পর অটোমান নৌবাহিনী কোনো শত্রুর প্রতি হুমকি বা মিত্রের প্রতি সহায়তা উভয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এর অস্ত্রশস্ত্র হয়ে পড়ে বিকলাঙ্গ। তুর্কি সাম্রাজ্যের সমূহ শক্তি যেমনটা বলা হতো, "যুদ্ধ নয়, স্পেনের সাথে শান্তির" মধ্য দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পোর্তেতে ইংরেজ-ফরাসি বৈরিতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন চতুর্থ হেনরি স্যাভারী ডে ব্রিভস্‌কে নতুন কূটনীতিক করে পাঠান। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক উভয় দিক দিয়ে ফরাসি প্রভাব বৃদ্ধি পায় পোর্তেতে। বারটনের স্থলাভিষিক্ত হেনরি লেলো অভিযোগ করে ওঠে, "ফরাসি কূটনীতিক ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে আমার নকশাকে বাধাগ্রস্ত করতে এমন কোনো কাজ নেই যা তিনি করেন না।"

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব এতটা বেড়ে যায় যে ভেনেশীয় কূটনীতিক এক শীতে রিপোর্ট লেখেন যে, "গতকাল সন্ধ্যায় তুষার-বল ম্যাচের ফলাফলের পর ফরাসি ও ইংরেজ কূটনীতিকদের গৃহভৃত্যদের মাঝে ভয়ংকর ঝগড়া বাধে। অনেকেই মারাত্মক আহত হয়। কূটনীতিকরা নিজেরাও অংশগ্রহণ না করলে অবস্থা এতটা খারাপ হতো না।"

হাঙ্গেরিতে তৃতীয় মাহমুদের লাগাতার যুদ্ধের ফলে ইংরেজ-ফরাসি দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়। কেননা চতুর্থ হেনরি পবিত্র রোমান সম্রাট হতে চেয়েছিলেন। ফরাসি ও ইংরেজদের মাঝে মতভেদের প্রধান উৎস ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। ডে ব্রিভস্ সব সময় চেষ্টা করত ইংরেজদের সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পণ চুক্তির নবায়ন রুখে দিতে।

এভাবে এতে জড়িত হয়ে পড়ে ডাচ্। তুর্কি জলসীমায় ইংরেজ ও ফরাসিদের সাথে প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে ডাচ্ বণিকরা। স্বাধীনতাযুদ্ধে ইংরেজরা ডাচ্‌দের সহায়তা করায় তারা ইংরেজ পতাকাতলে আনতে চায় ডাচ্‌কে। অন্যদিকে স্পেনীয় প্রজা হওয়ায় ফ্রান্স ডাচ্‌কে নিজের আয়ত্তে আনতে চায়। অবশেষে ১৬০১ সালে প্রধান উজির নতুন করে চুক্তি নবায়নের মাধ্যমে ডাচ্‌দের নির্দেশ দেয় ইংরেজ পতাকাতলে জাহাজ চালানোর।

১৬১২ সালে একত্রিত প্রদেশসমূহকে সীমিত ব্যবসায়ের শর্তে ইংরেজ ও ফরাসিদের মতো সুবিধা দেয়া হয়। এতে করে মুফতির কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তামাক প্রচলিত হয় তুর্কিতে। অটোমান তুর্কিরা এতটা সাদরে গ্রহণ করে যে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মাঝে জাতীয় প্রতীকে পরিণত হয়—পাইপ। সুলেমানের অধীনে ইতিমধ্যেই কফির প্রচলন হয়েছিল। কবির ভাষায়, আফিম

আর ওয়াইনের সাথে কফি ও তামাকের প্রচলনে এখন তুর্কিরা আনন্দ ভুবনের চার উপাদানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু মুসলিম বিধান রক্ষকদের ভাষায়, "শয়তানের চার সহচরই ছিল এরা।"

এভাবে সুলেমানের শাসনামল শেষে অটোমান সাম্রাজ্যজুড়ে শুরু হয় ইংরেজ প্রভাব ও ইংরেজ-ফরাসি দ্বন্দ্ব।

॥ ২২ ॥

১৬৪৮ সালে সুলতান ইব্রাহিমের হত্যাকাণ্ড ও তাঁর পুত্র, বালক সুলতান চতুর্থ মাহমুদের অভিষেকের সাথে সাথে অভ্যুত্থান শুরু হয়নি। মাহমুদের শাসনামলের প্রথম আট বছর ধরে জানিসারিস ও সিপাহিদের মাঝে মতভেদের দরুন রাজদ্রোহ চলতেই থাকে। আর এতে সর্বতভাবে অনুপ্রেরণা ঢালেন দুই সুলতানা। মাহমুদের মাতা ও দাদি। এছাড়া বিদেশ থেকেও আসতে থাকে নতুন হুমকি। ক্রীটে অটোমানদের লাগাতার অভিযানের ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তুর্কিরা আর সমুদ্র শাসনের ক্ষমতা রাখে না। সপ্তদশ শতকের মাঝ বরাবর থেকে ভেনেশীয়দের হাতে চলে যায় এ ক্ষমতা। এছাড়াও মাল্টিজ এবং তাস্কানরাও অটোমান নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তুর্কিরা এমনকি নিজেদের সমুদ্র সীমা বা উপকূলের প্রতিরক্ষাতেও ব্যর্থ হতে থাকে।

দার্দেনালেসে অটোমান ও তুর্কিদের মাঝে বিশাল এক যুদ্ধ হয়ে যায় যেখানে ভেনেশীয়রা তুর্কিদেরকে পরাজিত করে তুর্কিদের রসদ বহনকারী জাহাজ ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে প্রণালি পথে ভেনেশীয়দের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে খোদ রাজধানীতে রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। জনরোষ ছড়িয়ে পড়ে আর সবার মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যে রাজধানী আক্রমণ হতে যাচ্ছে।

শুধু এই সংকটে পড়ে মাহমুদের মাতা সুলতানা তুরহান গোপনে দক্ষ কোপরুলু মাহমুদকে অটোমান অভ্যুত্থানের দায়িত্ব অর্পণ করে। প্রধান উজির পদে নিয়োগ দেয়া তাকে।

উত্তর আনাতোলিয়ার কোপরু শহরে ঝোড়ো হওয়া একাত্তর বছর বয়সী মাহমুদের শর্ত সাপেক্ষে প্রধান উজির পদে দায়িত্ব পালনে রাজি হন ঃ তার সমস্ত কাজ বিনা প্রশ্নে বৈধতা পাবে; সব দপ্তরে কর্মী নিয়োগে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবেন তিনি; কোনো উজির বা কর্মী তার ওপরওয়ালার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না; রাজদরবারে সমস্ত প্রতিবেদন তার মাধ্যমে যাবে। সংক্ষেপে সুলতানের মতো একচ্ছত্র ক্ষমতার দাবি করে প্রধান উজির। সুলতানা তুরহান নিজের পুত্রের হয়ে সমস্ত শর্ত মেনে নেন। মুফতি ফতোয়া জারি করে সমস্ত কাজে বৈধতা দেয় ও সুলতান মায়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় তাকে

প্রধান উজির পদে নিয়োগ দেন। নিয়োগপ্রাপ্তির পরে বলকান পর্বতমালার খ্রিস্টান; আলবেনিয়ার নিজ শহরের লোক ও বুলগেরিয়া থেকে অনেককেই নিয়োগদান ও ইসলামে ধর্মান্তরিত করে প্রধান উজির। এর মাধ্যমে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে নতুন বিশ্বস্ততা ও প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়।

সাম্রাজ্যের সরকার পরিচালনার ভার কার্যত সম্পূর্ণভাবে কোপরুলুর হাতে ও পরবর্তীতে তার পুত্র আহমেদের হাতে ছেড়ে দেন সুলতান। নিজে সরকার পরিচালনা না করলেও পিতা ও পুত্রকে সমস্ত ষড়যন্ত্র ও সাম্রাজ্যের শত্রুদের বিরুদ্ধে সমর্থন দান করতে থাকেন। এভাবে পরবর্তী বিশ বছরে দুই রাজত্বকালের মধ্যবর্তী সময়টুকু বাদে সপ্তদশ শতকের শেষ নাগাদ অটোমান রাষ্ট্র, রাজকীয় পরিবারতন্ত্রের কাঠামোর বাইরে, প্রধান উজিরের শক্তিশালী মন্ত্রিপরিষদের স্বাদ গ্রহণ করে। এই পরিবার তাদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সরকার পরিচালনার ক্ষমতাবলে সাম্রাজ্যের সরকার ব্যবস্থা সুলতানের প্রাসাদ থেকে সরিয়ে প্রধান উজিরের প্রাসাদ বাব-ই-আলীতে হস্তান্তর করে।

সরকার পরিচালনার যন্ত্র ও এদের কমতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিল কোপরুলু। কথার চেয়ে কর্মে বিশ্বাসী শক্তিশালী এই ব্যক্তি শাসনভার গ্রহণের পরপরই বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মীদের মাঝে রদবদল ঘটান। বিশৃঙ্খলা দুর্নীতি রুখতে ও সাম্রাজ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের নিমিত্তে প্রথম পাঁচ বছরের মাঝে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার দুর্বৃত্তকে হত্যার আদেশ দেন কোপরুলু। এদের মাঝে প্রধান জল্লাদ নিজে ব্যক্তিগতভাবে চার হাজার জনকে শ্বাসরোধে হত্যা করে।

কোনো প্রবণ আবেগের বশে নয় বরঞ্চ ঠাণ্ডা মাথায় বিস্তর বিচার বিবেচনা করে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার খাতিরে হুমকিস্বরূপ কর্মচারী, সৈন্য, বিচারক, একই ধর্মীয় সকলকে হত্যার আদেশ দেয় প্রধান উজির। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ স্থিরতার পাশাপাশি দেশের বাইরেও সম্মান ও শক্তি অর্জন করা।

সবকিছুর ওপরে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার মনস্থির করে কোপরুলু। ঘরের সমস্যা থেকে দূরে রেখে বাইরে অটোমান অভিযানের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয়ে ওঠে কোপরুলু। ত্বারিত গতিতে দার্দেনালেস থেকে ভেনেশীয়দের বিতাড়িত করে, টেনেডস ও লৈমনস্ দ্বীপ পুনর্দখল করে অটোমান নৌবাহিনীর আত্মবিশ্বাস পুনরায় ফিরিয়ে আনে প্রধান উজির। এরপর প্রণালিতে প্রবেশমুখে দুটি স্থায়ী দুর্গ নির্মাণ করে আজিয়ানের বন্দর ও দ্বীপসমূহে তুর্কি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে পুনরায় ক্রিট দ্বীপে সৈন্য পাঠানোর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে কোপরুলু। যদিও ভূমধ্যসাগরে অটোমান নৌবাহিনী পুরোপুরি ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে পারেনি; কিন্তু ভেনিসের যুদ্ধ ও ক্যান্ডিয়া অবরোধের ক্ষেত্রে বাধা অপসারিত হয়।

কোজাকদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ সাগরে অটোমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ট্রান্সসিলভ্যানিয়াতে অভিযান পরিচালনায় সফলতা পায় প্রধান উজির। নতুন একটি প্রদেশ গঠন করে এখানে যাতে করে হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়াতে বড়োসড়ো অভিযান পরিচালনা করা যায়।

পাঁচ বছর শাসন করে ১৬৬১ সালে কোপরুলু মাহমুদ মৃত্যুবরণ করে। তার পুত্র আহমেদ, দ্বিতীয় কোপরুলু নামে পরবর্তী পনেরো বছর রাষ্ট্রনায়কের মতোই অটোমান সাম্রাজ্য পরিচালনা করে। মৃত্যুশয্যায় বিশ বছর বয়সী সুলতানের জন্য অবশ্য পালনীয় চারটি নীতি প্রস্তুত করে দিয়ে যায় কোপরুলু ঃ কখনো কোনো নারীর পরামর্শে কান না দেয়া; কখনো কোনো প্রজাকে বেশি ধনী না হতে দেয়া; সবসময় জনগণের রাজকোষ পূর্ণ রাখা; সবসময় ঘোড়ার পিঠে থাকা, সেনাবাহিনীকে নিয়মিত কাজে ব্যস্ত রাখা।

বস্তুত সুলতান মাহমুদ নিজের জীবনের বেশির ভাগ সময় ঘোড়ার পিঠে কাটিয়েছেন কিন্তু কোনো যুদ্ধে নয়, ঘোড়দৌড়ের মজা লাভের জন্য।

বাল্যকাল থেকেই সব ধরনের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী সুলতান ছিলেন ঘোড়দৌড়ে পারদর্শী ও দক্ষ শিকারি। সুলতানের ক্রীড়া অভিযানের কারণে বলকান ও আড্রিয়ানোপল অঞ্চলের প্রজারাও প্রস্তুত থাকত। একবার এক উপলক্ষে পনেরোটি পৃথক জেলা থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার কৃষকদেরকে একত্রে জড়ো করা হয়। "চার-পাঁচ দিনের জন্য বনের গাছপালায় শব্দ করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয় তাদের... এই চক্রের মাঝে সকল প্রকার বন্য পশুকে বন্দি করে ফেলা হয়। তারপর নির্দিষ্ট দিনে মহান প্রভু কুকুর, বন্দুক বা অন্য কোনোভাবে তাদের হত্যা করেন।" গ্রামাঞ্চলের ওপর এই বাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্য শুল্ক আরোপ করা হয়। প্রচণ্ড শীতে, অপরিচিত জঙ্গলে পরিশ্রান্ত ও ক্ষতি স্বীকার করে অনেকেই সুলতানের অবসরকালের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন দান করতে বাধ্য হয়।

এমন নয় যে সুলতানের সহচরেরা প্রভুর এহেন আচরণ সবসময় খুশি মনে মেনে নিত। বরঞ্চ স্মৃতিকাতর হয়ে তারা সেরাগলিওতে কাটানো কর্মহীন দিনের কথা ভাবত। পুত্রের এ যথেচ্ছাচার যাযাবরসুলভ প্রাণচাতুর্যের তুলনায় হয়তো পিতার আয়েশী জীবন আনন্দের ছিল। এক শীতের দিনে ঘরে ফেরার ইশারাতে পুরো বিশ ঘণ্টা ঘোড়ার পিঠে থাকে সুলতান ও অন্যদেরও বাধ্য করে। পূর্বপুরুষদের যুদ্ধ বিক্রমের মতো তাঁর শিকারের কাহিনীও কবিতাতে মহান হয়ে আছে। নিজের হাতে প্রতিটি শিকার করা পশুর সবিস্তারে বর্ণনা লিখে রাখত মাহমুদ।

সুলতান মাহমুদ স্বেচ্ছায় শুধু দানিয়ুবে কোপরুলু আহমেদের সাথে অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন প্রধান উজির যুদ্ধ করছিল সুলতান

শিকার করছিলেন। ১৬৬৩ সালে নিজ বাহিনীর সাথে আড্রিয়ানোপল পর্যন্ত যাওয়ার পর আহমেদের হাতে পবিত্র স্তম্ভ হস্তান্তর করে সরে যান সুলতান। বেলগ্রেডে আহমেদ এত বড় বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় যেমনটা সুলেমানের পর থেকে আর একত্রিত হয়নি। এক্ষেত্রে ওয়ালাসিয়া, রুমানিয়া ও তুর্কি সহায়তায় হাবসবুর্গ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হাঙ্গেরিয় কৃষকেরা যোগ দেয়।

ড্রাভাতে পৌঁছে সুলেমানের সময়ে ধার্যকৃত কর দাবি করলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আহমেদ বূদা হয়ে নহ্‌সেলে পৌঁছায়। এখানে অস্ট্রিয়াকে চমকে দিয়ে প্রায় সত্তুর বছর পর তুর্কিরা কোনো বৃহৎ বিজয় অর্জনে সমর্থ হয়। এর ফলে আহমেদ আরো উচ্ছাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে ভিয়েনা দখলের ও মহান সুলেমানকে ছাড়িয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

এরপর বেলগ্রেডে শীত কাটিয়ে পশ্চিমে অগ্রযাত্রা শুরু করে আহমেদ। ভিয়েনার সব দুর্গ দখল করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগোতে থাকে আহমেদ। এহেন হুমকির মুখে ভাস্‌ভারে অস্ট্রীয়রা শান্তিচুক্তির কথা তুললে নীতিগত দিক দিয়ে একমত হয় আহমেদ। কিন্তু স্বাক্ষরের পূর্বেই রাব নদী পার হতে চায় সে। কিন্তু সেন্ট গোর্থাডের আশ্রমের কাছে এসে সংখ্যায় ছোট কিন্তু কৌশলগত দিক দিয়ে দক্ষ রাজকীয় বাহিনীর কাছে দ্রুত পরাজিত হয় আহমেদ।

১৬৬৪ সালে সেন্ট গোর্থাডের পরাজয়ে ভাগ্যের চাকা উল্টো দিকে ঘোরা শুরু করে। ইউরোপের খ্রিস্টান শক্তি দ্বারা অবিশ্বাসী তুর্কিরা প্রথমবারের মতো বৃহৎভাবে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের মাধ্যমে নতুন মাত্রার সামরিক অভিজ্ঞতা হয় তুর্কি বাহিনীর। প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, কৌশল এবং নেতৃত্ব প্রভৃতি সবক্ষেত্রে ইউরোপীয় বাহিনী ত্রিশ বছরের যুদ্ধের পর উন্নত হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতকের যুদ্ধ স্পৃহা নিয়ে তুর্কি বাহিনী তাদের সাথে পায়ে পা মেলাতে পারেনি।

সামরিক প্রকৌশলের দিক দিয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় এ সময় উন্নত ছিল ফরাসিরা। সেন্ট গোর্থাডের অস্ট্রিয়াবাসীকেও সাহায্য করে চতুর্দশ লুইস। কেননা প্রথম কোপরুলুর শাসনামল থেকেই কূটনীতিক সম্পর্কে ফরাসি ও তুর্কিদের দোটানা চলছে।

অস্ট্রিয়া বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও কম ছিল না। যুদ্ধ শুরুর দশ দিনের মাথাতেই প্রধান উজিরের সাথে শান্তি আলোচনায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে তারা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে অটোমানরা অস্ট্রীয়দের বিজয় খুশি মনে গ্রহণ করে। তুর্কিরা নিজেদের অভিযানে বিজয় লাভ করা অঞ্চলসমূহ লাভ করে ও ইস্তাম্বুলে বিজয়ের বেশে ফিরে আসে।

১৬৬৬ সালে বৃহৎ এক বাহিনী নিয়ে ক্রীটের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে আহমেদ্। এখানে তিন বছর থাকে আহমেদ। আর এই তিন বছরে এক

ক্রেটান দাসি তরুণী সুলতানের প্রিয়া সুলতানা হয়ে প্রভুর দেখভাল করে ও আহমেদকে সমর্থন করে।

ক্যান্ডিয়া অবরোধ ছিল উভয় পক্ষের শক্তি প্রদর্শনের মতো। প্রকৌশলীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাইন ফিট করে, পরিখা খনন করে ট্রেঞ্চ বানায় তুর্কি প্রতিরোধে। অন্যদিকে তুর্কিরাও রোডস অবরোধের সময় থেকেই এ কাজে পারদর্শী হয়ে দক্ষতার সাথে ক্যান্ডিয়ার নিচে গর্ত খনন করে চলে।

অভিযানের প্রতিটি পর্বে তুর্কিরা নৌবাহিনী পাঠানোর ক্ষমতা অর্জন করেছিল। অন্যদিকে ভেনেশীয়দেরকে সহায়তা করেছে পোপের বাহিনী, ইটালিয় ও হাবসবুর্গের রাজকীয় বাহিনী। এমনকি গোপনে ফরাসি বাহিনীর সহায়তাও পেয়েছিল তারা।

ট্রয় নগরীর চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে অবরুদ্ধ থাকে দ্বীপ। বিজয়ের পর আহমেদ সম্মানসূচক কিছু শর্ত তৈরি করেন; যা মেনে নেয় ক্রিট। ক্রেটানরা অন্য কোথাও বাসভূমি খুঁজে নেওয়ার স্বাধীনতা পায়। ভেনিস দ্বীপে বন্দর রাখতে পারলেও তা এক অর্থে তুর্কিদের অঞ্চলে পরিণত হয়। দ্বীপে গ্রিক-খ্রিস্টান অধিবাসীরা তুর্কিদেরকে স্বাগত জানায়। আর সময়ের সাথে সাথে তাদের অনেকেই ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। কোপরুলু নিজের পুত্রের কাছে দুই সাম্রাজ্যের যুদ্ধ বন্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে যান মৃত্যুর পূর্বে। কিন্তু আহমেদ, শুধু একজন যোদ্ধার চেয়েও বেশি কিছু ছিল একজন রাষ্ট্রনেতা হওয়ার মতো সমস্ত গুণ ছিল তার। এমনকি তুর্কি ইতিহাসবিদগণ সুলেমানের সর্বশেষ প্রধান উজির সোকুলুর সাথে তুলনা করেছে আহমেদের। সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি ঘটিয়ে সুলেমানের মৃত্যু-পরবর্তী বছরগুলোতে ধ্বংস রুখে দিয়েছে।

আহমেদের অর্ধশিক্ষিত পিতা আইন বিষয়ে সুশিক্ষা দিয়ে গেছে পুত্রকে। পিতার মতোই শক্তিশালী হয়েছে আহমেদ। পিতার মৃত্যুর পর আহমেদ আরো মানবিক, ন্যায়বিচারসম্পন্ন এবং তুলনামূলকভাবে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলে। আহমেদের ধনলিপ্সা বলতে কিছুই ছিল না। তাই ঘুষ দাতাকে পছন্দ করার চেয়ে বরঞ্চ তার প্রতি আরো বেশি নাখোশ হতো আহমেদ।

একজন কঠোর মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আহমেদের চরিত্রে ধর্মান্ধতা ছিল না। অন্যান্য বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল হিসেবে খ্রিস্টান ও জিউদের সকল প্রকার অন্যায় থেকে সাহায্য করত আহমেদ। এছাড়া গির্জা নির্মাণের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও রদ করে দিয়েছিল। স্বচ্ছ সৃষ্টি দিয়ে যে কোনো সমস্যার সরাসরি মূল দেখতে অভ্যস্ত আহমেদ বাতুলতা বাদ দিয়ে শুভ ইচ্ছার অনুসারী ছিল। নম্র ও ভদ্র আচরণের আহমেদকে তাই জনগণ সম্মান করত আর সত্যবাদিতার জন্য শ্রদ্ধা ও স্নেহ করত।

আহমেদের প্রধান কাজ ছিল প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনঃসংস্কারের জন্য পিতার নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ পূর্ণ করা। ইসলামি আইন ও সুলতানের কানুন যাতে মান্য করা হয়, তার ব্যবস্থা করে আহমেদ। রাষ্ট্রে অরাজকতা বন্ধ ও আর্থিক বোঝা কমানোর জন্য গৃহস্থালির সৈন্যদের সংখ্যা কম করে দেয় আহমেদ। কর ব্যবস্থার পরিবর্তন করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি কৃষকদের উন্নয়নে কাজ করে আহমেদ। এছাড়া বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আহমেদ বিভিন্ন কবি, ইতিহাসবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। এরা পরবর্তীতে আহমেদের বিজয় ও অন্যান্য কর্মকে অমরত্ব দান করে গেছেন।

আহমেদ নতুন কোনো বিজয়ের তৃষ্ণা অনুভব করে। ১৬৭২ সালে কৃষ্ণ সাগর পার হয়ে রাশিয়া ও পোলান্ডের দিকে দৃষ্টি দেয় আহমেদ্। নির্দিষ্টভাবে ইউক্রেনের দিকে দৃষ্টি যায় আহমেদের। পোলিশ ইউক্রেনের কোজাকরা তাদের প্রভুর প্রতি বিদ্রোহ কাজে সুলতানের সহযোগিতা কামনা করে। এর পরিবর্তে কোজাক নেতা জন সোবিস্কি সুলতানকে তার অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করে। ইস্তাম্বুলে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে সুলতান ক্রিমিয়ার খানকে আদেশ দেন কোজাকদের সহায়তা করার। এর ফলে পোলান্ডের রাজা এবং রাশিয়ার জার উভয়ে একত্রিত হয়ে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুমকি দেয়। পোলিশ দূতকে নিজ হস্তে পত্র লিখে প্রধান উজির "কোজাকরা স্বাধীন হিসেবে পোলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নিষ্ঠুরতা, অন্যয্যতা, দমন-নিপীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে তারা ক্রিমিয়ার খানের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছে, তুর্কি নামের নিচে... যদি কোনো দেশের জনগণ, তাদের স্বাধীনতা অর্জনে শক্তিশালী সুলতানের সহায়তা কামনা করে, তাদের পিছু ধাওয়া করাটা কি পরিণামদর্শী কাজ হবে?"

পোলান্ডের রাজা এতে আমল না দেয়ায় ১৬৭২ সুলতান তুর্কি বাহিনী নিয়ে মলডোভিয়ার মাঝে দিয়ে দিনিয়েস্টারে রওনা হন। যদিও সাথে থাকলেও ঠিক নেতৃত্ব দেননি সুলতান।

নদী পার হয়েই তুর্কিরা গুরুত্বপূর্ণ দুটি দুর্গ দখল করতে সফল হয়। অবমাননাকর একটি শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোলান্ডের রাজা পোডোলিয়া প্রদেশ তুর্কিদের ছেড়ে দেন। এছাড়াও পোর্তেকে কর প্রদানের রাজি হয়ে যান রাজা।

সাম্রাজ্যের নতুন সম্পদসমূহ ব্যবহার করে আহমেদ এ অর্জন করে। কিন্তু এ অর্জন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এটি ছিল তার শেষ অভিযান। অতিমাত্রায় ওয়াইন ও ব্র্যান্ডি পানের ফলে মৃত্যু ঘটে আহমেদের।

॥ ২৩ ॥

সাধারণভাবে সবাই ধারণা করেছিল যে আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হবে তার ভাই মুস্তাফাজাদে। কিন্তু সুলতান মাহমুদ নিজের রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রধান উজির পদে নিজের জামাতা কারা মুস্তাফাকে নিয়োগ দেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের জন্য তেরো বছরব্যাপী হওয়া অপূরণীয় ক্ষতি করে যান সুলতান।

কৃষ্ণ মুস্তাফা—কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের অধিকারী মুস্তাফা ছিল উদ্ধত স্বভাবের, উচ্চাকাঙ্খী চরিত্রের। প্রায় পনেরশ উপপত্নী সহযোগে তার প্রখ্যাত হারেমে এতটাই নারী দাসে পূর্ণ ছিল যে সাতশ কৃষ্ণ খোজা ছিল তাদের গৃহস্থালি রক্ষায়। প্রধান উজির হিসেবে নিজের ধনলিপ্সা মেটাতে গিয়ে সব ধরনের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল কারা মুস্তাফা।

মোটের ওপরে বিশ্বব্যাপী খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা ছিল কারা মুস্তাফার। ধর্মীয়ভাবে উন্মাদ স্বভাবের কারা মুস্তাফা সুলতান প্রথম বায়েজীদের হুমকির পুনরাবৃত্তি করেছিল যে একদিন সে তার ঘোড়াকে রোমে সেন্ট পিটারসে দানা খাওয়াবে ও ভিয়েনা দখল করে রাইনে গিয়ে চতুর্দশ লুইসের সাথে যুদ্ধ করবে। কারা মুস্তাফা নিজেকে ইউরোপীয় অঞ্চলের প্রধান শাসক হিসেবে বিবেচনা করত। কিন্তু একজন জেনাবেল হিসেবে একেবারে নিচু মানের ছিল কারা মুস্তাফা।

তার নেতৃত্বে পাঁচ বছরের মাঝে অটোমানরা ইউক্রেনের শেয়ার হারিয়ে ফেলে রাশিয়ার কাছে। এর পরপরই আরো দুটি অভিযানে ব্যর্থ হয় তারা।

কিন্তু এতেও উদ্বিগ্ন হয়নি কারা মুস্তাফা। কেননা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল মধ্য ইউরোপ জয় করা। ভিয়েনা জয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল মুস্তাফা। হাঙ্গেরিতে প্রোটেস্ট্যান্ট বিদ্রোহীদের কারণে এ সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিদ্রোহীদের নেতা কাউন্ট টিকেলি সুলতানের সাহায্য কামনা করে। কারা মুস্তাফা অটোমান সার্বভৌমত্বে টিকেলিকে পশ্চিম হাঙ্গেরিতে রাজা হিসেবে স্বীকৃতিদানের প্রতিজ্ঞা করে। ফলে টিকেলির বিরুদ্ধাচারণ আরো বেড়ে যায়।

পোর্তেতে অস্ট্রীয় কূটনীতিক ভাসভার চুক্তির নবায়ন প্রার্থনা করে। কিন্তু প্রধান উজির এ আবেদন খারিজ করে দেয়। এর পাশাপাশি গিওরের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যয়ভার দাবি করে প্রধান উজির। এর প্রতিউত্তরে অস্ট্রীয় কূটনীতিক জানায় "একটি দুর্গ হয়তো বাহুবলে জোর করে ছিনিয়ে নেয়া যায়; কিন্তু জোর করে কথার মাধ্যমে কখনোই নয়।" ফলে আরো একবার অস্ট্রীয় ও অটোমান সাম্রাজ্যের মাঝে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৬৮২ সালের শরতে সেরাগলিও প্রাসাদের ওপর ঘোড়ার লেজবিশিষ্ট সুলতানের প্রতীক চিহ্ন উত্তোলন করে শহর ত্যাগ করে যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা দেয়া হয়। আদ্রিয়ানোপলে যাত্রা করেন সুলতান। ১৬৮৩ সালের মাঝে

সেনাবাহিনীও যোগ দেয় তাঁর সাথে। প্রকৌশলী, গোলন্দাজ, ক্রিমিয়ার তাতার, অনিয়মিত অশ্বারোহী, কারিগর, ব্যবসায়ী, মেরামতকারী, ষাঁড়-উটসহ একত্রে মিলিত হয়। আর এতে করে যতটা নয় তার চেয়েও বৃহৎ দেখায় এ অটোমান বাহিনী।

এটি ছিল খ্রিস্টান ইউরোপের বিপক্ষে অগ্রসর হওয়া শেষ বৃহৎ মুসলিম বাহিনী। এর প্রতিরোধে সম্রাট লিওপোল্ড, জেনারেল ডিউক চার্লস অব লোরেন্‌কে দায়িত্ব দেন।

১৬৮৩ সালে সুলতান নিজে নেতৃত্ব দিয়ে অটোমান বাহিনীকে পরিচালনা করলেও বেলগ্রেডে পৌঁছে নবীজির স্তম্ভসহ এ দায়িত্ব কারা মুস্ত াফাকে অর্পণ করেন। ইজেকে এসে টিকেলির বাহিনীও একত্রিত হয় তুর্কি বাহিনীর সাথে। ভিয়েনা অবরোধের কোন ঘোষণা না দিলেও, এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, গিওর ও করমেভ্‌ দুর্গ দখলের প্রয়াস আছে কারা মুস্তাফার।

রাবে পৌঁছানোর পূর্বে যুদ্ধ সভা বসান প্রধান উজির। এতে বূদার পাশা ইব্রাহিম কারা মুস্তাফাকে পরামর্শ দেয় ভিয়েনার পূর্বে পৌঁছে এর সীমান্ত সমূহকে অধিকার করা উচিত প্রথমে। শহর দখল স্থগিত রাখলে পরবর্তী শরৎ বা বসন্তে এটি আপনিই ধরা দেবে তুর্কিদের হাতে।

প্রধান উজির এর উত্তরে বলে ওঠে: "আশি বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ আপনি, আপনার চেতনা জরাগ্রস্ত হয়ে গেছে।" ক্রিমিয়ার খান ও পাশার মতে মত মিলিয়ে প্রধান উজিরের শত্রুতে পরিণত হয়। কারা মুস্তাফা সরাসরি ভিয়েনাতে পৌঁছানোর ব্যাপারেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। প্রকৌশলীদের আদেশ দেয়া হয় রাবজুড়ে নৌকা-সেতু প্রস্তুত করার জন্য। নদী পার হয়ে তৎক্ষণাৎ পশ্চিমে রওনা দেয় কারা মুস্তাফা। ইব্রাহিম পাশা পেছনে রয়ে যায় ভাড়ার সামলানোর জন্য। তাতার অনিয়মিত বাহিনী টিকেলি বাহিনীর সাথে গ্রামাঞ্চল লুটপাটের কাজে রয়ে যায়, যেন মধ্য ইউরোপজুড়ে অটোমান আগমনী বার্তা বেজে ওঠে।

জুলাই মাসের ১৩ তারিখে ভিয়েনা দেয়ালের সামনে এসে হাজির হয় কারা মুস্তাফা ও তার বাহিনী। একজন তুর্কি অফিসার এগিয়ে সাধারণভাবে আত্মসমর্পণ ও ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া অথবা শহর খালি করে দেওয়ার বার্তা নিয়ে যায় শহরের গভর্নরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এর উত্তরে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই মেলে না। সম্রাট নিজে রাজদরবারসহ পশ্চিমে পাসাডতে চলে গেছেন। প্রধান জেনারেল ছোট অস্ট্রীয় বাহিনী নিয়ে দানিয়ুবে। আর তাই প্রায় বারো হাজার বাহিনী মাত্র রয়ে গেছে শহরের দুর্গ রক্ষায়।

অটোমান মাম্রাজ্যের সীমানা।

শহরের পশ্চিমে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকৃতি নিয়ে অটোমান বাহিনী নিজেরাই একটি শহর বানিয়ে ফেলেছে। পঁচিশ হাজার তাঁবু ও পঞ্চাশ হাজার মালামালের গাড়ী রয়েছে সেখানে। সুলেমানের স্মরণীয় প্যাভিলিয়নের সাথে প্রতিযোগিতায় নামার মতো উপযোগী সবার মাঝখানে নির্মিত তাঁবুতে বসে কৃষ্ণ মুস্তাফা অবরোধ কর্মসূচি ও সরকারের বাণিজ্যিক কার্যাবলি পরিচালনা করছে। তুর্কি বাহিনীকে প্রতিহত করা ও নিজের রাজধানী রক্ষার জন্য সম্রাট লিওপোল্ড ইউরোপে নিজের মিত্রদের ওপর অনেকটাই নির্ভর করেছিল ব্যাভারিয়া, সাক্সোনী ও পোলান্ডের রাজা। কিন্তু এ সাহায্য তখনই গ্রহণ করবে সম্রাট, যখন ভিয়েনায় আক্রমণ হবে। অন্যদিকে কারা মুস্তাফা ইতিমধ্যেই অনেকটা করেছেন ভেবে সন্তুষ্ট আছেন। এতে মনে হতে থাকে যে ধনলিপ্সায় পেয়ে বসে তাকে। যদি শহর আক্রমণের মুখে ভেঙে পড়ে। তাহলে লুণ্ঠিত দ্রব্য পাবে সৈন্যরা। কিন্তু যদি দখল করা হয় তাহলে সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে লুণ্ঠিত সম্পদ পাবে কারা মুস্তাফা।

কিন্তু অবরোধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বোঝা যায় যে ভিয়েনার দুর্গের সৈন্যরা উন্নতমানের কামান ব্যবহার করছে। কারা মুস্তাফার গোলন্দাজ বাহিনী ততটা উন্নত হয়। বূদাতে প্রস্তুতকৃত অস্ত্র ও শেল্ খুবই নিম্নমানের ও হালকা। তুর্কিরা তাই মাইনের ওপরই ভরসা করতে থাকে।

কারা মুস্তাফা প্রথমেই শহরের বেশির ভাগ অংশ ঘিরে ফেলে খ্রিস্টান দাসদের দিয়ে ট্রেঞ্চ খননের কাজে ও মাইন রাখতে লাগিয়ে দেয়। কিন্তু পাথরের দেয়াল ছিল অসম্ভব দৃঢ়। আর প্রতিরক্ষা বাহিনীও ছিল সাহসী। খুব দ্রুত তারা যেকোনো ক্ষতি মেরামত করা শুরু করে। কিন্তু তারপরে তুর্কিদের মাইন দেয়ালে কিছু গর্ত সৃষ্টি করে। সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখে এক বৃহৎ বিস্ফোরণের পর তুর্কি বাহিনী আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এগিয়ে যায়। অস্ত্রের ঝনঝনানি ও উভয় পক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর দুই ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধে পিছু হটে তুর্কিরা। কিন্তু অপর পাশে প্রতিরোধ বাহিনীর অবস্থাও সুবিধার ছিল না।

কিন্তু এই মুহূর্তেই খবর এসে পৌঁছায় যে রাজা জন সোবিস্কির বাহিনী ওয়ারশ থেকে যাত্রা করে ক্রাকোতে পৌঁছেছে। এরপর দানিয়ুব পৌঁছে লোরেনের বাহিনী ও ব্যাভারিয়া ও সাক্সোনীদের সাথে যোগ দেয় তারা। এরপর তিন দিন ধরে যাত্রা করে ভিয়েনায় পৌঁছে বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় যে এ শহর এখন পর্যন্ত দখল করে নেয়নি কারা মুস্তাফা। শহরের দিকে তাকিয়ে সোবিস্কি দেখতে পায় যে নিচে দেয়ালের বিভিন্ন জায়গা মাইন বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট গর্ত ও দেয়ালের ভাঙাচোড়া ইট-সুরকি পড়ে আছে। অন্যদিকে দেয়ালের বাইরে সারি সারি শত্রু তাঁবু সৈন্য জড়ো করা ছাড়াই এমনিই ছড়িয়ে আছে। সব দেখে শুনে সোবিস্কি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে

উঠেন, "এই ব্যক্তি ভুলভাবে তাঁবু স্থাপন করেছে। যুদ্ধের কিছুই জানে না সে। আমরা অবশ্যই তাকে পরাজিত করব।"

কারা মুস্তাফা অবরোধ করলেও নিজের অবরোধকারীদের প্রতিরক্ষায় কোনো বাহিনী প্রস্তুতের পূর্বপরিকল্পনা করেননি। অন্যদিকে অটোমান তাঁবুসমূহ যথেচ্ছভাবে স্থাপন করে কোনো পর্যবেক্ষক সৈন্য বা অশ্বারোহী বাহিনীও ছিল না শত্রুর সম্ভাব্য আগমনী সংবাদ জানানোর জন্য। দানিয়ুবের তীরে অস্ট্রীয় বা পোলিশ সৈন্যদের নদী পারাপারে বাধা দেওয়ার মতো কোনো বাহিনী প্রস্তুত রাখেনি কারা মুস্তাফা। পরবর্তীতে ক্রিমিয়ার খানকে এ ব্যর্থতার জন্য দোষারোপ করে কারা মুস্তাফা। একই ভাবে কাহলেনবার্গের পাথুরে ভূমিজুড়ে শত্রুর অগ্রযাত্রা ঠেকানোর জন্য কোনো পূর্ব ব্যবস্থা নেয়নি কারা মুস্তাফা। শুধু যখন শত্রুর বনফায়ারের শিখায় আলোকিত হয়ে ওঠে এ অঞ্চল, মুস্তাফা উপলব্ধি করে যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন শুধু একটাই কাজ করার আছে নিচের উপত্যকায় গিয়ে সোবিস্কি বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করা।

সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখের প্রভাতে এ সুযোগ সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টান সৈন্য পুরোপুরি শৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ নিয়ম মেনে পর্বতের গা বেয়ে নেমে আসতে থাকে। কারা মুস্তাফা বিশ্বাস করে বসে যে একদল অশ্বারোহীই এ বাহিনী রুখে দিতে পারবে। কিন্তু ক্রিমিয়ার খান তাগাদা দেয়ায় জানিসারিসদের একটি দলকে পাঠাতেও রাজি হয়ে যায় মুস্তাফা। কিন্তু বেশির ভাগ সৈন্যই রয়ে যায় শহরের কাছে। অন্যদিকে গোলন্দাজ বাহিনী আনার মতো যথেষ্ট সময়ও ছিল না।

কিন্তু অনিবার্য পরিণতির মতো তুর্কি বাহিনী এভাবে স্বশস্ত্র-দুর্গ ও সুদক্ষ নেতৃত্বপ্রাপ্ত দলের মাঝখানে পড়ে যায়। পাহাড়ের পাশে পাথরের মাঝে থেকে প্রথমে আক্রমণ করা হয় তুর্কিদের ওপর। তারপর সমভূমিতেও পোলিশ অশ্বারোহী, জার্মান, সোবিস্কির বাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তুর্কি বাহিনী। খ্রিস্টান রাজাকে নিজেদের মাঝে দেখে ক্রিমিয়ার খান চিৎকার করে ওঠে ঃ "ওহ্ আল্লাহ! আমাদের মাঝে রাজা সত্যিই এসেছেন।" অটোমান বাহিনীর জনগণ হতবাক হয়ে জ্ঞানশূন্যভাবে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকে দশ হাজার মৃতদেহ।

শহরের বাইরে পরিখায় থেকে যাওয়া জানিসারিসরা পালাতে না পেরে পোলিশ ও দুর্গের সৈন্যদের হাতে পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে অটোমান তাঁবু খালি করে চলে যায় সবাই। পেছনে শূন্য তাঁবুতে পড়ে থাকে দামি কার্পেট, পশম, শত হাজার ষাঁড়, গোলা-বারুদ, রত্নখচিত অস্ত্র ও কোমরবন্ধনী। সোবিস্কি ও তার বাহিনী এসব কিছুর মালিক হয়ে যায়। কিন্তু মুদ্রা তুর্কিরা সময়মতো নিজেদের সাথে নিয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে কিছু পায়নি তারা। কৌতূহলের সাথে লুণ্ঠিত দ্রব্যের মাঝে পাওয়া যায় সদ্য গলা কাটা

মেয়ে, উট; তোতা পাখি, খাঁচায় বন্ধ অন্যান্য পাখি ও কফি'র বিশাল এক মজুদ। যার মাধ্যমে স্থাপিত হয় ভিয়েনার প্রথম কফি হাউস।

তাড়াহুড়া করে অন্যদের সাথে প্রধান উজির নিজেও পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়। শুধু নবীজির স্তম্ভ ও অর্থ নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। বিলাসবহুল দুর্গটি পোলিশ রাজা, রাণির উপহারস্বরূপ নিয়ে নেয়া।

প্রায় দেড়শ বছর আগে সুলতান সুলেমান ভিয়েনা অবরোধ করেও শহরটি দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু রসদের কমতি যাতায়াতের সমস্যার জন্য ব্যর্থ হলেও সামরিক বাহিনী ছিল সুরক্ষিত। অন্যদিকে কারা মুস্তাফা শত্রু সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিপুলসংখ্যক সৈন্য হারিয়েছে। আর এই পরাজয়ে বিজয়ী জাতি হিসেবে অটোমানদের সম্মান চিরতরে ভস্মীভূত হয়ে গেছে ইউরোপীয়দের কাছে।

সোবিস্কি ও লোরেনের নেতৃত্বে খ্রিস্টান সেনাবাহিনী পলায়নরত তুর্কিদের পিছু ধাওয়া করে। কারা মুস্তাফাও পথিমধ্যে রাবে এসে পলায়ন বিরতি দেয়। এই সময়ে শত্রুকে ও ইব্রাহিম পাশাকে তার কৌশলের জন্য অভিযুক্ত করে মুস্তাফা। অতঃপর ইব্রাহিম পাশার পিছিয়ে আসা ও এতে বাকিরাও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে; এই অভিযোগে ইব্রাহিম পাশা ও নির্দিষ্ট কিছু উচ্চপদস্থ অফিসারকে হত্যার আদেশ দেয় কারা মুস্তাফা।

বূদা পর্যন্ত পলায়নরত তুর্কিদের ওপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ করতে থাকে অস্ট্রীয় মিলিশিয়া বাহিনী। তাতার অনিয়মিত সৈন্যরা আগের মতোই হাঙ্গেরিয় গ্রামাঞ্চল উজাড় করে দেয়। তাদের পিছু ধাওয়া করে আসা পোলিশ সৈন্যরা তুর্কিদের অ্যামবুশের কবলে পড়লেও বিপুল বিক্রমে প্রতিরোধ করে তুর্কিদেরকে হটিয়ে দানিয়ুব পর্যন্ত নিয়ে যায় তারা। আর তাড়াহুড়ায় নদী পার হতে গিয়ে প্রায় সাত হাজার তুর্কি সৈন্য সেতু ভেঙে নদীতে ডুবে বা পোলিশদের হাতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। এরপর তুর্কিরা বেলগ্রেড থেকে চলে যায়। সুলতান এ সময় ছিলেন আড্রিয়ানোপলে। তাঁর নির্দেশে হত্যা করা হয় কারা মুস্তাফাকে। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে সুসজ্জিত প্রধান উজিরের, যার সামরিক অদক্ষতায় সবচেয়ে বড় পরাজয়ের স্বাদ নিতে বাধ্য হয় তুর্কি বাহিনী। আর ভিয়েনা অবরোধের শেষ বছরের সমাপ্তি ঘটলেও আরো ষোলো বছর কেটে যায় এ যুদ্ধ শেষ হতে।

খ্রিস্টান বিশ্ব এই বিজয়ে যারপরনাই স্বস্তি লাভ করে। তুর্কি-সংকেত নিশ্চুপ হয়ে যায় চিরতরে। পোপ বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিবস উদযাপন করে। এরপর ১৬৮৪ সালে বহুল প্রতীক্ষিত হোলি লীগ গঠিত হয় অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড ও ভেনিসের সমন্বয়ে। এছাড়া পারস্য থেকেও সাহায্যের আশা করা হয়। সবাই একমত হয় যে, যে যার স্বার্থে হানিকর অঞ্চলের ওপর

আঘাত হানবে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে, পোলান্ড কৃষ্ণ সাগরের উপকূল ও ভেনিস গ্রিস, ডালমাটিয়াকে আঘাত হানার পরিকল্পনা করা হয়। যদিও মাত্র বছর পাঁচেক সক্রিয় সামরিক উপাদান হিসেবে টিকে থাকার পর নিজ নিজ স্বার্থের দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে সবাই।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৬৮৪ সালে ভেনিস, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তুর্কি সুলতানের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মোরোসিনির নেতৃত্বে ভেনেশীয়রা প্রিভেসা, আলবেনিয়া, বসনিয়া, মোরিয়া জয় করে এথেন্স অবরোধ ও দখল করে নেয়। এখানে দুই হাজার বছর ধরে সংরক্ষিত পার্থেয়নের মন্দিরের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায় ভেনেশীয় ও তুর্কিদের মধ্যে যুদ্ধের ফলে। এরপর এথেন্স ছেড়ে চলে যায়, ভেনেশীয়রা। কিন্তু যাওয়ার পূর্বে পিরাকাসের সিংহ ও ডেলসের সিংহী নিয়ে যায়। যা এখন ভেনিসের আর্সেনালে সৌন্দর্য বর্ধন করছে।

সোবিস্কি মলডোভিয়া ও ট্রান্সসিলভ্যানিয়া দখল করার উচ্ছাশা পোষন করলেও সহসম্রাটের সাথে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জেরে পরাজিত হয়।

১৬৮৪ সালে অস্ট্রীয় বাহিনী ক্রোয়েশিয়ার অনেকটুকু দখল করে নেয়। এরপর গ্রান থেকে এগিয়ে নহসেল্ পুনর্দখল করে নেয় অস্ট্রীয় বাহিনী। এর এক বছর পরে বূদা অবরোধে অগ্রসর হয় অস্ট্রীয়রা। কিন্তু তুর্কি সৈন্যরা বীরত্বপূর্ণভাবে তিন তিনবার ঠেকিয়ে দেয় তাদের। তারপরেও রাজকীয় বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে তুর্কি কমান্ডার ও দুর্গ। ফলে ১৬৮৬ সালে প্রায় দেড়শ বছর তুর্কি শাসনাধীনে থাকার পর বূদা শহর ইউরোপীয়দের আনন্দ বন্যায় ভাসিয়ে হাঙ্গেরিয়দের হাতে আসে।

এক বছর পরে নতুন প্রধান উজির সুলেমান তুর্কি বাহিনী নিয়ে দ্রাভার দিকে অগ্রসর হয়। এখানে ঐতিহাসিক মোহাক প্রান্তরে লোরেনের চার্লসের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয় তুর্কি বাহিনীর। এখানেই হাঙ্গেরির বিপক্ষে যুদ্ধে জিতেছিলেন সুলতান সুলেমান। ইতিহাসের নদী এবার উল্টো দিকে প্রবাহিত হওয়ায় প্রায় বিশ হাজার সৈন্যের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে পরাজিত হয় তুর্কি বাহিনী। এভাবে হাঙ্গেরির বেশির ভাগ সম্রাট লিওপোল্ডের অধীনে চলে যায়।

ইতিমধ্যে মোহাকের পরাজয়ে তুর্কি সেনাবাহিনী ও অটোমান রাজধানীতে বিদ্রোহের মুখে সিংহাসনচ্যুত হন সুলতান চতুর্থ মাহমুদ্। এরপর তাঁর দুই ভাইয়ের মাঝে বড়জনকে দ্বিতীয় সুলেমান হিসেবে সিংহাসনে বসানো হয়। ভাইয়ের তুলনায় সুদক্ষ সুলতান হিসেবে প্রমাণিত হন সুলতান দ্বিতীয় সুলেমান আড্রিয়ানোপলে দিওয়ানদের জরুরি সভা বসে। মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তৃতীয় কোপরুলাস মুস্তাফাজাদেকে প্রধান উজির পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

প্রাণচার্যুযে ভরপুর ও সুদক্ষ তৃতীয় কোপরুলু পুনরায় কাজ শুরু করে দেয়। রাজকোষ, প্রশাসন, সেনাবাহিনী প্রভৃতি সব ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজিয়ে অটোমান অঞ্চলসমূহের পুনরুদ্ধারের তোড়জোড় শুরু করে তৃতীয় কোপরুলু। নবীজির নাম ও আইনের কথা স্মরণ করে দিয়ে তুর্কিদের অনুপ্রাণিত করে তোলে হাবসবুর্গের বিরুদ্ধে।

১৬৮৮ সালে ইংরেজ অভ্যুত্থানের ফলে ক্ষমতায় আসে উইলিয়াম অব অরেঞ্জ। ফরাসি কূটনীতিক কোপরুলুর কাছে আর্জি জানায় যেন পোর্তে উইলিয়ামের স্বীকৃতি না দিয়ে সম্রাটের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রথম আবেদনে কেবল ইংরেজদেরই অধিকার আছে জানিয়ে দ্বিতীয় আবেদনে সাড়া দেয় প্রধান উজির।

ফলে ১৬৯০ সালে নবীজির স্তম্ভ বহনকারী তুর্কি কোপরুলুর নেতৃত্বে সার্বীয়াতে অগ্রসর হয়। নিশ্‌সহ গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ পুনর্দখল করে হৃত সম্মান ফিরিয়ে আনে অটোমান বাহিনী। এর ফল প্রায় বিনা বাধায় বেলগ্রেডও দখল করে নেয় তুর্কি বাহিনী। কোনো বড় ধরনের অভিযানের পক্ষে এ ঋতু অনুকূল না হওয়ায় ছোট্ট এক দল সৈন্যবাহিনীকে ট্রান্সসিলভ্যানিয়ায় পাঠিয়ে মুস্তাফা জাদে বেলগ্রেড ত্যাগ করে। এখানে শক্তিশালী দুর্গ স্থাপন করে ইস্তাম্বুলের দিকে রওনা হয় প্রধান উজির; যেখানে সুলতান এক বিজয় সম্ভাষণ প্রস্তুত করে রেখেছেন তার উদ্দেশ্যে।

পুরো শীতকালজুড়ে বিশাল বড় এক বাহিনী প্রস্তুত করে কোপরুলু। ১৬৯১ সালের গ্রীষ্মে এ বাহিনী বেলগ্রেড হয়ে দানিয়ুবে যাত্রা শুরু করে। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই প্রিন্স লুডউইগের অভিজ্ঞ বাহিনীর মুখোমুখি হয় তুর্কিরা। জেনারেলদের অপেক্ষা করার নীতি সরিয়ে আপন বুদ্ধি বলে কামান দাগার নির্দেশ দেয় মুস্তাফা।

প্রথম দিকে এ ভয়ংকর যুদ্ধে তুর্কিরা পিছিয়ে থাকলেও নদীপথে তাদের নৌকাসমূহ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল।

শত্রুবাহিনী ছিল বন্দুকযুদ্ধে পারদর্শী। তাই পরাজয় অনিবার্য জেনেও এক দুঃসাহসী প্রচেষ্টায় রত হয় মুস্তাফা। আল্লাহর নাম নিয়ে অস্ট্রীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রধান উজির। কিন্তু এই বীরত্ব বৃথা যায়। কপালে আঘাত পেয়ে বুলেটের আঘাতে মৃত্যু হয় মুস্তাফা জাদের। তার কমান্ডারেরা কিছু সময়ের জন্য হয়তো এ সংবাদ গোপন করতে পারত। কিন্তু সবাই মাতম শুরু করে দিলে পর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সাহস হারিয়ে মনোবল ভাঙ্গা সৈন্যরা পালিয়ে যায়। পুরো যুদ্ধক্ষেত্র বিশৃঙ্খল হয়ে যায়।

অস্ট্রিয়া খানিকটা মূল্য দিলেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়। কিন্তু মুস্তাফা জাদের মৃত্যুর সাথে সাথে অটোমানদের মাঝে ঘোর সংকট নেমে আসে।

সুলতান দ্বিতীয় সুলেমান চার বছর পর এক অভিযানে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর সুলতান দ্বিতীয় আহমেদও বছর চারেক শাসনামলের পর লজ্জা ও হতাশার মাঝে সমাপ্তি ঘটান।

শুধু আনাতোলিয়াতে অভিযান চালিয়েই তুর্কিরা কেবল সান্ত্বনা খুঁজতে পারে। ভেনেশীয়রা মোরিয়া দখলে রাখতে হিমশিম খেয়ে যায়। কেননা থেবসে্ ছিল তুর্কি পাশারা। ১৬৯৩ সালে মোরিসিনি ভেনিসের সকল সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হয়। কিয়স দখলের প্রতিজ্ঞা করে মোরোসিনি। যা তুর্কিদের কাছে দার্দেনালেসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নেওয়ার পূর্বেই মোরোসিনি মৃত্যুবরণ করে। তথাপি মাল্টা ও পোপের বাহিনীর সহায়তায় কিয়স্ দখল করে ভেনেশীয়রা। কিন্তু পরের বছরই তুর্কি নৌবাহিনী ভেনেশীয় স্কোয়াড্রনকে হটিয়ে পুনরায় কিয়স্ দ্বীপ দখল করে নেয়। এই বিজয়ে ইস্তাম্বুলে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। যদিও সুলতান আহমেদ এ সংবাদ শুনে যেতে পারেননি মৃত্যুর পূর্বে। এরপর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় মুস্তাফা।

এই অটোমান নৌবাহিনীর পুরো সাফল্যের দাবিদার নতুন প্রধান অ্যাডমিরাল হাসান। ভূমধ্যসাগরে তুর্কি নৌশক্তির জন্য নতুন আশা ও জীবনের ডাক বয়ে আনে হাসান।

অন্যদিকে কৃষ্ণ সাগরে নতুন এক শত্রু দেখা দেয়, রাশিয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে ধন্যবাদ দিতে হয় তাতারদের। যাদের সহযোগিতায় পোলিশ ও রাশিয়া উভয়ের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফলতা লাভ করে তুর্কিরা এ অঞ্চলে। কিন্তু অনিবার্য শত্রু হিসেবে উন্মেষ ঘটে পিটার দ্য গ্রেটের। ১৬৯৫ সালে ক্রিমিয়াতে নতুন করে রাশিয়ার যুদ্ধ প্রস্তুতি ঘটান পিটার। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আজভ দখল করা। অটোমান সাম্রাজ্যের জন্য প্রথমবারের মতো বিস্তৃত পরিসরে নৌশক্তির উত্থান ঘটায় পিটার দ্য গ্রেট।

ইতিমধ্যে তরুণ সুলতান দ্বিতীয় মুস্তাফা প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর ছিলেন। পিতার মতো মামুলি শিকারি না হয়ে পূর্বপুরুষদের মার্শাল ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে মনোযোগী হন তিনি।

সুলতান আহমেদের মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় রাজকীয় আড্ডায় সুলতান দ্বিতীয় মুস্তাফা ব্যক্তিগত নেতৃত্বে হাবসবুর্গ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা দেন।

এর ওপর ভিত্তি করে উলেমা, প্রধান উজির, অন্যান্য উজিরেরা, আঘার দল, লেফটেন্যান্টসহ সকলে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বসে যে সুলতান কি সম্রাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে নাকি আড্রিয়ানোপলে থাকবে। তিন দিন পর দিওয়ান-সুলতানের আদেশের বিরুদ্ধে যায়। কেননা এতে রাষ্ট্রের বিপুল ব্যয় হবে ও সুলতানের সামরিক অভিজ্ঞতাও বেশি নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরে মুস্তাফা জানিয়ে দেন : "আমি অগ্রসর হব।" ১৬৯৬ সালে, সৈন্যদের গভীর প্রতীক্ষার ফলস্বরূপ নিজ সুলতানের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করে তুর্কি বাহিনী। বেলগ্রেড থেকে যাত্রা করে কিছু ছোট ছোট দুর্গ দখল করে প্রতিকূল ঋতুর কারণে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন সুলতান। যারা তাঁকে অনুৎসাহী করেছিল, সেসব অফিসার এবার সুলতানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়।

পরবর্তী বছরে আরো একটি সফল অভিযানের আশায় সেনাবাহিনী নিয়ে বেলগ্রেডে যাত্রা করেন সুলতান। কিন্তু এবার তাঁকে মোকাবেলা করতে হয় সম্রাটের নতুন, বুদ্ধিদীপ্ত কমান্ডার ইউজিনের সাথে। এর ওপরে আবার সুলতানের নিজের কমান্ডারদের মাঝে মতবিরোধ দেখা যায়—পশ্চিমে স্লোভোনিয়া নাকি উত্তরে হাঙ্গেরিতে যাবে তুর্কি বাহিনী। সুলতান নিজেও দ্বিধায় ভুগতে থাকেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় উত্তরে সিজা উপত্যকায় অগ্রসর হবে তুর্কি বাহিনী।

কিন্তু রাজকুমার ইউজিন একজন যুদ্ধবন্দিকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে সুলতানের পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে নিয়ে তাঁকে রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। জেন্তাতে পৌঁছে যায় ইউজিন বাহিনী; তখন তুর্কি বাহিনী সবেমাত্র মাঝ নদীতে। বেশির ভাগ অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে সুলতান বাম পাড়ে পৌঁছে গেলেও বেশির ভাগ সৈন্য রয়ে গেছে নদীর ডান পাশে। কিন্তু ইউজিনের বাহিনী তখনো আক্রমণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না। তথাপি মনস্থির করতে না পারায় অপ্রস্তুত সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হটিয়ে দেয়ার সুযোগ হারায় সুলতান ও তাঁর বাহিনী। সূর্যাস্তের পূর্বে বাকি ছিল মাত্র দুঘণ্টা। আর ভিয়েনা থেকে যুদ্ধে না যাওয়ার নির্দেশ আসা সত্ত্বেও সুযোগ পাওয়া মাত্র কাজে লাগাতে আগ্রহী, সাহসী ইউজিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তুর্কিদের সাথে।

অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি আকৃতিতে শত্রু ট্রেঞ্চের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইউজিন ও তার বাহিনী। ফলাফলস্বরূপ রক্ত গঙ্গায় ভেসে যায় তুর্কি শিবির। সৈন্যরা দ্বিধায় পড়ে যায়। কমান্ডাররাও হতবিহবল হয়ে পড়ে। প্রায় বিশ হাজারেরও বেশি তুর্কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আরো দশ হাজার সৈন্য নদী পার হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে পানিতে ডুবে যায়। ইউজিনের নিজের বাহিনী, তার ভাষায় "মৃতদেহের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল; যেন একটি দ্বীপ।" রাত নামার আগেই সব সমাধা হয়ে গেছে।

নদীর অপর পাড় থেকে অসহায়ের মতো নিজ বাহিনীর ধ্বংস চাক্ষুষ করেন সুলতান। তারপর পিছু হটে বেলগ্রেড হয়ে ইস্তাম্বুলে চলে যান। রসদের অভাব ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে ইউজিন সুলতানের পিছু নেয়নি। কিন্তু অর্থ এবং অস্ত্র ছাড়াও নয় হাজার ওয়াগন, ষাট হাজার উট, পনেরোশ পশু, সাতশ ঘোড়া—প্রধান উজিরের রাজকীয় সীলমোহর, সুলতানের ক্ষমতার

প্রতীক, যা এর আগে আর কখনো শত্রু হাতে পড়েনি। অনুৎসাহী তরুণ সুলতান আর কখনোই যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদান করেননি।

আরো একবার কোপরুলু পরিবারের কাছে অটোমান ভাগ্য রক্ষার দায়িত্ব দেন সুলতান। আহমেদের চাচাতো ভাই কোপরুলু হুসেনকে প্রধান উজির পদে নিয়োগ দেন সুলতান। চতুর্থ কোপরুলু হিসেবে দেশের মাঝে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য যথেষ্ট করে হুসেন। কিন্তু ইউরোপে আর বেশি কিছু করার ছিল না। ভিয়েনা অবরোধের পর হাবসবুর্গের রাজকীয় বাহিনী আরো নয়টি, বৃহৎ বিজয়ে নয়টি বৃহৎ দুর্গ দখল করে নেয়।

ভেনিস যুদ্ধের ফলে নিঃশোষিত হয়ে গিয়েছিল। সোবিস্কির মৃত্যুর পর, ১৬৯৬ সাল থেকে পোল্যান্ডও দৃশ্যপট থেকে সরে গেছে। শুধু পিটার দ্য গ্রেট, রাশিয়ার আগ্রাসনের সূচনা হিসেবে অটোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেওয়ার প্রয়াস নেয়। ভিয়েনাতে পৌঁছে সম্রাটকে চাপ দিতে থাকে পিটার, যুদ্ধমৈত্রী গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে শান্তি প্রক্রিয়া শুরুর প্রয়াসে মেতেছে।

পোর্তের সাথে ইংরেজ সম্পর্কের প্রধান চাবিকাঠি ছিল বাণিজ্য। সিংহাসনে আরোহণের পর হল্যান্ডের সাথে একত্রিত হয়ে চতুর্দশ লুইসের বিপক্ষে তুর্কি সাহায্যের আশায় অটোমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে তৃতীয় উইলিয়াম। এ বৈরিতাও শেষের দিকে এসে গেছে। কিন্তু তারপরেও ব্রিটেন এবং হল্যান্ড উভয়ের উদ্দেশ্য ফ্রান্সকে, বাণিজ্যিক দিক দিয়ে শক্তিশালী না হতে দেয়া। চতুর্দশ লুইসের কূটনীতিক সুলতানকে যথাসাধ্য ভাবে নিজ অঞ্চল থেকে ভেনেশীয়দের তাড়াতে প্ররোচিত করছে। অন্যদিকে সুলতানের রাজদরবারে ইংরেজ বিলাসীদ্রব্যের প্রয়োজন কমে গেছে।

এভাবে ইংরেজ কূটনীতিক লর্ড প্যাগেট ও তার ডাচ্ সহকর্মী জ্যাকব, পোর্তে ও খ্রিস্টান শক্তিসমূহের মাঝে শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতে প্রধান বিষয় ছিল যে, উভয় পক্ষই নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করবে। মূলত ইউরোপীয়রা যে সমস্ত তুর্কি অঞ্চল দখল করে নিয়েছে তারই অনুমোদন ছিল এ চুক্তি। কোপরুলু হুসেন রাষ্ট্রের সভা আহ্বান করে ও কয়েক দিনের মাঝে প্যাগেটের সামনে রাজাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছু সংশোধনী, বিশেষ করে ট্রান্সসিলভ্যানিয়াকে তুর্কিদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার পাল্টা প্রস্তাব করেন। যাই হোক অ্যাংলো-ডাচ্ মধ্যস্থতা মেনে নেওয়া হয়।

১৬৯৮ সালের শেষ মাসে, দানিয়ুবের পূর্ব তীরে ক্রোয়েশিয়াতে শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিজয়ী ও বিজিতের মাঝে পার্থক্যবিহীন

নিরপেক্ষভাবে সজ্জিত একটি কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এ সম্মেলন। অংশগ্রহণকারী চার শক্তির জন্য সমান মর্যাদার প্রবেশপথ তৈরি করা হয়। সম্রাটের অনুরোধে রাশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পিটার দ্য গ্রেট এ শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই চুক্তি স্বাক্ষর না করে শুধু দুই বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে রাশিয়া। বিস্তর আক্রমণাত্মক তর্ক-বিতর্ক ও ছোটখাটো সংশোধনের পর অন্যান্য শক্তিসমূহ পঁচিশ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরে ঐকমত্যে পৌঁছায়।

হাবসবুর্গ সাম্রাজ্য স্লোভেনিয়া, ট্রান্সসিলভ্যানিয়া, হাঙ্গেরির বড় একটি অংশ লাভ করে। তুর্কিদেরকে তাদের পূর্বের দখলকৃত এক-তৃতীয়াংশ হাঙ্গেরিয় অঞ্চল দেয়া হয়। তুর্কিরা ইস্তাম্বুলে শরণার্থী হিসেবে বসবাসরত হাঙ্গেরিয় বিদ্রোহী টিকেলিকে অস্ট্রীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে প্রত্যাখান করে। তার বদলে এশিয়া মাইনরে যেতে দেয়া হয় টিকেলিকে। দ্য ট্রিটি অব কার্লোডিইটজ্ স্বাক্ষরিত হয় তুর্কিদের জ্যোতিষশাস্ত্র মোতাবেক ১৬৯৯ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি কামান দাগার মাধ্যমে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়, শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় দানিয়ুব দুর্গ থেকে শুরু করে বেলগ্রেড পর্যন্ত।

এভাবে সপ্তদশ শতকের শেষ নাগাদ অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের-ও একটি বিশাল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। মাত্র তিন শতাব্দী পূর্বেও খ্রিস্টান শক্তিসমূহের কাছে আতঙ্কের নাম ছিল তুর্কিরা। এবার শুরু হয় এশিয়াতে শক্তিশালী থাকলেও ইউরোপে একের পর এক পরাজয়ের পালা। সাথে আরো যুক্ত হয় বিভিন্ন প্রতিকূল চুক্তি। বিজয়ীদের স্বর্ণ উজ্জ্বল দিন আর কখনোই ফিরে আসবে না।

সব সময়কার মতো পশ্চিমা বিশ্ব তার জাতি-রাষ্ট্র উত্থানের মাধ্যমে পূর্বের ক্ষমতাকে পদতলে দলিত করে ফেলে। উভয়ের মাঝে পার্থক্য কেবল বাড়তেই থাকে। শুধু সামরিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও শর্তাধীন করে ফেলে পূর্বকে। আভ্যন্তরীণভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের আধুনিকায়ন হয়েছে বিলম্বে। অনেক সময় তা একেবারে স্থির হয়েও ছিল। আন্তর্জাতিকভাবেও তাই এর সম্মান হয়ে ওঠে উদ্বেগের বিষয়। সামরিক দিক থেকে কেবল নয়, কূটনীতিক ক্ষেত্রেও। নিজের দুর্বলতার মাঝে দিয়ে শক্তিশালী থেকে ধীরে ধীরে অন্য কোনো শক্তির আগ্রাসনের সামনে মাথানত করতে থাকে অটোমান সাম্রাজ্য। আঠারো শ শতকের প্রাক্কালে এ রকমই এক শক্তির উত্থান ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া।

অধ্যায় পাঁচ

রাশিয়ার শত্রুতা

॥ ২৪ ॥

পিটার দ্য গ্রেটের তুলনা করা যায় আড়াইশ বছর পূর্বেকার বাইজেন্টাইন বিজয়ী সুলতান মাহমুদের সাথে। "তৃতীয় রোমের" সম্রাট হিসেবে "পুরো রাশিয়ার একচ্ছত্র নায়ক" শুধু নয়, "নতুন শহর কনস্টান্টিনোপলের নতুন জার কনস্টানটাইন" হিসেবে দ্বিমুখী ঈগলের প্রতীকের অধীনে এই শহর তুর্কিদের কাছ থেকে পুনর্দখল করতে চায় পিটার দ্য গ্রেট। একটি সামরিক রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হিসেবে এশিয়া ও ইউরোপে আগ্রাসনের নীতি গ্রহণ করেছিল পিটার। পরবর্তী শতাব্দীতে এই পথেই হেঁটেছে আগামীর জাররা। অটোমানরা মোকাবেলা করেছে এমন সব প্রতিপক্ষের মাঝে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ছিল এই রাশিয়া। খ্রিস্টান ইউরোপের মতোই ঐক্যবদ্ধ, জাতীয়তাবাদী এক শক্তি; আঞ্চলিক ও মানবিক সম্পদে পরিপূর্ণ।

অটোমান তুর্কিরা প্রথম দিকে এশিয়ার অনুর্বর ভূমিতে পৌত্তলিক যাযাবর জীবন ও এরপরে মধ্যযুগীয় ইসলামি সভ্যতা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এই অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্টি করেছে মানবসম্পদ ও সম্পদের কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠান, আলোকিত ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ও পেশার সেনাবাহিনী। মধ্যযুগীয় ইউরোপ, এর ন্যায় রাষ্ট্র ও সামন্তবাদ নিয়ে তুর্কিদের প্রতিহত করতে পারেনি।

কিন্তু সময়ের প্রবহমানতায় ঢেউয়ের গতি হয়েছে বিপরীতগামী। পশ্চিম পূর্বের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে গেছে। মোটের ওপর এই দুই পক্ষের মাঝে পড়ে আঘাত করতে উদ্যত রাশিয়ার জার প্রথম পিটার ছিল সাম্রাজ্য বিজয়ী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। নিজের দেশে পশ্চিমাকরণ নীতি গ্রহণ করে পিটার। ১৬৯৮ সালে জানিসারিসদের মতো রাশিয়ার বাহিনী Streltsy কে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে দেয় পিটার। এরপর রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে গার্ড রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুনভাবে গঠন, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়। আধুনিক ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেনাবাহিনীকে।

সামরিকভাবে আধুনিক, দক্ষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিকভাবে জারের সাথে একমত হয় সেনাবাহিনী।

পঁচিশ বছরব্যাপী সক্রিয় যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী বীর মাহমুদের মতো—নিজ দেশের সম্পদ ও সামরিক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে রাশিয়ার বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিটার। এর বিপরীতে অটোমান বাহিনী দিন দিন পতনের দিকে এগিয়ে যায়। নিজেদের সময়ে তুর্কি জানিসারিস, গোলন্দাজ, উৎসর্গীকৃত যোদ্ধা, সুদক্ষ, সুশৃঙ্খলিত ও ঠাণ্ডা মাথার কমান্ডারদের নেতৃত্বে অশ্বারোহী বাহিনী, দেশীয় সৈন্য সবকিছু মিলিয়ে অটোমান তুর্কিরা ছিল অগ্রগামী।

কিন্তু পশ্চিমে অতি উন্নত ভ্রাম্যমাণ গোলন্দাজরা তাদের পেছনে ফেলে দিয়েছে। যাতায়াত, অস্ত্রের সরবরাহ, ইউনিফর্ম, খাবার ও অন্যান্য দ্রব্য প্রভৃতি সবকিছুর জন্য প্রয়োজন বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান। এটিই যুদ্ধের অস্ত্র। এর ভিত্তি আধুনিক সামরিক কৌশল। কিন্তু এক্ষেত্রে অটোমানরা এখনো তাদের পূর্বেকার সামরিক নীতি নিয়ে যুদ্ধ করছে, যা প্রায়ই অসম হয়ে যাচ্ছে। এসব কারণেই আঠারোশ শতকে এসে যেমনটা ছিল সপ্তদশ শতকে—দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাদান ব্যবহার, সরবরাহ প্রক্রিয়া নতুন দিনের তুলনায় অপেশাদার, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট নয়। কোনভাবেই অভিযানে রত একটি সেনাবাহিনী শুধু লুটপাটের ওপর নির্ভর করতে পারে না; পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্য ও তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আধুনিক যুদ্ধের জন্য নতুন, সুপরিকল্পিত ও সু-প্রশাসনিক অর্থনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন।

গত দুই শতাব্দী ধরে মধ্যযুগীয় দুর্গ ব্যবস্থা থেকে পুনর্জাগরণ ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে নতুন রূপে জেগে উঠেছে খ্রিস্টান ইউরোপ। নতুন পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে ব্যবসা ও কারিগরি দিক থেকে অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু ঠিক একইভাবে উন্মেষের ক্ষেত্রে অটোমান সাম্রাজ্য এখনো দুই শতাব্দী পিছিয়ে আছে। ঘুনে ধরা আমলাতান্ত্রিক গঠনের কবলে পড়ে অর্থনৈতিক, শিল্প ও গ্রামীণ জীবন সব কিছুতেই ক্ষয় ধরেছে অটোমান সাম্রাজ্যে। যা থেকে উত্তরণের জন্য সম্পদ ও ইচ্ছে উভয়ের অভাব রয়েছে। একই সাথে আর্থিক ও ব্যবসায়িক অনভিজ্ঞতা ও নিজেদের শক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর অন্ধবিশ্বাস এ পতন ত্বরান্বিত করছে।

অটোমান সাম্রাজ্য মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন দেখা যায় এর অর্থনীতির বেশির ভাগ একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। গ্রিক, জিউ ও আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের হাতে চলে গেছে ব্যাংক ও ব্যবসা। এর শাসকশ্রেণী নিজেদের অনভিজ্ঞতা ও অবিশ্বাসীদের প্রতি ঘৃণাবশত সরকার ব্যবস্থা ও আর্থিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীর মাঝে সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই একই

প্রক্রিয়াতে মূলধন ও সরকার ব্যবস্থা, জনগণ ও অর্থ প্রভৃতির মাঝে পারস্পরিক মিত্রতার ফলে ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটছে। এটি শুধু অটোমান রাষ্ট্রে; বস্তুত এই সময়কার অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে সরকার পরিচালনা পদ্ধতি ও আর্থিক কর্মকাণ্ড একে অন্যের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হিসেবেই রয়ে গেছে। ফলে অটোমানদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি দীর্ঘ-মেয়াদি ও বৃহৎ পরিসরের অর্থনৈতিক প্রজেক্টের অভাবে উন্নতির একেবারে নিচের দিকে রয়ে গেছে। ইউরোপীয়দের কারখানাতে প্রস্তুত টেক্সটাইল ও অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালের সাথে প্রতিযোগিতা ও ভিন্ন ব্যবসার চাহিদা মেটাতে পারছে না অটোমানদের হস্তশিল্প।

মৌলিকভাবে এ ধরনের সমস্যসমূহের সাথে যুদ্ধ করার পেছনে ইসলামি মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি ইসলামি সভ্যতার অগ্রগণ্য ভাব সম্পর্কে এক ধরনের ভ্রম ও এগিয়ে চলা ইউরোপীয় সভ্যতার সামনে অটোমান রাষ্ট্রের পরাজয় স্বীকারের অনিচ্ছা। এটা অনেকটা অদৃষ্টবাদের মতোই। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা কঠোরভাবে ঐতিহ্য অনুসারী হতে শিক্ষা দেয়। ফলে ঘটনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে গ্রহণ করে, মানুষের হস্তক্ষেপে এর দিক বদলের ভয় তৈরি হয়। ফলে জানিসারিস বা কারিগর সমাজই শুধু নয়, উলেমা সম্প্রদায়ও এমনকি অটোমান রাষ্ট্রের যে কোনো ত্বরিত পরিবর্তনের বিপক্ষপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই নিজেদের ভালো নিহিত দেখতে পায়। আঠারোশ শতকের শুরুর দিকে অটোমান সাম্রাজ্যে এভাবেই পচন শুরু হয়; ঠিক তখন রাশিয়ার সাম্রাজ্যিক অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

কিন্তু পুরোনো কাপড় এখনো একেবারে বাতিলের দলে চলে যায়নি। জ্বর আসার পূর্বের শীতবোধ এখনো বাকি আছে। পুরাতন তুর্কিদের মাঝে জীবন এখনো রয়ে গেছে। সুলতান আর শাসন প্রক্রিয়ায় নেই। কিন্তু তাঁর হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা শাসন করছেন তাদের মাঝে কারো কারো ভেতরে ঐতিহ্যগতভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার উপাদান রয়ে গেছে। এদের মাঝে আছে নতুন এক অভিজাত সম্প্রদায়– তরবারি নয়, কলমর ভক্ত। পাশাদের তুলনায় ভিন্ন, পুরাতন আমলাদের চেয়ে পৃথক এই শ্রেণী পূর্বের মতো খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত নয়; বরঞ্চ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মুসলিম সন্তান।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহকে শান্ত করার নিমিত্তে Treaty of Karlowitz স্বাক্ষরিত হয়েছিল। প্রধান উজির "জ্ঞানী কোপরুলু" হিসেবে পরিচিত কোপরুলু হুসেন এই চুক্তির সুযোগ নিয়ে চাপ প্রয়োগ করে প্রশাসনে পুনঃসংস্কার কাজে মেতে ওঠে। সাম্রাজ্যের অর্থনীতি, আইন, শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র প্রভৃতি সব কিছুর মূলে পুনঃসংস্কারের কুঠারাঘাত করে হুসেন। জানিসারিসদের ভূমিকাকে নতুনভাবে গঠন করে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা

ফিরিয়ে আনার প্রতি মনোযোগ দেয় হুসেন। এছাড়া নৌ ও সেনা উভয় বাহিনীর জন্য নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়, নতুন ব্যারাক নির্মাণ ও রাজকীয় বাহিনীকে নতুনভাবে শৃঙ্খলিত করে হুসেন। বিজয়ী সুলতান মাহমুদও পূর্বের অন্যান্য মহান সুলতানদের মতো করে রাষ্ট্রীয় বা নিজ অর্থে হুসেন জনসাধারণের জন্য খাল, সেতু, মসজিদ, বিদ্যালয় ও বাজার নির্মাণ করে। এছাড়াও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থেও কাজ করে হুসেন। সার্বীয়া ও হাঙ্গেরির সীমান্ত এলাকার জনগণকে এক বছরের কর মওকুফ করা হয়। রুমেলিতে রায়াদের অবস্থার উন্নতিতেও যথেষ্ট বিনিয়োগ করে হুসেন। এছাড়া সিরিয়াতে পশু পালনের ওপর স্বাধীনতা দেয়া হয়।

এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষক সমাজের বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়। কেননা পিটার দ্য গ্রেট, অটোমান আক্রমণের পরিকল্পনায় শুধু ভৌগোলিক সম্প্রসারনবাদ রাখেনি; আভ্যন্তরীণ অরাজকতা সৃষ্টির পরিকল্পনাও ছিল। অটোমান খ্রিস্টান-ক্ষুদ্রগোষ্ঠীগুলোর ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করার উচ্ছাকাঙ্ক্ষা ছিল পিটার দ্য গ্রেটের। অনেক পূর্ব থেকেই রাশিয়ার অর্থডক্স গির্জাসমূহ খ্রিষ্ট বিশ্বাসের রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এ কারণে বিভিন্ন দেশে লোক নিয়োগ করে আসছে এ উদ্দেশ্য পূরণে। বিশেষ করে গ্রিকরা নিজেদের মাঝে রাশিয়ার চরদেরকে গ্রহণ করে রাশিয়াকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। এদের অনেকেই জাতিগতভাবে স্লাভ এবং ল্যাটিনকে ধর্মীয়ভাবে অবিশ্বাস করে। দীর্ঘমেয়াদি এই লক্ষ্য পূরণে পিটার দ্য গ্রেট অটোমান খ্রিস্টানদেরকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে।

কিন্তু বলকান অঞ্চলের খ্রিস্টানরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে নয়; বরঞ্চ অস্ট্রীয় ক্যাথলিকদের হাত থেকে বাঁচার জন্য রাশিয়ার সহায়তা চাইছিল। তুর্কি কিংবা জিউদের তুলনায় পোপ এবং জেসুইটরা অর্থডক্স খ্রিস্টানদের জন্য অধিকতর হুমকিস্বরূপ ছিল। তবে পিটার দ্য গ্রেট এই সুসময়ে অর্থডক্স খ্রিস্টানদের রক্ষাকর্তারূপে আবির্ভূত না হয়ে, বরঞ্চ নিজের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করার প্রতি বেশি মনোযোগী ও আগ্রহী ছিল।

পূর্বের তুলনায় খ্রিস্টান ইউরোপের সাথে অটোমান সাম্রাজ্যের সম্পর্কের সুবাতাস বইছে বর্তমানে। চুক্তি স্বাক্ষরের ছয় মাস পর ইস্তাম্বুলে সুলতানের সামনে যথাযোগ্য জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই চুক্তি অনুমোদিত হয়। এই বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার মাঝে পোর্তেও এর বিভিন্ন পূর্বতন শত্রু রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনীতিক আদান-প্রদান শুরু হয়। ফলে আঠারোশ শতকের শুরুর দিকে অটোমান কূটনীতিকরা বিভিন্ন বিদেশি রাজধানীতে স্থায়ী হয়ে পশ্চিমা সভ্যতা, সরকার পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পায়।

হারেমের প্রভূ বা পরিচালনাকারী প্রধান কৃষ্ণ নপুংসক।

অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যে নতুন অটোমান কূটনীতিক নির্বাচিত হয় ইব্রাহিম পাশা। ভিয়েনাতে প্রবেশের সময় অসাধারণ সব রত্নখচিত উপহার নিয়ে যায় সম্রাটের উদ্দেশ্যে ইব্রাহিম। এর মাঝে ছিল সাটিন দিয়ে সেলাইকৃত তাঁবু; এর বিভিন্ন মেরুতে ছিল সোনার নব্। ইস্তাম্বুলে অস্ট্রীয় কূটনীতিকের সম্মানে বিশেষভাবে বসফরাস থেকে আনা মাছ ভাজা পরিবেশন করা হয় খাদ্যসম্ভারে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম পদমর্যাদার কূটনীতিকরা এ সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়—যেমন, পোলান্ডের প্রতিনিধি।

ইংল্যান্ড থেকে নতুন কূটনীতিক হিসেবে পোর্তেতে আসেন স্যার রবার্ট সূতন। লড প্যাগেটের মধ্যস্থতায় শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। তাই স্যার রবার্টকেও উষ্ণ সম্ভাষণ জানান সুলতান। অন্যদিকে রাশিয়া চুক্তি স্বাক্ষর না করে দুই বছরের যুদ্ধ-বিরতিতে রাজি হয়। সে সময়ও নবায়নের প্রান্তে এসে গেছে। এর ওপর আবার রাশিয়ার কূটনীতিক পুরোদস্তুর যুদ্ধজাহাজে করে ইস্তাম্বুলে পৌঁছে। জারের নতুন শিপইয়ার্ডে প্রস্তুতকৃত এ জাহাজ দেখে ইস্তাম্বুলে সতর্ক সংকেত বেজে ওঠে।

এই ধরনের পরিবেশে আলোচনা হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তা ও বিস্ফোরণের কারণ। অবশেষে অটোমানরা একটি চুক্তিতে একমত হয়। এই চুক্তি মোতাবেক রাশিয়া দিনিয়েপারে অবস্থিত চারটি দুর্গ ধ্বংস করতে রাজি হয়। উভয় সাম্রাজ্যের সীমান্তের মধ্যবর্তী একটি অংশ অদখলকৃত মরুভূমি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ক্রিমিয়ার তাতাররা রাশিয়ার অঞ্চলে আকস্মিক আক্রমণ বন্ধে একমত হয়। কিন্তু নদীর ব-দ্বীপে রাশিয়ানদের মতোই মাছ ধরার ও লবণ সংগ্রহের কাজে সম-অধিকার পায়। এছাড়া নদীর উভয় পাড়ে মাছ ধরা, শিকার, মৌমাছি পালন ও গাছ কাটার অধিকার পায়।

ইতিমধ্যে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির মতো রাশিয়াও পোর্তে-তে স্থায়ী কূটনীতিক রাখার অধিকার নিশ্চিত করে নেয়। কিন্তু এসব কিছুই রাশিয়ার নৌবাহিনীর উন্নয়নকাজ বন্ধ করতে পারেনি আজভ সাগরে। এই উপলক্ষে খেপে ওঠে ক্রিমিয়ার খান। পোর্তের কাছে কৃষ্ণ সাগরে যথেচ্ছ চলাচলের সুযোগ চেয়ে আসছিল রাশিয়া। কিন্তু অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখিত হয় রাশিয়া। এছাড়াও আজভ সাগরে রাশিয়ার রণপোতবহরের বৃদ্ধি দেখে সচেতন হয়ে প্রণালি মুখে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে পোর্তে। এ উদ্দেশ্যে তাগানরোগের কাছে নতুন দুর্গ নির্মিত হয় ১৭০৩ সালে। এর মাধ্যমে উত্তর দিক দিয়ে প্রণালি পথের প্রবেশমুখ সুরক্ষিত করে তুর্কিরা। জোর করে প্রবেশে উদ্যত যে কোনো জলযান ধ্বংস করতে সমর্থ ছিল এই দুর্গের সৈন্যরা।

নিজ দেশে কোপরুলু হুসেন, মুফতি ও প্রধান কৃষ্ণ খোঁজার কাছ থেকে বিরোধিতার মুখোমুখি এদের ষড়যন্ত্রে পদত্যাগে বাধ্য হন প্রধান উজির। নিজের পছন্দনীয় স্থান মারমারা সাগরের তীরে এক খামারে মাত্র পাঁচ বছর কাজ করে অবসর গ্রহণের তিন মাসের মাথায় মৃত্যুবরণ করে হুসেন।

১৭০৩ সালে এভাবে প্রধান উজিরদের আসা-যাওয়া পরিবর্তনের মাঝে সাম্রাজ্যজুড়ে আবারো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জানিসারিসরা বেতন-ভাতা নিয়ে বিদ্রোহ করে। ছয় সপ্তাহব্যাপী বিদ্রোহ প্রায় গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। সুলতান মুস্তাফা এ সময় ছিলেন আদ্রিয়ানোপলে। বিশাল বিদ্রোহী সেনাবাহিনী, ছাত্র সহযোগে নবীজির পবিত্র স্তম্ভ ও মুফতির সম্মতি নিয়ে আদ্রিয়ানোপলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এখানে সুলতানের বাহিনীও তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। নিজের তরুণ বয়সে সামরিক পরাজয়ে হতাশায় নিমজ্জিত সুলতানের পদত্যাগ দাবি করে তারা।

॥ ২৫ ॥

বিভিন্ন সমস্যার মাঝে সালতানাতে অভিষেক ঘটে মুস্তাফার ভ্রাতা তৃতীয় আহমেদের। চতুর্দশ লুইসের হয়ে ফরাসি কূটনীতিক দে ফেরিওল পোর্তেকে ফরাসি মৈত্রী জোটে আসার আহ্বান জানিয়ে আসছিল। এছাড়া হাঙ্গেরিতে হাবসবুর্গদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানেও পোর্তের সাহায্য কামনা করছিল ফ্রান্স। কিন্তু সুলতান আহমেদ এতে দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা একদিকে ফরাসিরা যুদ্ধে ভালো অবস্থায় ছিল না অন্যদিকে তাঁর মতে অবিশ্বাসীরা এমনিই একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করছিল।

রাশিয়ার ক্ষেত্রে পোর্তের সাথে শান্তির সময় চলছিল। এই মধ্য বিরতি পিটার দ্য গ্রেটের ইচ্ছেতেই হয়েছিল। কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিকে নিজের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রেখে পিটার দ্য গ্রেট উত্তরে সুইডেনের দিকে দৃষ্টি দেয়। এখানকার রাজা দ্বাদশ চার্লস রাশিয়াকে আক্রমণ করে নিজের রাজ্য বৃদ্ধির মতলবে ছিল। ১৭০০ সালে সুলতানের সাথে সমঝোতার পর ডেনমার্ক ও পোলান্ডের সাথে একত্রিত হয়ে "বাল্টিক যুদ্ধ" শুরু করে রাশিয়া; সুইডেনের বিরুদ্ধে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও তুর্কিরা বসে থাকেনি। রাশিয়ার গতিবিধি নজর করার জন্য প্রতিবছর কৃষ্ণসাগরে রণপোতবহর পাঠাত অটোমান সরকার।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার জার নাটকীয়ভাবে সুইডিশ রাজাকে পরাজিত করে ১৭০৯ সালে। ফলে প্রভুত শক্তির অধিকারী হয়ে যায় রাশিয়া। রাজা চার্লস অটোমানদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সুলতান তৃতীয় আহমেদ অতিথিসুলভ গ্রহণ করে রাজাকে। রাশিয়া রাজা চার্লসের প্রত্যার্পণ দাবি করলে নাকচ করে দেন সুলতান। কিন্তু তিনি এও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে চার্লসকে পুনরায়

ক্ষমতালাভে সাহায্য করে জারের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করার কোনো অভিপ্রায় নেই সুলতান আহমেদের। কিন্তু তার পরেও রাশিয়ার সেনাবাহিনী অটোমান ভূখণ্ড মলদোভিয়াতে অনুপ্রবেশ করে। তুর্কিরা তৎক্ষণাৎ রাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। পোর্তেতে যুদ্ধবাদী একদল মন্ত্রীর পরামর্শে সবশেষে সুলতান রাশিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মলদোভিয়াতে রওয়ানা হন।

উত্তরে বাল্টিকে ব্যস্ত জার এ সময় কৃষ্ণসাগরে সেনাবাহিনী পুনর্মোতায়েনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু কিছুটা বিলম্বে হলেও নিজে নেতৃত্ব দিয়ে বাহিনী নিয়ে প্রুতে সুলতানের মোকাবেলা করতে রওয়ানা হন জার। কিন্তু এই ধরনের খরাসমৃদ্ধ অঞ্চলে রসদের সরবরাহের সমস্যার মুখে পড়েন জার। এছাড়া চিন্তিত খ্রিস্টান শক্তিরাও জারের বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে না পেরে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল না। এদিকে প্রুতের উচ্চভূমিজুড়ে তাতার ও তুর্কিরা পৌঁছে গেছে জারের বাহিনীকে অবরুদ্ধ করতে। পরাজয় অথবা আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কোনো পথ নেই জারের সম্মুখে। নিজের তাঁবুতে হতাশায় মুষড়ে পড়ে তুর্কিদের হাতে বন্দিত্ববরণের ভয় করতে থাকে জার। আবার শেষ মুহূর্তে "দাস" ও "প্রিয়তমা সেন্ট পিটারসবুর্গ" ব্যতীত অন্য যে কোনো ভূখণ্ড হারাবার শর্তে রাজি হওয়ার মনস্থির করেন জার।

এই সংকটময় মুহূর্তে জারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্ত্রী ক্যাথেরিন, যে কিনা জোরপূর্বক এই অভিযানে জারের সঙ্গিনী হয়েছে, সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, স্নেহশীল বাক্যের বিনিময়ে জারের চিন্তা-চেতনাকে সুশৃঙ্খলিত করে ক্যাথেরিন। সহধর্মীনির পরামর্শ মেনে নিয়ে অটোমান প্রধান উজিরের কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠাতে একমত হন জার। ক্যাথেরিনের গহনা ও অফিসারদের কাছ থেকে সংগৃহীত হাজার স্বর্ণ একত্রিত করে প্রধান উজিরকে উপহার পাঠায় জার। এভাবে এক ধরনের ঐকমত্যে পৌঁছায় সকলে।

এই শর্তানুসারে আজভ ও এর আশপাশের অঞ্চলকে সমর্পণ করতে একমত হয় পিটার। এছাড়াও পোলান্ড থেকে রাশিয়ার সেনাবাহিনী তুলে নেয়া; রাশিয়ার ভূখণ্ড দিয়ে সুইডেনে ফিরে যাওয়ার সময় রাজা চার্লসের সাথে সদ্ব্যবহার করতে সম্মত হয় পিটার। এর মাধ্যমে কৃষ্ণসাগর দখল করার স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ হয় পিটারের।

কিন্তু বাদ্য বাজিয়ে পতাকা উত্তোলন করে রাশিয়া বাহিনীর প্রস্থান দেখতে দেখতে হতাশ হয়ে ওঠে রাজা দ্বাদশ চার্লস। অন্যদিকে সুলতানের হয়ে প্রধান উজির যুদ্ধবিরতি চুক্তি করাতে জার নিজেও অটোমানদের স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন ভূখণ্ড না হারাতে পেয়ে যারপরনাই সন্তুষ্ট হন। ক্রিমিয়ার খান ও রাজা চার্লস উভয়েই রাশিয়া বাহিনীকে আক্রমণে আগ্রহী ছিল।

কিন্তু ব্রিটিশ কূটনীতিক স্যার রবার্টের প্রভাবে শান্তিবাদী নীতি গৃহীত হয়েছে। এসব শর্তের ওপর ভিত্তি করে ১৭১২ ও ১৭১৩ সালে আরো দুটি সফল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে আজভ তুর্কি ভূখণ্ড প্রসারিত হয় ও কৃষ্ণসাগরে অবশেষে রাশিয়া বাহিনীর প্রবেশে বাধা পড়ে।

প্রুতে পিটার দ্য গ্রেটের এ পরাজয়ের ফলে অটোমান সাম্রাজ্যে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ব্যতীত শান্তিতে কেটে যায় আরো প্রায় বেশ কিছু বছর। কিন্তু সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী বসে নেই। প্রধান উজির দামাদ আলী তুর্কিদের পুরোনো শত্রু ভেনিসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে মনস্থির করে। এই সময়ে ভেনেশীয় প্রজাতন্ত্রের মিত্রের অভাবে অটোমানদের চেয়েও বেশি বিপর্যয় ঘটেছিল দেশটিতে।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মোরিয়া পুনর্দখলে আগ্রহী হয় দামাদ আলী। ১৭১৫ সালে জ্যোতিষশাস্ত্র মোতাবেক নৌবাহিনীর সহায়তা ও বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করে দামাদ আলী। এবং তিন সপ্তাহ অবরোধ করে রাখার পর করিন্থ দখল করে নেয় তুর্কি বাহিনী।

বস্তুত সাইপ্রাস ও ক্রীটের মতোই এবার গ্রিকরা তাদের ল্যাটিন অরাজক প্রভুর বিরুদ্ধে ত্রাণকর্তা হিসেবে তুর্কিদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। এভাবে সরাসরি যুদ্ধে না যাওয়ায় প্রজাতন্ত্র মোরিয়া ও আর্কিপেলাগোর সব দ্বীপ হারিয়ে বসে তুর্কিদের কাছে। এর পরবর্তীতে কর্ফু ও আইয়োনিয়ান দ্বীপে আক্রমণ করে জেনশিয়াদের পুরোপুরি গ্রিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নেয় তুর্কি বাহিনী।

কিন্তু দামাদ আলীর ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনকে প্রতিহত করার জন্য পাল্টা প্রস্তুতি নেয় হাবসবুর্গ সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস। কিন্তু ভেনেশীয়াদের হয়ে আক্রমণে ব্যর্থ সম্রাট বরঞ্চ অস্ট্রীয়দের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে ও শান্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করতে সম্মত হয়। তাই ভেনেশীয়রা সম্রাটের মিত্রতা আহ্বান করলে শুধু সাধারণভাবে প্রতিরক্ষা মৈত্রী জোটে স্বাক্ষর করে সম্রাট। এক্ষেত্রে তাকে প্রভাবিত করে স্যাভয়ের রাজকুমার ইউজিন। কেননা তুর্কিরা পুনরায় আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে ইটালির ভূখণ্ডসহ পূর্ব ইউরোপে জার্মান ভূমিও আক্রমণের শিকার হবে।

অন্যদিকে এই মৈত্রী জোট নিয়ে পোর্তেতে সন্দেহ দেখা যায়। শান্তিকামী দিওয়ানের একটি অংশ সম্রাটের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের ওপর সামরিকবাদী প্রধান উজির উলেমা ও মুফতির কাছ থেকে যুদ্ধ যাত্রার সম্মতি লাভ করে নেয়।

ফলে আবার ১৭১৬ সালে অটোমান সেনাবাহিনী বেলগ্রেড যাত্রা করে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে আবারো। দামাদ আলী বিরোধি পক্ষের মতো

হটিয়ে, জ্যোতিষশাস্ত্রের ইঙ্গিত অবজ্ঞা করে দানিয়ুবের দক্ষিণে যাত্রা করে পিটার ওয়ার্ডেন অবরোধ করার জন্য।

অস্ট্রীয় সেনাপ্রধান রাও প্রথমে তাদের কৌশল নির্ধারণে একমত হতে পারেনি। অটোমান বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য ও দামাদ আলীর গ্রিস বিজয়ের খ্যাতিতে ভয় পেয়ে যায় তারা। কিন্তু তুর্কিদের সাথে পরিচিত রাজকুমার ইউজিন সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করে দেয়।

ফলে ১৭১৬ সালে ইউজিন আত্মরক্ষার কৌশল গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে কার্লোউইটজ্ গ্রামে অটোমানরা অস্ট্রীয়দের ছোট একটি দলকে পরাজিত করে পিটারওয়ার্ডেন যাত্রা করে। এখানে ইউজিন ও তার বাহিনী প্রস্তুত ছিল তুর্কিদের মোকাবেলা করার জন্য। প্রথমে জানিসারিসরা অস্ট্রীয়দের ওপর কিছুটা জয় লাভ করলেও ইউজিন পূর্ণ সৈন্য নিয়োগ করে জানিসারিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জানিসারিসরা ভেঙে পড়ে আর তুর্কিদের অপরিচিত ভারী গোলন্দাজ অস্ত্র ব্যবহার করে অস্ট্রীয়রা—ফলে সিপাহিরাও ভয় পেয়ে পিছু হটে। কিন্তু প্রধান উজির রাগান্বিত হয়ে নিজের অফিসারদের নিয়ে শেষ চেষ্টার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়। ঠিক কোপরুলু মাহমুদের ন্যায় মাথায় বুলেটের আঘাত পায় দামাদ আলী। মৃত্যুপথযাত্রী প্রধান উজিরকে ঘোড়ার পিঠে করে কার্লোউইটজ ফিরিয়ে নেয়া হলেও মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় অটোমান বাহিনীর ভেঙে পড়ার সংবাদে।

এই বিজয়ের পরপরই হাঙ্গেরিতে শেষ মুসলিম অংশ তেমেসভার দখল করে নেয় রাজকুমার ইউজিন। এই দুর্গবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে রাজকুমার। কোনোরকম বাধাদান ছাড়াই এর জনগণকে চলে যেতে দেয়া হয়। এরপর পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী জার্মান ও অস্ট্রীয়দের বসতি গড়ে ওঠে এখানে, যা "ছোট্ট ভিয়েনা" হিসেবে পরিচিত পায়।

পরবর্তী বছরে বেলগ্রেড অবরোধে ভূমিকা রাখে ইউজিনের এই বিজয়। এখানে অটোমানরা তাদের দুর্গ রক্ষায় দ্বিগুণ সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলেও অস্ট্রীয়রা বেঁচে যায় তুর্কিদের দ্বিধা, যোগ্য কৌশলের অভাব ও বিলম্ব আক্রমণের ফলে। নিজেদের বিজয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে তুর্কিরা অবরোধকারীদের ওপর বিলম্বে আক্রমণ করে। অটোমান অংশের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে ভয় ছড়িয়ে দেয় ইউজিন। বেয়নেটের ব্যবহারের ফলে জানিসারিসরা পুরোপুরি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

প্রিন্স ইউজিনের সাহসী নেতৃত্বে পিটারওয়ার্ডেনের মতোই প্রভুত ক্ষতি স্বীকার করে পালিয়ে যায় অটোমানরা। বেলগ্রেডের এই বিজয় নিয়ে পরবর্তীতে গান, কবিতা ও বিজয়গাথাঁ রচিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অস্ট্রীয় বাহিনী যুদ্ধযাত্রায় স্মরণ করত এই গাথা।

এখন সময় এসেছে শান্তি আনয়নের। আরো একবার ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড শান্তি রক্ষায় এগিয়ে আসে। সার্বীয়ার ছোট্ট একটি গ্রামে ১৭১৮ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে হাঙ্গেরির সবটুকু হাবসবুর্গকে দিয়ে দেয় অটোমান সাম্রাজ্য। এছাড়াও সার্বীয়ার বৃহৎ অংশ, বেলগ্রেড, ওয়ালাসিয়া ও বসনিয়ার বড় একটি অংশও দিয়ে দেয়া হয় হাবসবুর্গকে।

শুধু ভেনিস, পৃথক একটি চুক্তির মাধ্যমে কাটা-ছেঁড়ার পর তুর্কিদের হাতে আসে।

॥ ২৬ ॥

শান্তিকামী মানুষ সুলতান তৃতীয় আহমেদ, নিজের শাসনাকালের পরবর্তী বারোটি বছর জুড়ে নির্ঞ্ঝাটে দিন যাপন করে যান। অবশ্য এ সময় পশ্চিমামুখী ও পুনঃসংস্কারের জন্য গুরুতর বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। একজন 'সহিষ্ণু শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী। সেরাগলিওর বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার প্রিয়তমার কোলজুড়ে আসা সুলতান ছিলেন হারেমের প্রভাব থেকে অনেকটাই মুক্ত। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় সভ্যতার প্রতি সমান আগ্রহী ছিলেন তিনি। সংগীত, কলা ও সাহিত্য অনুরাগী সুলতান নিজের চারপাশে বিশেষ প্রতিভার অধিকারী কবিদের নিয়ে রাজদরবারে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও সেরাগলিওতে নতুন পাঠাগার স্থাপন করে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেন।

নন্দনশৈলীতে বিশেষভাবে মেধাসম্পন্ন ছিলেন সুলতান তৃতীয় আহমেদ। অসংখ্য দালানের নকশা ও নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তিনি। শহুরে নয়; বরঞ্চ প্রকৃতির সান্নিধ্যকে আপন করে নিতে গাছের ছায়া, ফুলের সুগন্ধ, পানির প্রবহমানতা, পাখিদের সুমধুর কলতান--নিজের বৃহৎ সেরাগলিও থেকে বের হয়ে ও দরবার ও পাশাদের জন্য গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ নির্মাণ করান সুলতান বিভিন্ন তুর্কি সমুদ্রতটে। এদের মাঝে একটি ছিল ইউরোপের মিষ্টি পানির ধারে। গোল্ডন হর্নের ঠিক মাথার দিকে। মার্বেল বাঁধানো খাল তৈরির জন্য নদীর দুই প্রবাহকে ভিন্ন খাতে নিয়ে গেছেন তিনি।

ঠিক মধ্যখানে তিনি নিজের জন্য নির্মাণ করেন গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ সা'দাবাদ। এর নকশা করা হয় সপ্তদশ শতকের ফরাসি মার্লোর পরিকল্পনা অনুযায়ী। এর চারপাশে গড়ে ওঠে আরো প্রায় শখানেক গ্রাম, প্রাসাদ, প্যাভিলিয়ন, উন্মুক্ত মঞ্চ। পূর্বের মতো পাথর এবং মার্বেল দিয়ে নয়; বরঞ্চ কাঠ ও প্লাস্টার দিয়ে নির্মিত হয় এসব স্থাপনা। একইভাবে এশিয়ার সমুদ্র পাড়েও শীঘ্রই গড়ে ওঠে একই কায়দার ভবনসমূহ। ইউরোপ ও এশিয়া থেকে আগত বিভিন্ন স্থাপত্যবিদের নকশা অনুযায়ী নির্মিত এসব গৃহ, ফরাসি

কূটনীতিকের মতানুযায়ী এতটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল যে কখনো মনে হতো ভার্সেইলেস; কখনো মনে হতো ইস্ফাহান। তার্কিশ রাজদরবার পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের খোঁজে প্রায় নতুন যাত্রায় রত হয়।

সুলতান আহমেদের জৌলুষপূর্ণ রাজদরবারে যথাযথ সংগত করেছেন জামাতা দামাদ ইব্রাহিম পাশা। সুলতানের রাজত্বকালের শেষ বারো বছর যাবৎ প্রধান উজির হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছে ইব্রাহিম পাশা। ইব্রাহিম নিজেও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন পছন্দ করত। মধ্যরাত পর্যন্ত ইস্তাম্বুলকে আলোকিত করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিয়েছিল ইব্রাহিম। এ উপলক্ষে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ফরাসি কূটনীতিকের ভাষায় বলা যায় "মসজিদের গম্বুজগুলো অসংখ্য আলোকিত মুকুট দ্বারা স্বজ্জিত আর মিনারের মাঝে কোরাণের বাণী আকাশজুড়ে আলোকিত হয়ে আছে আগুনে অক্ষর দ্বারা।" বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় তিন দিন আর রাতব্যাপী আলোকসজ্জা করা হতো ইস্তাম্বুল শহরে। এক উৎসবে, সুলতানের তিন কন্যার বিবাহ, দুই ভ্রাতুষ্কন্যার বিবাহ, চার পুত্রের সুন্নতের অনুষ্ঠানে পুরো সাম্রাজ্যজুড়ে আনন্দ উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেয় প্রধান উজির। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় দুই হাজার বাদ্যযন্ত্রী, পনেরোশ মুকাভিনেতা, মুষ্টিযোদ্ধা, অ্যাক্রোব্যাট, আর অসংখ্য রাঁধুনীদের আনা হয়। রাঁধুনীরা বিভিন্ন উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। এর মাঝে ছিল পাঁচ গজ লম্বা ও চার গজ চওড়া একটি বাগান। পুরোটাই চিনি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, বিবাহের মিষ্টতা প্রদর্শনের জন্য।

শীতকালে সেরাগলিওতে সামাজিক মেলামেশার আয়োজন করা হতো। দর্শনশাস্ত্র, কবিতা পাঠ, চীনের ছায়া খেলা, আর প্রার্থনার পাশাপাশি মিষ্টান্ন বিতরণ করা হতো। অথবা হালুয়াও বিতরণ করা হতো। শীত ঋতু শেষ হয়ে গেলে বিশেষভাবে সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য টিউলিপ উৎসব করা হতো। ফুলের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল সুলতান আহমেদের—গোলাপ, লাইলাক, জেসমিন, কার্নেশন। কিন্তু টিউলিপপ্রীতি অন্য ফুলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সুলতান তৃতীয় আহমেদের শাসনকালকে বলা হয় "টিউলিপের শাসনকাল।"

এশিয়ার অনুর্বর ভূমির একটি বন্য ফুল টিউলিপ। শতাব্দী ধরে তুর্কিদের পশ্চিম অভিবাসনের পথে পথে ছড়িয়ে থাকত এ ফুল। ষোড়শ শতকে অস্ট্রিয়ার রাজকীয় কূটনীতিক বুশবেক পশ্চিমের কাছে প্রথম টিউলিপকে পরিচিত করে তোলে। এর পর থেকেই ইউরোপীয় বণিকেরা হল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে প্রায় বারোশ জাতের সৃষ্টি করে। সপ্তদশ শতকে অটোমান অভিজাতদের মাঝে টিউলিপোম্যানিয়া ছড়িয়ে পড়ে। টিউলিপ "ইউরোপের স্বর্ণ" হিসেবে সুখ্যাতি পায়।

আহমেদের পিতা চতুর্থ মাহমুদ পুনরায় তুর্কিতে টিউলিপের প্রচলন করেন। সেরাগলিওতে টিউলিপের একটি আলাদা অংশ প্রস্তুত করা হয়

বাগানে। কিন্তু আহমেদ প্রথম হল্যান্ড ও পারস্য থেকে বিপুল পরিমাণে টিউলিপ আমদানি শুরু করে। প্রতিটি বেড়ে একটি মাত্র জাত হিসেবে সুপরিকল্পিতভাবে চাষ করা হয় প্রাসাদের বাগানে।

তৃতীয় আহমেদের টিউলিপের উৎসব অনেক সময় ইসলামের উৎসবকেও ছাড়িয়ে যেত। এপ্রিলে পরপর দুই সন্ধ্যায় এ উৎসব হতো, বিশেষ করে পূর্ণিমার সময়ে। সুলতান নিজের বাগানের যে অংশে টিউলিপ গাছ ছিল, সে অংশকে বিশেষভাবে আচ্ছাদিত করে রাখতেন। এখানে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন ফুলদানিতে বিভিন্ন রং আর আকারের ফুল থাকত। রঙিন কাচের বাতি ছড়ানো থাকতো একটু পরপর। গাছের শাখা-প্রশাখায় বিভিন্ন খাঁচার মাঝে ক্যানারি ও বিরল প্রজাতিক গায়ক পাখি রাখা হতো। রাজকীয় তাঁবুর নিচে নিজের সিংহাসন নিয়ে সবার মধ্যমণি হয়ে থাকতেন সুলতান।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় হারেমের নারীদের জন্য আনন্দ আয়োজনের ব্যবস্থা করা হতো। সুলতান একাকী নারীদের সাহচর্যে গান, কবিতা ও দাস-দাসিদের নাচ উপভোগ করতেন। আর এ সময় টিউলিপদের আলোকিত করতে সারা বাগানময় ঘুরে বেড়াত পিঠে করে মোমবাতি নিয়ে কচ্ছপের দল। কখনো সখনো গুপ্তধন শিকারের ব্যবস্থা করা হতো যেমনটা হয় ইউরোপে, ইস্টার ক্র্যা, চিনির মিঠাই বা সামান্য কোনো অলংকার ফুল গাছের মাঝে মাঝে লুকিয়ে রাখা হতো আর হাস্যরসে মশগুল উপপত্নীরা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত তাদের খোঁজে। ইব্রাহিম পাশা নিজে সব প্রজাতির মাঝে "নীল মুক্তা" (Blue pearl) পছন্দ করত।

অটোমানদের টাইলস্ ও অন্যান্য গৃহাস্থালি সাজাবার কলার ক্ষেত্রেই নয়; বসন্তের দূত হিসেবে টিউলিপ অটোমান কবিদের প্রেরণা জোগাত। পারস্য প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজেদের ধারা খুঁজে পায় এই সময়ে অটোমান কবিরা। তৃতীয় আহমেদের শাসনামলে প্রধান কবি ছিলেন নেদিম। আনন্দ ও লঘু-হৃদয়ের দার্শনিক ছিলেন তিনি "এসো আমরা সকলে হাসি আর খেলায় মেতে উঠি, এসো আমরা পৃথিবীর আনন্দ উপভোগ করি।"

বিংশ শতকের রিপাবলিকান আমল পর্যন্ত তুর্কি পদ্যের চিত্র হিসেব ছিল টিউলিপ। ইয়াইয়া কামাল লিখে গেছেন, "বিজয় হচ্ছে নষ্ট সুন্দরীর মতো, যার আছে গোলাপের মুখমণ্ডল আর টিউলিপের চুম্বন।"

টিউলিপ যুগে অটোমান সাম্রাজ্যের আধুনিককাল শুরু হয়। সূর্যোদয় হয় এক নতুন পৃথিবীর, নতুন চেতনা, যৌক্তিক অনুসন্ধানের প্রেরণা ও স্বাধীন পুনঃসংস্কার। পশ্চিমের কাছ থেকে প্রেরণা খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক উন্নতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামরিক শক্তি প্রভৃতি সব মিলিয়ে ইসলামিক পূর্বের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর নিরপেক্ষতার সম্ভার ফেলতে চায়। এ

কারণেই টিউলিপ হয়ে ওঠে পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে তুর্কি রেনেসাঁর প্রতীকস্বরূপ।

১৭২০ সালে তুর্কি সরকার পঞ্চদশ লুইসের দরবারে বিশেষ একজন দূত পাঠায়। চেলেবি মাহমুদ। তার দাপ্তরিক দায়িত্ব ছিল—যাতে সে সফল হতে পারেনি—ফ্রান্সের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলা। কিন্তু প্রধান উজির তাকে আরো একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছিল,. "দুর্গ, কারখানা আর ফরাসি সভ্যতার অন্যান্য কাজ ঘুরে দেখে এসে প্রয়োগযোগ্যগুলোর ওপর প্রতিবেদন পেশ করবে।" তুর্কিতে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সারগ্রস্ত হিসেবে কাজ করে এই সফর।

মাহমুদ এবং তার পুত্র সাঈদ তুর্কিদের মাঝে প্রথম, যারা ফরাসি ভাষা শিখে নেয়। প্যারিস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এর অভিনব সব জিনিসের প্রতি মুগ্ধ হয়ে যায় মাহমুদ। যেন এ এক নতুন পৃথিবী আবিষ্কার। কারিগরি এবং চিকিৎসা, কলা, প্রাণী এবং বৃক্ষরাজির বাগান, অপেরা ও থিয়েটার আর সবকিছুর ওপরে প্যারিসের সামাজিক অভ্যাসসমূহ বিস্মিত করে মাহমুদকে। শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিতে দেখতে থাকে সেসব নারীকে "যারা পুরুষের তুলনায় বেশি মর্যাদা ভোগ করে ও ইচ্ছেমতো যে কোনো জায়গায় যাওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে তাদের।" প্যারিসের মানমন্দির ও পনেরোশ শতকের সমরকন্দ জ্যোতির্বিদ রাজকুমার উলুজ বের রাশিচক্রের টেবিল দেখে বিশেষভাবে চমৎকৃত হয় মাহমুদ। এছাড়া সেইন্ট-সাইমনের সাথে মিলিত হওয়ার পরে ইস্তাম্বুলে ফিরে গিয়ে একটি প্রকাশনা খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করে মাহমুদ।

এছাড়া মাহমুদপুত্র সাঈদ ফান্সের চিত্রকলা এবং এর সাংস্কৃতিক মূল্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। এই আবিষ্কার পরবর্তীতে অটোমান সাম্রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তারপরেও অটোমান ভবিষ্যতে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয় এই আগ্রহ। ১৭২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম প্রকাশনী; যা কোনো মুসলিম দেশে এর আগে কখনো হয়নি।

ইব্রাহিম পাশাকে সুলতানের মানস চক্ষু খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি মুদ্রিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। লেখা ছিল পূর্বে মুসলিম জাতিসমূহের তুলনায় দুর্বল খ্রিস্টান জাতিসমূহ কেমন করে বিভিন্ন ভূখণ্ডে রাজত্ব করছে বর্তমানকালে? এমনকি একসময়কার বিজয়ী অটোমান সেনাবাহিনীকেও পরাজিত করেছে?" উত্তরস্বরূপ এতে লেখা ছিল, মুসলিমদেরকে অমনোযোগিতা থেকে জেগে উঠতে হবে। "শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। দূরদৃষ্টি এবং খুব কাছ থেকে নতুন ইউরোপীয় প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান, কৌশলবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যার সাথে পরিচিত হতে হবে।" সামরিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ভূগোল শিখতে হবে, নৌ-চার্টসমূহ দেখে নৌবিজ্ঞান চর্চা করতে হবে; যার মাধ্যমে খ্রিস্টানরা নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করেছে; মুসলিম

ভূখণ্ড দখল করেছে। বিশেষ করে প্রতিবেশী রাশিয়ার জারের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে, "যেমন করে তিনি অন্যান্য দেশ থেকে এসব বিদ্যায় দক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে নিজের সেনাবাহিনীতে তাদের পরামর্শ, সহায়তা ও সুপারিশের প্রয়োগ করেছেন।"

এছাড়াও শেখ-উল-ইসলামের কাছ থেকে শব্দাভিধান এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক মুদ্রণের অনুমতি জোগাড় করা হয়।

কিন্তু শান্তিকামী শাসক সুলতান তৃতীয় আহমেদের রাজত্বকাল প্রায় শেষলগ্নে এসে পৌঁছেছে। যেমনটা প্রায়ই দেখা গেছে পূর্বে, কিছুদিন শান্তিপূর্ণ সময় অতিবাহিত করার পর জানিসারিসরা পুনরায় সহিংস হয়ে ওঠে। অমিতাচার আর চাপল্যতা দিয়ে রাজদরবারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ও নিজ স্বার্থে সরকার পরিবর্তনে আগ্রহী হয়ে ওঠে; তেমনটা আবার ঘটতে শুরু করে। ১৭৩০ সালের শরতে পারস্যের কাছে অটোমান সীমান্তজুড়ে নতুন আগ্রাসী শাসক নাদির খানের অনুপ্রবেশের সংবাদ আসতে থাকে। এ ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ জনগণের সমর্থন নিয়ে আলবেনীয় একজন জানিসারিস বিদ্রোহ করে বসে। প্রাথমিকভাবে ইব্রাহিম পাশাকে লক্ষ করে এ বিদ্রোহ শুরু হয়। এ সময়ে প্রধান অ্যাডমিরাল শান্তভাবে এশীয়-বসফরাসের তীরে নিজের বাগানে টিউলিপ রোপণে ব্যস্ত ছিল।

সাহস হারিয়ে জানিসারিসদের দাবির মুখে প্রধান উজির, প্রধান অ্যাডমিরাল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তাদের হাতে তুলে দেন সুলতান। পরে তাদেরকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। নিজের এবং তাঁর সন্তানদের জীবন রক্ষা হবে; এ শর্তে সিংহাসন ত্যাগ করেন সুলতান। ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম মাহমুদ সুলতান হিসেবে শাসনকাল শুরু করেন।

সুলতান তৃতীয় আহমেদের রাজত্বকালে অটোমান সাম্রাজ্যে পুনঃসংস্কারের নতুন প্রথা শুরু হয়। যা এর পরেও চলতে থাকে। ইব্রাহিম মুতেফেরিকার স্মারকলিপি, সামরিক পুনঃসংস্কারের উদ্দেশ্যে সুলতান প্রথম মাহমুদের সামনে পেশ করা হয়। কিন্তু সেরাগলিও খাঁচায় বন্দি হিসেবে বড় হওয়া এই সুলতান অযোগ্য শাসক হিসেবে পরিগণিত হন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে ইব্রাহিম মুতেফেরিকা পঁচিশ জন অনুবাদক নিয়ে গঠিত কমিটির সহায়তায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ, ভূগোল (যার ওপর তিনি নিজে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন), পদার্থ এবং জ্যোতির্বিদ্যা, টেলিস্কোপ এবং মাইক্রোস্কোপের ওপর অ্যারিস্টটলের লেখার অনুবাদ, চুম্বকবিদ্যা ও কম্পাস, গ্যালিলিওর তত্ত্ব, গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার তত্ত্ব এবং অবশেষে চিকিৎসাবিদ্যার ওপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক মুদ্রণ করেন। ১৭৪৫ সালে ইব্রাহিম মুতেফেরিকার মৃত্যু হলে তার মুদ্রণ সংস্থা বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে অনেক অনুবাদ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতে

রয়ে যায়। ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাক্রম তুরস্কে মুদ্রণ সংস্থার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। ফলে টিউলিপ যুগে তুর্কি নব-জাগরণের উন্নতিতে বিলম্ব সংঘটিত হয়।

॥ ২৭ ॥

যুদ্ধ নয়, বরঞ্চ কূটনীতি হয়ে ওঠে ইউরোপের সাথে অটোমান সাম্রাজ্যের সম্পর্কের প্রধান নির্যাস। সেসব স্বর্ণোজ্জ্বল দিনের ইতি ঘটে যখন মনে হতো অর্ধচন্দ্র, ধর্মীয় ও সামরিক শৌকর্যের মাধ্যমে ক্রসকে ঢেকে দেবে। দামাদ আলীর পিটারওয়ার্জেন, রাজকুমার ইউজিনের হাতে পরাজয়ের মাধ্যমে এর অবসান হয়। বাস্তবিক অর্থে চিরদিনের জন্য অটোমানরা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে ইউরোপীয় বিষয়ে তাদের ভূমিকা, প্রতিরক্ষা ও মৈত্রীদের ওপরই নির্ভর করবে। এশীয় মুসলিম শক্তি হিসেবে কার্লোউইটজ চুক্তির পূর্বে তুর্কিদের কূটনীতি ছিল একনায়কত্বসুলভ। কোনো পারস্পরিক আদান-প্রদান ছিল না। "পৃথিবীতে একটিই জাতি", এই ছিল তুর্কিদের জাতিগত আইন। অনুন্নত জাতি হিসেবে খ্রিস্টান জাতি সমূহের কূটনীতিকদের গ্রহণ করলেও পরিবর্তে নিজেদের কোনো কূটনীতিক পাঠাত না অটোমানরা। এই চর্চার কারণে ইউরোপীয়দের সাথে সম্পর্ক বিবর্জিত হয়ে পড়ে তারা। কার্লোউইটজ এবং পরবর্তীতে পাসারোউইটজ উভয় চুক্তি পশ্চিমা কূটনীতির কৌশল ব্যবহার করে অটোমান শক্তিকে সম্প্রসারণবাদিতা থেকে সরিয়ে আনে। এর পর থেকে যে কোনো আলোচনার অনুষ্ঠানে দুর্বল হিসেবে প্রতিপন্ন হয় অটোমান সাম্রাজ্য; পূর্বের মতো শক্তিশালী নয়। বিদেশে কূটনৈতিক মিশন নয় এমনকি নিজ দেশেও বৈদেশিক বিষয় দেখভাল করার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না অটোমান সাম্রাজ্যে।

এতে করে সমস্যায় পড়েছিল খোদ বিদেশি কূটনীতিকেরা। হতাশাজনকভাবে নিজ নিজ সরকারের নীতিসমূহ তুর্কিদের বোঝাতে ব্যর্থ হয় তারা। যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশা ও দূরত্বের বিচারে সময়সাপেক্ষ হওয়ায় নিজ দেশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন কূটনীতিকেরা, পেরাতে অবস্থিত বিদেশি কোয়ার্টারে বাস করার পরে প্রতিদ্বন্দ্বি কূটনীতিকদের কাছ থেকেও প্রায় বিচ্ছিন্নই থাকত বলা চলে। গোল্ডেন হর্নের ওপারে, ইস্তাম্বুলে কদাচিৎ মেলামেশার সুযোগ ঘটলেও তুচ্ছ অটোমান নিষেধাজ্ঞার বাধার কবলে পড়ত সকলে। সরকারের মাঝে ক্ষমতার পালাবদলের মাঝে, একের পর এক প্রধান উজিরের পরিবর্তনে যে কোনো বৈঠকে বিলম্ব, বিচ্যুতি, ছল-ছাতুরি, এড়িয়ে যাওয়া প্রভৃতি হয়ে দাঁড়ায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

তবে মোটের ওপর ভাষার সমস্যা ছিল বিদেশি কূটনীতিকদের প্রধান সমস্যা। কেননা তাদের কেউ তুর্কি ভাষা জানত না, অন্যদিকে খুব অল্প

সংখ্যক তুর্কি ক্ষমতার পালাবদলের মাধ্যমে স্বধর্মত্যাগী খ্রিস্টানদের চেয়ে মুসলিম বংশোদ্ভূত অফিসাররা শাসনকাজে নিয়োজিত হয় ইউরোপীয় ভাষা জানত। এ কারণে বিদেশি প্রতিনিধি তার নিজস্ব দোভাষী এবং গোয়েন্দা প্রতিনিধির ওপর নির্ভর করত। সাধারণভাবে এরা হতো গ্রিক বা ল্যাটিন বংশোদ্ভূত লেভান্টিন। পোর্তের অফিসারদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এসব দোভাষী এমন এক অবস্থানে ছিল, সেখানে সে যেভাবে চাইত তাই বলত।

১৬৬৯ সালে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে পোর্তেতে দোভাষী হিসেবে গ্রিক বা আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানদের শুধু নিয়োগ দেয়া হতো। গ্রিক বণিক সম্প্রদায়ের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ করে গ্রিক অর্থডক্স বিশ্বাসীদের বিভিন্ন পদ দেয়া হতো। ব্যবসায়িক কারণে পশ্চিমা ভাষার সাথে গ্রিক বণিকেরা পরিচিত ছিল। এক্ষেত্রে মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় অজ্ঞ ছিল। এছাড়াও গ্রিকেরা নিজেদের সন্তানদের পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য পাঠাতো। পরবর্তীতে এরা খ্রিস্টান স্বায়ত্তশাসিত গভর্নর হতে পারত। এভাবে ইউরোপীয়দের সাথে সম্পর্ক যত বাড়তে থাকে, দোভাষীর কাজ হয়ে উঠে আরো দুষ্কর। বিদেশি প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, ব্যবসায়িক আলোচনা, সুলতানের সাথে আলোচনার সময় দোভাষীর দায়িত্ব পালন, প্রধান উজিরদের সাথে সাক্ষাৎকার, বিদেশি সরকারের সাথে যোগাযোগ প্রভৃতি সব কিছুই দোভাষী ও তার কর্মীদের করতে হতো।

এরপরেও কূটনৈতিকভাবে হতাশা যায় না বিদেশি প্রতিনিধিদের মন থেকে। পঞ্চদশ লুইসের প্রতিনিধি হিসেবে পোর্তের সাথে ফ্রান্সের সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পায় মারকুইস দে ভিলিনেরভ আঠারোশ শতকের শুরুতে। এ সময় অটোমান দুর্বলতা ও মস্কোর শক্তির কারণে ইউরোপে ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হুমকি দেখা দেয়।

এমন সময়ে গোল্ডেন হর্নে ভিলিনেয়ভের আগমন ঘটে যখন বসফরাসের তীরে উৎসব চলছিল। যখন রাজনৈতিক ব্যবসার চেয়ে আনন্দপ্রাপ্তিই বড় বিষয় ছিল। মাত্র দশ মিনিটের জন্য সুলতানের সাথে আনুষ্ঠানিক পরিচয় হয় তার। কয়েক দিন পরে প্রধান উজিরের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ আসে। ধূপমান না করলেও ভিলিনেয়ভ বাধ্য হয় প্রধান উজিরের সাথে বিশ ফুট লম্বা পাইপ টানতে। তারপরেও ভিলিনেয়ভ চেষ্টা করে খ্রিস্টান ক্ষুদ্রগোষ্ঠীদের নিরাপত্তা ও সন্ধি শর্তে আত্মসমর্পণের বিষয় দুটি নিয়ে কথা বলতে। কিন্তু প্রধান উজির আগ্রহ নিয়ে জানতে চায় ভার্সেলেইসের বাগান এখনো আগের মতো মনোহর আছে কিনা। কিছুদিন পরে পুনরায় ফরাসি কূটনীতিকের কাছে পোর্তের দোভাষী এসে প্রভুর হয়ে জানতে চায় ফ্রান্স থেকে বাল্ব এবং চারাগাছ পাওয়া

যাবে কিনা। এরপর আরো আট মাস অতিবাহিত হওয়ার পর প্রধান উজিরের দর্শন লাভের সুযোগ পায় ভিলিনেয়ভ।

বেলগ্রেডে অবমাননাকর পরাজয়ের পরে সম্রাটের সাথে আর কোনো দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে তুর্কিরা। কিন্তু তৃতীয় আহমেদের সিংহাসনচ্যুতি, প্রধান উজিরের মৃত্যুদণ্ডের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। ফরাসি নীতির জন্য অটোমান সমর্থন অনুমোদন করে নেয় ভিলিনেয়ভ।

কয়েক মাসের মাঝেই নতুন প্রধান অ্যাডমিরালের মাধ্যমে ফরাসি পণ্যদ্রব্যের ওপর থেকে কর মওকুফ করে নেয় ভিলিনেয়ভ। এরপর ফরাসিপ্রেমী প্রধান উজির তোপাল ওসমানের মাধ্যমে ফ্রান্স তার ধর্মীয় অবস্থান সুসংহত করে। খ্রিস্টান প্রদেশসমূহে আবারো মিশনারিরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মচর্চার সুযোগ পায়। খ্রিস্টানদেরকে নতুন গির্জা নির্মাণের ও পুরাতন গির্জা, যেগুলো তুর্কিরা পুড়িয়ে দিয়েছিল পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়। এভাবে "ফ্রান্সের সম্রাট" আবারো তাঁর বিশ্বাসের সর্বময় নিরাপত্তার রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

অ্যাম্বাস্যাডর ভিলিনেয়ভ পোর্তের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে ফরাসি উপদেষ্টা হিসেবে স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকে। প্রধান উজির গোপনীয়তা ভঙ্গ করে তার কাছে স্বীকার করে যে, যথাযথ সময়ে অস্ট্রিয়া ও সারিনা অ্যানার (Tsarina Anna) ওপর অটোমান আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কিন্তু ফরাসিপ্রেমী প্রধান উজিরের পদত্যাগের পর "যথাযথ সময়" উপস্থিত হয় অনেক বিলম্বে। ইতিমধ্যে ১৭৩৩ সালে অস্ট্রিয়া ও জারিনা একত্রিত হয়ে পোলান্ডের বিরুদ্ধে মৈত্রী গড়ে তোলে। পোল্যান্ড এসময় ফরাসি সমর্থন পেয়েছিল। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া অটোমান নিরপেক্ষতা দাবি করে, যা তৎক্ষণাৎ মেনে নেয়া হয়। অন্যদিকে ফ্রান্স এ সময় অটোমানদের আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু তুর্কি'রা এ সময় প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক মৈত্রী জোট দাবি করে। কিন্তু ভার্সেইলেসে পঞ্চদশ লুইসের ক্ষমতার প্রধান শক্তি কার্ডিনাল ফ্লুরি ইউরোপের খ্রিস্টান শক্তিসমূহের সাথে যুদ্ধে জড়াতে মনস্থির করে। বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের সাথে। সম্পূর্ণরূপে এই প্রত্যাখ্যানে প্রমাণিত হয় যে তুর্কিরা তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের মতোই কূটনীতির ক্ষেত্রেও একগুঁয়ে।

এভাবে তুর্কি নিরপেক্ষতার ওপর ভরসা করে ১৭৩৪ সালে রাশিয়া বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে দানজিগ দখলে অগ্রসর হয়। ওয়ারশ থেকে যাত্রা করে পোলান্ডের অনেকটুকু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পেয়ে যায়। ফলে বাল্টিক থেকে কৃষ্ণ সাগরের উপকূল পর্যন্ত চলাচলের স্বাধীনতা পেয়ে প্রুতে তুর্কিদের হাতে পিটার দ্য গ্রেটের পরাজয়ের প্রতিশোধ পূর্ণ হয়।

এরপর তাতার খানের বাহিনী রাশিয়া ভূখণ্ডে প্রবেশের অজুহাত দেখিয়ে কোনো রকম যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই আজ দখল করে নেয় রাশিয়া বাহিনী। একই সময় রাশিয়ার সেনাবাহিনী ক্রিমিয়া দখল করে নেয়, তাতারদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ ভঙ্গ করে। এরপর ক্রিমিয়ার উপদ্বীপে প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা ও নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় তারা। যেমনটা এর পূর্বে পিটার দ্য গ্রেট বা কোন রাশিয়ার সেনাবাহিনী আর কখনো করেনি। কিন্তু এই অঞ্চলের শুষ্ক ও পানিবিহীন ভূমি অবশেষে তাদেরকে পরাজিত করে ও শীত আসার পূর্বে ক্ষুধা ও রোগে আক্রান্ত হয়ে এ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় তারা। রাশিয়ার সাফল্য এভাবে তৎক্ষণাৎ ব্যর্থতার মাধ্যমে ভারসাম্য ফিরে পায়, যা তুর্কিদেরকে খানিকটা নিরাপত্তা দেয়।

এতদসত্ত্বেও পোর্তে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নেয়। দানিয়ুবের দিকে অগ্রসর হয় অটোমান সেনাবাহিনী। বস্তুত রাশিয়াকে প্রতিহত করা তুর্কিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দানিয়ুবে সারিনার যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যিক জলযানসমূহ স্বাধীনতা দাবি করছে। এর মাধ্যমে এটি রাশিয়ার খালে পরিণত হয়ে ইস্তাম্বুলে ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরে পৌঁছাবার পথ খুলে দেবে। এক্ষেত্রে সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস নিজেও আক্রমণের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মাঝে গোপন চুক্তি হয়।

কিন্তু তুর্কিরাও যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলা করতে অপারগ। বরঞ্চ কোনো এক খ্রিস্টান শক্তির মাধ্যমে মধ্যস্থতা করার প্রতি বেশি আগ্রহী তারা। এ ভূমিকা পালনের সুযোগ পাওয়ার জন্য ইংল্যান্ড ও ডাচ্ কূটনীতিকদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ১৭৩৬ সালের গ্রীষ্মে নতুন প্রধান উজির, যার সাথে ভিলিনেয়ভ এখনো পরিচিত হতে পারেনি; সেনাবাহিনী নিয়ে বেন্দারের ক্যাম্পে অগ্রসর হয়। এখানে যুদ্ধ নয়; বরঞ্চ শান্তির আলোচনা প্রত্যাশা করছিল প্রধান উজির। সম্রাটের বাহিনীও পোলিশ যুদ্ধের পর এখনই অটোমানদের সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত নয়।

পোলিশ ইউক্রেনের নেভিরভে ১৭৩৭ সালের গ্রীষ্মে সম্মেলন বসে। তরবারি হাতে আলোচনার মঞ্চে রাশিয়া শুধু কৃষ্ণসাগরে নৌ-স্বাধীনতা নয়, বসফরাস হয়ে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছানোর স্বাধীনতাও দাবি করে; দিনিয়েস্টার পর্যন্ত রাশিয়ার সীমান্ত বৃদ্ধি, রাশিয়ার অধীনে মলদোভিয়া ও ওয়ালাসিয়ার স্বাধীনতা, কৃষ্ণসাগরের উত্তরে তাতার ভূখণ্ড ত্যাগ দাবি করে রাশিয়া। অস্ট্রীয়রা পুরো বসনিয়া ও সার্বীয়া থেকে তুর্কিদের প্রস্থান দাবি করে। তাদের উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে দাবিকৃত অঞ্চলে অগ্রযাত্রা শুরু করে দিয়েছে। উভয়ের যৌথ দাবি এক ধরনের চরমপত্র হিসেবে প্রতিপন্ন হয় কোনো পরাজিত শক্তির প্রতি। ফলে শর্তসমূহ অগ্রাহ্য করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না তুর্কিদের।

অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার একমাত্র আশা নিহিত থাকে ফ্রান্সের মাঝে। এই সংকটে পঞ্চদশ লুইস খানিকটা দ্বিধায় পড়ে যায়। রাশিয়া এতে তৃপ্ত থাকবে ধরে নিয়ে যুদ্ধ এড়ানোর বিকল্প হিসেবে শর্ত মেনে নেয়ার কথা ভাবে ফ্রান্স। কিন্তু কৃষ্ণসাগর হয়ে ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার উপস্থিতি হুমকিস্বরূপ দেখা দেয় ফ্রান্সের জন্য। কার্ডিনাল ফ্লুরি বিবেচনা করে দেখতে পায় যে, বাণিজ্যিকভাবে লেভান্তের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও অটোমান সাম্রাজ্য যতটাই জীর্ণ বা অক্ষম হোক না কেন, ইউরোপের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ফলে ভার্সেইলেস থেকে নতুন ধরনের প্রতিরক্ষানীতির উন্মেষ ঘটে। ভিয়েনাতে গোয়েন্দা পাঠানো হয় অস্ট্রিয়া-রাশিয়া মৈত্রী জোটে ফাটল ধরানোর উদ্দেশ্যে। একইভাবে তুর্কিদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য গোয়েন্দা পাঠানো হয়। অটোমান সৈন্যদের বোঝানো হয় যে সম্মান হানিকর শান্তির চেয়ে যুদ্ধ শ্রেয়তর।

প্রধান উজির যখন উপলব্ধি করতে পারে যে অস্ট্রিয়া-রাশিয়া তাকে প্রতারণা করছে; তৎক্ষণাৎ এক পত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্সের মধ্যস্থতার প্রস্তাব পাঠায় প্রধান উজির। নীতিগতভাবে এই প্রস্তাব মেনে নেয়া হয়। এরই মাঝে নতুন প্রধান উজিরের অধীনে তুর্কি সেনাবাহিনী পশ্চিমে অস্ট্রীয় সীমান্তের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। এরই মাঝে আবার অস্ট্রিয়া তাদের মিত্র রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের অবনতির স্বীকার হয়, উভয়ের কোনো পরিকল্পনা তাই ফলপ্রসূ হয় না। পূর্ব দিকে অটোমান বাহিনী নিশ পুনর্দখল করে নেয়, ফলে মোরাভা উপত্যকা থেকে বেলগ্রেড পর্যন্ত পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় তাদের সামনে। অন্যদিকে রাশিয়া বাগ-এর মুখে অচাকভ্ ও কিনবার্ন দুর্গ দখল করতে পারলেও অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া সহ্য করতে না পারায় দানিয়ুবের দিকে আর অগ্রসর হতে পারেনি।

তুর্কি সেনাবাহিনীর সাফল্যের পেছনে ভূমিকা রেখেছে ফরাসি স্বধর্মত্যাগী ও ভাগ্যবান সেনা কোতে দে বোনেভাল, সুলতানের হয়ে কাজ করতে এসে বোনেভাল ইউরোপীয় লাইনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বোমাবাজিতে সিদ্ধহস্ত বাহিনী গড়ে তোলে। এছাড়াও অটোমান সেনাবাহিনীকে পুনরায় ঢেলে সাজিয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বোনেভাল।

এই বিজয়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে যায় ইউরোপ। কিন্তু অবিশ্বাসীদের প্রতি তুর্কিরা এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে যে, সেনাবাহিনী দ্বিতীয়বার যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। এবার অস্ট্রীয়রা প্রতিরক্ষা কৌশল গ্রহণ করে। তুর্কিরা সেমেন্দ্রিয়া ও অবসোভা দুর্গ দখল করে নেয়। রাশিয়া বাহিনী কৃষ্ণসাগরের পেছনে তাদের অভিযান চালিয়ে গেলে রসদ সরবরাহ ও অসুখের কবলে পড়ে সদ্য দখলকৃত অচাকভ্ ও কিনবার্ন দুর্গ খালি করে চলে যেতে বাধ্য হয়।

এ সময়ে এসে ভিলিনেয়ভ মধ্যস্থতা করতে প্রয়াসী হয়। নিজের সমস্ত সনদপত্র ও রাজা পঞ্চদশ লুইসের পত্র, "প্রিয় ও নিপুণ বন্ধু, অটোমান সম্রাট" নিয়ে সেরাগলিওতে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে ভিলিনেয়ভ। সাক্ষাৎ সময়ে নিজের চারপাশে ফরাসিদের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ আবহাওয়া টের পায় ভিলিনেয়ভ; যা পোর্তেতে আর কখনো দেখা যায়নি।

এরপর আড্রিয়ানোপলে প্রধান উজিরের সাথে মিলিত হবার জন্য যাত্রা করে ভিলিনেয়ভ। কিন্তু প্রধান উজির এ সময় সেনাবাহিনী নিয়ে নিশ্ যাত্রা করেছে। নিশ্ পৌঁছে ভিলিনেয়ভ শুনতে পায় সেনাবাহিনী বেলগ্রেডে নিশ্ অববাহিকায় ক্রোজকাতে ভীষণ যুদ্ধে রত। এখানে অস্ট্রীয় বাহিনী অরসোভা দখল করতে চাইলেও অটোমান বাহিনীর কাছে প্রভুত ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে বেলগ্রেডে পিছু হটে। অটোমান বাহিনী এই জয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। যা দেখে ভিলিনেয়ভ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সে ভালোভাবেই জানত যে রাজকুমার ইউজিন বেলগ্রেড দুর্গ দখল করার পর জার্মান প্রকৌশলীরা একে অতি আধুনিক করে তোলে, ফলে এ দুর্গ ইউরোপের শক্তিশালী দুর্গদের মাঝে একটি হয়ে উঠেছে। ভিলিনেয়ভ ভয় পেতে থাকে যে বিজয়ের আনন্দে মধ্যস্থতাকে পাশ কাটিয়ে বেলগ্রেড দুর্গ আক্রমণ করে বসলে তুর্কিরা নির্ভুল ভাবে পরাজিত হবে। প্রধান উজিরের সাথে ভিলিনেয়ভের দেখা হওয়ার আগেই এ ভয়কে সত্যি প্রমাণিত করে তুর্কিরা শহরে বোমা বর্ষণ শুরু করে দিয়েছে।

ভাগ্যক্রমে এ সময় অস্ট্রীয়দের মনোবল ভেঙে পড়েছিল। এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলো ভিলিনেয়ভ। অস্ট্রীয় সম্রাট দূত পাঠিয়ে পোর্তের সাথে মধ্যস্থতার প্রস্তাব পাঠায়। প্রধান উজির বেলগ্রেডের চাবি নিজের হাতে দাবি করে, শর্তস্বরূপ।

ভিলিনেয়ভ উভয় পক্ষের জন্য সহনশীল একটি সমাধানে এগিয়ে আসে। অস্ট্রীয়রা নিজেদের নির্মিত দুর্গ ধ্বংস করে ফেলবে; কিন্তু তুর্কি দেয়ালসমূহ অরক্ষিত থাকবে। এই শর্তে সম্রাট খানিকটা জেদ করলেও রাজি হয়ে যায়। অন্যদিকে অটোমান সাম্রাজ্য সার্বীয়া, বসনিয়া ও ওয়ালাসিয়া পুনরায় ফিরে পায়। দানিয়ুব, সাভা ও তেমেস্ভারের পার্বত্য অঞ্চল পুনরায় উভয় দেশের সীমান্ত হিসেবে স্থির হয়।

অস্ট্রীয়দের এই আত্মসমর্পণ তুর্কিদের আরেক শত্রুর জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। রাশিয়ার কমান্ডার মার্শাল মুনিক সরাসরি অটোমান ভূখণ্ডে প্রবেশের জন্য কৃষ্ণসাগর ছেড়ে যাত্রা শুরু করে দিনিয়েস্টার এবং প্রুত হয়ে মলদোভিয়া যাত্রা করে মার্শাল। এখানে কোজিম দুর্গ দখল করে নিজের পাপেট রাজকুমারকে ক্ষমতার বসায় মার্শাল। এ রাজকুমার মুসলিম আগ্রাসনের

বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের একত্রিত করে মার্শালের জন্য দরজা খুলে দেয়। এরপর বেসাবারিয়া হয়ে দক্ষিণে ঠিক তুর্কিদের ইউরোপীয় ভূমি, এমনকি ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে মনস্থির করে মার্শাল। কিন্তু অস্ট্রীয় বাহিনীর পরাজয়ের কারণে অটোমান বাহিনী ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী ও বিজয়ের আনন্দে অধিকতর উদ্যমী। মার্শাল নিজে যেমনটা লিখে গেছে, "তুর্কিদের মোহাম্মদ, ভিলিনেয়ভ ও নিপপার্গকে ধন্যবাদ দিতে দাও!"

উল্লেখ্য, নিপপার্গ ছিল অস্ট্রীয় সম্রাটের দূত।

বেলগ্রেডে পোর্তের সাথে নিজেদের চুক্তি স্বাক্ষর করা ব্যতীত আর কোনো পথ খোলা রইল না রাশিয়ার সামনে। তুর্কিরা এক্ষেত্রেও শর্ত বেঁধে দেয় যে, আজভের দুর্গ ধুলায় মিশিয়ে এর আশপাশের অঞ্চল উভয় সাম্রাজ্যের মাঝে নিরপেক্ষ, অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হবে।

ডনের নিচে, পোর্তে দুর্গ নির্মাণের অধিকার পায়। ফলে রাশিয়ার জন্য সমূদ্র যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণসাগরে কোনো ধরনের রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ বা ব্যবসায়িক জলযান প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ভবিষ্যতেও এর উপকূলে নৌবাহিনী জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা পড়ে। ক্রিমিয়া, মলদোভিয়া ও বেসাবারিয়ায় রাশিয়ার অর্জনসমূহ তুর্কিদের হাতে চলে আসে। শুধু ইউক্রেনের অঞ্চল খানিকটা সম্প্রসারিত করার সুযোগ পায় রাশিয়া। এছাড়া ফরাসি পরামর্শ মতে পোলান্ডের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাশিয়ার কোনো রকম হস্তক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পোর্তে।

এই বেলগ্রেড চুক্তি হাবর্সবুর্গের জন্য অবমাননা, রাশিয়ার জন্য হতাশা ও তুর্কিদের জন্য স্বস্তি বয়ে আনে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ক্ষয়িষ্ণু অটোমান সাম্রাজ্য খানিকটা হলেও যুদ্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। পুরোনো শত্রু অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে গর্ব পুনরুদ্ধার করে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ছিদ্রসমূহ বন্ধ করতে সমর্থ হয় অটোমান সাম্রাজ্য।

এতদসত্ত্বেও বিজয় এবং শান্তির ক্ষেত্রে কূটনীতি উভয় দিকে ফ্রান্সের দূরদর্শিতা, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাকে সম্মান জানাতেই হবে তুর্কিদের। ফ্রান্স সংকটের মুহূর্তে তুর্কিদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে; বিজয়ের সময় শান্তি আনতে আলোচনার টেবিলে একে অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শিখিয়েছে। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অটোমান সাম্রাজ্যের নতুন দিনের সূচনা হয় এর ফলে। একসময়ে অটোমান সাম্রাজ্য সমগ্র খ্রিস্টান ইউরোপের প্রভু হতে চাইত আর বর্তমানে নিজের ভূখণ্ড রক্ষা করতে সেই খ্রিস্টান ইউরোপের এক শক্তির সাথে জোটবদ্ধ হতে হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তুর্কিদের।

এসবের মাঝে ফ্রান্স অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে পোর্তের ওপর প্রভাব খাটানোর মতো সম্মান ও পদ পেয়ে যায়। ১৭৪০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধু

ও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। চব্বিশটি আর্টিকেলে বিভক্ত এ চুক্তির ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ফরাসি বাণিজ্য উত্তরোত্তর ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। এরপর ফ্রান্সের পরামর্শমতো সুইডেনের সাথে বন্ধু ও বাণিজ্য চুক্তি এবং পরবর্তীতে প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়ার হুমকির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে পৌঁছে যায় অটোমান সাম্রাজ্য। কোনো খ্রিস্টান শক্তির সাথে স্বাক্ষরিত এ ধরনের চুক্তি এটাই প্রথম হয় অটোমানদের জন্য। এরপর ল্যাটিন খ্রিস্টানদের ওপর প্রভাব খাটানোর অধিকার পেয়ে পুরো সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ফ্রান্স। ফলে পশ্চিমা শক্তি এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও সমর্থনের জন্য ফ্রান্সের দিকেই ঝুঁকে পড়ে অটোমান সাম্রাজ্য।

॥ ২৮ ॥

এক প্রজন্মের জন্য শান্তি বিরাজিত হয়েছে অটোমান সামাজ্যের ইউরোপীয় ভূ-খণ্ডে। এই সময়ে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ বেশির ভাগ ছিল যুদ্ধেরত। ১৭৪০ সালে হাবসবুর্গ সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর সাত বছরব্যাপী যুদ্ধ ও পরবর্তীতে ইউরোপে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে প্রুশিয়ান রাজা ফ্রেডেরিক।

অটোমান সাম্রাজ্যের শান্তি নির্মাতা ও রক্ষক হিসেবে ফ্রান্স, ইউরোপে তার স্বার্থরক্ষায় তুর্কিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে চলেছে। এই সময়ে এসে ফ্রান্স হাঙ্গেরিতে আক্রমণ করার জন্য তুর্কিদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু সুলতান প্রথম মাহমুদ এতে রাজি না হয়ে, বরঞ্চ খ্রিস্টান শক্তিসমূহের মাঝে শান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় আগ্রহী হয়ে ওঠে সুলতান।

ফ্রান্স পুনরায় বোনেভালের দ্বারস্থ হয়। এই আশায় যে বোনেভালের প্রভাবে পোর্তে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। কিন্তু সুলতান এবং তার মন্ত্রিপরিষদ পূর্বের মতোই অনড় থাকেন। পরবর্তী দশকে প্রুশিয়া ও সুইডেনের সাথে পোর্তের মৈত্রী জোটের প্রস্তাবেও পোর্তে তার অনড় অবস্থান থেকে এক তিল পরিমাণ জায়গা ছাড়ে না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে পোর্তের এই বিরুদ্ধতার পেছনে কাজ করেছে অস্ট্রীয় সম্রাটকন্যা মারিসা থেরেসা ও ইংল্যান্ডের মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে চিরস্থায়ী শান্তিচুক্তির প্রতিশ্রুতি।

সুলতান মাহমুদ ১৭৫৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর প্রায় সেরাগলিও'তে বড় হওয়া প্রায় মেরুদণ্ডহীন সুলতান তৃতীয় ওসমানের পর সুলতান হন তৃতীয় মুস্তাফা। এ সময় সাম্রাজ্য পরিচালনা করছিল প্রধান উজির রাগিব পাশা। কোপরুলুর মতোই দক্ষ পাশা ছিল সৎ এবং আলোকিত ধ্যান ধারণার অধিকারী। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে শিক্ষিত রাগিব নিউটনের বড় ভক্ত

ছিল। শৃঙ্খলা বজায়া রাখার জন্য রাগিব পাশা বুঝতে পারে যে বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে ঐক্য ধরে রাখা জরুরি।

বিদেশে, পোর্তের শান্তির নীতি পালনের ওপর জোর দেয় রাগিব পাশা। ১৭৬১ সালে প্রুশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে রাগিব পাশা। রাশিয়ার দ্বন্দ্বের কথা মাথায় রেখে অটোমান সেনাবাহিনীর পুনঃসংস্কারের জন্য অস্ত্রাগারকে ঢেলে সাজায় রাগিব পাশা, কামানের জন্য ঢালাই কারখানা নির্মাণ করে, সেতু নির্মাণের জন্য বাহিনী নির্মাণসহ নতুন যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের কাজ শুরু করে রাগিব পাশা। গণিত, নৌ-প্রশিক্ষণ, প্রকৌশল ও গোলন্দাজবিদ্যার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, আনাতোলিয়ার জানিসারিস, সিপাহি, অশ্বারোহী বাহিনী ও সুড়ঙ্গ নির্মাণকারী সৈন্যদের জন্য দৈনিক অনুশীলনের বাধ্যবাধকতা জারি করে রাগিব পাশা। প্রশাসনকে নতুনভাবে সুসংগঠিত করে সাম্রাজ্যের আর্থিক দিকে শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করে রাগিব পাশা। পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনাতে শস্যের সরবরাহ নিশ্চিত করে রাগিব পাশা। জনগণের কল্যাণে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মাঝে খাল নির্মাণের পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক পুনরায় কাজ শুরু করে পাশা। এসব কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে তৃতীয় মুস্তাফাকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করে প্রধান উজির।

কিন্তু সুলতান তৃতীয় মুস্তাফা চুপচাপ বসে থাকার পাত্র ছিলেন না। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, পরিশ্রমী মুস্তাফা দেশের স্বার্থে কাজ করতে ও জনগণকে নেতৃত্বদানে আগ্রহী ছিলেন। প্রথম দিকের অটোমান সুলতানদের মতো রাজ্য জয়ের তৃষ্ণা ছিল তাঁর রক্তে। কিন্তু ১৭৬৩ সালে রাগিব পাশার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুলতান তৃতীয় মুস্তাফা ব্যক্তিগতভাবে শাসন করার সুযোগ পাননি। কাকতালীয়ভাবে এ সময় সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট শত্রু হিসেবে উত্থিত হয়। তৃতীয় পিটারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সিংহাসনে বসেন সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন। ক্যাথেরিনের উচ্চাশা ছিল বসফরাসের তীরে অটোমান সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করার মাধ্যমে সারিনার মতো রাজত্ব করা।

এ উদ্দেশ্যে ১৭৬৪ সালে পোলিশ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডেরিকের সাথে মৈত্রী করে গড়ে তোলে ক্যাথেরিন। এর মাধ্যমে পোলান্ড দখল করে এর বিভক্তি ঘটায় রাশিয়া ও প্রুশিয়ার বাহিনী।

তৃতীয় মুস্তাফা রাশিয়ার এই আগ্রাসন ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁর দিওয়ানেরা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। এমনকি অটোমান সেনাবাহিনীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রথম দিকে মৌখিকভাবে বিরোধিতা করে পোর্তে। কিন্তু রাশিয়া ও প্রুশিয়ার কূটনীতিকরা এ অবস্থার অবসান ঘটবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। এ ক্ষেত্রে ক্যাথেরিন অপেক্ষা করছিল

পোলান্ড ও রশিয়ার স্বর্ণের জন্য। ফলে দিওয়ানদের গুরুত্বপূর্ণ ভোট কিনে নিতে পেরেছিল।

কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্যকে একই ভাবে আক্রমণ করার আকাঙ্ক্ষা গোপন করতে ব্যর্থ হয় সম্রাজ্ঞী। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাশিয়ার চরেরা জনগণের মাঝে মতভেদ গড়ে তোলে—মন্টিনিগ্রো, আলবেনিয়া, মলদোভিয়া, ওয়ালাসিয়া, জর্জিয়া, ক্রিমিয়া। বাগ্‌ ও ইউক্রেন সীমান্তে বেলগ্রেড চুক্তি ভঙ্গ করে দুর্গ গড়ে তোলে রাশিয়া। ফলে অটোমান তুর্কি ও তাতারদের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সবশেষ হিসেবে বাল্টাতেও পোলদের নির্বিচারে তুর্কিদের নিগ্রহ করা হয়। চুক্তি ভঙ্গের এহেন দুঃসাহসে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন সুলতান। তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণার ডাক দেয়। শুধু প্রধান উজির, মুহসীনজাদে পাশা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। নীতিগতভাবে নয়; কিন্তু তার দাবি ছিল যে সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী ও সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। পরবর্তী বসন্তের আগে কোনো সামরিক অপারেশন সম্ভব নয়। আর এ ধরনের অকারণ সাবধান বাণী রাশিয়াকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।

কিন্তু অধৈর্য সুলতান দেখতে পান যে অবশেষে তাঁর সময় এসেছে। অতি দ্রুত প্রধান উজির ও সবাইকে চাকরিচ্যুত করা হয়। নতুন প্রধান উজির হামজা পাশার মাধ্যমে রাশিয়ার কূটনীতিকদের জানানো হয়, পোলান্ড থেকে সারিনা যেন তার বাহিনী সরিয়ে নেয়। কিন্তু রাশিয়ার দূত এই চরমপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে সাত স্তম্ভের কারাগারে বন্দি করে রাশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে সুলতান। ফ্রান্স একজন প্রাচীন এবং বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে দিওয়ানকে এ ধরনের কোনো কাজের জন্য চাপ দিতে থাকে। পোর্তেতে ফরাসি কূটনীতিক দ্য ভার্জিনেসকে, ভার্লেইলেস থেকে চৌসিউল নির্দেশ পাঠায় যেন পোলান্ড ও অন্য যে কোনো জায়গায় রাশিয়ার আক্রমণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তুর্কি মন্ত্রীদের সচেতন করে তোলা হয়। এর পরিবর্তে ভার্সিনেস ভার্সেইলেসকে অটোমান সম্পর্কে অপ্রস্তুত অবস্থা অবগত করে তোলে। কিন্তু সব ধরনেই ভ্রম শীঘ্রই দূরীভূত হয়। ভার্সেইলেস থেকে ব্যারণ দে টটকে সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে পাঠানো হলে সুলতান অস্ত্র ও গোলাবারুদ পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করে ব্যারনকে। কিন্তু ইস্তাম্বুলের অস্ত্রাগারের বেহাল দশা দেখে ভীত ও বিস্মিত হয়ে ওঠে ব্যারন।

ঐতিহ্যগতভাবে যুদ্ধের চর্চা ভুলে গেছে তুর্কিরা। দুর্গ নির্মাণ, প্রশিক্ষণ, নিয়ামানুবর্তিতা—সবকিছুই শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। অযোগ্যতা সেনাবাহিনীকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তুলেছে। অজ্ঞতাই শাসন করছে দাপ্তরিক কাজে, এমনকি প্রাথমিক বিষয় ভূগোল সম্পর্কেও জ্ঞান নেই তাদের। বিশৃঙ্খলা

যুদ্ধক্ষেত্রে পচন ধরিয়েছে। সৈন্যদের অধিকাংশই যুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করছে; সামরিক দায়িত্ব ভুলে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েছে অশ্বারোহী বাহিনী; রেশনের ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ চলছে; জানিসারিসরা প্রায়ই অফিসারদের ওপর চড়াও হয় এবং পদাতিক সৈন্যবাহিনীও যুদ্ধ ময়দানে ঘোড়ায় চড়তে জোর করছে যদি না অফিসাররাও পদব্রজে যুদ্ধ করে। এভাবে বর্বর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অটোমান সেনাবাহিনী উচ্ছন্নে গেছে।

নৌবাহিনী জাহাজসমূহে রাবিগ পাশার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচীন নকশা, খারাপ মালামাল ব্যবহারের দরুন নির্মাণে ত্রুটি রয়ে গেছে। ডেকের উচ্চতা সৈন্যদের মাথায় পরিহিত পাগড়ির উচ্চতার সমান। বাতাস বইলে নিচের অংশ এতটাই পানিতে দেবে যায় যে শত্রুরা অল্প আগুন আর বিস্তর কাঠ পাবে। এই অস্ত্রাদির দায়িত্বে নিয়োজিত কমান্ডারগণ এসব ত্রুটি সম্পর্কে এমনকি ওয়াকিবহাল নয়।

প্রস্তুতির পূর্বেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সুলতান মুস্তাফার এই দুর্দান্ত আবেগের ফলে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন তাঁর বিরুদ্ধে ভিন্ন পাঁচটি সেনাবাহিনী একত্রিত করার সময় পেয়ে যায়। পশ্চিম থেকে পূর্বে দিনিয়েস্টার, ইউক্রেন, ক্রিমিয়া, ডন ও ককেশাসের মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং জর্জিয়া ও পূর্ব আনাতোলিয়ার টিফলিস অঞ্চলে জড়ো হয় এ বাহিনীসমূহ।

অটোমান সীমান্ত থেকে ক্রিমিয়ার খান, ক্রিম ঘিরাই শুধু ১৭৬৯-এর জানুয়ারিতে তীব্র শীতের মাঝে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। তার সাথে ব্যারন দে টট যোগ দেয়। তাতারের মতো পোশাক পরিধান করার পর ব্যারনকে দশটি কোরকাশান ঘোড়া দেয়া হয়। কেননা তার নিজের আরবীয় ঘোড়াটি শীত সহ্য করতে না পেরে সুস্বাদু ঝলসানো মাংসে পরিবেশিত হয়, স্মোকড এই ঘোড়ার মাংস পবিেশিত হয় ততোধিক সুস্বাদু ক্যাভিয়ারের সাথে। খানের বিশাল বাহিনী নতুন সার্বীয়ার বরফ রাজ্যের ওপর দিয়ে গিয়ে দক্ষিণ রাশিয়ায় তাণ্ডব চালিয়ে হাজারো বন্দি নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু খান এর কিছুদিন পরেই মৃত্যুবরণ করলে পোর্তের পছন্দমতো তার উত্তরসূরি তার সম্মান ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়।

একই ঘটনা ঘটে নতুন অটোমান প্রধান উজির ও প্রধান কমান্ডার মাহমুদ ইমিনের বেলাতেও। মাহমুদের নিয়োগদানের মাধ্যমে নেতা নির্বাচনে সুলতানের অদক্ষতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কোনো ধরনের সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল না তার। ১৭৬৯ সালের বসন্তে নিজের জেনারেলদের নিয়ে দানিয়ুবে সম্মেলন করে তাদের মত জানতে চায় প্রধান উজির যে, কেমন করে অভিযান পরিচালনা করা যায়। কিন্তু কোনো রূপ মতৈক্য ছাড়াই, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ব্যতীত মলদোভিয়াতে অপারেশন শুরু করে তুর্কি বাহিনী। এর সাথে যুক্ত হয়

অন্যান্য বাধা। খাদ্য সরবরাহের অভাব; পার্শ্ববর্তী ভূমিতে ডাঁশ ও মশার উপদ্রব। এর ফলে তুর্কিরা পিছু হটে, রাশিয়া বাহিনী কোজিম দখল করে মলদোভিয়া ও ওয়ালাসিয়াতে অগ্রসর হয়। অবশেষে সুলতাল প্রধান উজিরকে ইস্তাম্বুলে ডেকে নিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

এবছরেরই শেষ দিকে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন তাঁর কল্পনার অভিযানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গ্রিস আক্রমণ। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল অবিশ্বাসী তুর্কিদের হাত থেকে খ্রিস্টানদের মুক্তি দান করা। এর ফলে অবশ্যই পুরো পশ্চিমা বিশ্ব তার প্রশংসায় ভরে উঠবে। এর কিছু সময় পূর্বে রাশিয়ার অর্থডক্স গির্জা, গ্রিসে গোয়েন্দা নিয়োগের মাধ্যমে ক্রস, গসপেল, ক্যাথেরিনের ছবি প্রভৃতির মাঝে দিয়ে গ্রিকদের কাছে বিদ্রোহের সমর্থন পৌঁছে দেয়। ভৌগোলিক কোনো জ্ঞান না থাকায় তুর্কিরা এ ধরনের প্রতিবেদনে কোনো কর্ণপাত করে না। কেমন করে রাশিয়া বাল্টিক থেকে ভূমধ্যসাগরে রণপোত পাঠাবে? ভেবে অবাক হয়ে যায় অটোমানরা। জন এলফিনসটন নামে অভিজ্ঞ ইংরেজ অ্যাডমিরাল ও দুজন রাশিয়ান অ্যাডমিরালের অধীনে রণপোতবহর এসে জড়ো হয় ক্রোনস্টাড ও এর আশেপাশের বন্দরসমূহে। রাশিয়ার নৌবাহিনী ততটা উন্নত ছিল না এসময়ে। জাহাজসমূহে স্থিরতার অভাব ছিল; কামানের ঢালাই কারখানা ভালো ছিল না; নভিসদের মধ্য থেকে কর্মী নিয়োগ হয়েছে।

সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনের জাহাজ ব্রিটিশ বন্দরে উষ্ণ সম্ভাষণ লাভ করে। অ্যাডমিরালের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রসদ ও যন্ত্রপাতি, দক্ষ পাইলট ও অন্যান্য অফিসার সরবরাহ করা হয় এসব জাহাজে। ফলে ইংরেজ সাহায্য নিয়ে রাশিয়ান জলযানসমূহ পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সময়ে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতির সাথে একমত পোষণ করে ইংল্যান্ড। এই সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে সরকার পূর্ব ধারণা দেয় যে, ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার রণপোতবহরে ফ্রান্স অথবা স্পেন বাধা দিলে তা সংঘর্ষে রূপ নেবে।

ক্যাথেরিনের পছন্দের পাত্রের ভাই, কাউন্ট অরলফ যে কিনা গ্রিসের সিংহাসনে বসতে চাইত, তার নেতৃত্বে রাশিয়া সেনাবাহিনী মোরিয়া পৌঁছায়—১৭৭০-এর প্রথম দিকে। ভেনেশীয় গোয়েন্দা পূর্বেই এ অঞ্চলের গ্রিক গোত্রপ্রধানদের সাথে খ্রিস্টান জনগণ দ্বারা বিদ্রোহের জন্য গোপনে একমত হয়েছে। রাশিয়ার পতাকাতলে এর বাহিনী মানিতে অবতরণ করে। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে যেতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু অভিযানের কোনো যৌথ পরিকল্পনা না থাকায় কোনো নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় রাশিয়া বাহিনী। তুর্কিদের হাতে নির্বিচারে দমনে অভ্যস্ত ছিল এই বন্য অঞ্চল।

মোরিয়ার গভর্নর প্রাক্তন প্রধান উজির মুহসীনজাদে পাশা'র প্রতিক্রিয়া হয় শক্তিশালী। আলবেনিয়া থেকে সৈন্য আনিয়ে গ্রিক বিদ্রোহী ও বিদেশি অনুপ্রবেশকারী উভয়কে পরাজিত করে পাশা। রাশিয়ার বাহিনী পিছু হটে জাহাজে পালিয়ে যায় এবং তীরভূমিতে খ্রিস্টান বিদ্রোহীরা নির্বিচারে মৃত্যুর শিকার হয়। রাশিয়া এমন একসময়ে এ অঞ্চল ত্যাগ করে যখন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের বাৎর্ষিক উৎসব চলছিল। মুহসীনজাদে পাশা নিজের বিজয়ে "মোরিয়া বিজয়ীর" খেতাব গ্রহণ করে।

কিন্তু ভূমধ্যসাগরে রাশিয়া বাহিনী রয়ে গিয়েছিল। স্থল অভিযানের চেয়ে এরা সফলতা বেশি পেয়েছিল সমুদ্র অভিযানে। কিয়স্ প্রণালিতে অটোমান রণপোতকে পরাজিত করে সংকীর্ণ চেস্‌মিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। এখানে আটকে পড়ার পর দুটি জাহাজের আগুনে সমগ্র বহর পুড়ে ছাই হয়ে যায়—ইংরেজ লেফটেন্যান্ট ছিল একটি জাহাজে। ব্যারন দে টট পরবর্তীতে এ ঘটনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখে গেছেন, "জাহাজ, গোলাবারুদ, ছাই সব মিলিয়ে পুরো বন্দর আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়; যার ফলে তুর্কিদের পুরো নৌবাহিনী ভস্মীভূত হয়ে যায়।" লেপান্তোর যুদ্ধের পর এটিই ছিল অটোমান বহরের ওপরে সবচেয়ে বড় দুর্যোগ। এই বিজয় উদ্‌যাপন করতে সব যোদ্ধাকে "আমি সেখানে ছিলাম" অঙ্কিত মেডেল উপহার দেয় সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন। ইংরেজ অ্যাডমিরাল এরপর দার্দেনালেসে গিয়ে ভঙ্গুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে মারামারা সাগরে পৌঁছে ইস্তাম্বুলের ওপর আঘাত হানার পরামর্শ দেয়। কিন্তু তার ওপরওয়ালা অরলফ—দ্বিধায় ভুগছিল। প্রণালির প্রবেশমুখে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভাসতে ভাসতে তুর্কিদের সময় দেয় অরলফ। এই সময়ে ব্যারন দে টট ও ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা চারটি ভারী সুসজ্জিত কামান শ্রেণি (Batteries) তাক করতে সমর্থ হয়। দুটি ইউরোপের দিকে ও দুটি এশিয়ার দিকে। ফলে যে কোনো জলযান পার হতে চেষ্টা করলে তুর্কিদের ক্রসফায়ারের মুখে পড়বে।

অরলফ লেমনস্ দুর্গ অবরোধ করে। ষাট দিন পর তুর্কিরা প্রায় আত্মসমর্পণের পথে। এ সময় আলজেরিয়ার হাসান বিপুল বিক্রমে ইস্তাম্বুল থেকে রওনা হয় অবরোধ প্রতিহত করতে।

বন্দুক, পিস্তলসহ চার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের দাবি জানায় হাসান। দ্বীপের অরক্ষিত পূর্ব পাশে অবতরণ করে অবরোধকারীদের বিস্মিত করে দেয় হাসান ও তার বাহিনী। পরিখার মাঝে কেটে টুকরো হয়ে যায় তারা আর বাকি রাশিয়ার সেনাবাহিনী আতঙ্কিত হয়ে দল বেঁধে জাহাজের দিকে ছুটে চলে। এই বীরত্বের কারণে পদমর্যাদা পেয়ে প্রধান অ্যাডমিরালের পদে সম্মানিত হয় হাসান।

ইস্তাম্বুলের স্বপ্ত-চূড়া দূর্গ। সুলতান সুলেমান নিজের বিশাল সম্পত্তি এখানে রাখতেন। পরবর্তী শতাব্দী গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ অটোমান সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে পরিণত হয় এটি। যাদেরকে সুলতান অপছন্দ করতেন অথবা অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধেরত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুতগণ এখানে বন্দি থাকতেন।

অরলফের নৌবাহিনী এর পরেও কিছুদিনের জন্য ভূমধ্যসাগরে রয়ে যায়। এখানে তুর্কি জাহাজসমূহকে বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করা ছিল এদের কাজ। এছাড়া রাজধানী ও এশিয়ার অঞ্চলসমূহের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করাসহ মিশর ও সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাকগলানো হয়ে দাঁড়ায় রাশিয়ার নিত্যদিনের কাজ। আক্রের শেখের সাথে মিলিত হয়ে মামলূক প্রধান আলী বেকে পোর্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়েও সাহায্য করে অরলফ।

দামাস্কাসের পাশার বিনিময়ে সিরিয়ার একটি বড় অংশ দখল করে নেয় আলী। কিন্তু ঘরের কাছে এসে বিশ্বাসঘাতকার জেরে পরাজিত হয়, যাতে চারশ রাশিয়ার সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিদ্রোহী পাশার খণ্ডিত মস্তক ও চারশ রাশিয়ান অফিসার বন্দি হিসেবে ইস্তাম্বুলে সুলতানের সামনে পরিবেশন করা হয়।

ইতিমধ্যে রাশো-তার্কিশ সীমান্তের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধাদেবী অটোমান বাহিনীকে ছেড়ে যায়। ১৭৭০ সালে রাশিয়া বাহিনী মলদোভিয়া ও ওয়ালাসিয়া দখল করে নেয়। তুর্কি বাহিনী আতঙ্কিত হয়ে দানিয়ুবে পালিয়ে যায়। এর পর পরই নদীর উত্তরে সব তুর্কি দুর্গ রাশিয়ার হাতে চলে যায়। শুধু বেন্দারের তাতার জনগণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। দুই মাস অবরুদ্ধ থাকার পর তাতারদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রাণে বেঁচে থাকে। এভাবে দিনিস্টোর দুর্গও রাশিয়া দখল করে নেয়।

১৭৭১ সালে ক্রিমিয়াও উভয় সীমান্ত দিয়ে রাশিয়ার আক্রমণের শিকার হয়। এ অরাজক অবস্থা আরো চরম আকার ধারণ করে তুর্কি ও তাতারদের মাঝে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে। তুর্কি সরকার বন্দিদের নিয়ে যায় আর খান লজ্জাজনকভাবে কোনো প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করেই পালিয়ে যায়। তার দুই পুত্র সেন্ট পিটারসবুর্গে গিয়ে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনের সাথে জোটবদ্ধ হয়। কৃষ্ণসাগরের বেশির ভাগ উত্তরাঞ্চল—অচাকভ আর কিনবার্ন দুর্গ ব্যতীত—অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ থেকে বিচ্যূত হয়। একই সময়ে ককেশাস অঞ্চলে জর্জিয়া ও মিনগ্রেলিয়া থেকে তুর্কিদের হটিয়ে দেয় রাশিয়ার বাহিনী।

প্রতিবেশী রাশিয়ার একের পর এক বিজয় অভিযানে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া; পোর্তের সাথে শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতার ভূমিকা নিতে রাজি হয় এই দুই দেশ। কিন্তু কোনো বহিরাগতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই শুধু সুলতানের সাথেই আলোচনা করার প্রতিউত্তর দেয় ক্যাথেরিন। এরপর অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার বিপক্ষে মৈত্রী গড়ে তোলে তুর্কিরা। অন্যদিকে ১৭৭১ সালের অভিযান শেষে পোর্তের সাথে যুদ্ধ বন্ধে একমত হয়ে ফোকচানী ও বুখারেস্টে শান্তি আলোচনায় বসে রাশিয়া।

কিন্তু খ্রিস্টানদের অধীনে ক্রিমিয়াকে ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানানোয় মুফতি ও উলেমাদের কারণে আলোচনা ভেস্তে যায়। কিন্তু সুলতান মুস্তাফা ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ এ শর্তসমূহে রাজি থাকলেও ইস্তাম্বুলে উলেমা-বিদ্রোহের ভয়ে রাশিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে বছরখানেক বিরতির পর আবারো যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। মুহসীনজাদে পাশাকে প্রধান উজির হিসেবে নিয়োগ দেন সুলতান এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য।

পুনরায় সেনাবাহিনীতে প্রাণসঞ্চার ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে ১৭৭৩ সালে পুনর্গঠিত তুর্কি বাহিনী নিয়ে দানিয়ুবের দক্ষিণে জড়ো হয় মুহসীনজাদে পাশা। প্রথমে তুর্কিরা সিলিসট্রিয়া দুর্গ থেকে রাশিয়াকে হটিয়ে দেয়। এর প্রতিশোধে বাজারজিকে সাধারণ জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করে রাশিয়া বাহিনী। এরপর তাদের মতোই অতর্কিতে তুর্কিদের দেখে নিজেদের ক্যাম্পে আধা-সিদ্ধ মাংসের পাত্র রেখে পালিয়ে যায় রাশিয়ার সৈন্যরা। ইতিমধ্যে ভার্নাতেও রাশিয়ান বাহিনী আক্রমণ করলে নৌবাহিনীর সহায়তায় তুর্কিরা তাদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়।

অপ্রত্যাশিত এসব বিজয়ে উৎসাহী হয়ে তুর্কিরা ১৭৭৪ সাল থেকে শূমলাতে অবস্থিত হেডকোয়ার্টার থেকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি গ্রহণ করে। এ সময় দানিয়ুবের নিম্ন অববাহিকা দিয়ে হিরোসোভা থেকে শত্রু উৎখাতের চেষ্টা চালায় তুর্কিরা। কিন্তু এবার রাশিয়া প্রথমে আক্রমণ চালিয়ে তুর্কিদের পরাজিত করে ক্যাম্প দখল করে নেয়। ইস্তাম্বুলের সাথে শূমলার যোগাযোগ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ে।

কার্যত এই ছিল অবসান। প্রধান উজির রাশিয়ার ক্যাম্পে যুদ্ধবিরতির অনুরোধ পাঠায়। পরিবর্তে শান্তির জন্য রাজদূত পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হয় তাকে। পোর্তের সম্মতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। মাত্র সাত ঘণ্টার মাঝেই ঐকমত্যে পৌঁছায় উভয় পক্ষ। দুই বছর পূর্বে প্রত্যাখিত হওয়ার শর্ত এবারে পূর্ণ হয়। চার দিনের জন্য স্বাক্ষরে বিলম্ব করে রাশিয়া। কাকতালীয়ভাবে এ সময় ছিল প্রুত চুক্তির বার্ষিক পর্ব। ফলে পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা ধুয়ে মুছে ফেলে রাশিয়া।

নতুন চুক্তি অটোমান সাম্রাজ্যের জন্য হয় অত্যন্ত অবমাননাকর। হয়তো পূর্বে একমত হলে এতটা ভয়াবহ হতো না। রাশিয়া ক্রিমিয়াকে নিজের হাতেও রাখেনি বা তুর্কিদেরকে ফিরিয়েও দেয়নি। বরঞ্চ তাতারদেরকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য পুনর্গঠন করে। রাশিয়া বা তুর্কি হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্থানীয় রাজকুমারকে শাসন ক্ষমতা দেয়া হয়। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে অটোমান সুলতান খলিফার নেতৃত্বেই থাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়—এটি ছিল নিজ সীমান্তের বাইরে মুসলিমদের ওপর সুলতানের অধিকারের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

কৃষ্ণ সাগর ও ভূ-মধ্যসাগর ।

অন্যদিকে ক্রিমিয়ার কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ দুটি দুর্গ তাকে ক্ষমতা দেয় যখন ইচ্ছে তখন ক্রিমিয়া দখলে নেওয়ার। মোটের ওপরে এ অঞ্চলে পদধূলির মাধ্যমে কৃষ্ণসাগরে পৌঁছোতে পারবে রাশিয়ার নৌবাহিনী। যার স্বপ্ন সম্রাজ্ঞী দেখে আসছে প্রায় এক শতক পূর্ব থেকে। এটি আর কোনোমতেই খাঁটি আর নিষ্কলুষ অটোমান লেক রইল না। চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া এই জলসীমায় পুরোপুরি নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা পেয়ে গেল।

ভূমধ্যসাগরের ক্ষেত্রে গ্রিক দ্বীপপুঞ্জ থেকে রাশিয়ার নৌবহর সরিয়ে নেয়া হয়। এশিয়াতে জর্জিয়া ও মিনগ্রেলিয়া এবং ইউরোপে ওয়ালাসিয়া ও মলদোভিয়া পোর্তেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ম জুড়ে দেয়া হয়। এ অঞ্চলের খ্রিস্টান জনগণের জন্য স্বচ্ছ সরকার ব্যবস্থা ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য পোর্তেতে রাশিয়ার মন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হয়। ভবিষ্যতে খ্রিস্টান প্রজাদের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে সংঘর্ষ সৃষ্টির পথ খুলে যায় রাশিয়ার সামনে। আর বর্তমানে কোনো ধরনের কর প্রদান ব্যতীত অটোমান আইনানুযায়ী প্যালেস্টাইনের পবিত্র ভূমিতে তীর্থযাত্রী হিসেবে মুক্ত প্রবেশাধিকার পায় রাশিয়ার প্রজারা।

ভবিষ্যতে অটোমান ভূমিতে ধর্মকে কেন্দ্র করে অরাজকতা সৃষ্টিতে রাশিয়ানরা তাদের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। আর এই সময়ে নীতি বাস্তবায়নের জন্য পোর্তে-তে স্থায়ী বসবাসকারী রাশিয়ান মন্ত্রীকে অনুমতি দেন সুলতান আর রাশিয়ার সম্রাজ্ঞীকে পাদিশাহ্ উপাধি ও মর্যাদায় ভূষিত করেন।

সুলতান মুস্তাফা ছিলেন গঠনকারী মনোভাবাসম্পন্ন শাসক। নিজের শুভ ইচ্ছার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। এছাড়াও পুনঃসংস্কারের জীবাণুও ছিল তাঁর মাঝে। এই কারণে ব্যারন দে টটের কাজকর্মকে উৎসাহ দিয়েছেন সুলতান। সুলতানের প্ররোচনায় একটি গণিতের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে ব্যারন। এর মাধ্যমে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর অফিসাররা ত্রিকোমিতিতে দক্ষ হয়ে ওঠে।

কিন্তু সুলতান তৃতীয় মুস্তাফা তাঁর সাহসী পদক্ষেপসমূহের করুণ পরিণতি দেখে যেতে পারেননি। নিজের তারকার ওপর বিশ্বাস করে—"বিলম্ব বিজেতা"-সুলভ ভাগ্যকে বিশ্বাস করে (এই ছদ্মনামে তিনি কবিতা রচনা করতেন)। ১৭৭৩ সালে আবারো ব্যক্তিগতভাবে দানিয়ুব যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে জেনারেলদের হাত থেকে দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেন সুলতান। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ এতে বাদ সাধে আর উলেমা প্রস্থানে বাধা দেয়। কেননা ভীষণ অসুস্থ ছিলেন সুলতান। কার্যত বছর না ঘুরতেই কয়েক সপ্তাহ পর মৃত্যুবরণ করেন সুলতান। অটোমান সাম্রাজ্যে প্রাণসঞ্চারের মতো মহতি ইচ্ছে

পোষণ করলেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, চারিত্রিক স্থিরতা ও মানবিক এবং বস্তুগত সম্পদের অভাব ছিল সুলতানের।

এরপর প্রথম আবদুল হামিদ নামধারী মুস্তাফার ভ্রাতা সালতানাতে অভিষিক্ত হন। প্রতিটি রাজত্বের শুরুতে সাধারণভাবে জানিসারিসদের যে ভাতা দেয়া হয় সেটি দিতেও ব্যর্থ হন সুলতান হামিদ। কেননা রাজকোষ ছিল প্রায় শূন্য। বিনীত স্বভাবের সুলতান শাসক হিসেবে ছিলেন নিষ্ফল। মনোবাসনা শুভ হলেও চারিত্রিক খামতি ছিল সুলতানের। বাইশজন ছেলেমেয়ের জনক সুলতানের বেশির ভাগ সন্তান অল্প বয়সে মারা যায়। একজন যে বেঁচে থাকে ও পরবর্তীতে দ্বিতীয় মাহমুদ নামে সিংহাসনে বসেন, তাঁর রক্তে ধরে নেয়া হয় যে ফরাসি অংশ ছিল। এমিতুবাক্ দে রিভেরীর সন্তান ছিলেন মাহমুদ।

সুলতানের মন্ত্রিপরিষদ যুদ্ধের ফলে নিঃশেষিত একটি সাম্রাজ্য শাসন করে যায়। কিন্তু তেরো বছরের জন্য শান্তির সময়ও উপভোগ করে তারা। তবে এটি ছিল অনিশ্চিত একটি কাল। কেননা এ সময়ে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে তার স্বপ্নের কার্যক্রম অটোমান সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

এ উপলক্ষে হাবসবুর্গ সম্রাট জোসেফের উক্তি ছিল "নারীর নিজস্ব একটি ইচ্ছে আছে, যা কোনকিছুই দমিয়ে রাখতে পারে না।" ১৭৭৮ সালে ক্যাথেরিনের দ্বিতীয় দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই মি. ইটনের ভাষ্যানুযায়ী "তার দেখাশোনার জন্য গ্রিক নার্সদের নিয়োগ দেয়া হয়; গ্রিক ভাষার মাধ্যমে দুধ পান করত বালক কনস্টানটাইন, পরবর্তীতে গ্রিক শিক্ষক এ শিক্ষা সম্পূর্ণ করে। সংক্ষেপে তার পুরো শিক্ষাব্যবস্থা ছিল কনস্টানন্টিনোপলের সিংহাসনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য। কেউই আর সম্রাজ্ঞীর নকশা সম্পর্কে সন্দিহান রইল না।" এটি পূর্ব থেকে পরিকল্পিত ছিল যে এই বালক অস্ট্রীয় সম্রাটের সাথে সেন্ট পিটারসবার্গের হয়ে স্বাধীনভাবে বাইজেন্টাইনের ইউরোপীয় অঞ্চল শাসন করবে। এ কারণে সম্রাজ্ঞী গ্রিসের জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকে যেন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয় তারা।

এভাবে উৎসাহিত হয়ে ইপিরাস পার্বত্য অঞ্চলের গোত্রসমূহ সক্রিয় বিদ্রোহে মেতে ওঠে। তরুণ রাজকুমার বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর পর গ্রিক দূত সারিনাতে আর্জি জানায় "আমরা কখনো তোমার সম্পদ চাইনি, এখনো চাই না। আমরা শুধু পাউডার ও গুলি চাই, যা আমরা কিনতে পারব না আর যুদ্ধে নেতৃত্ব চাই।" সাহায্য নিশ্চিত হলে ক্যাথেরিনের দৌহিত্রকে গ্রিকের প্রভু হিসেবে কামনা করে তারা। বাসিলাসে কনস্টানটাইনের নিজস্ব বাসভবনে গ্রিকের সম্রাট হিসেবে সম্ভাষণ জানালে পর, তরুণ কনস্টানটাইন গ্রিক ভাষায় উত্তর দেয়—: "যাও, এবং তোমাদের ইচ্ছানুযায়ীই সব হোক।"

ইতিমধ্যে ক্রিমিয়ার সমাপ্তি রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে ক্যাথেরিন। তাতার খান ডেভলেট ঘিরাইকে রাশিয়া তার পক্ষে না পেয়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অজুহাতে ক্রিমিয়াতে সেনাবাহিনী পাঠায়। কিন্তু তুর্কিরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত না থাকায় ক্রিমিয়াকে সমর্পণে মনস্থির করে। ১৭৭৯ সালে ফ্রান্সের প্ররোচনায় রাশিয়ার সাথে এক কনভেনশনে স্বাক্ষর করে অটোমান সাম্রাজ্য। নতুন খানের নিয়োগ হয় রাশিয়ার ইচ্ছেনুযায়ী এবং মুসলিম মতে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি দেয়া হয় তাকে।

এরপর তাতার গোষ্ঠী নতুন খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে সম্রাজ্ঞীর কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানায় খান। আবারো রাশিয়ার সেনাবাহিনীর আগমন ঘটে ক্রিমিয়াতে। নির্দয়ভাবে বিদ্রোহে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ঘটে। সম্রাজ্ঞী ও তার প্রধান কমান্ডার, উপদেষ্টা ও পছন্দের মানব রাজকুমার পটেমকিন বিস্তর বিবেচনার পর বুঝতে পারে যে ক্রিমিয়া সরাসরি দখলে নেওয়ার জন্য সময় এসেছে। দূর্ভাগ্যের শিকার খানকে হুমকি ও ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে সম্রাজ্ঞী মুকুট ছিনিয়ে নেয়। এর মাধ্যমে ১৭৭৩ সালে ক্রিমিয়া, কূবান ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ রাশিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

পশ্চিমা বিশ্ব বিদ্রূপাত্মকভাবে নিশ্চিত হয় যে রাশিয়া ক্রিমিয়াতে স্বাধীনতার রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। তাতার জনগণ তাদের সীমান্তে রাশিয়া ও তুর্কিদের সাথে বিদ্যমান যুদ্ধ ও সংঘর্ষ থেকে মুক্তি লাভ করবে। এ ব্যাপারে সম্রাজ্ঞী উক্তি করে "সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছতার প্রতি ভালোবাসাস্বরূপ রাশিয়ার সেনাবাহিনী ক্রিমিয়াতে এসেছে।" কিন্তু তাতার জনগণ যখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, জেনারেল পল পটেমকিন বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ প্রায় ত্রিশ হাজার তাতারকে নির্বিচারে হত্যা করে। আরও হাজার হাজার তাতার বিদেশে পালিয়ে যায়। এছাড়াও আরো অনেকে, আর্মেনীয়ান খ্রিস্টানদের একটি বড় অংশসহ আজভ সাগর পার হতে গিয়ে ঠাণ্ডা ও অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। আর এসব কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ জেনারেলকে কৃষ্ণসাগরের প্রধান অ্যাডমিরাল পদে উন্নীত করে নতুন রাশিয়ার প্রদেশ টরিস-ক্রিমিয়া ও এর আশপাশের অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

কয়েক বছর পর অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার মাধ্যমে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন এই নতুন দক্ষিণাঞ্চল থেকে শুরু করে উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন কার্যক্রম।

এই উদ্ধত উন্নয়ন কার্যক্রম, পৃথিবীর কাছে বিজ্ঞাপন প্রচারের শামিল হয়। এছাড়াও অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহে উসকানি দিয়ে চলে রাশিয়া। যেন তুর্কিরা যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় ও পৃথিবীর সামনে তাদের আগ্রাসী ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে। কেননা ফরাসি বিদ্বান ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে সম্রাজ্ঞী

ক্যাথেরিনকে আলোকিত ও সভ্যতার উন্নতিতে উৎসর্গীকৃত হিসেবে খ্যাত করে তুলেছে। তৃতীয় মুস্তাফার বিরুদ্ধে ক্যাথেরিনের যুদ্ধকে ভলতেয়ার দেখেছেন, যৌক্তিকতাও ধর্মোন্মাদের ভেতরে যুদ্ধ হিসেবে। কোতে দে ভলনের মতে, তুর্কিরা ছিল "বসফরাসের বর্বর" এবং অজ্ঞ ও অনুন্নত এ অঞ্চলে রাশিয়ার আগমনের মাধ্যমে পারস্যে নতুন জীবন উৎসাহিত হয়ে উঠবে।

১৭৮৭ সালে পোর্তে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এদিকে আবার অস্ট্রীয় সম্রাট জোসেফ চুক্তি ভঙ্গ করে চতুরভাবে বেলগ্রেড দুর্গকে বিস্মিত করে দিয়ে, সম্রাজ্ঞীকে সমর্থন করে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে। এ সময় সমুদ্রপথে তুর্কিরা পেয়েছিল অবিসংবাদিত কমান্ডার হাসান্‌কে। প্রধান অ্যাডমিরাল হিসেবে অটোমান রণপোতকে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল হাসান। এছাড়াও সিরিয়ার বিদ্রোহী অঞ্চলের ওপর সুলতানের শাসন পুনরায় সুশৃংখলিত করেছিল হাসান। মোরিয়া ও মিশরেও বিদ্রোহীদের দমন করে হাসান।

অটোমান নৌ ও সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কায়রো থেকে ডেকে পাঠানো হয় হাসানকে। কিনবার্ন, বাগ ও দিনিয়েপারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ছিল তার লক্ষ্য। কিন্তু এখানে হাসানকে যুদ্ধ করতে হয় রাশিয়ার সে সময়কার শ্রেষ্ঠ জেনারেল সোভোরোর সাথে। নিজের বাহিনী নিয়ে পোতাশ্রয়ের প্রবেশমুখ পাহারা দিয়ে হাসানের পুরো বহর ধ্বংস করে দেয় সাভোরো। কিনবার্নের পক্ষে তাই অর্জন করে "সাভোরোর বিজয়"।

পরের বছর শীতকালে পটেমকিনের সাথে একত্রে অচাকভ দখল করে, দিনিস্টোরের মুখে তুর্কি জলযান ডুবিয়ে দিয়ে পোতাশ্রয়ের ঠাণ্ডা পানি উপেক্ষা করে ও প্রচুর গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও দুর্গের দিকে এগিয়ে যায় সোভোরো। রাশিয়ার সেনাবাহিনী নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি, তাতার অনুর্বর ভূমি ও পার্শ্ববর্তী রাশিয় গ্রামে তুর্কিদের নির্বিচার হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ শহরের কিছু নারী ও শিশু ব্যতীত প্রায় সকলকে হত্যা করে। আর এভাবে ১৭৮৮ সালের শেষ নাগাদ পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধে তুর্কিরা কার্যত পরাজিত হয়।

অস্ট্রীয় সীমান্তে তুর্কিরা অযোগ্য সম্রাট, যে কিনা নিজের বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। সে সুবাদে কিছুটা সুযোগ পায়। সন্দেহ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যখন রাতের অন্ধকারে অস্ট্রিয়া বাহিনী ভুলবশত নিজেদের বাহিনী আক্রমণ করে বসে। এর ফলে পিছু হটতে দেরি করায় তুর্কিরা তাদের নাগাল পেয়ে যায়। প্রতিরক্ষা কাঠামোতে সাজিয়ে নিজেদের চারপাশে গুলি ছুড়তে থাকে তারা। দিনের আলো ফুটতেই দেখা যায় যে নিজেদের অস্ট্রীয় কমরেডদের ওপরেই গুলি ছুড়েছে তারা। তুর্কিরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামানের দখল নিয়ে নেয়। এরপর পিছু ধাওয়া করে

এমন গ্রাম্যদেশে নিয়ে যায়, যেখানে যুদ্ধ ক্ষতি ব্যতীত রোগ-বালাই এবং পোকামাকড়ের উৎপাতে হাজার হাজার সৈন্য হারায় সম্রাট। এরপর আর কখনোই– তুর্কিদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে, যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার সাহস করেনি সম্রাট।

১৭৮৯ সালে অস্ট্রিয়ার রাজকীয় বাহিনীর নেতৃত্বে আসে মার্শাল লুডন। যার ধমনীতে ছিল স্কটিশ রক্ত। "ভদ্রলোকের মতো যুদ্ধ" তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিল বলশালী মার্শাল। অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে নতুন জীবনদানকারী মার্শাল বসনিয়া ও সার্বীয়াতে সফল অভিযান পরিচালনা করে। রাজকুমার কোর্বাগের নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী মলদোভিয়াতে পটেমকিনের রাশিয়া বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে দিনিয়েপার ও দানিয়ুব ব-দ্বীপ দখল করে নেয়।

বছরের প্রথম দিকে সুলতান আবদুল হামিদ মৃত্যুবরণ করলে অভিষেক হয় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান তৃতীয় সেলিম। সেলিম ছিলেন তরুণ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর ও দূরদর্শী। নিজের দেশের রক্ষা ও পুনঃসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। এক আজ্ঞা বলে ষোলো থেকে ষাট বছরের মধ্যবর্তী সকল মুসলিম যুবা-পুরুষকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন সেলিম। এরপর হাসানকে একই সাথে প্রধান উজির ও কৃষ্ণসাগরে নিজের যুদ্ধজাহাজ বহরের প্রধান কমান্ডার নিযুক্ত করেন। স্থলের চেয়ে জলের ব্যাপারে অভিজ্ঞ হাসান মলদোভিয়ার সীমান্তে কোবার্গকে পরাজিত করার মতো সৈন্য একত্রিত করে। কিন্তু হাসান সোভোরো-র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো শক্তিশালী ছিল না। সোভোরো মাত্র একদিনের ব্যবধানে বন্য পার্বত্যাঞ্চল পার হয়ে রাশিয়ার সেনাবাহিনী নিয়ে নাটকীয়ভাবে অস্ট্রীয়দের রক্ষায় আবির্ভূত হয়! নিজের বাহিনীকে শুধু একটাই বাক্য বলছিল বারবার, "আগে বাড়ো এবং আঘাত করো!" নিজে নেতৃত্ব দিয়ে বিলম্ব না করে সাহসের সাথে হাসান'কে রুখে দেয় সোভোরো। ফলে প্রভাতের ঘণ্টা দুয়েক পূর্বেই অটোমান ক্যাম্পে প্রচণ্ড আক্রমণ করে অস্ত্র, গোলাবারুদ, কামান দখল করে ভয়ংকর বেয়নেটের ব্যবহার করে দমন করে তুর্কি বাহিনীর। বন্দুকের ওপর ভরসা ছিল তার। যুদ্ধক্ষেত্রে তার বাণীই ছিল "বেয়নেটকে জোরো ধাক্কা দাও বল পথ হারিয়ে ফেলবে—বেয়নেট কখনো নয়। বল বোকা, বেয়নেট কখনো নয়।"

একই ভাবে সোভোরোর হাতে আরেকটি বৃহৎ অটোমান বাহিনীর পরাজয়ে ইস্তাম্বুলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এর সমাধান খুঁজতে গিয়ে যোদ্ধা হাসানের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন সুলতান। ইতিমধ্যে লুডন বেলগ্রেড শহর এবং সেমেন্দ্রিয়া দুর্গ দখল করে নেয়। কিন্তু ১৭৯০ সালে সম্রাট জোসেফের মৃত্যুর পর পরবর্তী সম্রাট লিওপোল্ড এ জায়গা ছেড়ে চলে যায়। কেননা রাশিয়ার

সাথে তুর্কিদের বিরুদ্ধে মৈত্রী জোট নিজের সাম্রাজ্যের কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না বলে মনে করত লিওপোল্ড।

১৭৯০ সালে আত্মরক্ষার খাতিরে উপকূলীয় অঞ্চল বেসাবারিয়া ও বুলগেরিয়া থেকে তুর্কিদের হটানোর প্রস্তুতি নেয় রাশিয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বাধা ছিল দানিয়ুবের খাঁড়িতে প্রবেশমুখের দুর্গ—ইসমাইল।

সোভোরো পুরো শীতকালব্যাপী অবরোধের ঝুঁকি না নিয়ে নিজের বাহিনীকে উদ্যম জোগাতে বলে ওঠে "আমার ভাইয়েরা কোয়ার্টারের চিন্তা করো না; খাদ্য মজুদ সীমিত।" রাতের দিকে শুরু হয় আক্রমণ। কিন্তু রাশিয়া বাহিনীর পিঠ ঠেকে যায় দেয়ালে। হতাশায় পর্যুদস্ত হয়ে তুর্কি বাহিনী ও সাধারণ মানুষ একত্রে রাস্তায় নেমে আসে রাশিয়া বাহিনীর প্রতিরোধ করতে। অবশেষে মধ্যাহ্নে এসে তুর্কি এবং দুর্গের তাতার বাহিনী বাজারে এসে জড়ো হয় ও দুইঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সকলে। এরপর ধ্বংসঃহয়ে যাওয়া শহরে তিন দিনব্যাপী লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে রাশিয়া।

অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয় ঠেকানোর আর কোনো উপায় থাকে না। আরো একবার সময় আসে মধ্যস্থতা করার আর এবার ইউরোপে শক্তির বিন্যাসে নতুন পরিবর্তন আসে। পুরো আঠারো শতকজুড়ে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড সমর্থন করত রাশিয়াকে। কিন্তু ফ্রান্সে বিপ্লবের সূচনা হওয়ার পর ইউরোপে ক্ষমতার কাঠামো পরিবর্তন হয় এবং রাশিয়া হয়ে ওঠে হুমকিস্বরূপ। ফলে ইংল্যান্ড, প্রুশিয়া ও হল্যান্ডের মাঝে অটোমান সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে মৈত্রী জোট গড়ে ওঠে ১৭৯০ সালে। অস্ট্রিয়া ও অটোমান সাম্রাজ্যের মাঝে স্বাক্ষরিত হয় সিসটোভা চুক্তি। রাশিয়া ও অটোমানদের মাঝে চুক্তির প্রস্তাবে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। প্রুশিয়ার রাজার উদ্দেশ্যে ক্যাথেরিন জানিয়ে দেয় "সম্রাজ্ঞী যুদ্ধ এবং শান্তি উভয়েই নিজের মর্জিমতো আনয়ন করে।" অচাকভ ও দিনিস্টোর ও বাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহ দাবি করে ক্যাথেরিন। কিন্তু ইংল্যান্ড ও প্রুশিয়া খাঁড়ির নিরাপদ আশ্রয় থেকে রাশিয়া সরাসরি কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করতে পারবে এই শঙ্কায় তুর্কিদের এ অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে রাশিয়াকে।

ইতিমধ্যে এ মধ্যস্থতাকে শক্তিশালী করার জন্য অস্ত্রের মহড়া বসায় তারা। ইংল্যান্ড বাল্টিকে পঁয়ত্রিশটি জাহাজের সমন্বয়ে একটি রণপোতবহর ও আরেকটি ছোট বহর কৃষ্ণসাগরে পাঠিয়ে দেয়। প্রুশিয়া লিভোনিয়াতে সৈন্য সমাবেশ করে কিন্তু কোনো পক্ষই ভৌগোলিক বিজয় নয়; বরঞ্চ পোর্তের নিরাপত্তার খাতিরেই চিন্তিত হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে সংসদের কাছ থেকে সাহায্যের আশায় ইংল্যান্ড রাজপিট মন্তব্য করে যে অটোমান সাম্রাজ্যের

নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে প্রুশিয়াসহ সারা ইউরোপ হুমকির মুখে পড়বে। কিন্তু হাউস অব কমনসে্ ফক্স এবং বার্ক বিরোধিতা করে। ফক্সের মতে, রাশিয়া, ইংল্যান্ডের সত্যিকার মিত্র। অন্যদিকে বার্কের মতে, "তুর্কিরা প্রকৃতই এশিয়ার অধিবাসী, যারা ইউরোপীয় বিষয় থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখেছে।" এবং শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় তুর্কিদের কোনো ভূমিকা নেই।

এছাড়াও বিরোধি পক্ষ তুর্কিদেরকে বর্বর ও সম্রাজ্ঞীকে অত্যন্ত উদার হিসেবে দাবি করে। একজন বক্তা এ বিতর্কে আরো একটু এগিয়ে ঘোষণা করে যে সম্রাজ্ঞী কনস্টান্টিনোপল দখল করে ইউরোপ থেকে তুর্কিদেরকে বিতাড়িত করলে তা মানবজাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। সরকারপ্রধান এসব বক্তব্যকে আমল না দিয়ে দুর্বল জাতির প্রতি সম্রাজ্ঞীর আচরণকে ব্যাখ্যা করে তুলে ধরে এর প্রতিহত না করা হলে ইউরোপে রাশিয়ার নৌবাহিনী আগ্রাসী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। কৃষ্ণসাগর, বসফরাস হয়ে ভূমধ্যসাগরে তাণ্ডব চালাবে তারা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সংসদ ও সাধারণ জনগণ পিটকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে তার যুদ্ধনীতি পরিবর্তন করার জন্য। যাই হোক, এত কিছু সত্ত্বেও পিট সমর্থ হন জনমনে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে যে, ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার প্রধান উপায় হলো রাশিয়া সামাজ্যকে সম্প্রসারিত হতে বাধা দেয়া ও অটোমান সাম্রাজ্যকে ক্ষয় হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা।

উভয় সীমান্তে অদক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে একের পর এক পরাজয়ে তুর্কিরাও শান্তি আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। একই ভাবে ক্যাথেরিন পোলান্ডের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভক্তিতে রাজি হয়ে ওঠে। ১৭৯১ সালে অনুষ্ঠিত আলোচনার টেবিলে দিনিস্টোরের পশ্চিমে জয় করে নেয়া সব ভূমি পরিত্যাগ করতে রাজি হয়। কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্য সফল করে দিনিয়েপার ও বাগের মধ্যবর্তী অঞ্চল লাভ করে ক্যাথেরিন। এর মাধ্যমে কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার রণপোতবহর ছিল তুর্কিদেরকে ছাড়িয়ে। এছাড়া স্থলপথে পোলান্ডের মধ্য দিয়ে আক্রমণ করতে পারবে ক্যাথেরিন। "মহতী নকশা"-র শুরু হয় ১৭৯৬ সালে। কিন্তু হঠাৎ করেই মৃত্যুবরণ করলে অটোমান সাম্রাজ্য আরো একবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়।

এরই মাঝে ইতিহাসের গতিপথ বদলাবার সময় হয়ে গেছে। পশ্চিমে শুধু নয়, পূর্বের ওপরেও পড়ে এর প্রভাব। ফরাসি বিপ্লব।

অধ্যায় ছয়

পুনঃসংস্কারকাল

॥ ২৯ ॥

১৭৮৯ সালে ঠিক ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার বছরেই তুর্কি সালতানাতে অভিষেক ঘটে তরুণ সুলতান তৃতীয় সেলিমের। তুর্ক-রাশান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নিজের সক্রিয় উদ্যোগ দিয়ে টিউলিপ যুগে শুরু হওয়া পুনঃসংস্কার কার্যক্রমের ফলপ্রসূতায় আত্মনিয়োগ করেন সুলতান।

ফরাসি বিপ্লব এসব পরিকল্পনার পালে নতুন হাওয়া জোগায়। খ্রিস্টান ইউরোপে ফরাসি গণজাগরণ শুরু হলেও সামাজিকভাবে এটি ছিল খ্রিস্ট থেকে বিছিন্ন এবং অ-ধার্মিক এমনকি চারিত্রিকভাবে অ-খ্রিস্টান। এটি ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন।

এমন একসময়ে অটোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন সেলিম, যখন সাম্রাজ্যের ক্ষয়কাল চলছে। হাঙ্গেরি, ট্রান্সসিলভ্যানিয়া, ক্রিমিয়া এবং আজভ হারালেও তুর্কিদের অধীনে ছিল বেশ বড় একটি অংশ। দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থবির থাকলেও আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের কারণে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে সাম্রাজ্য। নিজের ভূখণ্ডের ওপর সুলতানের আধিপত্য কমে যাচ্ছে স্থানীয় পাশাদের বিশ্বাসঘাতকতায়, কর ও জীবন-মৃত্যু নিয়ে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারে ও সাধারণভাবেই অযোগ্য কর্মচারীদের কল্যাণে। এর ওপরে আবার বিভিন্ন প্রদেশে আরবীয় মরুভূমিতে শক্তিশালী ওহাবিয়ারা বিদ্রোহে ইন্ধন জোগানো শুরু করেছে; সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে দ্রুজ; মিশরে মামলুক; বিভিন্ন খ্রিস্টান প্রজাদের মাঝে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি হুমকি বিদ্রোহের কারণ হিসেবে ওঠে আসছে।

এছাড়াও সাম্রাজ্যজুড়ে সামন্তবাদী ইউরোপের ন্যায় বিশৃঙ্খলা বিরাজমান রয়েছে। স্থানীয় রাজকুমারেরা উত্তরাধিকার সূত্রে গুণিতক হারে জমির মালিক হয়ে অধীনস্তদের দমন নিপীড়ন ও সুলতানকে অগ্রাহ্য করত। কৃষক ও সাধারণ জনগণের মাঝে দরিদ্রতা ও দুর্দশার অন্ত ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সমস্যার সমাধানও হয়ে পড়ে অপ্রতুল। এই পরিস্থিতির মোকাবেলা

করার জন্য অন্ততপক্ষে কেন্দ্রে পশ্চিমা ধাঁচে পুনঃসংস্কারের উদ্যোগ নেন সেলিম। এখন শুধু দেখতে হবে যে ঐতিহ্যবাহী অটোমান প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় পরিবর্তনের পথে।

রাশিয়ার সাথে শান্তি সমাপ্তির পর শুরু করা সেলিমের পুনঃসংস্কার কার্যক্রমকে সামগ্রিকভাবে নাম দেয়া হয় নিজাম-ই-জেদিদ বা দ্য নিউ অর্ডার। নতুন শৃঙ্খলা আনয়নের এ নামকরণ নেয়া হয় বিপ্লবের পর ফরাসিদের অনুকরণে।

১৭৯১ সালে দানিয়ুবের তীর থেকে সেনাবাহিনী তখনো ফিরে আসেনি, সুলতান বাইশজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সাধারণ, সামরিক এবং ধর্মীয় এমনকি এর মাঝে দুজন খ্রিস্টান কর্মচারীও ছিল; এদের নির্দেশ দেন তাঁর সম্মুখে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য। এরপর এসব প্রতিবেদন বিভিন্ন সভা ও কমিটিতে মুক্তভাবে আলোচনা করার পর, পূর্বে যা কখনো করা হয়নি—রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ধার্য করা হয়। পরবর্তী দুবছরজুড়ে এর পরিকল্পনা করে সুলতানের নতুন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এতে শুধু সামরিক নয়, নাগরিক আইন পুনঃসংস্কার করা হয়; অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়।

এতদসত্ত্বেও সামরিক পুনঃসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা থাকে সর্বাগ্রে। সুলতান বিশেষ দুজন প্রতিনিধি সরাসরি ইউরোপীয় সামরিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি, সরকার, সমাজ ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেন। ১৭৯২ সালে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সামরিক কার্যক্রম ও বিশেষ করে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সামরিক বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্ণ প্রতিবেদন সুলতানের হাতে এসে পৌঁছায়। কিন্তু সুলতার তাঁর সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও মতামত প্রদানের জন্য ফ্রান্সের দ্বারস্থ হন। প্যারিসের কাছে বিভিন্ন অফিসার ও টেকনিশিয়ানদের তালিকা পাঠিয়ে দেন সুলতান কর্মীর সন্ধানে—বস্তুত এ আবেদনের প্রথম দিককার একজন আবেদনকারী ছিল তরুণ নেপোলিয়ন বোনাপার্তে।

কামান, গোলাবারুদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পরামর্শ চাওয়া হয়—এ বিষয়ে সুলতান সেলিম নিজেও এতটা আগ্রহী ছিলেন যে সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই এর ওপরে একটি ব্যাখ্যা লিখে রেখেছিলেন। এছাড়াও অস্ত্রাগার, যন্ত্রপাতি, বন্দুকশালার উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ফরাসি পরামর্শ মেনে নেন সুলতান। পূর্বে প্রকৌশলবিদ্যার বিদ্যালয়কে আরো বিস্তৃত করা হয়। বন্দুক যুদ্ধ, দুর্গ নির্মাণ, নৌ চলাচল ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য নতুন নতুন সামরিক ও নৌ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষকদের বেশির ভাগ ছিল ফরাসি। নিজেদের উপকারের জন্য ও

সুলতানের সহায়তা ও উৎসাহে এসব ফরাসি ইউরোপীয় বইয়ের এক বিশাল পাঠাগার গড়ে তোলে ইস্তাম্বুলে। এসব বই বেশির ভাগ ছিল ফরাসি ভাষায় আর তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ফরাসি ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

এই কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে ১৭৯৫ সালে পুনরায় প্রাক্তন ফরাসি মুদ্রণ সংস্থা চালু করা হয় ইস্তাম্বুলে। প্যারিস থেকে আনা হয় কর্মচারী। এভাবে নতুন প্রজন্মের অনেকেই এসব বই ও ইউরোপীয় শিক্ষকের সংস্পর্শে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে আলোকিত হয়ে ওঠে।

এ রকম সংকটময় মুহূর্তে অটোমান সাম্রাজের রাজনৈতিক সমর্থন লাভের জন্য মিশনারি ও ইস্তাম্বুল ও অন্যান্য জায়গায় ফরাসি সম্প্রদায় তুর্কিদের সাহায্য করে চলে। এদের প্রভাবশালী একটি অংশ বিপ্লবকে সমর্থন দিয়ে, অস্ট্রীয় ও প্রুশীয় কূটনীতিকদের রাগান্বিত করে বৈপ্লবিক সভা-সমিতি করা শুরু করে। ১৭৯৩ সালে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের পতাকা উত্তোলনের এক অনুষ্ঠানে সেরাগলিও বন্দর থেকে দুটি ফরাসি জাহাজ স্যালুট প্রদান করে। অটোমান পতাকা ও আর্মেনীয়ান প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য রাষ্ট্র যারা শাসকদের সাথে হাত মেলায়নি তাদের পতাকাও উত্তোলিত হয়। এরপর শ্রদ্ধাভরে তুর্কি মাটিতে "স্বাধীনতার বৃক্ষ" রোপণ করা হয়। ফরাসিদের প্রচেষ্টায় ইস্তাম্বুলের সমাজেও পরিবর্তন আসে। মুসলিম ও ফরাসিদের মাঝে পূর্বের দূরত্ব কেটে গিয়ে তুর্কি, ভাষা ফরাসি ও ফরাসিভাষী তুর্কিদের মাঝে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। আর এভাবেই সাম্প্রতিক ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদান চলতে থাকে। যার মাধ্যমে তুর্কিদের ছোট কিন্তু প্রভাবশালী একটি অংশে বিপ্লবের চেতনা ছড়িয়ে পড়ে; পরামর্শ এবং উৎসাহের জন্য পশ্চিমামুখী হয়ে ওঠে তারা।

কিছু সময়ের জন্য সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান অংশ বিশেষ করে ইস্তাম্বুলের গ্রিক ও আর্মেনীয় অভিজাত সম্প্রদায় পশ্চিমের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সরকারের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। অটোমান অর্থনীতিতেও বিস্তর প্রভাব ছিল তাদের। সেলিমের পুনসংস্কার কাজে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় এরা পশ্চিমা বই অনুবাদে পারদর্শী হয়ে ওঠে, পশ্চিমা শিক্ষকদের জন্য তুর্কি দোভাষী হিসেবে কাজ করতে থাকে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে এদের মনোভাব ছিল নেতিবাচক।

সুলতান সেলিমের কাছে পেশকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাঝে একটিতে লেখা ছিল, "ইউরোপে দূত পাঠিয়ে ইউরোপীয় প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও আয়ত্ত করা।" এরই কারণে ১৭৯৩ সালে প্রথম সারির পাঁচটি ইউরোপীয় মিশন স্থাপন করে পোর্তে। যার প্রথমটি ছিল লন্ডনে, তৃতীয় জর্জের দরবারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেয়া হয় তুর্কি কূটনীতিকদের। সাথে আরো যাওয়ার সুযোগ পায় গ্রিক দোভাষী ও তরুণ তুর্কি

সেক্রেটারি। যার কাজ ছিল ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সমাজ সম্পর্কে জানা বিশেষ করে ফ্রান্স।

রাজনৈতিকভাবে এই প্রচেষ্টা তৎক্ষণাৎ ফলপ্রসূ না হলেও তরুণ তুর্কিদের একটি অংশ পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে সমর্থ হয়। পোর্তে ফিরে এসে সাম্রাজ্যের কাজে লাগবে এমন সব পদে অধিষ্ঠিত হয় তারা। এভাবে ইস্তাম্বুলেও বিদেশি নাগরিকদের বসবাস বেড়ে যাওয়ায় সেলিমের রাজত্বকালে ইউরোপীয় জীবনধারা অবলোকনের সুযোগ পায় অটোমান সাম্রাজ্য।

ইতিমধ্যে নতুন শৃঙ্খলা আনয়ন কর্মসূচি, বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের মোকাবেলা করা শুরু করে। প্রাদেশিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে পাশাদের ক্ষমতা কমিয়ে গভর্নরের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয় তিন বছরে। এরপর পুনরায় নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হয় এলাকার জনগণের সন্তুষ্টি। প্রাদেশিক কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আদেশ জারি হয় যে কর সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করবে রাজকীয় খাজাঞ্চিখানা। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রধান উজিরের ক্ষমতাও সীমিত করা হয়। শর্ত বেঁধে দেয়া হয় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিওয়ানের সাথে পরামর্শ করার। ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। মালিকের মৃত্যুর ফলে শূন্য জমিসমূহ সরাসরি সার্বভৌম শাসকের হাতে চলে যায়। একইভাবে এর কর আদায়ের ভার যায় রাজকীয় খাজাঞ্চিখানার হাতে।

অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে পুনর্বাসনকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। মুদ্রা সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়ে এর সত্যিকার মূল্য স্থাপন করা হয়। শস্য ব্যবসার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ জরুরি হয়ে পড়ে। দেশের আর্থিক উন্নতি অনুকূল ব্যবসা ভারসাম্যতার ওপর নির্ভর করে। এই নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে তুর্কিদের আর্থিক সহায়তায় অটোমান মার্চেন্ট ম্যারিন প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়াও খ্রিস্টানদের বদলে মুসলিমদের হাতে তুর্কি বাণিজ্যকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবও করা হয়। আর্থিক সংকট মোকাবেলার জন্য বৈদেশিক ঋণের কথা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ প্রস্তাব বিরোধিতা করা হয় এ যুক্তিতে যে কোনো খ্রিস্টান দেশ থেকে মুসলিম সরকার ঋণ গ্রহণ করলে তা হবে অবমাননাকর। অথচ ঋণ দেয়ার মতো কোনো মুসলিম দেশও নেই।

তাই পরিকল্পনা করা হয় মূল্যবান ধাতু ও পাথরের রপ্তানি বন্ধ করা হবে এবং খনিকাজে লাগানোর প্রতি উৎসাহিত করা হয় সবাইকে। এছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব উদ্যোগের কিছু কিছু বাস্তব রূপ লাভ করে।

সুলতান তৃতীয় সেলিম (১৭৮৯-১৮০৭) তুর্কিদের কাছে 'পৃথিবীর প্রভূ', ও অনুপ্রাণিত হিসেবে পরিচিত। সংস্কার প্রবর্তনের জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের রোষানলে পড়ে নিজের সিংহাসন ও জীবন হারান। এই প্রধান তৈলচিত্র ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে। এখানে কাছ থেকে সুলতানের স্বাক্ষর দেখা যায়।

কিন্তু সেলিমের নতুন শৃঙ্খলা আনয়ন সামরিক ক্ষেত্রেই বেশি কাজ করে চলে। শীঘ্রই এটি অনুধাবন করতে পারে সকলে যে কার্যকর সংস্কারের জন্য কার্যকর সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজন আর আধুনিক সেনাবাহিনী কেবল এসব শর্তসমূহ পূরণ করতে পারে। সামরিক বিদ্যালয়ের জন্য পশ্চিমা ধাঁচে সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত নিয়মিত পদাতিক বাহিনীর প্রস্তাব করা হয় সংস্কার কার্যক্রমে। দিওয়ানের অধীনে নতুন ও বিশেষ খাজাঞ্চি স্থাপন করে এর ব্যয়ভার বহনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভূমি কর, তামাক, কফি ও অন্যান্য দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ এ খাতে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এ বাহিনীর পুনসংস্কারের জন্যই নতুন শৃঙ্খলা আনয়ন কর্মসূচির উদ্ভব হয়েছে বলা চলে। এ ধরনের বৃহত্তর পরিসরে সামরিক পুনঃসংস্কারের ব্যাপারে তুর্কিরা হয়ে ওঠে দ্বিধাগ্রস্ত। প্রাচীনপন্থী যারা সাম্রাজ্যের পুরোনো সামরিক গৌরবকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উচ্চকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে, তারা প্রাচীন অটোমান সামরিক কায়দায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করে। সমঝোতায় আস্থাভাজনেরা ফ্রাঙ্কিশ পদ্ধতি আধুনিকবাদীরা, যারা বিশ্বাস করে যে পুরোনো সেনাবাহিনী সংস্কারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আর তাই এ পক্ষ সুলতানের কাছে আর্জি জানায় সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি পশ্চিমা ধাঁচে ঢেলে সাজানোর জন্য।

এদিকেই মনোনিবেশ করেছেন সুলতান সেলিম। তিনি জানতেন যে সুশৃঙ্খলিত বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী অত্যাবশ্যকীয় সাম্রাজ্যের ভেতরকার শৃঙ্খলা রক্ষা ও সংস্কার কার্যক্রমের সফলতা এবং বৈদেশিক হুমকি মোকাবেলা উভয় ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে পিটার দ্য গ্রেটের উদাহরণে মনোযোগী হয়ে ওঠেন সুলতান।

রাশিয়ার সাথে শেষ যুদ্ধের সময় প্রধান উজির ইউসুফ পাশা তুর্কি বংশোদ্ভূত রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে কর্মরত এক বন্দিকে নিয়ে আসে সুলতানের সামনে। ওমর আঘা আর তার সাথেই দুই দেশের সামরিক বিষয়াদি আলোচনা করতে প্রস্তুত হন সুলতান। আর ওমরের ছোট একটি বাহিনীর প্যারেড দেখে সুলতান বিস্মিত হয়ে ওঠেন। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর খ্রিস্টান শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব একই সাথে অস্ত্র চালনায় ও নিয়মানুবর্তিতায়। একইভাবে জানিসারিসদের এভাবে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তারা। ফলে এ পরিকল্পনার এখানেই ইতি ঘটে।

১৭৯৬ সালে ইস্তাম্বুলে আগমন ঘটে প্রখ্যাত জেনারেল অবার্ট-ডুবায়েট, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের কূটনীতিক হিসেবে। নিজের সাথে করে সুলতানের জন্য পুরস্কারস্বরূপ অবার্ট নিয়ে আসে আধুনিক সব কামানের মডেল ও বেশ কিছুসংখ্যক ফরাসি প্রকৌশলী ও কামান বিশারদ। এই যৌথ প্রচেষ্টায় তুর্কি

অস্ত্রের নির্মাণ, সজ্জাকরণ ও ভূমিকাতে প্রভুত উন্নতি ঘটে। এছাড়াও জানিসারিসও সিপাহিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সাথে নিয়ে আসে ফরাসি পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর সামরিক সার্জেন্টদের। কিন্তু জানিসারিসরা ফরাসি পদাতিকদের অস্ত্র বহনে বা শিক্ষা নিতে প্রত্যাখ্যান করলে ফরাসি সার্জেন্টদের হাতে শুধু ওমর আঘার ছোট্ট বাহিনীকে শিক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকে। এ বাহিনীর নামকরণ হয় তোপিজি।

সবকিছু বলা এবং করার পরেও তুর্কিদের একটি গোষ্ঠীই কেবল সুলতানের শৃঙ্খলা আনয়ণ কর্মসূচি ও ফরাসি বিপ্লবের চেতনাকে সমর্থন জানায়। সরকারের মাঝে প্রতিক্রিয়াশীলদের একটি বড় অংশ বিপ্লবকে তুর্কিদের কোনো বিষয় নয় বরঞ্চ বর্বর পশ্চিমা খ্রিস্টানদের আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু এ বিষয়ে পরোক্ষ মত ওঠে আসে সুলতানের সেক্রেটারি আহমেদ ইফেনদির লেখনীতে, ১৭৯২-এর জানুয়ারিতে ইফেনদি, প্রকাশ করে ' "ঈশ্বর ফ্রান্সের বিশাল উত্তরণকে সিফিলিসের মতো ছড়িয়ে দিন তুর্কি সাম্রাজ্যের শত্রুদের ওপর; সজোরে নিক্ষেপ করুন একে অন্যের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে আর এর ফলাফল সাম্রাজ্যের মঙ্গল বয়ে আনুক। আমিন।" নিজের অংশে সুলতান সেলিম এ যুদ্ধের ব্যাপারে পরিষ্কার ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া স্বদেশে গৃহীত সংস্কারকাজে বাধাই আনবে শুধু।

কিন্তু যুদ্ধ হয়ে ওঠে অনিবার্য। ফ্রান্সে নেপোলিয়নের উন্মেষ ঘটায় সেলিমের শান্তিবাদী ধারণার বাস্তব রূপ ঘটার কোনো আশা থাকে না। বোনাপার্টের রাজ্য বিস্তৃতির উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাত থেকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনো ভাবেই অটোমান সাম্রাজ্যের বাঁচার উপায় থাকে না। ১৭৯৭ সালে ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মাঝে Treaty of Campo Formio স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে ভেনেশীয় প্রজাতন্ত্র খণ্ডিত রূপ লাভ করে। এরপর Directory of the revolutionary government-এর লেখা অনুযায়ী নেপোলিয়ন মনস্থির করেন, "পূর্বে ফরাসি শক্তির প্রতিষ্ঠা করা" অর্থাৎ অনেকটা ইংল্যান্ডের সাথে সংঘর্ষে জড়ানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

কিন্তু নেপোলিয়ন রাশিয়ার জার আলেকজান্ডারের ন্যায় অটোমান সাম্রাজ্যকে ভেঙে ফেলার চেষ্টায় রত হননি। নেপোলিয়নের চোখে এ সাম্রাজ্য ইতিমধ্যে নিজেদের কারণেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। Directory- তে যেমন লিখে গেছেন, "আমাদের সময়কালেই এর পতন দেখতে পারব।"

এর পরিবর্তে ফ্রান্স সীমান্তের মাঝে বাণিজ্যিক, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও ধর্মীয় দিকে মনেযোগী হয়ে ওঠে নেপোলিয়ন।

তূলনে নেপোলিয়ন এত বড় সেনা ও নৌবাহিনীর সমাবেশ ঘটান যা দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। প্রথমে এটি ধারণা করা হয় যে সেনাবাহিনীর নকশা

এমন ভাবে হয়েছে যেন ইংল্যান্ড আক্রমণ করা যায়। কিন্তু ১৭৯৮ সালের এপ্রিলে পূর্ব দিকে যাত্রা করার পর পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে এটি মিশনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে "শৃঙ্খলা" রচনায় নেপোলিয়ন দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন "প্রাচ্যের সব দখল থেকে ইংলিশদের মুক্ত করতে হবে; যেখানে নেপোলিয়ন পৌঁছাতে পারবেন এবং লোহিত সাগরে তাদের সব স্টেশন ধ্বংস করে দিতে হবে। সুয়েজের ইস্থমুস থেকে খনন করে এ সাগরে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের মুক্ত এবং একচ্ছত্র অধিকার কায়েমের জন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।" আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপসারণ করা।

সেন্ট জনের নাইটদের হাত থেকে মাল্টা'কে অবরোধ ও সংযুক্ত শেষে আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদ্রতটে অবতরণ করেন নেপোলিয়ন ও তাঁর বাহিনী।

এরপর সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ক্রুসেডের পর প্রথম কোনো খ্রিস্টান বাহিনী মিশরে অনুপ্রবেশ করলে সচেতন হয়ে ওঠে মিশর। এখানে ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন পিরামিডের যুদ্ধে মামলুকদের পরাজিত করেন। এরপর অরাজকতা থেকে "ত্রাণকর্তা" হিসেবে কায়রো দখল করে নেন। তুর্কিরা নয়, মামলুকরা ছিল তাঁর প্রধান শত্রু।

এভাবে খানিকটা সন্দিহান অবস্থার পর পোর্তে, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের সাথে একত্রিত হয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। ফরাসি কূটনীতিককের সেভেন টাওয়ারে ও ফরাসি প্রজাদের কিছু অংশকে অন্যান্য কয়েদখানায় আটক করা হয়। অন্যদিকে লেভান্তের বন্দরে ফরাসি নৌবাহিনী মুসলিম প্রশাসকদের দিয়ে ফরাসি বণিকদের আটক করায়। ইতিমধ্যে রাশান রণপোত কৃষ্ণসাগর হয়ে বসফরাসে পৌঁছে গেলে সুলতান ব্যক্তিগতভাবে এ বহর পরিদর্শন করে স্বাগত জানান। এরপর আরো এগিয়ে এ যুদ্ধজাহাজ তুর্কি নৌবহরের সাথে একত্রে ভূমধ্যসাগরে যাত্রা করে।

নেপোলিয়ন দ্বিতীয়বারের মতো মিথ্যা ভ্রমের কবলে পড়েন। নিজের রণপোত বহরের শক্তি সম্পর্কে গর্ববোধ করতেন তিনি। আকার সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে এর ক্ষমতা ও কৌশল যোগ্যতা নিয়ে অতিরঞ্জিত চিন্তা করেন নেপোলিয়ন। ছোট কিন্তু শক্তিশালী ইংরেজ রণপোত, লর্ড নেলসন, নেপলস্ থেকে পিছু ধাওয়া করেও নেপোলিয়নকে বাধা দিতে পারেনি—এভাবে সম্ভবত আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণ ঠেকাতে না পারলেও, আবোকির বে-তে ফরাসি রণপোতের নাগাল পেয়ে যায় ইংরেজ লর্ড নেলসন মাত্র দুটি জাহাজ কোনোমতে পালিয়ে যেতে পারলেও পরবর্তিতে তাদেরও দখল করে ইংরেজরা। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী এভাবে তাই মিশরে অসহায় অবস্থায় অবরুদ্ধ হয়, ঘরে ফেরার কোনো উপায় থাকে না।

১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন ঘরে ফেরার পরিবর্তে সানকেন রণপোত ও মামলুকদের মধ্য থেকে নিয়োগের মাধ্যমে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করে। নিজের বাহিনী নিয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন আরবীয় প্রদেশের দিকে অগ্রসর হয়ে গর্বের সাথে নেপোলিয়ন ঘোষণা করে বসেন যে মধ্য গ্রীষ্মের মাঝেই তাঁর বাহিনী ইউফ্রেটিসে পৌঁছে যাবে এবং শরতে ভারতে পৌঁছাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। জাফা ও গাজা দখল করে সেন্ট জ্যা ডি' আক্রের দিকে অগ্রসর হয় নেপোলিয়ন। এর প্রশাসক "কসাই" হিসেবে খ্যাত আহমেদ ডিজেজার পাশা নিজের আলবেনীয় ও বসনীয় বাহিনী নিয়ে খোদ সুলতানের জন্যই ছিল হুমকিস্বরূপ। নিজের সিরিয়ার বাহিনী নিয়ে পাশা প্রস্তুত হয় নেপোলিয়নকে প্রতিরোধ করতে।

দু'মাসব্যাপী আক্রে অবরোধ করে রাখে নেপোলিয়ন। সমুদ্রে ইংরেজ বাহিনীর জন্য আবারো তা বাধাগ্রস্ত হয়। ইংরেজ অ্যাডমিরাল স্যার সিডনি স্মিথ নিজের স্কোয়াড্রন নিয়ে ফরাসি ছোট জাহাজ বহর, যা কামান ও গোল াবারুদ বহন করছিল, বাধা দেয়। প্রথমে নিজের জাহাজ থেকে মেরিন ও বন্দুকবাজদের পাঠিয়ে পরবর্তীতে তুর্কি বাহিনীর সহায়তা পায় স্যার সিডনি। সুলতান সেলিমের নতুন এ বাহিনী ছিল বন্দুক ও বেয়নেট সুপ্রশিক্ষিত। দামাস্কাসের বড় একটি বাহিনীকে পরাজিত করলেও আক্রে দখলে ব্যর্থ নেপোলিয়ন বলে উঠেন, "এই দুর্গে পূর্বের ভাগ্য লুকিয়ে আছে"। ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে মরুভূমি হয়ে মিশরে চলে যেতে বাধ্য হন নেপোলিয়ন।

এখানে দ্বিতীয় অটোমান সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয় নেপোলিয়ন। আবোকির যুদ্ধে বেয়নেটের আঘাতে জর্জরিত তুর্কিদের বাধ্য করে নেপোলিয়ন সমুদ্রে পালিয়ে যেতে। আর এ বন্দরের পানিতে পাগড়ি উঠানামা করতে থাকে; কেননা হাজারে হাজারে তুর্কি সেনা পানিতে ডুবে যায়। মামলুকে নেপোলিয়ন তাঁর হৃত সম্মান ফিরে পেলেও ধন্যবাদ ব্রিটিশ নৌ-শক্তিকে। কেননা পূর্বে সাম্রাজ্য বিস্তৃতির তাঁর সংক্ষিপ্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। গোপনে নিজের স্টাফদের নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে যায় নেপোলিয়ন। এরপর নিজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দিক বদলে পশ্চিমের দিকে তাক করেন ও Directory ছুড়ে ফেলে নিজেকে প্রথম কনস্যুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

দুই বছর পরে অ্যাংলো, তার্কিশ বাহিনী জেনারেল স্যার রালফ্ অ্যাবারক্রোমব্রি নেতৃত্বে মিশরে অবতরণ করে বিপথগামী ফরাসি বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিতে। ফলে ১৮০২ সালে Threaty of Amiens স্বাক্ষরিত হয়। মিশর এবং অন্যান্য ভূখণ্ডের ওপর সুলতানের অধিকার স্বীকৃত হয় ও পাশাদের পরিবর্তে মামলুকদের দায়িত্ব দেয়া হয়। মিশর থেকে ইংরেজ বাহিনীও চলে যায়।

কিন্তু নেপোলিয়নের কারণে লোহিত সাগর ও এর আশপাশে ব্রিটেন নতুন নীতি প্রণয়ন করে। ব্রিটেন পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে যে যদি ভারতকে মিশর আক্রমণ করে তাহলে ভারতও মিশরকে আক্রমণ করবে। একই ভাবে অন্যান্য অটোমান সীমানার উপকূলেও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। পারস্য উপসাগরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওমান থেকে ফরাসিদের বিতাড়িত করে। এছাড়াও বাগদাদে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসরাতে "তুর্কি আরবীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক দূত" হিসেবে ব্রিটিশ কনস্যুল কাজ শুরু করে। আর এভাবেই নেপোলিয়নের ব্যর্থতায় উৎসাহ জুগিয়ে ব্রিটিশ সফলতা বেড়ে চলে।

স্বল্প সময়ের জন্য অ্যামিয়েন চুক্তি অনুযায়ী আইয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ওপর ফ্রান্স তার মালিকানা তুলে নেয় ও রাশো-তার্কিশদের হাতে ছেড়ে দেয়। পোর্তের নিযুক্ত চতুর প্রশাসক আলী পাশা, নিজের বাহিনী নিয়ে বেশ কিছু প্রতিবেশী গোত্রকে উৎখাত করে—এদের মাঝে খ্রিস্টান বিদ্রোহী সুলিয়টরাও ছিল। এভাবে ইপিরাসের পশ্চাদভূমি ও নিম্ন আলবেনিয়ার ওপর স্বায়ত্তশাসন কায়েম করে আলী পাশা।

পোর্তে ফরাসি বন্দিদেরকে মুক্তি দিয়ে, ফরাসি সম্পদ পুনরায় ফিরিয়ে দেয়। ফরাসিদের শর্তাধীন আত্মসমপর্ণ পুনরায় নবায়ন করে কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্য ও নৌ-চলাচলের অধিকার দেয়া হয়। আর এর ফলে ফরাসি বণিকদের তৎপরতায় চিন্তিত হয়ে ওঠে রাশিয়া ও ব্রিটেন। তিন বছরের ব্যবধানে ইস্তাম্বুলে ফরাসি সম্মান পুনরায় ফিরে আসে। এ অবস্থার আরো উন্নতি ঘটে মিশরে নেপোলিয়নের বাহিনীর সহিষ্ণুতা ও সফলতায়। পূর্বের মতোই উভয়ের মিত্রতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নতুন ফরাসি কূটনীতিক পোর্তেতে তার দেশের হৃত প্রভাব ফিরিয়ে আনতে ওঠে পড়ে লেগে যায়। একই ভাবে প্যারিসে নতুন অটোমান কূটনীতিক ফরাসি সব কিছুতে নিজের আগ্রহ লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়।

সুলতান বিদেশিদের কাছ থেকে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সার্বীয়ার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে। এ অঞ্চলে জানিসারিসরা অরাজকতা সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অবাধ্য হয়ে ওঠে। বেলগ্রেডের প্রাদেশিক গভর্নরকে হত্যা করে দেশটিকে চারজন প্রধানের অধীনে বিভক্ত করে দেয় জানিসারিসরা। সিপাহিদের ভূমি দখল করে; রায়াদের দমন-নিপীড়ন শুরু করে রায়ারা। খ্রিস্টান কৃষক সম্প্রদায় দূত পাঠিয়ে ইস্তাম্বুলের কাছে আবেদন জানায়। তারা প্রার্থনা জানায় "এসো আমাদেরকে এসব দুষ্ট লোকদের হাতে থেকে মুক্ত করুন; আর যদি তা না পারেন, তাহলে অন্তত জানিয়ে দিন, যাতে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে পর্বতে, জঙ্গলে অথবা নদীতে পালিয়ে গিয়ে এই দুদর্শামর অস্তিত্বের সমাপ্তি টানতে পারব কিনা।"

কিন্তু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সুলতানের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নিজের শক্তির অভাব। জানিসারিসদের হুমকি দিয়ে শুধু খ্রিস্টানদের নির্বিচারে হত্যায় ইন্ধন জোগান সুলতান। তাই এরপর তিনি স্থানীয় সিপাহি যাদের উচ্ছেদ করেছিল জানিসারিসরা, বসনিয়ার পাশার অধীনে বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী ও অল্পসংখ্যক তুর্কি ও মুসলিমদের মাধ্যমে জানিসারিসদের বিরুদ্ধে সার্বীয়দের বিদ্রোহে সমর্থন প্রদান করেন সুলতান। মুসলিম প্রভুর হয়ে এই খ্রিস্টান কৃষক সমাজ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। জানিসারিসদের সমর্থন দেয় ভিদিনের পাশা ও শহরের ধর্মান্ধ মুসলিম অংশ। কিন্তু এরা সকলেই পরাজিত হয় ও তাদের স্বৈরশাসন সমূলে উৎপাটিত হয়, যখন খ্রিস্টান বিদ্রোহীরা সার্বীয় ক্যাম্পে চারজন মৃত জানিসারিস প্রধানের খণ্ডিত মস্তক প্রদর্শন করে। পুরো সার্বীয়া চলে যায় সার্বীয়দের হাতে, শুধু বেলগ্রেড ও অন্যান্য কিছু দুর্গে সুলতানের সেনাবাহিনী রয়ে যায়।

উদ্দেশ্য পূরণের পর সুলতান খ্রিস্টান রায়াদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে নিজ নিজ খামার ও পশুপালনে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু বিজয়ের ফলে সার্বীয়দের মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে, যা সহজে দমিত হয় না। প্রায় বিশ বছর পূর্বে অস্ট্রীয় সম্রাটের অধীনে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সার্বীয়ার মাঝে এক ধরনের যুদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। যা দেখে বিস্মিত হয়ে তুর্কি কমিশনার এক অস্ট্রীয় কমিশনারকে প্রশ্ন করেছিল "তোমরা আমাদের রায়াদেরকে কী বানিয়ে দিয়েছো?" এরপর সাথে সাথে সার্বীয় সেনাবাহিনী বাতিল করা হয়।

সুলতানের নিজস্ব স্বার্থে তারা ব্যবহৃত হয়েছে বুঝতে পেরে এখন সার্বীয়রা স্বায়ত্তশাসন দাবি করে বসে। নিজেদের নির্বাচিত প্রধান "কারা জর্জ" অথবা কালো জর্জের, যে কিনা জানিসারিসদের বিরুদ্ধে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল সার্বীয়দের, উৎসাহে রাশিয়ার কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। জার, পোর্তের কাছে তাদের দাবি উত্থাপনের পরামর্শ দেয়। ফলে এভাবে সার্বীয়রা সুলতানের কাছে দূত পাঠিয়ে কর মওকুফ ও বেলগ্রেড এবং এর আশপাশের দুর্গ ত্যাগের দাবি জানায়।

কিন্তু এতে দিওয়ানের মুসলিমরা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ও সুলতানও প্রত্যাখ্যান করেন। এছাড়াও সার্বীয় প্রতিনিধিকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দান করেন। এরপর তিনটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করে প্রাক্তন সার্বীয় মিত্রদের প্রশমিত করার চেষ্টা করেন সুলতান। কিন্তু অবিসংবাদী কারা জর্জের কল্যাণে এসব বাহিনীর সকলেই পরাজিত হয়। এমনকি অবশেষে বেলগ্রেড ও অন্যান্য দুর্গ থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করতেও সক্ষম হয় কারা জর্জ। আর এভাবেই অটোমান শাসনের হাত থেকে সার্বীয়দের জন্য জাদুকরী স্বাধীনতা এনে দিয়ে ইতিহাসের

পাতায় ঠাঁই করে নেয় কারা জর্জ। জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের প্রভাতলগ্নে প্রথম বলকান খ্রিস্টান সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

ইস্তাম্বুলের জন্য এ সময়টা ছিল কূটনীতির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮০৫ সালে রাশিয়া ও ইংল্যান্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুর্কি সমর্থনের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। এদিকে নেপোলিয়ন Treaty of Amiens স্বাক্ষরের পরেও পূর্ব থেকে নিজের দৃষ্টি সরাননি। ফ্রাঙ্কোইস সেবাসটিয়ানির অধীনে লেভান্তে মিশন পাঠায় নেপোলিয়ন। একদা যাজক হিসেবে কাজ করা সেবাসটিয়ানি পরবর্তীতে সৈনিক ও কূটনীতিক হিসেবে প্রশংসা পায়। প্রত্যক্ষভাবে ফরাসিদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা তার উদ্দেশ্য হলেও পরোক্ষভাবে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ফরাসি অভিযানে মনস্থির করেন নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে নিজেকে ঘোষণার পর সেবাসটিয়ানি পোর্তে-তে কূটনীতিক হয়ে আসে। এখানে তুর্কি বাহিনীকে রাশিয়াতে আক্রমণের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের বিজয়ে এ দাবি আরো জোরালো হয়। ১৮০৫ সালে Treaty of Pressburg-এর মাধ্যমে ক্রোয়েশিয়া ও ডালমাটিয়া অর্জনের মাধ্যমে অটোমান সাম্রাজ্যের সরাসরি সংস্পর্শে চলে আসে ফ্রান্স ভূখণ্ড। এর মাধ্যমে সীমান্তে নেপোলিয়ন বাহিনী গড়ে তোলে। যা প্রয়োজন অনুসারে তুর্কিদেরকে আক্রমণ বা সমর্থন উভয়ই করতে পারবে। ফরাসি বাহিনী এহেন বিজয়ে উল্লসিত হয়ে নেপোলিয়নকে ফরাসি সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতিদানের পাশাপাশি কূটনীতিক পাঠিয়ে নিজের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও মিত্রতার প্রদর্শন করেন সুলতান সেলিম। এর উত্তরে নেপোলিয়ন নিজের কূটনীতিকের মাধ্যমে উত্তরে জানান "অটোমানদের সাথে যাই হোক, ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, তা ফ্রান্সের জন্যও ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যই হবে।"

কিন্তু সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়নকে সুলতানের স্বীকৃতিদানের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে বসে ব্রিটিশ এবং রাশিয়ার কূটনীতিকদ্বয়।

একইভাবে রাশিয়াও তুর্কিদের সমর্থন দাবি করে প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষা মৈত্রী জোটের জন্য। আরো এগিয়ে গিয়ে জার অটোমান সাম্রাজ্যের অর্থডক্স খ্রিস্টানদের রক্ষাকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দাবি করে সুলতানের কাছে। এছাড়াও তাদের রাশীয় কূটনীতিকের ক্ষমতা প্রদান ও দাবি করে বসলে সুলতান সেলিমের মুসলমানসুলভ অহংকার পদদলিত হয়। সেবাসটিয়ানির পরামর্শে ওয়ালাসিয়া ও মলদোভিয়া থেকে জারের দূতদের পদচ্যুত করেন সুলতান। চুক্তি ভঙ্গের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রাশিয়া; একই ভাবে ব্রিটেন। এভাবে পোর্তের প্রতি সংকেত দেয়া হয় যে এক পক্ষের সামরিক ও অপর পক্ষের নৌবাহিনী "নতুন তাড়না লাভ করতে পারে"।

একজন তোপিজি, সুলতানের ফরাসি প্রশিক্ষিত গোলন্দাজদের একজন।

সুলতান শান্তি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে ক্রোধ প্রশমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু রাশিয়ার সেনাবাহিনী কোনোরূপ যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতীত মলদোভিয়া ও ওয়ালাসিয়ায় অগ্রসর হয়ে তৎপরতার সাথে দানিয়ুবের দিকে এগিয়ে যায়। পোর্তের সেনাবাহিনী ব্রিটিশ কূটনীতিকের হুমকির কাছে মাথানত না করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে।

এভাবে ১৮০৭ সালে অ্যাডমিরাল ডুকওয়ার্থের নেতৃত্বে ব্রিটিশ রণতরী দার্দেনালেস হয়ে মারমারা সাগরে যাত্রা করে। পোর্তের কাছে চরমপত্র পেশ করে ডুকওয়ার্থ। অটোমান রণতরীর সমর্পণ দাবি করে নচেৎ এটি পুড়িয়ে দিয়ে ইস্তাম্বুলে গোলাবর্ষণ করবে ব্রিটিশ নৌবাহিনী। ব্রিটিশ মন্ত্রী ও তার অ্যাডমিরালের সাথে দশ দিনব্যাপী হয় আলোচনা বৈঠক। এই সুযোগে সুলতান নিজের রণতরীকে কামানের রেঞ্জের বাইরে নিয়ে যান ও সেবাসটিয়ানির যে কিনা সেরাগলিওর বাগানেই নিজের তাঁবু গেড়েছে, সহায়তায় শহরের দুর্গ রক্ষায় কামানশ্রেণী মজবুত করা হয়। এছাড়া তার সামরিক প্রকৌশলীর দার্দেনালেসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও জোরদার করে তোলে।

অ্যাডমিরাল ডুকওয়ার্থ নিজের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। সমাপ্তি সুরে বুঝতে পারে যে বোমাবর্ষণ করলে নিজের রণতরীও সমস্যায় পড়বে। নোঙ্গর উঠিয়ে দার্দেনালেস দিয়ে ফিরে যায় ডুকওয়ার্থ। এক্ষেত্রে সেবাসটিয়ানির কামান মেরামতের তরিৎ কর্ম ধন্যবাদের যোগ্য। প্রাচীন বিশাল কামানের গোলা বর্ষিত হয় ডুকওয়ার্থের জাহাজে। একশ পাউন্ড ওজনের আগুনে গোলার আঘাতে দুটি জাহাজ হারায় ডুকওয়ার্থ। ইতিমধ্যে প্রণালির প্রতিরক্ষার জন্য পাঁচশো গোলন্দাজ এনে ফরাসি মিত্রতার ঘোষণা করে সুলতান সেলিম।

ডুকওয়ার্থের মতো আরেকটি নিষ্ফল নৌ-অভিযান হয় মাল্টা থেকে মিশরের বিরুদ্ধে। এতে আশা করা হয়েছিল যে মামলুকদের সহায়তায় দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। কেননা মেসিডোনিয়া থেকে আগত আলবেনীয় মাহমুদ আলী নিজেকে কায়রোর প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ফিরে এসেছে। নেপোলিয়নের সাথে একই বছরে জন্মগ্রহণ করা মাহমুদ আবোকির যুদ্ধে লড়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। মিশরের পাশা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে এই মাহমুদ আলী।

মাহমুদ আলী আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ব্রিটিশ বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে চতুরতার সাথে উৎখাতের জন্য আলোচনা শুরু করে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ নৌ ও সামরিক বাহিনীকে ভূমধ্যসাগরে রসদ সরবরাহের শর্তে নিজের এবং তার উর্বর প্রদেশের সুবিধা আদায় করে নেয় মাহমুদ। এভাবেই সুলতানের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে মিশরে স্বায়ত্তশাসন কায়েমের লক্ষ্যে শাসকের উদ্ভব হয়।

রাশিয়ার সাথে দানিয়ুব সীমান্তে যুদ্ধ চলছিল ঢিমেতালে। নেপোলিয়নের দিকে দৃষ্টি থাকায় তুর্কি বা রাশিয়া কোনো বাহিনী নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা ঢেলে দিতে বাধাগ্রস্ত হয়। সীমান্তে সুলতান জানিসারিসদের অনুপস্থিতিতে তোপিজিদের নিয়োগ দান করেন। ওমর আঘার ছোট্ট বাহিনীকে আরো দুটো রেজিমেন্টে উন্নীত করে অস্ত্র প্রদানের মাধ্যমে ফরাসি ধাঁচে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সুলতান।

১৮০৫ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্যসংখ্যা কমে যাওয়া সুলতান এক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সাধারণ জনগণ ও জানিসারিসদের মাঝে তরুণ ও শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় সীমান্তের যুদ্ধে। যদিও জানিসারিসরা বেলগ্রেডে পর্যুদস্ত হয়েছিল—কিন্তু রায়াদের কল্যাণে অন্যান্য প্রদেশে এখনো হিংস্র উপস্থিতি আছে তাদের। আড্রিয়ানোপলে সুলতানের আদেশ অমান্য করে তারা। এ নির্দেশ বলবতের দায়িত্বে থাকা অফিসারকে হত্যা করা হয়। কারামানিয়ার পাশার অধীনে সুলতানকে সমর্থন জানানো বিশাল বাহিনীও দানিয়ুবের যুদ্ধ মঞ্চে জানিসারিসদের হাতে পরাজিত হয়।

এর ফলে ইস্তাম্বুলে জানিসারিসরাও বিদ্রোহী হয়ে উঠলে দিওয়ান ও উলেমাদের মাঝে থেকে প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের সমর্থণ জানায়। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের এই মুহূর্তে রাজধানীতেও গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহের আশঙ্কায় সুলতান বাধ্য হন প্রধান উজিরের অফিসে জানিসারিসদের আঘাকে নিয়োগদানে।

কিন্তু ১৮০৭ সালে গ্রীষ্মের শুরুতে বসফরাসে কামান শ্রেণীর দায়িত্বে থাকা ইয়ামাকদের নির্দেশ দেয়া হয় ইউরোপীয় ধাঁচে ইউনিফর্ম ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হতে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ইস্তাম্বুলের হিপোড্রোমে অগ্রসর হয় তারা; এখানে আরো হাজারো জানিসারিস তাদের সাথে মিলিত হয়। একজন অধস্তন গভর্নর মুসা পাশা, যে কিনা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কুখ্যাত ছিল ও প্রধান মুফতির সহায়তায় ট্রাইব্যুনাল বসায় বিদ্রোহীরা। এ বিচার সভায় সংস্কারকর্মে সুলতানকে সমর্থন প্রদানকারী মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের বিচার করা হয় ও ইস্তাম্বুলের জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা হয়।

তাদেরকে ঘিরে অনেককেই হত্যা করা হয়। আর সতেরোজন সংস্কারবাদীর খণ্ডিত মস্তক বিদ্রোহে উৎসাহদাতাদের সামনে প্রদর্শন করা হয়।

দুভার্গ্যক্রমে সুলতানের শুরুর দিকে মৃত্যুবরণ করে আর উলেমাদের বেশির ভাগ সুলতানের সংস্কার কাজের বিরোধি ছিল। তাই বিদ্রোহীদের শক্তির সামনে নত হয়ে সংস্কারকাজের ইতি টানেন সুলতান। কিন্তু সিংহাসন রক্ষায় অনেক দেরি করে ফেলেছেন সুলতান। জানিসারিস অফিসারদের প্রতিনিধিবর্গ পাঠিয়ে প্রধান মুফতি ঘোষণা করে যে, "যেহেতু সুলতান মুসলমানদের মাঝে অবিশ্বাসীদের আদব-কায়দার প্রচলন করছেন এবং জানিসারিসদের দমন-

নিপীড়ন করছেন, আইন এবং নবীজির সতিকার প্রতিপালক" হিসেবে মুসলিম ভূখণ্ড ও ওসমান হাউজের স্বার্থে সুলতানকে পদচ্যুত হতে হবে। এক ফতোয়া জারির মাধ্যমে এ পদচ্যুতি'কে স্বীকৃতি দিয়ে বিদ্রোহী নেতাকে বসফরাসের দুর্গের দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর খাঁচাসূলভ সেরাগলিও প্রাসাদে অবসর গ্রহণ করে সেলিম নিজের তরুণ চাচাতো ভ্রাতা মুস্তাফাকে সুলতান হিসেবে রাজ্যভার অর্পণ করে পরামর্শ দেন বেশি পরিবর্তনের পথে না যেতে আর নিজের তুলনায় সফল শাসনকালের শুভেচ্ছাও পৌঁছে দেন ভ্রাতার কাছে। এরপর বিষপানের চেষ্টা করে মুস্তাফা, সেলিমের মুখের কাছ থেকে কাপ ছুড়ে ফেলে তাঁর জীবন রক্ষার শপথ করে। এভাবে যাত্রা শুরু হয় সুলতান চতুর্থ মুস্তাফার।

কিন্তু মাত্র কয়েক মাস শাসন করতে সমর্থ হন তিনি। সেলিমের বন্ধু এবং সমর্থক ছিল বেশ কিছু। বিশেষ ভাবে মুস্তাফা বায়রাকদার দানিয়ুবের রাস্তুকের স্বাধীন পাশা। সংস্কারবাদী হিসেবে সেলিমের গুণগ্রাহী মুস্তাফা তাঁকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তির ফলে নিজের সেনাবাহিনী ও আড্রিয়ানোপলের বিশ্বস্ত প্রধান উজিরের বাহিনী নিয়ে একত্রে নবীজির চিহ্ন বহন করে ইস্তাম্বুলে যাত্রা করে মুস্তাফা।

তার উদ্দেশ্য ছিল জানিসারিসদের ভয় দেখিয়ে বশীভূত করে প্রাসাদ দখল করা; মুস্তাফাকে সিংহাসনচ্যূত করে সেলিমকে পুনর্বহাল করা।" সত্যিকার সুলতান সেলিম"-এর সাথে দেখা করতে চাইলে প্রাসাদ দ্বাররক্ষকদের বাধায় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুস্তাফা বাহিনী। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিলম্ব হয়ে দাঁড়ায় অভিশাপ। এই দাবির মুখে সুলতান মুস্তাফা তৎক্ষণাৎ সেলিম ও তাঁর ভাই মাহমুদকে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে ওসমান হাউজে একমাত্র জীবিত থাকবেন মুস্তাফা।

হত্যাকারীরা ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে সেলিমকে মেরে ফেলে ও তাঁর দেহ ভেতর উঠানে পৌঁছে যাওয়া বায়রাকদারের সামনে প্রদর্শন করা হয়। এরপর আলবেনীয়দের সহায়তায় মুস্তাফাকে সিংহাসন থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে আনে বায়রাকদার। ইতিমধ্যে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহায়তায় স্নানঘরের অগ্নিকুন্ডের মাঝে লুকিয়ে পড়ে মাহমুদ। এখানে বিজয়ী আলবেনীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে রাতের পূর্বেই সেরাগলিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে চতুর্থ মুস্তাফা পদচ্যুত হয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেছেন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ।

মুস্তাফা বায়রাকদার প্রধান উজির নিযুক্ত হয়। গুপ্তঘাতকদের হত্যা করে, মুস্তাফার প্রিয় পাত্র ও ইয়ামাক বিদ্রোহের প্রধানকে হত্যার পর সেলিমের শুরু করা সংস্কারকাজ এগিয়ে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে মুস্তাফা বায়রাকদার। নতুন শৃঙ্খলায় ইউরোপীয় প্রশিক্ষণে সেনাবাহিনী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে প্রধান

উজির। বিভিন্ন সংস্কার নীতিকে পুনরায় শুরু করে। ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন আনে প্রধান উজির। এর অন্যতম নির্দিষ্ট একটি ছিল দীর্ঘদিনের অপব্যবহার রোধকরণের জন্য জানিসারিসদের বাহিনীকে ঢেলে সাজানো। প্রথমবারের মতো সাম্রাজ্যের সব অংশ থেকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজকীয় প্রাসাদে।

স্বতঃস্ফূর্ত বিতর্কের শেষে সরকারের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে করে আইন ও নাগরিক বিষয়ে সবার দায়িত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নিজের ক্ষমতার প্রতি হুমকি আসবে ভেবে সুলতান মাহমুদ এদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। উলেমা ও জানিসারিসরা চুপচাপ সহ্য করে যায় ও প্রধান উজির নিজের আলবেনীয় ও বসনিয়ার বাহিনীকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠায়।

জানিসারিসরা আবারো বিদ্রোহে খেপে ওঠে। বায়রাকদারকে তার প্রাসাদে আক্রমণ করা হয়। আগুন লাগিয়ে দেয়া ও বায়রাকদার পালিয়ে গেছে এমন একটি টাওয়ার জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়া হয়। এভাবে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায় প্রধান উজির। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী অবশেষে বিজয় লাভ করে। পুরাতন বিশৃঙ্খল অবস্থা পূর্বের মতোই শক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুলতান তৃতীয় সেলিমের সংস্কারকাজ কিছুদিনের জন্য মুলতবি হয়ে যায়। অটোমান সুলতানদের মাঝে একাকী সেলিম সাম্রাজ্যের আমূল সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইসলামের ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে পূর্বদিকে যা করে গেছেন সুলতান সুলেমান আড়াইশ বছর পূর্বে, সেলিম ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমে তাই করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অটোমান সাম্রাজ্যকে পশ্চিমা সভ্যতার পথে পরিচালনায় একাগ্র হলেও নিজের জনগণের চরিত্র সম্পর্কেই অন্ধ রয়ে গিয়েছিলেন সুলতান সেলিম। জনগণের কল্যাণ চাইলেও পূর্বপুরুষদের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন সুলতান; আর এভাবে তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হন সুলতান। অন্যদিকে অবিবেচনা ও পশ্চিমা ধ্যান ধারণার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহবশত নিজের কর্মচারীদের মাঝে সংস্কারবিরোধিদের কুসংস্কারের আগুনে ঘি ঢেলে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শক্ত করে তোলেন সুলতান।

স্পষ্টভাবে বলতে গেলে সেলিমের ব্যর্থতা নিহিত আছে একটি রূঢ় সত্যের মাঝে। তিনি একটি অসম্ভব উদ্যোগ নিয়েছিলেন অটোমান ইতিহাসের এই পর্যায়ে এসে এক আঘাতেই ঐতিহ্যবাহী সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চেয়েছেন সুলতান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য এখনো একগুঁয়ে ও অমলিন রয়ে গেছে। নিজের সাম্রাজ্যে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সেলিমের প্রয়োজন ছিল মৌলিক কাঠামোতে পুনরায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঢেলে সাজানো, যেন সিদ্ধান্তসমূহ সহজেই কার্যকর

করা সম্ভব হয়। মোটের ওপর একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সুলতান হিসেবে সব কিছুর ওপর সীমাবদ্ধতা কায়েম করা। কিন্তু সেলিম এমনটা ছিলেন না ও তাঁর সময়ে এ রকম একটি উদ্দেশ্য সহজে অর্জিত হওয়ার মতো ছিল না। একমাত্র যা করতে পারতেন তিনি তা হলো পুরোনো প্রক্রিয়া নতুন ধারণার অবতারণা করা। এখানেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

সেলিমের পুনঃসংস্কার নীতিতে ক্ষুদ্র অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, যারা পূর্বতন সংস্কার টিউলিপ যুগ থেকে সামান্য এগিয়ে গেছে। এর বাইরে বিশাল ও শক্তিশালী অংশে ছিল সেনাবাহিনী, দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র ও উলেমা, যিনি কিনা ইসলামের কণ্ঠ হিসেবে সুলেমানের সংস্কারের সুবিধা ভোগ করছেন। আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষায় এরা বড় ভূমিকা পালন করছে।

কিন্তু গুণগত ভাবে এরা অধঃপাতে নেমে গিয়ে পার্থিব স্বার্থরক্ষায় ক্ষমতার অপব্যবহারে মেতে ওঠে। ঘুষ আদান-প্রদান, ভালো মুদ্রা তৈরি, ধর্মীয় ফাউন্ডেশনসমূহের যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ, নিচু স্তরে ও কর্মচারীরা একই কাজে প্রবৃত্ত হয়। জানিসারিসরাও যেমন বাণিজ্যিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এদের প্রতিটি গোষ্ঠী যে কোনো পরিবর্তনে অনেক কিছু হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে। তাই প্রাচীন স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে প্রভাব এবং সম্পদ ও এতে বেঁচে যাবার প্রেরণা থাকে।

এমন একটি দেশ যেখানে শিল্প এখনো নবজাতক শিশু এবং বাণিজ্য বেশির ভাগই বিদেশিদের হাতে, সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক এমন কোন বাধা ছিল না, যা ফরাসি বিপ্লবের ন্যায় কোনো বিপ্লবে ইন্ধন জোগাতে পারে। তাই সংস্কারবাদীদের ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর পেছনে কোনো চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী ছিল না।

তাই ধন্যবাদ ফরাসিমুখী নীতিসমূহকে; এই ছিল সুলতান তৃতীয় সেলিমের ভাগ্য। যদিও তাঁর সংস্কারকর্মসমূহ ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু তিনি নতুন এবং পশ্চিমের আলোকিত ধারণার দিকে চালিত একটি আন্দোলনের সূচনা করে গেছেন। তাঁর সময়ের পরে ইসলামের দুর্গে আঘাত হানাটাই ভাগ্যলিপি হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীজুড়ে ধীরে ধীরে এর দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ছোট্ট একটি প্রবাহ দ্রুতগতির বন্যায় রূপ নেয়। ঘটনাক্রমে এই অপরিচিত মাটিতে ফরাসি বিপ্লবের মূল চেতনা, স্বাধীনতা ইসলামের ভেতরের বৈধ ধারণা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে; সমতা প্রথম দিকে ইসলামের মাঝে নিমজ্জিত সমাজসেবায় ঐতিহ্যবাহী হিসেবে এর কিছুটা কম গুরুত্ব ছিল ও ভ্রাতৃত্ব অটোমান সাম্রাজ্যজুড়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়ে; নিজেদের শিকড় গড়ে তোলে।

॥ ৩০ ॥

ওসমান রাজবংশের একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী হিসেবে দ্বিতীয় মাহমুদ সংস্কারবাদী সুলতান হিসেবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। নিজের শতকের অরাজকতা সত্ত্বেও মাহমুদ সুলতান বিজয়ী বীর দ্বিতীয় মাহমুদ ও আইনপ্রণেতা সুলতান সুলেমানের মতোই যোগ্য ছিলেন ও সমান কাতারের সম্মান অর্জন করেছিলেন। অটোমান সাম্রাজ্যের পিটার দ্য গ্রেট ছিলেন সুলতান মাহমুদ। মাহমুদের মাতা ফরাসি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও তিনি নিজে কোনো বিদেশি ভাষা জানতেন না। এছাড়া প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক শিক্ষার জন্য পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার সাথে কোনো প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ না থাকলেও সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ উজ্জীবিত হয়েছেন সুলতান তৃতীয় সেলিম দ্বারা। তাই ধৈর্যের সাথে টিকে থেকে প্রায় দুই দশক কেটে যাওয়ার পর মাহমুদ সমর্থ হন সাম্রাজ্যের সংস্কারকাজের জন্য সালতানাতে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার।

এই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে তাঁর শক্তি নিঃশেষিত হয় রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে। নেপোলিয়ন অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত ছিলেন। তাই রাশিয়ার জার আলেকজান্ডারের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলেন। ১৮০৭ সালে জারের ইংরেজ মিত্রর বিরুদ্ধে রাশিয়া ও ফ্রান্স ইউরোপে ডিভিশন গড়ে তোলে। গোপনে অটোমান সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড করার পরিকল্পনায় মেতে ওঠে দুই পরাশক্তি ফ্রান্স ও রাশিয়া। অটোমান সাম্রাজ্য মূলত এশিয়া ভূখণ্ডে কেন্দ্রীভূত ছিল। পূর্ব বলকান ইউরোপ রাশিয়া দাবি করে ও ফ্রান্স, আলবেনিয়া, গ্রিস, ক্রিট ও দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপসমূহ নেওয়ার পরিকল্পনা করে। যদি রাশিয়া ও তুরস্কের দ্বন্দ্ব অবসানে তুর্কিরা ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় রাজি না হয়, তাহলে ফ্রান্স রাশিয়ার সাথে একই উদ্দেশ্যে শামিল হবে। “ইউরোপকে বিরক্তিকর তুর্কিদের” হাত থেকে রক্ষা করা। পোর্তে ফ্রান্সের প্ররোচনায় শান্তির শর্ত ব্যতীত রাশিয়ার সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করলেও দুই বছর পরে পুনরায় দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়।

এরই মাঝে চতুর্থ মুস্তাফার হত্যাকাণ্ড ও সন্তানহীন দ্বিতীয় মাহমুদ সিংহাসনে আসলে আশার আলো দেখতে পায় রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার। তাই কনস্টান্টিনোপল ও দার্দেনালেস দাবি করার ঝুঁকি নিয়ে বসে জার। গোপন চুক্তিতে এ অঞ্চল এখনো কারো মাঝে ভাগাভাগি হয়নি। এ ধরনের মনোবাসনা ঠেকাতে নেপোলিয়ন সেন্ট পিটারসবুর্গে কূটনীতিকের মাধ্যমে আলেকজান্ডারকে রাজি করানোর চেষ্টা করতে থাকে।

ফরাসি কূটনীতিক প্রস্তাব করে যে শহর এবং প্রণালির তীরভূমি স্বাধীন অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু রাশিয়া গ্রিক অর্থডক্স গির্জার কারণেও

প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিকভাবে পূর্বের সাম্রাজ্য হিসেবে কনস্টান্টিনোপল দাবি করে। অন্যদিকে ফ্রান্স দার্দেনালেস ও এর উপকূল অঞ্চল দাবি করে বসে বিনিময়ে। কিন্তু কৃষ্ণ সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মাঝে ফ্রান্সকে কোনো প্রবেশপথ দিতে দ্বিমত পোষণ করে রাশিয়া।

ফলাফলস্বরূপ অটোমান সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করে ফ্রাঙ্কো-রাশান যৌথ অংশীদারত্বে শাসন করার নেপোলিয়নের অলীক স্বপ্ন ভেস্তে যায়। পদ্ধতি পরিবর্তন করে তাই ১৮০৮ সালে পোর্তের বিরুদ্ধে পুনরায় রাশিয়ার সাথে মৈত্রী জোটে আবদ্ধ হয় ফ্রান্স। এর মাধ্যমে ব্রিটেনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও মলদোভিয়া ও ওয়ালাসিয়া থেকে রাশিয়ার বাহিনী অপসারণের দাবি করে নেপোলিয়ন। এতে ইংরেজদের প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায় থাকেন তিনি।

দানিয়ুবের ভূখণ্ডের ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণের শঙ্কায় সচেতন হয়ে অস্ট্রীয় সম্রাট এবার তুরস্ক-ইংল্যান্ডের মাঝে মধ্যস্থতা করতে ওঠে পড়ে লেগে যায়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এই লক্ষ্য অর্জিত হয় ১৮০৯ সালে Treaty of Dardenelles-এর মাধ্যমে। এর মাধ্যমে আবারো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে রাশিয়া ও তুর্কি বাহিনী। প্রধান উজির শূমলা ক্যাম্প থেকে প্রতিরোধ করে রাশিয়া বাহিনীর। এরপর বলকান পার্বত্যাঞ্চলে পার হতেও ব্যর্থ হয় রাশিয়া। কিন্তু এরপর বসনিয়ার বাহিনীর প্রতিরোধ সত্ত্বেও রাস্তুক দখল করে নেয় জার বাহিনী।

১৮১১ সালে নেপোলিয়নের সাথে মৈত্রী জোট ভেঙে গেলে, পশ্চিমে ফ্রান্সের আক্রমণ প্রত্যাশা করে রাশিয়া। এ আক্রমণ প্রতিহত করতে দানিয়ুব সীমান্তে প্রতিরক্ষা বূহ্য গড়ে তোলে জার। এ সময়ে পোর্তের সাথে শান্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে রাশিয়ার। তাই ১৮১২ সালের গ্রীষ্মে, নেপোলিয়ন অগ্রসর হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বুখারেস্টে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে প্রুতকে রাশিয়া ও অটোমান সাম্রাজ্যের সীমানা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। মলদোভিয়া ও ওয়ালাসিয়া সুলতানকে ফিরিয়ে দিলেও দানিয়ুবে প্রবেশের জন্য বেসাবারিয়া রেখে দেয়।

বিলম্বে হলেও নেপোলিয়ন পুনরায় পোর্তের বন্ধুত্ব কামনা করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আর্জি জানান সুলতানের কাছে। এর বিনিময়ে মলদোভিয়া, ওয়ালাসিয়ার নিরাপত্তাসহ ক্রিমিয়া ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও ব্রিটেনের চাপে পড়ে রাশিয়ার সাথে শান্তি আনতে মনস্থির করে। এছাড়া নেপোলিয়নে পূর্বপরিকল্পনা যার লক্ষ্য ছিল অটোমান সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করা, টের পেয়ে বিশ্বাস হারায় সুলতান।

বালক সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮-৩৯)। প্রধান তৈলচিত্র ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে।

বুখারেস্ট চুক্তিতে ক্ষতির সম্মুখীন হয় সার্বীয়া। তাদের বিদ্রোহের রাজনৈতিক অপরাধীদের ক্ষমা বা মুক্তি প্রদান করা হয়। তবে বেলগ্রেড ও অন্যান্য দুর্গ সুলতানকে ফিরিয়ে দেয়া হয় ও সার্বীয়দের তৈরি দুর্গ ভেঙে ফেলা হয়। এর পরই নেপোলিয়নের পতনের পর তুর্কিরা আবারো সার্বীয়াকে প্রজা রাষ্ট্রে পরিণত করে।

নেপোলিয়ন এবং আলেকজান্ডার যে সাম্রাজ্যকে ভেঙে টুকরো করতে চেয়েছিল, তা তাদের নিজেদের চেয়েও শতায়ু হয়। কিন্তু মাহমুদের সময় থেকেই এর অঙ্গচ্ছেদের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম হিসেবে আসে গ্রিসের নাম। ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে গ্রিসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম দিকে সাংস্কৃতিক গণজাগরণ থাকলেও ফরাসি বিপ্লবের লিবারেল দার্শনিকদের কাছ থেকে ধ্যান-ধারণা এসে পৌঁছায় গ্রিসে। এছাড়াও সুলতান তৃতীয় সেলিমের আমলে গ্রিকদের মাঝে তুর্কিদের মতোই আলোকিত জ্ঞানের হাওয়া এসে লাগে। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি, ধনী-গ্রিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিক ইতিহাসচর্চা ও বিদেশে গ্রিক ভাষায় পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে এ চর্চা এগিয়ে চলে।

এর মাঝেই লুকায়িত ছিল গ্রিক স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের স্পৃহা। পশ্চিমের গ্রিকরা পোর্তের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত গ্রিক, ইস্তাম্বুলে গ্রিক বণিকগোষ্ঠী সকলেই এই ধারাকে আরো এগিয়ে নেয়। সালোনিকা, স্মূর্নাসহ গ্রিক দ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপ বিশেষত কিয়স্ কার্যত নিজেদের দ্বারাই শাসিত হতো। এছাড়া তিনটি নটিক্যাল দ্বীপ হিদরা, স্পেটসাই ও সারার নাবিকদের জাহাজ ও মালামালের অংশীদারত্ব ভোগ করত। এছাড়াও এ দ্বীপসমূহ ছিল ভবিষ্যৎ গ্রিক রণতরীর সূতিকাগার। এভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক গ্রিক পশ্চিমের সাথে প্রত্যক্ষ ও নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে অটোমান প্রশাসন জনগণকে দমন-নিপীড়নমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ধারণ করত। নিরাপত্তা বা সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কর সংগ্রহে ব্যস্ত থাকত তারা। অনেক সময় দুর্নীতিপরায়ণ পাশা অবিচার চাপিয়ে দিত। এছাড়াও সম্পত্তির মালিকানা টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মান্তরিত হওয়া গ্রিক জমিদাররাও গ্রাম ও শহরের প্রধানেরা তুর্কি প্রশাসনের হয়ে কর সংগ্রহ করত ও অটোমান প্রভুদের পদ্ধতি অনুসরণ করত। এর ফলে নিজেদের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে দমন-নিপীড়ন করত তারা।

এছাড়াও গ্রিক যাজক সম্প্রদায় ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। তাই আইনজ্ঞ, জমিদার এবং স্থানীয় অফিসার সকলে নিজ নিজ স্বার্থে কোনোরূপ জাতীয়তাবাদী চেতনা বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিল। আর তাই গ্রিক ভাষা ও ধর্ম ব্যতীত জাতির পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পেতে বিলম্ব ঘটতে থাকে।

সময়ের প্রবহমানতায় যখন এমনটা ঘটে, গ্রিক জনগণ তখন দুইভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমে ছিল ক্লিফেটস্, তুর্কি প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে পার্বত্যঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো, ডাকাতি ও রাহাজানি করা বন্য ও আইনের ঊর্ধ্বে থাকা গোষ্ঠী। অটোমান স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তারা। গ্রিক জাতীয়তাবাদী কারণের জন্য দ্রেশপ্রেম গড়ে ওঠে এদের মদদ দেয়া বিদ্রোহে। ক্রিট এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের পাশে মোরিয়া, ইফিরাস ও রুমেলির পার্বত্যাঞ্চলে বিভক্ত ছিল এদের কার্যক্রম। এসব প্রধানেরাই পরবর্তীতে বিপ্লবের রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়। এদের বিরুদ্ধে একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় আমার্তোলিকে অস্ত্র সরবরাহ করত তুর্কিরা। কিন্তু প্রায়ই এরা তাদের পক্ষ নিত।

সমুদ্রেও এদের শক্তিশালী মিত্র ছিল। যারা বিভিন্ন দ্বীপ ও উপকূলে জলদস্যুতা করত। উভয় পক্ষই উদাহরণ ও অভিজ্ঞতার জন্য ব্রিটিশ অভিযানের ওপর আস্থা রেখেছিল। ১৮১৪ সালে ব্রিটিশ সেনা ও নৌবাহিনী নেপোলিয়নের কাছ থেকে আইয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়। এই দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলিত হলে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়। গ্রিসের মূল ভূখণ্ডজুড়ে বয়ে যায় বিপ্লবের হাওয়া।

কিন্তু সফলতার জন্য পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনে ছিল। গ্রিস এবং বিদেশে নিজেদের বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করে গ্রিক বণিক সম্প্রদায়। এর চালক ছিল "বন্ধুত্বের সমাজ" নামে একটি সংস্থা। ১৭৭০ সালের রাশিয়ার সহায়তার তুর্কিদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ গ্রিক আন্দোলনের ফসল এই সংস্থা। এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন গ্রিক জাতীয় কবি রিগাস ফেরা ইয়স্। বাস্তব নয় বরং কবিতার ছত্রচ্ছায়ায় খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহের স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে একক গ্রিসের স্বাধীনতা শুধু নয় বহুজাতিক বলকান ফেডারেশনের স্বপ্ন দেখেছিলেন রিগাস। কল্পনা করেছিলেন গ্রীকের মুক্তির জন্য সার্ব, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও আলবেনিয়াবাসী খ্রিস্টানরাও একত্রে তরবারি হাতে তুলে নেবে। এ লক্ষ্যে কারা জর্জ ও প্রথম খ্রিস্টান বিদ্রোহী নেতা একত্রে উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু রিগাসের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তুর্কিরা এর সমাপ্তি টানে। যাই হোক ১৮১৪ সালে গ্রীসে এবং রাশিয়াতে এর পুনর্জাগরণ ঘটে। ওডেসার তিনজন বণিক এর সংগঠক ছিল। এথেন্সে গ্রিক সাহিত্য সভার মাধ্যমে তুর্কিদের সন্দেহ উদ্রেগ না করে শিক্ষিত গ্রিকেরা এর চর্চা শুরু করে।

এই সমিতির কার্যক্রম ধীরে ধীরে সাহসী হয়ে ওঠে। তুর্কি সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশে ও এশিয়া মাইনরের শহরসমূহে এদের প্রতিনিধি ছড়িয়ে পড়ে। এদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও প্ররোচনায় বলকান সম্প্রদায়সমূহের মাঝে রাজদ্রোহের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর সদস্যদের মাঝে রাশিয়ার অফিসাররাও

ছিল। গোপনে জারের মদদপুষ্ট কনস্যুলার প্রতিনিধি যে কোনো ধরনের আন্দোলনে সামরিক সমর্থনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফলে গ্রিকরা নির্ভরতার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে।

এই সমিতির প্রধান হওয়ার জন্য সেন্ট পিটারসবুর্গে জারের দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীতে প্রভাবশালী ও সম্মানীয় কাউন্ট জন কাপোদিস্ট্রিয়াকে প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু জন প্রত্যাখ্যান করলে আলেকজান্ডার ইপসিলানটিসকে এ প্রস্তাব ও নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। ১৮২০ সালে General Commissioner of Supreme Autority পদে নিয়োগ দেয়া হয় তাকে।

উত্তরে বিদ্রোহ শুরু করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইপসিলানটিস অভিযানের আগ্রহে অজ্ঞতার বশে প্রুত বরাবর মিশ্র বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। কিন্তু জনসাধারণ ও এতদসম্পর্কিত বিষয়ে তার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। রুমানিয়া ও গ্রিক খ্রিস্টানদের মাঝে একতার ওপর নির্ভর করেছিল ইপসিলানটিস। কার্যত যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। মলদোভিয়া স্বাগত জানালেও ওয়ালাসিয়া কোনোরূপ সমর্থন করেনি তাকে। এখানে স্থানীয় একটি বিদ্রোহ জানিয়ে দেয় "গ্রিস গ্রিকদের জন্য, রোমানিয়া রোমানদের জন্য।" জার সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত করেন ইপসিলানটিসকে। বুখারেস্টে তুর্কি বাহিনী তার পবিত্র বাহিনীকে।" ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ইপসিলানটিস্ নিজে অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে গেলে সম্রাট বন্দি করে তাকে। এর মাধ্যমে দানিয়ুবে গ্রিক প্রশাসন খারিজ করে রুমানিয়ার স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

এতদসত্ত্বেও গ্রিক স্বাধীনতা জন্ম লাভ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের মাধ্যমে। জাতিকে নেতৃত্ব দিতে সামনে এসে দাঁড়ায় বিভিন্ন গ্রিক নেতারা। এদের মাঝে ইপসিলানটিসের ভাই দিমিত্রিও ছিল। ১৮২১ সালের ২৫ মার্চ বিদ্রোহ শুরু হয়।

ঠিক সময় মতোই শুরু হয়েছিল বিদ্রোহ। এই সময়ে কোনো রূপ গ্রিক বিপদের আশঙ্কা না করেই সুলতান মাহমুদ, আলী পাশাকে ইপিরাস থেকে অপসারণের কাজ শুরু করে। আলী নিজের আলবেনীয় সেনাবাহিনী নিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮১৯ সালে আড্রিয়াটিকের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর পার্গা দখল করে নেয় আলী। পরের বছর আলীর ব্যক্তিগত শত্রু ইস্তাম্বুলের নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে গেলে সুলতান এই ইসমাইলকে রাজগৃহাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। দুজন ভাড়াটে গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে ইসমাইলকে হত্যা করে আলী। কিন্তু ব্যর্থ হলে সুলতান শত্রু বিনাশের অজুহাত পেয়ে যান। আলীকে সরকারিভাবে বিদ্রোহী ঘোষণা করে পাশালিক দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে ইসমাইলকে পাশা হিসেবে নিযুক্ত করে তার অধীনে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সুলতান মোরিয়া থেকে নিষ্ঠুর কমান্ডার খিরশিদ পাশাকে এ দায়িত্ব শেষ করতে ডেকে পাঠান।

অবশেষে পরাজিত হয় আলী। তার এবং তার তিন পুত্র ও পৌত্রের খণ্ডিত মস্তক ইস্তাম্বুলে সুলতানের কাছে পেশ করা হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মোরিয়ার দুর্গসমূহের প্রতিরক্ষা নাজুক থাকায় গ্রিক বিদ্রোহীরা দখল করে নেয়। যুগপৎভাবে সমুদ্র উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসমূহ দখল করে নেয় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গ্রিক জাহাজসমূহ। এর মাধ্যমে পার্বত্যঞ্চল ও গেরিলা সমৃদ্ধ ভূখণ্ডে তুর্কিদের কাছে সৈন্য ও রসদ পাঠানোর ক্ষেত্রে যোগাযোগব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। দ্বীপসমূহের মাঝে বিদ্রোহীরা স্পেটসাই—এখানে ধনী এক গ্রিক বিধবা ব্যক্তিগতভাবে ও নিজের অর্থে নপলিয়া উপসাগর অবরোধ করে—এরপর সারা ও তারপর হিদ্রা। পুরো উপদ্বীপজুড়ে বিদ্রোহের জনপ্রিয় সংগীত "মোরিয়াতে একজনও তুর্কি রবে না" এর কারণে সমস্ত মুসলিমই হত্যাযজ্ঞের স্বিকার হয়। পশ্চিমে ভয়ংকর বিদ্রোহে মেসোলোঙ্ঘি ফেটে পড়ে। উত্তরে মেসিডোনিয়ার উপদ্বীপেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে মাউন্ট অ্যাথসের সন্ন্যাসীরাও হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। ক্রীটে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ধর্মান্ধ ক্রেটান মুসলিম খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ক্যান্ডিরা মেট্রোপলিটান সহ ক্যাথেড্রালের বেদিতে পাঁচজন বিশপকে হত্যা করা হয়। এর ফলে পার্বত্যাঞ্চলের স্প্যাকিয়ানরা যুদ্ধচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ক্যানিয়া বন্দর দখলে রাখে গ্রিক রণতরীর সহায়তায়।

সুলতান মাহমুদ তাঁর শাসন লঙ্ঘনকারীদের অব্যাহতি দেওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না। সেনাবাহিনী বিদ্রোহের প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠার পর মোরিয়াজুড়ে তুর্কি হত্যার জন্য গ্রিকদের ওপর ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন সুলতান। ইস্তাম্বুলে পোর্তেসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গার গ্রিক দোভাষীদের হত্যার আদেশ দেন সুলতান। ইস্টার সানডের দিনে প্রাসাদের গেটে ঝুলিয়ে মোরিয়া গ্রিক যাজককে হত্যা করা হয়। এরপর তিন দিন প্রদর্শিত হওয়ার পর জিউদের দিয়ে দেয়া হয় টেনে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার জন্য। কিয়সের আগে তুর্কি পতাকাবাহী জাহাজকে, অ্যাডমিরাল ও নাবিকসহ ধ্বংস করে দেয় গ্রিক বিদ্রোহী রণতরী। এর প্রতিশোধে তুর্কিরা পুরো সমুদ্র দ্বীপটিকে তছনছ করে দেয়। দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার পর বা বিদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে প্রায় কয়েকশ হাজার খ্রিস্টানকে। এরপর করিন্থের বিদ্রোহ দমনে সফল হলেও মোরিয়াতে আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয় তুর্কি বাহিনী।

কিন্তু গ্রীকেরা সামরিকভাবে একত্রিত হয়ে সুযোগ গ্রহণের চেয়ে রাজনৈতিকভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে স্থানীয় সরকার গঠনে। প্রতিটি দখলকৃত অঞ্চলে সংসদ আহ্বান করা হয়—মেসেনিয়াতে সেনেট, পেলোপনিসে "কেন্দ্রীয় সরকার" ও পূর্ব ও পশ্চিম রুমেলিতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরকার নিয়োগ করা হয়। এদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উন্মেষ ঘটে জমিদার, গির্জার

নেতা, দ্বীপ বণিক, ক্লিফেটস্; যারা নিজেরাই আইন তৈরি করত। তাদের মাঝে একতা ছিল এক অলীক উচ্চাশা। তখনো পর্যন্ত জাতি হিসেবে গ্রিক ভাবতে পারত না নিজেদের।

ত্রিপোলী পতনের পর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সবার স্বার্থকে একই সুঁতোয় বাঁধার চেষ্টা করা হয়। ১৮২২ সালে বছর শুরুর দিনটিতে প্রজাতান্ত্রিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি সংবিধান গঠন করা হয়। আলেকজান্ডার মাভরোকরডাটোসের বেশির ভাগ অংশ প্রস্তুত করে। তাকে প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু একটি জনগোষ্ঠী যারা শতকের পর শতক ধরে প্রাচ্য দেশীয় শাসনের অধীনে রয়েছে; তার ওপরে আবার নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বস্ত; এরকম পশ্চিমা স্বাধীন সংবিধানের পরীক্ষা তারা কিছুটা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল বলা চলে।

খুব শীঘ্রই এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে একজন গ্রিক কখনো অন্য আরেকজন গ্রীকের প্রভুত্ব মেনে নেবে না। ফলাফল বাকি রইল পশ্চিমা কোনো রাজকুমারকে শাসক হিসেবে খুঁজে নেওয়া।

প্রথম দিন থেকেই গ্রিকরা পশ্চিমা সমর্থনের প্রতি বেশি আশাবাদী ছিল। কিন্তু সামরিকভাবে তাদের হতাশ হতে হয় খুব অল্প সময়ের মাঝেই। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর রাশিয়াসহ পশ্চিমা শক্তিসমূহ শান্তি খুঁজছিল। প্রায় এক দশকজুড়ে এই বিপ্লব-বিরোধি "প্রভুদের লীগ" নিজেদের মাঝে একতা ধরে রেখেছিল। তাই ব্রিটেন, রাশিয়া বা অস্ট্রিয়া কেউই, গ্রিক জাতীয়তাবাদে সমর্থন দিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৮২২ সালে এই তিন রাষ্ট্র এক সম্মেলনে গ্রিক প্রতিনিধি নিতে অস্বীকার জ্ঞাপন করে।

কিন্তু তাদের প্রজাদের অনেকেই রোমান্টিক চেতনায় আপ্লুত হয়ে গ্রিকদেরকে নিপীড়িত খ্রিস্টান নয়; বরঞ্চ ক্ল্যাসিকাল বীরদের বংশধর হিসেবে ধরে নেয়। অভিযাত্রীদের দল, পুরাকীর্তি সংগ্রাহক, ক্ল্যাসিকাল পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, বিদ্বান ও কবি সবাই মিলে সভ্যতার সূতিকাগারের দিকে সাংস্কৃতিক পৃথিবীর দৃষ্টি উন্মোচন করে দেয়।

পশ্চিমা ইউরোপের রাজধানীসমূহ ও রাশিয়ার মাধ্যমে গ্রিক বণিক সম্প্রদায় হেলেনিক বার্তা পৌঁছে দেয় বাণিজ্যিক বিশ্বের কাছে। সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে যৌথভাবে তারা বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করে। বিদেশে বিশেষ করে রাশিয়ায় বসবাসরত ধনী গ্রিকেরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। আবার একই সাথে ইউরোপ আমেরিকা থেকে তরুণ অভিযাত্রীরা নিজেদের সরকারকে অমান্য করে স্বেচ্ছায় গ্রিকদের সাথে যুদ্ধ করতে আসতে থাকে। উইলিয়াম কবেট বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে বলেছেন, "গ্রিক বিপ্লব ঘটিয়ে কবিরাও শেয়ার-চাকরি প্রার্থীরা, রাশিয়ার সুবিধার্থে।"

কবিদের মাঝে অসাধারণ ছিলেন—যিনি গ্রিকদের সাথে সমর্থন দিয়েছিলেন—লর্ড বায়রন, ১৮০৯ সালে প্রথমবারের মতো গ্রিস বেড়াতে এসে মুগ্ধ হয়ে পদ্যের অমরত্ব দান করেছেন একে। লন্ডনে গ্রিক কমিটি থেকে ছয় সংখ্যাবিশিষ্ট আর্থিক সাহায্য পেতেও সহায়তা করেন তিনি।

বিদ্রোহীদের মাঝে একতার অভাব গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। ১৮২৪ সালে বায়রন যখন গ্রিক মূল ভূখণ্ডে পৌঁছান, দেখতে পান গ্রিকরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে নতুন এক পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধে।

কবি বায়রনের তাৎক্ষণিক দায়িত্ব হয় এসব বিতর্ক প্রশমন করা। আর এই কাজে তিনি ক্ষণিক সময়ের জন্য হলেও সফলতা লাভ করেন। তাঁর নির্দেশানুযায়ী ফান্ডের অর্থ কনডোরায়োটিসকে প্রদান করা হয়। কোলোকোটরনস নিজের শেয়ারের বিনিময়ে নপলিয়া সমর্পণ করে। কিন্তু কয়েক মাস পর গৃহযুদ্ধ আবারো অনিবার্য হয়ে পড়ে। কোলোকোর্টারসকে বন্দি ও হিদ্রাতে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ইংরেজদের ঋণ তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ব্যয় না হয়ে গ্রীকের সাথে গ্রিকের দ্বন্দ্বে অপচয় হয়। এর সংগ্রাহক লর্ড বায়রন অবশ্য নিজের প্রচেষ্টার অপমৃত্যু দেখে যাননি। মেসোলজ্ঞিতে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন কবি। কিন্তু গ্রিকদের মাঝে বীর ও শহীদের সম্মানে আসীন আছেন তিনি। তাঁর মৃত্যু ইউরোপে গ্রিক জাতির উন্মেষ ও স্বীকৃতির আশা জাগিয়ে রাখে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ দাঙ্গা সত্ত্বেও গ্রিকেরা সফল হয়েছিল বলা চলে। কেননা ১৮২৫ সালে সুলতান স্বয়ং একাকী গ্রিকদের পরাজিত করতে নিজের অপূর্ণতা বোধ করেন। নিজের এশিয়ার প্রদেশসমূহ থেকে সৈন্য নিয়োগে ব্যর্থ হয়ে সুলতান মিশরের পাশা মাহমুদ আলীর সহায়তা কামনা করেন। নেপোলিয়নের সময় থেকেই আলীর সেনাবাহিনী পশ্চিমা কায়দায় প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এর বিনিময়ে ক্রিট ও পেলোপনেসিয়ার পাশা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার প্রতিজ্ঞা করা হয় আলীর কাছে অন্যদিকে আলী নিজে সিরিয়ার পাশা হওয়ার মনোবাসনা পোষণ করত।

মাহমুদের পুত্র ইব্রাহিম পাশা তাই আলেকজান্দ্রিয়া থেকে নৌবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ বাহিনী ছিল ভূমধ্যসাগরে অ-ইউরোপীয় বাহিনীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মোরিয়ার সর্ব দক্ষিণে মোদন বন্দরে পৌঁছায় ইব্রাহিম বাহিনী। এভাবে শুরু হয় গ্রিক স্বাধীনতার দ্বিতীয় পর্যায়। তিন বছরের মাঝে সুশৃঙ্খল বাহিনী তুর্কি নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনে এ অঞ্চলে। এর ফলে গ্রিকদের মাঝে একতার বোধ জেগে ওঠে। কোলোকোটরনস্‌কে মুক্তি দিয়ে মোরিয়ার প্রধান কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।

এরপর ১৮২৬ সালে ইব্রাহিম পাশা তার বাহিনী নিয়ে মেসোলজ্ঞি অবরোধে নিযুক্ত তুর্কি কমান্ডার রাশিদ পাশাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়।

এখানে ইব্রাহিম পাশার নৌবাহিনী ঘটনার গতি পরিবর্তন করে ফেলে। গ্রিক রসদবাহী রণতরীকে বন্দরে ভিড়তে বাধা দিয়ে দুর্গবাসী গ্রিক জনগণকে প্রতিরোধে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মেসোলঙ্ঘির পতনের পর কোনডোরায়োটিসের সরকার ব্যবস্থার পতন ঘটে ও আরো একবার গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। এর পূর্বে দুজন দক্ষ ব্রিটিশ অফিসার স্যার রিচার্ড চার্চ, একজন আইরিশ ও লর্ড কোচরান, একজন স্কটকে যথাক্রমে পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ দেয়া হয়। নিজেদের কাজের শর্ত হিসেবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অংশের পুনর্মিলন দাবি করে ব্রিটিশদ্বয়। এর ফলে নতুন সংবিধানের আওতায় জাতীয় সংসদ থেকে কাপোডিস্ট্রিয়াকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদে নির্বাচিত করা হয়। ইতিমধ্যে রাশিদ পাশা অ্যাথেন্স অবরোধ করে ও ১৮২৭ সালের জুন মাসে এর দুর্গ তুর্কিদের হাতে আসে। এভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রায় সমাপ্তি ঘণ্টাই বেজে ওঠে।

কিন্তু এটি সমাপ্তি ছিল না। ছয় বছরব্যাপী রক্তগঙ্গার পর ইউরোপীয় শক্তিসমূহ অবশেষে আক্রমণে উদ্যত হয়। এদের মাঝে রাশিয়া তুর্কিদের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অস্ট্রিয়া বিদ্রোহের দমন আশা করে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ঘটনাক্রমে আবারো রাশিয়া ও তুর্কিদের মাঝে যুদ্ধের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে।

পোর্তেতে আসে হেলেনিক মতধারানুসারী ব্রিটিশ কূটনীতিক স্ট্যাটফোর্ড ক্যানিং। ইব্রাহিম পাশার কর্মকাণ্ডে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ইংরেজরা। কেননা গ্রিকদের দাস বানিয়ে মিশরীয়দের দিয়ে পেলোপনিসকে ভরে তোলার খ্যাতি রটে যায় পাশার বিপক্ষে অন্যদিকে লর্ড বায়রনের মৃত্যু সবার মাঝে বিরোচিত ভাবমূর্তির উন্মেষ ঘটায়।

তাই পশ্চিমা শক্তিসমূহের প্রথম দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় গ্রীসের ভবিষ্যৎ সীমানা ও মর্যাদা স্থির করা। এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১৮২৬ সালে সেন্ট পিটারসবার্গে ব্রিটেন ও রাশিয়া, তুকি ও গ্রিকদের মাঝে রক্তবন্যা ঐকমত্যে পৌঁছায়। ঠিক স্বাধীনতা নয়, কিন্তু সুলতানকে বার্ষিক কর প্রদানের বিনিময়ে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার পাবে গ্রিকরা।

এই বছরের শরতে গ্রিকরা এই প্রটোকলে ফ্রান্সকেও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায়। ক্যানিংয়ের প্রচেষ্টায় যে কিনা কিছুদিন পরেই মৃত্যুবরণ করে ১৮২৭ সালের জুলাই মাসে 'লন্ডনে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; এথেন্সের পতনের এক মাস পর। এই চুক্তি অনুযায়ী ত্রিশক্তি পোর্তের কাছে মধ্যস্থতার প্রস্তাব করে। এই শর্ত প্রত্যাখিত হলে ত্রিশক্তির ক্ষমতা থাকবে গ্রিসের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার। প্রতিনিধি প্রেরণ ও বিদ্রোহী প্রদেশসমূহকে স্বাধীন হিসেবে

স্বীকৃতি জানাবে পশ্চিমা শক্তি। গ্রিস এসব মেনে নিলেও সুলতান প্রত্যাখ্যান করেন। একরোখাভাবে বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নিজের সার্বভৌম অধিকারের ওপর বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বলে ঘোষণা করেন সুলতান।

এছাড়াও চুক্তিতে যুদ্ধ বিরতি ও সংঘর্ষ ঠেকানোর জন্য যৌথ রণতরীর কথা বলা হয়। এ উপলক্ষে তিন পক্ষের অ্যাডমিরাল-সহযোগে রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে রণতরী প্রেরণ করে। কিন্তু ইব্রাহিম পাশা সুলতানের নির্দেশ ব্যতীত যুদ্ধবিরতিতে রাজি হতে অস্বীকৃতি জানালে দ্বিধায় পড়ে যায় যৌথ বাহিনী। অবশেষে নাভারিনোতে পৌঁছে নিজেদের মাঝে একমত হয় অ্যাডমিরালগণ যে, তুর্কিরা প্রথমে আক্রমণ না করলে তারা শুরু করবে না। এবার ইব্রাহিম পাশা যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হয় ও পাল উঠিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিনিধিদের বহনকারী একটি খোলা নৌকায় গুলি করে বসে মিশরীয় জাহাজ। ফ্রান্স পতাকাবাহী জাহাজ তৎক্ষণাৎ রাইফেল দিয়ে এর উত্তর দেয়ার পর বৃহৎ আকারের নৌবাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এতে ইব্রাহিমের রণতরী ধ্বংস হয়ে যায়। লেপান্তোর যুদ্ধের পর অটোমান সাম্রাজ্যের ওপর সবচেয়ে ভয়ানক নৌ-আক্রমণ ছিল এটি। রাশিয়া ও ফ্রান্স এতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়। অন্যদিকে ডিউক অব ক্ল্যারেন্স (ভবিষ্যৎ রাজা চতুর্থ উইলিয়াম) ব্রিটিশ অ্যাডমিরালকে পুরস্কৃত করে। গ্রিকরা অবশেষে মুক্তির আনন্দে বিজয়ী হয়ে ওঠে।

নির্বাচনের পর থেকেই জাতীয় সংসদের রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাপোদিস্ট্রিয়া ইউরোপের রাজধানীসমূহ ভ্রমণ করছিলেন সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে। ১৮২৮ সালের শুরুতে নপলিয়া ফিরে এসে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজে লেগে যায়।

ইংরেজরা মাহমুদ আলী'র কাছ থেকে ইব্রাহিম বাহিনীর প্রত্যাহার নিশ্চিত করে। যারা এতদিনেও রয়ে গিয়েছিল অবশেষে মোরিয়ার রাজধানী আক্রমণের পর ফরাসি বাহিনীর আক্রমণে পিছু হটে যায়। এরপর শান্তি প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে রাশিয়া ও তুরস্ক নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

কয়েক বছর পূর্ব থেকেই রাশিয়া তুর্কিদের ওপর কূটনৈতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করে আসছিল। ১৮২৬ সালে পোর্তের ওপর অবমাননাকর আকারম্যান কনভেনশন চাপিয়ে দেয় রাশিয়া। এর ফলে এশিয়াতে অটোমানদের বেশ কিছু দুর্গের পতন হয়। এখন আবার নাভারিনোতে রণতরী হারিয়ে যাওয়ায় রাশিয়াই কৃষ্ণসাগরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সামরিক জার প্রথম নিকোলাস অস্ত্রের মাধ্যমেই শত্রুর বিনাশে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ১৮২৮-এর বসন্তে রাশিয়া অটোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ করতে চায়;

সুলতান তার পূর্বেই ১৮২৭-এর শীতকালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে।

পরবর্তী বসন্তে জার নিজে নেতৃত্ব দিয়ে প্রুতে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। এরপর জুনের পূর্বেই দানিয়ুব পার হয়ে বলকান পর্বতের শেষে সুলতানের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয় প্রথম নিকোলাসের বাহিনী। ভার্নার পতন হলেও পর্বতে প্রবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শূমলা ও সিলিস্ট্রিয়া বেঁচে যায়।

রাশিয়ার প্রভুত ক্ষয়ক্ষতি হলেও পরের বছর আবারো বৃহৎ বাহিনী কমান্ডার মার্শাল দিবিসের নেতৃত্বে; যার অজেয় সফলতা ছিল খ্যাতির তুঙ্গে; অগ্রসর হয়। ছোট একটি রাশিয়া বাহিনী সিলিস্ট্রিয়া অবরোধ করলে পর মার্শালের বাকি বৃহৎ বাহিনী শূমলাতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এবার তুর্কিরা ধরাশায়ী হলে পুরো গোলন্দাজ বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়।

এরপর দিবিস্ সাহসী পদক্ষেপে বলকান পর্বতমালা অতিক্রমের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শূমলা তখনো টিকে ছিল। রাশিদ পাশা শূমলা রক্ষার দায়িত্ব নিলে ছোট একটি বাহিনী রেখে অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে পর্বতমালা অতিক্রমের আশায় নয় দিনের কষ্টসাধ্য ভ্রমণে অগ্রসর হয় মার্শাল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ যাত্রাপথে মার্শাল প্রায় কোনো রূপ বাধাই পায়নি।

ফলে এ রকম দুর্ভেদ্য একটি বাধাও অতিক্রম করে রাশিয়া বাহিনী অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে কৃষ্ণসাগরে রাশিয়া রণতরীতে রসদ সরবরাহের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সামনে। ছোটখাট তুর্কি প্রতিরোধ ভেঙে খ্রিস্টান কৃষকদের সাহায্যে রাশিয়া বাহিনী আড্রিয়ানোপলের দেয়ালের সামনে অবস্থিত সমভূমিতে পৌঁছে যায়– ইউরোপে তুর্কিদের রাজধানী। এর দুর্গ কোনো রকম গোলাগুলি ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে বসে। কেননা এ ধরনের পার্বত্যাঞ্চলের বাধা পেরিয়ে এর পূর্বে আর কোনো সেনাবাহিনী অতর্কিতে হাজির হয়নি তুর্কিদের সামনে। বস্তুত এ রকম একটি নিষ্ঠুর অঞ্চল পার হতে গিয়ে রাশিয়া বাহিনী ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছিল। ডায়রিয়া, পোকা-মাকড় ও সামগ্রিক অবসাদের কবলে পড়ে পূর্বের শক্তি হারিয়ে বসেছে রাশিয়া বাহিনী। আবার নিরাপদে ফিরে যাওয়ার বা সৈন্য নিয়োগের কোনো সুযোগও ছিল না। তুর্কিরা যদি রাশিয়া বাহিনীর সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত না ভাবত, তাহলে হয়তো তারা এদের ধ্বংস করতে পারত। এই ধরনের বিপদের কথা মাথায় রেখে ও কৃষ্ণসাগরে রণতরীর ছত্রচ্ছায়ায় বসফরাস ও ইস্তাম্বুলে আক্রমণের স্বপ্ন দেখে মার্শাল। নিজের বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ আরো একশ মাইল এগিয়ে নিয়ে যায়।

রাজধানী জুড়ে হতাশা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজের দুর্গের শক্তির ওপর ভরসা রেখে তুর্কিদের স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় সুলতান।

নবীজির পবিত্র ব্যানার প্রসারিত করে সুলতান নিজ নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রস্তুতি নিয়েও প্ররোচনার বশে পূর্বসূরিদের মতো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার না হয়ে গাড়িতে চেপে বসেন সুলতান। ফলে জনগণের মনোভাব দমে যায়। শ্রদ্ধা হতাশায় ছেয়ে যায়। দিওয়ানের প্রধানমন্ত্রী ও ব্রিটিশ ও ফ্রান্স কূটনীতিকেরা শান্তির জন্য চাপ দেয় সুলতানকে। রাশিয়ার দুর্বলতাকে না দেখার ভান করে উভয় রাষ্ট্রদূত। এসব চাপে পড়ে সুলতান, যদিও তিনি ভীরু ছিলেন না, ভেঙে পড়েন। রাশিয়ার মিথ্যাচারের কবলে পড়ে, দিবিস্‌কে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে ১৮২৯-এর শরতে Treaty of Adrianople নিয়ে আলোচনা করার জন্য দূত পাঠাতে সম্মত হন।

রাশিয়া নমনীয় শর্তে একমত হয়। জা'রের নামে শপথ করে মার্শাল ভৌগোলিক বিস্তৃতি পরিত্যাগ করে ও যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা অঞ্চলসমূহ অটোমানদের ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু মলদোভিয়ার কিছু অংশ ও দানিয়ুবের প্রবেশ মুখ নিজ অধিকারে রেখে দেয় নদী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে। মলদোভিয়া ও ওয়ালাসিয়া সুলতানের শাসনাধীনে থাকলেও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেয়ে কার্যত মুক্তিই লাভ করে।

সার্বীয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। এশিয়াতে আরেক অবিসংবাদী জেনারেল পাসকিভিস্‌ একইভাবে বিজয় লাভ করে। কার্জ, আরজুরাম ও বায়েজীদ তুর্কিদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। রাশিয়া অন্যান্য দুর্গ ও জর্জিয়াকে চিরস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করে, ককেশাসের অন্যান্য অঞ্চল সমূহ সহ।

গ্রীসের ক্ষেত্রে পূর্বে প্রত্যাখান করা শর্তসমূহ মেনে নিতে বাধ্য হন সুলতান। রাষ্ট্র হিসেবে গ্রীস সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে যায়। ১৮৩০ সালে নতুন গ্রিসের যাত্রা শুরু হয়। মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপসমূহের মাধ্যমে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতে রাজ্যে পরিণত হওয়া গ্রিস, ক্রিট ছাড়া সুলতানকে থেসালি ও আলবেনিয়া সীমান্ত প্রদেশ হিসেবে দিয়ে দেয়া হয়।

নতুন রাষ্ট্র শাসন করার জন্য গ্রিসের রাজকুমার পদবিধারী প্রভুর খোঁজ শুরু হয় গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ায় শাসক পরিবারসমূহে। রাজা চতুর্থ জর্জের জামাতা, রাজকুমার লিওপোল্ড একত্রে প্রথম পছন্দ হয়। কাপোডিস্ট্রিয়ার চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে নিজের প্রার্থিতা তুলে নেয় লিওপোল্ড। কেননা রাশিয়ার স্বার্থের ওপর দৃষ্টি রেখে আজীবন ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিল কাপোডিস্ট্রিয়া। বেলজিয়ানদের রাজা হয়ে পরবর্তীতে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেয় লিওপোল্ড। অতঃপর ১৮৩১ সালে মানিয়ত শত্রুদের হাতে কাপোডিস্ট্রিয়ার পতন ও মৃত্যু ঘটে। গ্রিসের মুকুট পরিধান করে ব্যাভারিয়ার রাজা লুডভিগের পুত্র রাজকুমার ওথো। সুলতানের কাছ থেকে যথাযোগ্যভাবে

স্বীকৃতি পেয়ে হেলেনিসদের প্রথম রাজা হিসেবে শাসনকাল শুরু করে রাজকুমার ওথো।

অটোমান সাম্রাজ্যের জন্য মাত্র এক দশকেরও কম সময়ে এত বড় পরাজয় প্রভূত দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। আংশিকভাবে এর পেছনে দায়ী ছিল সুলতানের অদক্ষ বিচারিক ক্ষমতা। সংকটের মুহূর্তে ত্রি-শক্তির সাথে সম্মানজনক শর্তের সুযোগ হারান সুলতান। এর ফলে পরাজিত হয় তাঁর নৌ-বাহিনী, হারাতে হয় গ্রিস ও অন্যান্য অটোমান ভূখণ্ড। পরিতাপের বিষয় এই যে, দুর্ভাগ্য সুলতানের পিছু নেয় এমন এক সময়ে যখন দেশের মাঝে সুলতান যথেষ্ট শক্তি ও সফলতার সাথে বহুল প্রতীক্ষিত সংস্কার কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হন। যার ফলে অটোমান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক ধারণার পরিবর্তন ঘটে।

॥ ৩১ ॥

সংস্কারক সুলতান মাহমুদ ধৈর্যের সাথে পুরো সতেরোটি বছর অপেক্ষা করেছিলেন, পরিবর্তনের ধারণাকে কাজে পরিণত করার জন্য। এর মাধ্যমে ইসলামের ওপর নির্ভরশীল মধ্যযুগীয় তুর্কি-রা আধুনিক সাংবিধানিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণার ওপর ভিত্তি করে। নতুন প্রতিষ্ঠান ও সহজ সরকারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে অতীতের সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করেন সুলতান মাহমুদ। যেমনটা এ সময় ইউরোপেও হচ্ছিল।

মাহমুদের দৃষ্টিতে সুলতানের ক্ষমতাকে একচ্ছত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। রাজধানী বা রাজ্যের প্রদেশ যেখানেই হোক না কেন, সর্বময় ক্ষমতা হবে একাকী সুলতানের। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মাহমুদ এ ক্ষমতা লাভ করেন। সুলতান তৃতীয় সেলিমের সংস্কারবাদী বন্ধুদের দেশত্যাগ বা হত্যাকাণ্ডের কারণে সুলতান মাহমুদ একাকী এ কর্ম সম্পাদন করেন। দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও দূরদর্শিতার মতো অসাধারণ সব চারিত্রিক গুণাবলি ছিল সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করে পদ্ধতিগতভাবে সমস্যার সমাধান করতেন সুলতান মাহমুদ। পূর্বপুরুষদের সংস্কারকাজে বাধাদানকারী শত্রুকে নির্মূল করেছেন চারিত্রিক শক্তি ও সাহস দিয়ে।

প্রথমেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রাদেশিক ক্ষমতার বিনাশ করেছেন সুলতান। বিদেশি আক্রমণে যে কোনো মুহূর্তে কেঁপে উঠবে এমন একটি সাম্রাজ্যে সুলতান অন্তত আভ্যন্তরীণ অরাজকতা বন্ধ করে এক ধরনের ইতিবাচক ঐক্য নিয়ে এসেছেন। অতি ধীরে ধৈর্যের সাথে নিজের

বিদ্রোহী পাশাদের দমন করেছেন। এরপর অগ্রসর হয়েছেন ক্ষমতার অপব্যবহারকারী উপত্যকাসমূহের প্রভু ও অবিশ্বস্ত প্রদেশপ্রধানদের দিকে। কেন্দ্রীয়করণের ক্ষেত্রে প্রশাসক ও জনগণের মাঝের সকল মধ্যবর্তী উৎসের সমাপ্তি টানার জন্য দমন করেছেন স্থানীয় শক্তিদের। এভাবে আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়ার বিশাল অঞ্চলে নিজের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এ প্রক্রিয়ার একটি ছিল জানিনাতে নিষ্ঠুর আলী পাশার অপসারণ। এর মাধ্যমে পথ খুলে যায় অটোমান রাষ্ট্রের ভেতরেই সবচেয়ে বড় শত্রু জানিসারিসদের ক্ষমতার অবসান করার। একদা অটোমান রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বীরপুরুষরাই এখন এর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানিসারিসদের চিরতরে শান্ত না করা পর্যন্ত কোনো সংস্কার অভিযান সম্ভব ছিল না। ১৮২৬ সালের গ্রীষ্মে এই আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেন সুলতান। ঠিক সময়টিই নির্বাচন করেছিলেন তিনি। ইব্রাহিম পাশার হাতে মেসোলঙ্ঘির পতনের পর সুলতান অনুধাবন করেন যে তাঁর নিজ সাম্রাজ্যের একটি আধুনিক সেনাবাহিনী কতটা দরকার। মিশরে মামলুকদের পরাজিত করার মাধ্যমে মাহমুদ আলী প্রমাণ করে দিয়েছেন ইউরোপীয় ঘরানার প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতা যে কোনো মুসলিম সেনাবাহিনীও আয়ত্ত করতে পারে। আর এ ধরনের সংস্কারকাজ হাতে নেয়ায় পশ্চিমে তাঁর শ্রদ্ধা ও সমর্থন বেড়ে যায়।

জানিসারিসদের বিরুদ্ধে এই সেনা অভ্যুত্থানের জন্য সুলতান তাঁর নিজের গোলন্দাজ বাহিনীকে আরো উন্নত ও বিস্তৃত করে তোলেন। বিশ্বস্ত অফিসারদের বাছাই করে নিষ্ঠুর এক জেনারেলকে দায়িত্ব প্রধান করেন সুলতান। "কৃষ্ণ নরক" হিসেবে যার খ্যাতি ছিল। বসফরাসের পেছনের এশিয়া থেকে সেনাবাহিনী প্রস্তুত রেখেছিলেন সুলতান যথাসময়ে পুনর্নিয়োগের জন্য। এর পর সুলতান রাষ্ট্রের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে বিদ্বান ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করেন। এরা সকলেই তাঁর স্বার্থে সমর্থন জানায় ও সকলের সম্মিলিত স্বাক্ষরে সুলতান ফতোয়া জারির মাধ্যমে নতুন সৈন্যদলের ভিত্তি স্থাপন করেন।

যদিও তৃতীয় সেলিমের নতুন শৃঙ্খলার পরিকল্পনা ছিল এটি; কিন্তু সুলতান মাহমুদ এ নীতিকে সুলতান সুলেমানের পুরাতন অটোমান সেনাবাহিনীর পুনর্জাগরণের মতো করে উপস্থাপন করেন। জাতির ক্রান্তি লগ্নে যাদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার অতীত। নির্দিষ্ট করে বলা হয় খ্রিস্টান বা বিদেশি নয়, সু-প্রশিক্ষিত মুসলিম অফিসার তাদের পরিচালনা করবে। প্রধান মুফতি এবং উলেমাও এতে সমর্থন জানায়। জানিসারিসদের প্রতিটি ব্যাটালিয়ন থেকে ১৫০ জন করে নতুন সৈন্যদলে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য নেওয়া হয়।

যেমনটা সুলতান ধারণা করেছেন, জানিসারিসরা এনিয়ম প্রত্যাখান করে। ১৮০৭ সালের মতো করে আরো একবার তারা হিপোড্রোমে ভেঙে পড়ে, গণহত্যা করতে করতে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এই সময় সুলতান তাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর সেনা ও গোলন্দাজ বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাঁকে সমর্থনকারী হাজারো মানুষ সিংহাসন রক্ষায় অগ্রসর হয়। মাহমুদ ব্যক্তিগতভাবে নবীজির পবিত্র স্তম্ভ উন্মুক্ত করে বিশ্বাসীদের আহ্বান করেন এর নিচে এসে দাঁড়াতে। জানিসারিসদের উত্তেজিত ভিড় সেরাগলির সামনে সংকীর্ণ রাস্তায় পৌঁছালে বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষিত হয়। ছত্রভঙ্গ হয়ে নিজেদের ব্যারাকে ফিরে যায় জানিসারিসরা। আক্রমণের ভয়ে ব্যারিকেড প্রস্তুত করে।

কিন্তু কোনো আক্রমণ হয়নি। সেনাবাহিনী হারাবার ঝুঁকি না নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনী ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করে। মুহূর্তের মাঝে চার হাজার বিদ্রোহী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মাত্র আধা ঘণ্টারও কম সময়ের মাঝে একসময়কার ইউরোপের ত্রাস ও পতনোন্মুখ অটোমান সুলতানদের পক্ষেও ভীতিকর পাঁচ শতকের পুরোনো বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। প্রদেশসমূহে আরো হাজার হাজার মৃত্যুবরণের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। জানিসারিসদের নাম মুছে, স্তম্ভ ধ্বংস করে ফেলেন সেই একই দিনে। এরপর এক মাস পর জানিসারিসদের মদদদাতা বেকতাশী দরবেশদের ভ্রাতৃসংঘ নিষিদ্ধ করে, আশ্রম পুড়িয়ে দেয়া হয়। প্রধান নেতাদের জনসমক্ষে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ও অনেক পুরোধাই বিদেশে পালিয়ে যায়। এই "শুভ লক্ষণ যুক্ত ঘটনা"-র মাধ্যমে সুলতান মাহমুদ নিজের সীমান্তের মাঝে বিরোধিদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেন। নতুন তুর্কি সেনাবাহিনী গঠিত হয়—"The Victorious Mohammedan Soldiery"

ধৈর্যশীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে মাত্র এক ঘণ্টাতেই শক্তিশালী ও জ্ঞানী সুলতান নিজের অটোমান পূর্বপুরুষদের ন্যায় একনায়কত্ব কায়েম করেন। কিন্তু নতুন ভবিষ্যতের ইতিহাসের জাগরণ ঘটিয়েছেন। এর পর আসে আলোকিত উন্নয়ন। যার মাধ্যমে সুলতান স্থায়ী ও স্বাধীন সমাজের জন্য নিজের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। উত্তরসূরিদের জন্য রেখে যান নতুন ধরনের বিস্তৃত সংস্কার-নীতি। যার মাধ্যমে সময়ের সাথে সাথে তুরস্ক পশ্চিমা সভ্যতার সাথে সাহচর্য গড়ে তোলে।

এশিয়া ও ইউরোপে সুলতানের ভূখণ্ড পূর্বের মতো অটোমান কমনওয়েলথ্ হয়ে শক্তিশালী ও একত্রিত হয়ে বাইরের শক্তির মোকাবেলা করতে পারবে- এই ছিল সুলতানের অভিপ্রায়। একই সাথে দেশের মাঝে সকল ধর্ম ও জাতির মানুষের মাঝে ও সৌহার্দ্য থাকবে। ফলে ঊনবিংশ ও দ্বাবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তি নিশ্চিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ সার্বভৌম হিসেবে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

টপকাপি প্রসাদের রাজকীয় হারাম মেলিং- এর সুদৃশ্য স্থাপনা। ঊনবিংশ শতকে হারাম ও অটোমান জীবন যাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। বিশেষ ভাবে দর্শনীয় ডান দিকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ দুজন নারী।

জানিসারিসদের বধ করার পর সামরিক উদ্দেশ্যই প্রধান হয়ে ওঠে সুলতান মাহমুদের কাছে। জানিসারিসদের আঘার পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় সেরাস্কার নিয়োগ দেয়া হয়। যার দায়িত্ব ছিল একই সাথে প্রধান কমান্ডার ও যুদ্ধ মন্ত্রী হিসেবে কাজ করা। এছাড়া নতুন বাহিনীর প্রতি বিশেষ দায়িত্বও পালন করতে হবে তাকে। এর বাইরে ইস্তাম্বুলের জননিরাপত্তায় পুলিশি দায়িত্ব বর্তায় তার ওপরে। সেনাবাহিনীতে নিয়ম গঠিত হয় যে রাজধানীতে বারো হাজার সৈন্য থাকবে। বাকিরা বিভিন্ন প্রদেশে দায়িত্ব পালন করবে। প্রত্যেকে বারোজন নিয়োগ পাবে সেনাবাহিনীতে।

সামরিক সংস্কার ও কার্যকর এবং নির্ভরশীল সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতান মাহমুদের প্রয়োজন ছিল এক দশকের জন্য যুদ্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। এ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাশিয়া পূর্ণ সচেতন ছিল। তাই সুলতানের সংস্কার নীতিকে ভেস্তে দেয়া ও সেনাবাহিনী শৃঙ্খলিত হওয়ার পূর্বেই রাশিয়ার জার সাম্প্রতিক যুদ্ধ উসকে দিতে চেয়েছে। যার ফলশ্রুতি আড্রিয়ানোপল চুক্তি।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। মাহমুদ পুরোপুরিভাবে নতুন বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও গঠনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। এর পেছনে অবশ্য মাহমুদ আলীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও কাজ করছিল। ১৮২৬ সালে মাহমুদ নিজের প্রজা রাষ্ট্র মিশরের কাছে বারোজন সামরিক প্রশিক্ষকের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু পাশা মাহমুদ আলী এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে সুলতান ইউরোপে দৃষ্টি দেন। গ্রিকদেরকে সাহায্য করার জন্যও পরবর্তীতে মাহমুদ আলী'কেও সমর্থনের জন্য ফ্রান্সকে এড়িয়ে যায় তুর্কিরা। গ্রিকদের প্রতি সহানুভূতির জন্য ব্রিটেনকেও তালিকা থেকে বাদ দেয় সুলতান। এ কারণে লর্ড পামারস্টোনের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন সুলতান। পরবর্তীতে অবশ্য উইলউইচে কিছু তুর্কি ক্যাডেট যাওয়ার পর তিনজন ব্রিটিশ অফিসারকে ইস্তাম্বুলে পাঠানো হয়। ১৮৩৮ সালে এদেরকে একটি নৌ মিশনে অনুসরণ করা হয়। কিন্তু তুর্কিরা তাদের প্রতি বিরাগভাজন হওয়ায় তারা তেমন কিছু অর্জন করতে পারেনি।

অবশেষে প্রুশিয়ার মাধ্যমে সুলতানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। তরুণ লেফটেন্যান্ট হেলমূথ ভন মল্‌কের প্রতি মুগ্ধ হয়ে সুলতান তাকে সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা বিষয়ে উপদেষ্টা ও সেনাবাহিনী সংগঠন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তুরস্ক এবং অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার মাঝে ক্যাডেট আদান-প্রদান শুরু হয়। এভাবে শুরু হয় তুর্কি সেনাবাহিনীতে জার্মান ঐতিহ্যের, যা বিংশ শতাব্দী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য তা সবসময় উল্লাসজনক ছিল না। কিন্তু মলকে দ্বিতীয় মাহমুদের প্রতি তেমন আগ্রহ বোধ করেনি। পিটার দ্য গ্রেটের তুলনায়

তুচ্ছ মনে করত মলকে সুলতানকে। এছাড়া বিদেশি অফিসারদের প্রতি তুর্কিদের ব্যবহারও পীড়া দিত তাকে। এ সম্পর্কে মলকে লিখে গেছে, "কর্নেলরা পূর্ববর্তী হিসেবে সম্মান দিত, অফিসাররা নম্র ছিল; কিন্তু সাধারণ মানুষ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিত না। নারী এবং শিশুরা প্রায়ই অভিশাপ দিত। সৈন্যরা মান্য করত কিন্তু স্যালুট প্রদান করত না।" এতসব কিছুর মাঝে সেরাস্কারবা প্রধান কমান্ডার যুদ্ধ মন্ত্রণালয় হিসেবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অটোমান সাম্রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, যা পরবর্তী শতকেও টিকে থাকে।

মাহমুদের পরবর্তী কাজ ছিল উলেমাদের ক্ষমতা খর্ব করা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিভাবকেরা পরবর্তী সামরিক স্থাপনাসমূহের অভিভাবকত্ব শুরু করেছিল। এখানেই ছিল সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি দ্বিতীয় হুমকি। জানিসারিসদের সাথে একত্রিত হয়ে উলেমা সম্প্রদায় সুলতান তৃতীয় সেলিম ও তাঁর সংস্কারকাজের মৃত্যু ঘটায়। নতুন সরকার গঠনের জন্য সাম্রাজ্যের প্রাচীন এই স্তম্ভ অপসারণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। এই সময়ে দুজন প্রতিনিধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুলতান ও খলিফা হিসেবে সুলতানের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল। প্রধান উজির নির্বাহক হিসেবে প্রশাসন ও বিচার বিভাগ তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রধান মুফতি, শেখ-উল-ইসলাম, উপদেষ্টা ও ব্যাখ্যাদানকারী বা তর্জমাকারীর দায়িত্ব ছিল তার ওপর।

এদের ক্ষমতা তরলীকরণের জন্য এমন ধরনের সরকার ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন সুলতান যেখানে কোনো ব্যক্তির একচ্ছত্র ক্ষমতা বা দায়িত্ব নয় উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে সকলে।

প্রথমেই শেখ-উল-ইসলামের অফিসকে অস্থায়ী সরকারের দায়িত্ব থেকে পৃথক করে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয় দেখাশোনার ভার দেয়া হয়। এতে প্রধান মুফতি নতুন ধরনের বিচারপতির ক্ষমতা লাভ করে, যা শুধু সুলতানের মুসলিম প্রজাদের ওপর প্রয়োগ করতে পারবে। অন্যদিকে নিরপেক্ষভাবে বিচারের জন্য নতুন বিচারালয় স্থাপিত হয়।

এখন পর্যন্ত প্রধান মুফতি নিজের বাসভবন থেকেই তার পরামর্শ ও শাসন (যার প্রায়ই রাজনৈতিক ভূমিকাও থাকত) জারি করতেন। নতুন নিয়মে জানিসারিসদের আঘার অফিস থেকে এ দায়িত্ব পালন করার আদেশ হয়। এই পদমর্যাদা তার স্বায়ত্তশাসনকেও সীমাবদ্ধ করে দেয়। যার ফলে রাষ্ট্রের অধীনে সাধারণভাবে উলেমাদের মাঝে আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে। এর ফলে আর্থিক ও প্রশাসনিকভাবে তাদের স্বাধীনতা কমে যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থাপন করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান। বিচার বিভাগীয় মন্ত্রণালয় গঠন করে আইনি বিষয় দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয় এবং একটি কমিটির অধীনে এমনকি

ফতোয়া জারির ক্ষমতাও দেয়া হয়। প্রধান মুফতিকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে পূর্বের মতো ক্ষমতা বলে নয়; কিন্তু ব্যক্তিগত গুণাবলির মাধ্যমেই সম্মান অর্জন করতে হবে।

অবশেষে মাহমুদ ধর্মীয় ফাউন্ডেশনের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। উলেমা সম্প্রদায় প্রশাসনিক ও কর সংগ্রাহকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই ফাউন্ডেশন দেখাশোনা করত। এর ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এরপর মাহমুদ নিজের নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা ইতরীতে মনোযোগী হয়ে উঠেন। এখানে ইউরোপীয় সরকার ব্যবস্থা অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তিনি। এভাবে নতুন তুর্কি রাষ্ট্রের আধুনিকতা দিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে মুগ্ধ করার প্রয়াস ছিল তাঁর।

এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই প্রধান উজিরের বর্তমান অফিস কাঠামো পরিবর্তন করেন। প্রধান উজিরের ক্ষমতা দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়ে বিভক্ত হয়ে যায়। বৈদেশিক এবং বেসামরিক। অন্যদিকে কোষাধ্যক্ষের অফিসকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে রূপান্তর করা হয়। শাসক ও সরকারের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনকারী হিসেবে প্রধান উজিরকে প্রধানমন্ত্রী পদবিতে নতুন নামকরণ করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে প্রাক্তন পদবিই পুনঃস্থাপিত হয়। নতুনভাবে দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে অন্যান্য মন্ত্রণালয় গড়ে তোলেন তিনি। প্রিভি কাউন্সিলে একত্রে সভা করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করত সরকারের এসব বিভাগ। প্রধানমন্ত্রী ছিল এদের রাষ্ট্রপ্রধান। উপদেষ্টা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রতিবেদন ও সিদ্ধান্ত পেশ করত সুলতানের ঘোষণার জন্য। এদের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামরিক কাউন্সিল ও আইন অধ্যাদেশ কাউন্সিল। প্রথমে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও বাণিজ্যকে একত্রিতভাবে একটি কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্বের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকার ও সুযোগ সুবিধাকে খর্ব করার মাধ্যমে আধুনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী ভূমিকা পালন করে সুলতানের সংস্কার পরিকল্পনা। বাস্তবিকভাবে এদের সফলতার পেছনে ভূমিকা পালন করেছে নতুন প্রজন্মের সরকারি কর্মচারীবৃন্দ; যারা শিক্ষা, সামাজিক বুৎপত্তি ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পূর্বের কর্মচারীদের তুলনায় ভিন্ন ছিল।

প্রদেশসমূহে মাহমুদের প্রশাসন এই কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভর ছিল। মধ্যবর্তী শক্তির উৎসসমূহ যা ঐতিহ্য, প্রথা, জনমত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ছিল; এরাও ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা হারিয়ে সুলতান সর্বময় হয়ে উঠেন। প্রাথমিকভাবে এই উদ্দেশ্যে দুই ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। একটি ছিল রুমেলিয়া ও আনাতোলিয়ার সব পুরুষের ওপর আদমশুমারি ও আরেকটি ছিল সকল জমির মালিকদের ওপর জমির জরিপ কাজ। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল নতুন

সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ ও একই সাথে এ বাহিনীকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য করের সংস্থান। এরপর তিমার প্রথার অবসান ঘটান সুলতান মাহমুদ। সিপাহি নিয়োগের ভিত্তি ছিল এই প্রথা। ষোড়শ শতক থেকে বেতনভুক্ত নিয়মিত বাহিনীর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। এর ফলে তিমারেরা কৃষকদেরকে জমি বন্ধক দিয়ে দিতে শুরু করে। কিন্তু আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়ার কিছু অংশে পুরাতন ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। মাহমুদ জানিসারিসদের নির্মূল করে অশ্বারোহী বাহিনীরও বিনাশ করেন। ফলে সামন্তপ্রথার শেষ অংশও মুছে গিয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

আইনের ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদ মৌলিক কিছু আবিষ্কার প্রবর্তন করেন। সুলতানের আইন ক্ষেত্র দুভাগে বিভক্ত ছিল। শরিয়ত, যেখানে ঈশ্বরের পবিত্র আইনের ওপর মানুষের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল ও কানুন; খলিফা হিসেবে সুলতানের বাণী প্রচারিত হতো। উভয় আইনের ভিত্তি ছিল মধ্যযুগীয় বিচার ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে আধুনিক আইনের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের সমান মর্যাদার মতো কিছু অর্জিত হয়নি। তাই আদালতের ধারণার প্রচলন করেন সুলতান মাহমুদ। এভাবে “ন্যায়বিচারক” খেতাব অর্জন করেন সুলতান মাহমুদ। শরিয়ত ও কানুন উভয় দিক থেকে পৃথক হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সাধারণ আইন প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান। এর মাধ্যমে সরকারের ওপর বিচারকদের ক্ষমতা ও দায়িত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ঘুষ ও অন্যান্য দুর্নীতির কারণে সরকারি কর্মচারীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা লাভ করে এসকল বিচারকেরা। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো এমন অপরিচিত ধারণার সাথে পরিচিত হয় সকলে যে সরকারি কর্মচারীরা জনগণের সেবক ও আইনের অধীনে সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব আছে। নতুন আইনের বলে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা শুধু বিচারকদের হাতে নয়; বরঞ্চ অপরাধী ও নাগরিক, ধর্মীয় ও নিরপেক্ষ, ব্যক্তিগত ও সাধারণ আইনের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণের ওপর নির্ভরশীল হয়।

এতদসত্ত্বে সাধারণ জনগণের জীবনে, তাদের সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের ওপর শরিয়তী আইন ও এর প্রথার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বিবাহ ও তালাক, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার, নারী ও দাসদের মর্যাদা এসব ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এক্ষেত্রে ধর্মই ছিল আইনের ভিত্তি। যেখানে হাত দেওয়ার এমনকি সুলতানেরও ক্ষমতা ছিল না। গৃহে মানুষ তখনো মধ্য যুগেই বাস করত।

কিন্তু বিস্তৃত পরিসরে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ভেঙে পড়তে থাকে। দ্বিতীয় মাহমুদ নিজের সময়ের চেয়ে এগিয়ে থেকে অটোমান সার্বভৌমত্বের নতুন ভিত্তি খুঁজতে থাকেন। এটি ছিল জনগণের ওপর নিবেদিত। সুলতান শীঘ্রই

হয়ে উঠেন বিশ্বাসের রক্ষকই শুধু নয়; বরঞ্চ জনগণের আলোকদিশারী। নিজের দয়ালু চারিত্রিক কাঠামোর কারণে সুলতান মাহমুদ নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা নয়; প্রজাদের অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রতি উদ্বিগ্ন ছিলেন। প্রজাদের অবস্থা পরিবর্তন ও উন্নতিতে মনোযোগী ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ।

এসবের মাঝেই নিহিত ছিল নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার ধারণা। অজানাকে জানার প্রয়োজন ছিল তুর্কিদের। প্রাচীন শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে মাদ্রাসা, একনায়কত্ব কায়েম করেছিল। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত শিক্ষা ছিল শুধু ঈশ্বর ও তাঁর প্রতি মনুষ্যত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে। মোটের ওপর এক্ষেত্রে মৌখিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই নিরক্ষরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮২৪ সালে মাহমুদ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন।

উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে উচ্চশিক্ষার জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন সুলতান। সামরিক স্থাপনার ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা অর্থই ছিল সামরিক শিক্ষা। নতুন ধরনের শিক্ষিত ও যোগ্য অফিসার প্রয়োজন ছিল সেনাবাহিনীতে। কিছু পশ্চিমা ধর্মত্যাগী, গোলন্দাজ ও প্রকৌশলী ব্যতীত এক্ষেত্রে অনেক কমতি ছিল অটোমান সেনাবাহিনীর। আঠারোশ শতকের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সামরিক ও নৌ বিদ্যালয়কে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮২৭ সালে বিস্তর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও সুলতান সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে ছোট একটি শিক্ষার্থী দলকে প্যারিসে প্রেরণ করেন। এভাবে পরবর্তীতে আরো তুর্কি শিক্ষার্থী ইউরোপে গমন করে স্বদেশের আধুনিকায়নে ভূমিকা রাখে। স্থায়ীভাবে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন স্থগিত করে মাহমুদ সামরিক সৈন্যদলের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নন-কমিশন্ড দৈনিক ও শিক্ষকদের মাঝ থেকে প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হতো। এসব শিক্ষার্থী পুনরায় তাদের শিক্ষা সহকর্মীদের মাঝে ছড়িয়ে দিত। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তুর্কি ক্যাডার গড়ে ওঠে।

ঘটনাক্রমে সুলতান সামরিক বিজ্ঞানের একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নেপোলিয়নের সামরিক একাডেমি সেন্ট সির (Cyr) আদলে এটি গঠিত হয়েছিল। যদিও এর শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিল ফরাসি বা প্রুশীয়—মূলত তুর্কি শিক্ষাব্যবস্থা ও ঐতিহ্যরে ওপরই নির্ভর ছিল এ বিদ্যালয়। এর মাধ্যমে তুর্কিদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সেনাবাহিনী বাদক দলের জন্য রাজকীয় সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন সুলতান মাহমুদ। যার একজন অন্যতম প্রশিক্ষক ছিল দোনিজেটি পাশা, মহান ইটালিয় সরকারের ভ্রাতা।

বিশেষভাবে বলতে হয় ডাক্তার ও শল্যবিদদের প্রশিক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের কথা। সুলেমানিয়ে মসজিদে সাধারণ নাগরিকদের জন্য ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ক্ল্যাসিকাল গ্রিক ও গ্যালেন অ্যাভিসেনার লেখনীসমূহ।

মাহমুদের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা একাডেমি ছিল তুরস্কে প্রথম বিদ্যালয় যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৩৮ সালে পেরা ও পরবর্তীতে প্রাসাদ বিদ্যালয়ের জায়গাতেই ইউরোপীয় শিক্ষকদের দ্বারা এই বিদ্যালয় কাজ আরম্ভ করে। তুর্কি ও ফরাসি উভয় ভাষাতেই শিক্ষা দেয়া হতো। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুলতান নিজে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। চিকিৎসার ভাষা হিসেবে আরবীয় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে বর্ণনা সুলতান বলেন "ফরাসি ভাষায় ওষুধ বিজ্ঞান শিখবে তোমরা" ফরাসিতে দক্ষতার জন্য নয়; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অল্প অল্প করে এই বিদ্যা আমাদের ভাষায় প্রয়োগ করা।" পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেই তুর্কি বিদ্বান ব্যক্তিরা চিকিৎসাবিদ্যার বই ও অন্যান্য পুস্তক অনুবাদের মাধ্যমে তুর্কি ভাষায় শিক্ষা প্রদান প্রচলিত হয়ে যায়। এভাবে তুরস্কে পুরাতনকে হটিয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান জায়গা করে নেয়। নতুন করে এর পাঠ্যসূচিতে শব ব্যবচ্ছেদ ও অটোপসিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মৃতদেহ কাটার ক্ষেত্রে উলেমাদের চাপে মোরে মডেল ব্যবহার করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদেরকে মানবদেহ থেকে শিক্ষা নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। এ কাজে দাসদের দেহ ব্যবহার হতো; যা সহজলভ্য ছিল।

সময়ের সাথে সাথে এ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও দর্শনবিদ্যারও চর্চা শুরু হয়। পূর্বে যা কখনো হয়নি—ফরাসি ভাষাতেই সাধারণত শিক্ষা দেয়া হতো ইউরোপীয় ইতিহাস ও সাহিত্য। এভাবে পারস্য সাহিত্যচর্চার জায়গা নিয়ে নেয় ফরাসি সাহিত্য। সামরিক শিক্ষার মতোই সুলতান মাহমুদের সমান নজরদারি ছিল সাধারণ শিক্ষার প্রতি। নতুন সরকার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মচারী প্রয়োজন ছিল। ১৮৩৮ সালে পশ্চিমা প্রভাবে উৎসাহিত হয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় সুলতানের সামনে ধর্মীয় জ্ঞান আগামীর পৃথিবীকে রক্ষা করবে। কিন্তু এই পৃথিবীতে পারদর্শিতার জন্য বিজ্ঞান প্রয়োজন। জ্যোতির্বিদ্যা, মাধ্যমে নৌ-চালনা ও বাণিজ্যিক উন্নতি সাধিত হবে। গণিতশাস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করা যাবে সুশৃঙ্খলভাবে আবার সামরিক প্রশাসনও এতে উপকৃত হবে...কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ব্যতীত কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি বোর্ড। আর বিজ্ঞান, শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার জরা দূরীকরণের জন্য বিদ্যালয়সমূহে নতুন শৃঙ্খলা প্রয়োজন।

উলেমা সম্প্রদায়ের বিরোধিতার কারণে বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয় যে এই সকল উদ্দেশ্য কিশোরদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। এর মাধ্যমে প্রাথমিক ধর্মীয়

শিক্ষা ও উচ্চ প্রশিক্ষণের মাঝে শূন্যস্থান পূরণ হবে। ধীরে উন্নতি হলেও সুলতান আহমেদ ও সুলেমানিয়ে মসজিদের পাশে দুটি গ্রামার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মাহমুদের শাসনকালে। পাঠ্যসূচিতে ব্যকরণ ও সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত ছিল ও উদ্দেশ্য ছিল সরকারি কর্মচারীদের প্রস্তুত করা।

এই সমস্ত পরিকল্পনার প্রধান বাধা ছিল—ভাষা। পশ্চিমা সরকার ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলনের চেষ্টা হয় এমন জনগণের জন্য যারা মুসলিম হিসেবে কার্যত কোনো পশ্চিমা ভাষা জানত না। তৃতীয় সেলিমের ভাষা শিক্ষায় উৎসাহী ছিল এমন অল্প কজন তরুণই জীবিত ছিল বা দক্ষ হয়েছিল। পূর্বে এ সমস্ত কাজ করত গ্রিকরা। অবশেষে সুলতান পোর্তেতে "অনুবাদ সমিতি" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাষা সমস্যার সমাধান করেন। পরবর্তীতে এটি বিদেশি ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

১৮৩৪ সালে তৃতীয় সেলিমের অপূর্ণ ইচ্ছার পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে মাহমুদ ইউরোপীয় রাজধানীসমূহে তুর্কি কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে। দূতাবাসের কর্মচারী হিসেবে তুর্কিরা পশ্চিমা ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি পশ্চিমা সভ্যতার থেকেও প্রভাবিত হতে শুরু করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মাঝে অটোমান সাম্রাজ্যে আলোকিত দেশ-নেতাদের উদ্ভব হয়।

এরই মাঝে সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে ইস্তাম্বুলে তুর্কি ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রচলন করেন সুলতান মাহমুদ। ফরাসিপত্রেও এর একটি ভার্সন বের হতো। নাম ছিল Moniteur Ottoman। সরকারি কর্মচারীদের মাঝে নীতি ও পরিকল্পনা পৌঁছে দেয়ার জন্য ১৮৩৪ সালে পোস্টাল সার্ভিস স্থাপন করেন সুলতান। এই ডাক বিভাগ পরবর্তীতে সাম্রাজ্য নিজেদের লোক নিয়োগ করা শুরু করে। এই কারণে সুলতান স্কুটারি থেকে আড্রিয়ানোপল পর্যন্ত প্রথম ডাক বিভাগীয় সড়ক নির্মাণ করেন।

এভাবে পূর্ব ও পশ্চিম সভ্যতার মেলবন্ধনে প্রশাসন, সামরিক ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে আধুনিক তূরস্কের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রেও সুলতানের দেখাদেখি সাধারণ মানুষ পশ্চিমা আদব-কায়দা রপ্ত করতে থাকে। অটোমান আদব-কায়দা নয়, ইউরোপীয় কায়দায় অতিথিদের মাঝে ঘুরে বেড়াতেন। কথা বলতেন এমনকি নারীদের প্রতিও ভিন্ন ব্যবহার করতেন।

দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে নিজের জনগণের সামনে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করতেন ও দর্শকদের সামনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতেন। মন্ত্রী'-রাও তাঁর উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকত না বরং বসতে পারত। দপ্তরসমূহ নিচু গদি ও কুশনের পরিবর্তে টেবিল-চেয়ার দিয়ে ইউরোপীয় রীতিতে সাজানো

হয়। এমনকি ইসলামি ঐতিহ্য ভেঙে সুলতানের প্রতিকৃতিও প্রায় দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

লম্বা দাড়ির প্রচলন বাদ দিয়ে পোশাক-আশাকেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন সুলতান। সৈন্যদের জন্য ইউরোপীয় কায়দায় টিউনিক ও বুটের ব্যবস্থা করেন। খানিকটা গোয়ার্তুমি সত্ত্বেও সকলে এ ব্যবস্থা মেনে নেয়।

কিন্তু শিরস্ত্রাণের পরিবর্তন মেনে নেয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। নবীজি নিজে ইসলামিক বিশ্বাসের চিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন এ টুপিকে। ১৮২৮ সালে ফেজ টুপির প্রবর্তন হয়। খানিকটা দ্বিধার পর উলেমা সম্প্রদায় একে স্বীকৃতি দান করে। কিন্তু মাহমুদের প্রস্তাবিত চামড়ার কিনারাসমৃদ্ধ টুপি যা কিনা সৈন্যদের চোখকে সূর্যের রশ্মি থেকে নিরাপদ করবে, প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কেননা এর মাধ্যমে নামাজের সময় কপাল মাটিতে স্পর্শ করা যাবে না। ১৮২৯ সালে আদেশ জারির মাধ্যমে সকলে ফেজ টুপি আয়ত্ত করে নেয়। মধ্যযুগীয় রোব ও পাগড়ি উলেমাদের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়। ইউরোপীয় পায়জামার মাধ্যমে আধুনিক জনগণ পরিচিত হওয়া শুরু করে অন্যদিকে গোঁড়া তুর্কিদের মাঝে প্রচলন হয় ফ্রাক কোট ও কালো চামড়ার জুতা।

জানিসারিসদের দমনের পর এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে বহুল প্রতীক্ষিত সংস্কারের জন্য ও কার্যে পরিণত করার জন্য দ্বিতীয় মাহমুদের হাতে মাত্র তেরোটি বছর বাকি ছিল। এই সময়ের প্রথমার্ধে মাহমুদ অন্তত নিজের সীমান্তের বাইরের যুদ্ধ থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু এ সময়টুকু প্রয়োজন ছিল তাঁর প্রজা মাহমুদ আলীর নাভারিনোতে হারিয়ে ফেলা জাহাজের পুনর্নির্মাণ ও নিজের সেনাবাহিনীতে ফরাসি অফিসারদের অধিক হারে নিয়োগের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে মাহমুদ আলী। মোরিয়াতে আক্রমণের পুরস্কারস্বরূপ মাহমুদ আলী'কে সুলতান ক্রীটের পাশা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সিরিয়ার পাশা হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয় না মাহমুদ আলীর। ১৮৩২ সালে সুলতানের সাথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য প্রস্তুত হয় মাহমুদ আলী। আক্রের পাশার সাথে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের অজুহাতে পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে শক্তিবলে সিরিয়া দখলের জন্য প্রেরণ করে মাহমুদ আলী।

গাজা ও জেরুজালেম দখল করে, রণতরীর সহায়তায় আক্রে অবরোধ করে ইব্রাহিম আলেপ্পো ও দামাস্কাসের দিকে অগ্রসর হয়। মাহমুদের নতুন বাহিনীর সাথে সফল যুদ্ধ শেষে কন্যা দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় ইব্রাহিম। বার্সা পর্যন্ত পৌঁছে দৃষ্টি ফিরিয়ে ইস্তাম্বুলের দিকে মনোযোগী হয় ইব্রাহিম। এতে ইন্ধন জোগায় মাহমুদ আলীর স্বপ্ন, পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া একটি সাম্রাজ্যের ললাটে নিজের নাম অঙ্কিত করা।

সম্রাট হিসেবে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮-৩৯) হিপোলিট বার্টক্স-এর তৈল চিত্র।

রাজধানীতে বিপদ ঘণ্টা বেজে ওঠে। সুলতান মাহমুদ ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্ট্র্যাটফোর্ড ক্যানিং সমর্থন করলেও লর্ড পামারস্টোন প্রত্যাখ্যান করে। ফলে পুরোনো শত্রু রাশিয়াকে সাহায্যের আর্জি জানানো ব্যতীত আর কিছু করার থাকে না সুলতান মাহমুদের। নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে তৎপর হয়ে ওঠে সদাপ্রস্তুত রাশিয়া। বসফরাসের মুখে শহরের প্রতিরক্ষার জন্য ছয় হাজার সেনাবাহিনীর এক শক্তিশালী দল ১৮৩৩ সালে অবতরণ করে। ছয় সপ্তাহ পর এর দ্বিগুণ আরো এক বাহিনী এসে পৌঁছায় ওডেসা থেকে। এভাবে স্কুটারির দৈত্যসুলভ পর্বত থেকে জার বাহিনী। ইস্তাম্বুল নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। বিদেশিদের মাঝে শুধু রাশিয়াই সুলতানের কাছে প্রবেশাধিকার পায়; ইস্তাম্বুলের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকে তাদের সৈন্য ও নাবিকেরা; তুর্কি ইউনিটকে খনন কাজ ও নেতৃত্ব সহায়তার জন্য রাশিয়া অফিসারদের সাহায্য নেয়া হয়। ইব্রাহিমের সেনাবাহিনী বসফরাস অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু রাশিয়ার আগমনে পিতার মুখপাত্র হিসেবে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকারও রাশিয়া আক্রমণের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে।

এবার কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রাশিয়ার বাহিনীর প্রত্যাহারের জন্য এগিয়ে আসে লর্ড পামারস্টোন। এর বিনিময়ে মাহমুদ আলীর হাত থেকে মুক্তি ও ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো আক্রমণে অ্যাংলো-ফ্রান্স সহায়তার প্রস্তাব দেয়া হয় সুলতানকে। এক ফরমান জারির মাধ্যমে মাহমুদ আলীকে জীবিত থাকাকালীন মিশর ও ক্রীটের ন্যায় সিরিয়া, দামাস্কাস, আলেপ্পো ও অ্যাডানার পাশা হিসেবে মেনে নেয়া হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে ইব্রাহিম বা অন্য কারো নিশ্চয়তা বাদ দেয়া হয়। আরেকটি পৃথক ঐকমত্যের মাধ্যমে ইস্তাম্বুল থেকে রাশিয়ার প্রত্যাহারের বিনিময়ে রাশিয়ার সাথে আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় সুলতান। এখানে একটি গোপন ধারার মাধ্যমে প্রণালি দিয়ে যে কোনো সময়ে যুদ্ধজাহাজ পারাপারের অধিকার পায় রাশিয়া। এই ধরনের সুবিধা রাশিয়ার মতো ব্যতীত অন্য কোনো দেশকে দেয়া যাবে না। এছাড়াও যুক্তিযুক্ত মনে হলে বসফরাসের তীরে রাশিয়া বাহিনী অবতরণের অধিকারও সংযুক্ত হয় এতে।

কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজের এশীয় ভূখণ্ডের এত বড় একটি অংশ বিদ্রোহী প্রজার হাতে ছেড়ে দিতে নারাজ হন সুলতান মাহমুদ। অন্যদিকে ১৮৩৮ সালে মাহমুদ আলী প্রায় স্বাধীনতা ঘোষণার মতো করে পোর্তেকে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। তাকে ভেঙে ফেলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ইউফ্রেটিসের তীরে সৈন্য সমাবেশ করেন সুলতান মাহমুদ।

এছাড়া সিরিয়ার উপকূলে সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য একটি রণতরীও প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু উভয় কৌশল ভয়ানকভাবে ব্যর্থ হয়। সুলতানের সেনাবাহিনী পুরোপুরি পরাজিত। এর প্রধান কারণ ছিল মিশরীয় স্বর্ণের লোভে পড়ে ঘুষ নিতে রাজি হয় সৈন্যরা। রণতরীর দুর্যোগ হয় আরো ভয়াবহ। এর বিশ্বাসঘাতক কমান্ডার সোজা আলেকজান্দ্রিয়ায় চালিয়ে নিয়ে মাহমুদ আলীর কাছে অর্পণ করে রণতরীকে।

এতে করে দ্বিতীয়বারের মতো রাশিয়া আক্রমণের আশঙ্কায় পশ্চিমা শক্তি তুর্ক-মিশরীয় সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। ফ্রান্স সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সুলতানের বিরুদ্ধে মাহমুদ আলীকে সমর্থন করে ফ্রান্স। লর্ড পামারস্টোনের নেতৃত্বে লন্ডনে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্রিটেন, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া ঐকমতে পৌঁছায়। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাহমুদ আলীকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, যদি সে সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে তুর্কি রণতরী পোর্তেকে ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তাকে সিরিয়াতে পাশা হিসেবে ও মিশরে উত্তরাধিকার সূত্রে পাশা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ত্রি-শক্তির রণতরী মিশর ও সিরিয়া উভয়কেই অবরোধ করবে।

মাহমুদ আলী এই চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করলে ব্রিটিশ রণতরী উদয় হয় সিরিয়ার উপকূলে। দুটি সফল অভিযানের মাধ্যমে গোলাবর্ষণ করে বৈরুত ও আক্রার দুর্গ ধ্বংস করে দেয় ব্রিটিশ সৈন্যরা। এরপর সৈন্যরা মাহমুদ আলীর বিরুদ্ধে আরবীয় বিদ্রোহের সহযোগিতায় মিশরীয় বাহিনীকে পরাজিত করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ফ্রান্স ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি দেয়। কিন্তু লুইস ফিলিপি দ্রুতই বুঝতে পারে যে যুদ্ধের হুমকি প্রদান ও যুদ্ধ করার মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এরপর অ্যাডমিরাল ন্যাপিয়ারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ রণতরী আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে গোলাবর্ষণের হুমকি দেয়। এতে ভীত হয়ে মাহমুদ আলী আলোচনায় বসতে রাজি হয়ে যায়। সুলতানের রণতরী ফিরিয়ে দিয়ে কর প্রদান পুনরায় শুরু করেও সৈন্যবাহিনীর আকার কমাতে রাজি হয়ে মিশরের পাশা হয় উত্তরাধিকার বলে। কিন্তু একই সাথে সিরিয়া থেকে অপসারিত হয়ে এখানে পোর্তের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়, ক্রিটসহ।

১৮৪১ সালে লন্ডনে এক কনভেনশনে ঐকমত্যে পৌঁছায় পশ্চিমা শক্তিসমূহ। এবার ফ্রান্সও এতে যোগ দেয়। দার্দেনালেস ও বসফরাসকে তুর্কি জলসীমা হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়।

কিন্তু সুলতান মাহমুদ নিজের প্রজার হাতে অবমাননাকর পরাজয় বা তারচেয়েও বেশি উৎসাহদায়ক ফলাফল দেখে যেতে পারেননি। ১৮৩৯ সালের ১ জুলাই সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ মৃত্যুবরণ করেন। মহান সুলতানদের মাঝে অবশ্যই নিজের জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। পূর্বসূরিদের ন্যায় হয়তো সামরিক

শাসক ছিলেন না; কূটনীতিতেও দক্ষ ছিলেন না। কিন্তু আভ্যন্তরীণভাবে একজন শাসকও দূরদর্শিতার জন্য তিনি ধন্যবাদের যোগ্য। পতন ঠেকিয়ে, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীদের হটিয়ে ধীরে হলেও আধুনিক রাষ্ট্রের দিকে এগিয়েছে তুরস্ক।

এরপর সালতানাতে অভিষেক হয় ষোলো বছর বয়সী মাহমুদপুত্র সুলতান আবদুল মজিদের।

॥ ৩২ ॥

সুলতান আবদুল মজিদ হয়তো পিতা মাহমুদের ন্যায় পারদর্শী ছিলেন না; কিন্তু সাম্রাজ্যের প্রতি আন্তরিকতার কোনো শেষ ছিল না তাঁর। পিতার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তরুণ সুলতান আবদুল মজিদ। দয়ালু স্বভাবের মজিদ সুলতানদের মাঝে "সবচেয়ে ভদ্রজন" হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন। চিন্তাশীল ও সিরিয়াস স্বভাবের তরুণ সুলতান ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্ট্যার্টফোর্ড ক্যানিংয়ের কাছ থেকে প্রথম সত্যিকারের রাজকীয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ক্যানিংয়ের ভাষায়, "পূর্বপুরুষদের সমস্ত সৎ গুণাবলি সমেত সুলতান মজিদ ছিলেন দয়ালু মেজাজের, যার ছিল দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা, অহংকারবিহীন মর্যাদাবোধ, বিচক্ষণতা ও মানবিকবোধ। দয়াশীল ও স্বাধীন নীতিসমূহের মাধ্যমে সংস্কারকাজ সম্পন্ন করেন তিনি। এই ধরনের কোন পদক্ষেপ নিজে না নিলেও, এদের বাস্তবায়নে ও উন্নতিতে কাজ করে গেছেন।" রাষ্ট্রদূত ও সর্বপ্রধানের মাঝে প্রথম থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে ও মজিদের নীতি তৈরিতে ক্যানিং বেশ প্রভাব রাখে।

তরুণ বয়স থেকেই সুলতানের ওপর তাঁর মাতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। কেননা পিতার মতো একাকী পথ চলতে অক্ষম মজিদের প্রয়োজন ছিল বিশ্বাসযোগ্য ও সৎ উপদেষ্টাদের। ক্যানিংয়ের কাছে সুলতান স্বীকার করেছিলেন যে, "দশজন সহযোগি পাশা পেলেই তিনি সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিন্তবোধ করবেন।" অসাধারণ এ রকম একজন ছিল মুস্তাফা রশীদ পাশা। প্যারিসে এবং অনান্য পদে অটোমান কূটনীতিক হিসেবে যে বিচক্ষণ ভূমিকা পালন করে গেছে। মাহমুদের মৃত্যুর সময়ে রশীদ লন্ডনে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে একটি বিশেষ মিশনে ব্যস্ত ছিল। ত্বারিত গতিতে দেশে ফিরে রশীদ পশ্চিমাদের কাছে প্রমাণ করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, অটোমান রাষ্ট্রও আধুনিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ইউরোপীয় মতামতের দিকে দৃষ্টি রেখে সংস্কার নীতির খসড়া তৈরি করে রশীদ পাশা; কার্যত যা ছিল দ্বিতীয় মাহমুদের শেষ ইচ্ছে।

১৮৩৯ সালে ৩ নভেম্বরে সেরাগলিওতে একটি উন্মুক্ত মঞ্চে বিদেশি কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে আবদুল মজিদের সামনে নাটকীয়ভাবে এটি পেশ করা হয়। এ জায়গার নাম ছিল গোলাপ প্রকোষ্ঠ। কেননা এখানে গোলাপ দিয়ে মিষ্টান্ন তৈরি হতো।

যে কোনো ইসলামিক দেশের জন্য প্রথম সংবিধান হিসেবে ছিল আইনি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের দলিল। সাম্রাজ্যের প্রজাদের জন্য ম্যাগনা কার্টা। এখানে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে দ্বিতীয় মাহমুদের রাজত্বকালের সময়ে অটোমান সাম্রাজ্যের জন্য নেয়া সকল পরিকল্পনার বিস্তারিত উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে পরবর্তী দুইদশকের মাঝে এগুলো কার্যকর হয়। সামগ্রিকভাবে এর নামকরণ হয় "পুনর্গঠন" বা "তানজিমাত"। এতে জীবন, সম্মান ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। কর সংগ্রহ ও মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত পদ্ধতি গঠনের পাশাপাশি কর-দুর্নীতি রোধ করা হয়। সেনাবাহিনীতে নিয়োগ ও চাকরির সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়। অবশেষে আইনের অধীনে স্বচ্ছ বিচারব্যবস্থা ও বৈধ কারণ ব্যতীত শাস্তি প্রদান রোধ হয়।

১৮৪০ সালে কাউন্সিল অব জাস্টিসকে বৃহৎ পরিসরে পুনর্গঠন করা হয় ও তানজিমাতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন কাউন্সিলের সদস্যরা নিজেদের মত প্রকাশে স্বাধীন ছিল। সুলতান বাধ্য ছিলেন অধিকাংশের মত সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে। কিন্তু কার্যত এতে সুলতানের একচ্ছত্র ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। সাংবিধানিক সংস্কারের কোনো দলিল ছিল না এতে। কাউন্সিলের সদস্যগণ নির্বাচিত নয় বরঞ্চ সুলতানের ইচ্ছে ও পছন্দেই নিয়োগ পেত। ফলে তাত্ত্বিকভাবে সীমিত হলেও বাস্তবে একচ্ছত্র ক্ষমতা অক্ষতই রইল।

তানজিমাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নীতি ছিল তা হলো সব অটোমান প্রজার ওপর এই পদ্ধতির সমানাধিকার। কোনো মত বা জাতি বৈষম্য ছিল না। এর ফলে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মাঝে ও অন্যান্য অ-মুসলিমদের মাঝে সকল বৈষম্য মুছে যায়। আইন, সম্পদ, কর প্রদান, শিক্ষা-সাধারণ বা সামরিক বিদ্যালয়ে সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মের যে কোনো শাখায় নিয়োগের ক্ষেত্রে সকলের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা একই হয়।

রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের মতে গুলহানের (গোলাপ প্রকোষ্ঠ) এই সিদ্ধান্তে পশ্চিমাদের ওপর বিস্ময়ের আঘাত হানে অটোমান সাম্রাজ্য। একজন ইসলামিক সম্রাট নিজের দরজা খুলে দেয় খ্রিস্টানদের জন্য। লর্ড পামারস্টোনের মতে "নীতি'র এহেন মহৎ আঘাতের ফলে এখানেও ফ্রান্সের জনমনে বিপুল প্রভাব পড়বে।" কিন্তু মিটারনিক ও অন্যান্যরা এসব সংস্কারের

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করে। কেননা বাস্তবে এদের কোনো আশা ছিল না কার্যে প্রয়োগ হবার।

নতুন সুযোগ ও চিরস্থায়ী সুবিধার আশায় ইউরোপীয়দের সমাগম ঘটতে থাকে অটোমান রাষ্ট্রে। কিন্তু এর মাধ্যমে অমুসলিম প্রজারা অন্য খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শঙ্কায় নারাজ হয়। একই ভাবে মুসলিমরাও খ্রিস্টানদের পাশাপাশি কোনো খ্রিস্টান কমান্ডারের অধীনে যুদ্ধ করার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। অটোমান দেশপ্রেমের বোধ না থাকায় খ্রিস্টানরা শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের বাড়তি সুবিধা হারানোর শঙ্কায় ও যাজকবর্গ ও ধর্মনেতারা নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার চিন্তায় মেতে ওঠে। অটোমান সরকারের স্বদিচ্ছার ওপর ভরসা করতে না পেরে তারা বিদেশি সাহায্যকে শ্রেয় মনে করতে থাকে—বিশেষ করে রাশিয়াকে—স্বায়ত্ত্বশাসন ও স্বাধীনতার খোঁজে।

অন্য দিকে বেশির ভাগ মুসলিম অবিশ্বাসীদের এহেন দাসত্বমোচনে খেপে ওঠে। কেননা এতে তাদের মুসলিম ধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রাচীন বোধের গায়ে সরাসরি আঘাত পড়ে। এ রকম বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যজুড়ে প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে; যা একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুলতান ছাড়া দমন করা সম্ভব ছিল না।

১৮৪১ সালে এ রকমই ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। রশীদ পাশা বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত নতুন আদালতে বাণিজ্যিক মতদ্বন্দ্বসমূহ নিয়ে আলোচনায় বসে। ফরাসি নীতির ওপর নির্ভর করে নতুন বাণিজ্য নীতি তৈরির অভিপ্রায়ও ছিল তার। কিন্তু মুসলিম বিচারকেরা শরিয়তের বরখেলাপ করে বিবেচনা করায় একজন জিজ্ঞেস করে ওঠে, এটি পবিত্র আইনানুযায়ী গঠিত হয়েছে কিনা। রাশীদ উত্তর দেয়, "পবিত্র আইনের এ ব্যাপারে কিছু করার নেই।" এ পর্যায়ে উলেমা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, "ঈশ্বরনিন্দা!" নীতি প্রস্তুতি সেখানেই স্থগিত করে বৈদেশিক ব্যবসায়ী ও সুলতানের বিরাট ক্ষতি করে উলেমাদের চাপে রশীদকে পদচ্যুত করে প্যারিসে প্রাক্তন দূতাবাসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ পদে আগমন ঘটে রিজা পাশা ও প্রধান উজির ইজ্জত মাহমুদ, পশ্চিমা ধারণা ও বিদেশিদের প্রতি ঘৃণার কারণে যে কুখ্যাত ছিল।

যাই হোক সেরাস্কার বা প্রধান কমান্ডার হিসেবে রিজা পাশা সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করে। যার মাধ্যমে সাম্রাজ্য শক্ত অবস্থানে পৌছে যায়। দুভাগে বিভক্ত হয় সেনাবাহিনী।

সক্রিয় বাহিনী—নিজাম পাঁচ বছর সময়সীমা হয় এদের দায়িত্ব পালনে; সংরক্ষিত বাহিনীর দিক নিজ নিজ জেলার হয়ে সাত বছর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। নিয়োগ প্রদান হয় বাধ্যতামূলক; প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি

ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধাঁচ অনুকরণ করা হয়। নতুন বাহিনীতে পুরোনো তুর্কি বাহিনীর ন্যায় সাহস ও নিয়মানুবর্তিতা প্রস্ফুটিত হয়। সামরিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের মাধ্যমে অফিসারদের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক আদেশ জারির পরেও এতে খ্রিস্টানরা ছিল না। এটা অনেকটা তেল ও জলের মিশ্রণের মতো অথবা লর্ড পামারস্টোনের ভাষায় "যেন কুকুর এবং বিড়াল একই বাক্সে বন্দি হবে।" ঘটনাক্রমে অমুসলিমদেরকে সামরিক কর্ম থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় অব্যাহতি কর প্রদানের বিনিময়ে। কিন্তু অতীতের মতোই নৌবাহিনীতে খ্রিস্টানদেরকে নিয়োগ দেয়া হতো। এই পুনর্গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় রিজা পাশার বন্ধু ব্রিটিশ নৌ অফিসার আদোলপাস্ স্লেডকে নতুন সেনাবাহিনী নির্মাণই, দেশের প্রতি রিজার একমাত্র সার্থক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া চার বছরব্যাপী সাধারণভাবে অবিচার, নিরাপত্তার অভাব ও প্রতিক্রিয়ার কারণে "গোলাপ প্রকোষ্ঠ" ধূলি-ধূসরিত হয়ে পড়ে।

এরই মাঝে স্ট্যাটফোর্ড ক্যানিং টের পায় যে অর্থমন্ত্রীর অজ্ঞতার ভান ও দুজন খ্রিস্টান পুঁজিবাদীর সহযোগিতায় রিজা পাশা অটোমান তহবিলের তছরুপের কাজে মেতে উঠেছে। কিন্তু তরুণ সুলতানকে এ ব্যাপারে অবগত না করে বরঞ্চ রিজার ওপর দৃষ্টি রাখে ক্যানিং।

এর পর থেকে ক্যানিং নিজের প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্বাসের প্রতি অনুগত হিসেবে খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করে চলে। একজন তরুণ আর্মেনীয়ান ও একজন তরুণ গ্রিক, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এরা পুনরায় আবার খ্রিস্টান ধর্মে ফেরত গেলে পর কোরআনি আইন অনুযায়ী তাদের হত্যা করা হয় স্বধর্ম ত্যাগ করার অপরাধে। এ ঘটনার প্রচণ্ড বিরোধিতা করে ক্যানিং। অবশেষে ব্যক্তিগতভাবে সুলতানকে প্রভাবিত করে ক্যানিং যে, "রাজকীয় প্রতিজ্ঞা করার জন্য যেন এরপর থেকে তাঁর ভূখণ্ডে কোনো খ্রিস্টান অপমানিত না হয় বা ধর্মের জন্য কোনো রকম নিগৃহীত না হয়।" জনসমক্ষে ঘোষণার মাধ্যমে এ নিশ্চয়তা সাম্রাজ্যের সব প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। রাণি ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে এ কাজের জন্য সুলতান অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করেন। এভাবে ক্যানিংয়ের প্রভাবে ১৮৪৫ সালে রিজা'কে পদচ্যুত করেন সুলতান।

ক্যানিংয়ের সন্তুষ্টি ঘটিয়ে রাশিদ প্রধান উজির হিসেবে ফিরে আসে। সংস্কারকাজও নবায়ন হয়। এরপর সুলতান আরো ঘোষণা করেন যে সামরিক সংস্কার ব্যতীত প্রজাদের উন্নতিকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে মন্ত্রীগণ। বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা শুরু করেন সুলতান। শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক নয়, অটোমান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমিটি গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও অনুদানের অভাবে এ নির্মাণ কখনো শেষ হয়নি। মাত্র কয়েক ফুট উঁচু দেয়াল করার পরপরই কাজে ইতি টানা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উলেমাদের অপতৎপরতা সত্ত্বেও খানিকটা উন্নতি ঘটে। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা বাড়ে খুবই ধীর গতিতে।

এক নতুন আইনের মাধ্যমে সুলতান প্রাদেশিক সরকারের ওপর সাহসী পরীক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। পাশাদের ক্ষমতাকে খর্ব করে এর ভিত্তি ছিল জনমত। প্রতিটি প্রদেশ থেকে দুজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসব বিখ্যাত নাগরিকের বুদ্ধিমত্তা, স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বিবেচনা করা হতো। এর মাধ্যমে উচ্চ কাউন্সিলে তারা তাদের বর্তমান অবস্থা ও এর প্রেক্ষিতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খোলাখুলি জানাতে পারত।

কিন্তু এতে তেমন সাড়া না পাওয়ায় সুলতান ভ্রাম্যমাণ কমিশনার প্রেরণ করে সংস্কার কার্যের অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করার আদেশ জারি করেন। প্রতিটি পাশা বা গভর্নরের জন্য কাউন্সিল বা মজলিস স্থাপন করেন সুলতান। স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে এদের সদস্য নির্বাচিত হতো। কিন্তু এই স্বদিচ্ছার উত্তরে প্রতিক্রিয়াশীল তুর্কিরা শুধু সংস্কারের চেতনাকেই নসাৎ করত। ফলে কার্যত দেক্ষা দমন রোধ করার পরিবর্তে গভর্নর কাউন্সিলকে দোষারোপের মাধ্যমে একক সিদ্ধান্তেই সব বিচার সম্পাদন করত।

দুটি ক্ষেত্রে ক্যানিং সংস্কার কার্যের উন্নতিতে নিজের সচেতন দৃষ্টি বজায় রেখেছিল। বস্তুত বিদেশি রাষ্ট্রদূতেরা, তানজিমাতের মাধ্যমে যাদের পদমর্যাদা বেড়ে যায়; দুর্নীতিপরায়ণ পাশার বিরুদ্ধে আক্রমণ বা খ্রিস্টানদের পক্ষ নিয়ে কথা বলার মতো অবস্থায় পৌঁছেছিল। এমনকি কখনো কখনো নিজেদের অবস্থার উন্নতিতেও মন্তব্য করতে পারত তারা। ক্যানিং সুলতানকে প্রভাবিত করে দুটি বিষয়ে সফলতা লাভ করে। তুর্কি জলযানসমূহে করে দাস পরিবহন ব্যবস্থা রদ করা ও ভূমি কর ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ না করে পূর্বের মতো সম্প্রদায় প্রধানের কাছ থেকে সংগ্রহ করার নীতির বাস্তবায়ন।

১৮৪৭ সালে বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে নাগরিক ও অপরাধী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। অটোমান ও ইউরোপীয়দের মাঝ থেকে সমান সংখ্যক বিচারক নিয়োগ পেত ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে ইসলাম নয়, ইউরোপীয় নীতি অনুসরণ করা শুরু হয়। ১৮৫১ সালে শাস্তির ধারায় পরিবর্তন আসে। রাশিদ পাশা নিজের বাণিজ্যিক ধারার স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। বাণিজ্যিক ট্রাইব্যুনালের অধীনে বিদেশি বিশেষ করে ফরাসিদের বাণিজ্যিক কাজ-কারবারকে নতুন করে সংজ্ঞায়ন, নিরাপত্তা ও সুবিধা দেয়া হয়। ফরাসি বণিকেরা বহুপূর্ব থেকেই অটোমান সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও তুর্কি আদালতে এ জাতীয় সমস্যার মীমাংসা পেত না। যদিও আইন ও অপরাধ ক্ষেত্রে পেত না। যদিও আইন ও অপরাধ ক্ষেত্রে পেত, কিন্তু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নয়।

বর্তমানে রাশিদ পাশার তৈরি নীতি বলে তুর্কি ও ফরাসি বিচারকেরা বাণিজ্যিক সংঘর্ষের সমাধান করার ক্ষমতা লাভ করে। ১৮৫০ সালে তুরস্কে উলেমাদের হাত থেকে স্বাধীন ও শরিয়তের বাইরে আইনানুযায়ী বিরোধ মেটাবার জন্য আইনি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এই বাণিজ্যিক সংহিতার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে এক ধরনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ঘটে। তুর্কি অর্থনীতিতে পশ্চিমাদের জন্য দ্বার খুলে যাওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক সম্পর্কও বৃদ্ধি পায়।

এর কিছুদিন পরেই অ্যাংলো-তুর্কি বাণিজ্যিক কনভেনশন স্থাপিত হয়। মুক্ত বাণিজ্য, আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়মিত হারে কর ও সীমাবদ্ধ চর্চাসমূহের রদ করার মাধ্যমে ব্রিটিশ ও অটোমান উভয় বণিকেরাই লাভবান হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে ফরাসিদের পরিবর্তে ব্রিটিশরা পূর্ব জলসীমার কাছে প্রধান বণিক জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ফরাসি ও ডাচ্‌দের সাথে ও অটোমান বাণিজ্যিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যবসা বাণিজ্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায় এবং আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির নতুন যুগের সূচনা হয়। সাম্রাজ্যের ভূখণ্ডসমূহ ইউরোপীয় শিল্পের উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক অর্থনীতির ন্যায় ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী। নতুন শহর প্রতিষ্ঠার ফলে শহুরে জনগণের সংখ্যা বেড়ে যায়—কৃষক ও কারিগরদের ধ্বংস বেড়ে যায়। মাত্র এক প্রজন্মের মাঝেই বড় শহরগুলো আকারে দ্বিগুণ, তিনগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ইউরোপীয় ও লেভানটিন জনগণে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মুসলিম তুর্কিরা বণিক, ব্যবসায়ী ছিল না। প্রশাসক, সৈন্য ও জমি কর্ষণকারী হিসেবে শতাব্দী থেকে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে তারা। বহুকাল থেকেই সুলতানেরা পরিপূর্ণ রাজকোষ বা সচল মুদ্রা ব্যবস্থা দেখেননি, এর ফলেই সরকারের নানা অংশে দুর্নীতি বাসা বাধে। মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করাটাই তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ১৮৪০ সালে সুলতান আবদুল মজিদ একটি অটোমান ব্যাংক নির্মাণের আদেশ জারি করেন। ইউরোপীয় ধাঁচের এ ব্যাংকে সরকারের আর্থিক সাহায্য নিশ্চিত ছিল।

এরপর তহবিল বন্ড হিসেবে কাগুজে অর্থের প্রচলন হয়। এরপর ১৮৪৪ সালে পুরাতন মুদ্রা বিলোপ করে ইউরোপীয় ধাঁচে গোল্ড পাউন্ডের ভিত্তিতে নতুন মুদ্রা প্রচলিত হয়।

কিন্তু ঊনবিংশ শতকের পুঁজিবাদের ভিত্তিতে আর্থিক বিষয় দেখভালের ক্ষেত্রে অটোমান সুলতানদের বিচক্ষণতার অভাব ছিল। ১৮৫৮ সালের পর থেকে একের পর এক সুলতান বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে আর্থিক পতন ত্বরান্বিত হয়। সাম্রাজ্যের মাঝে মুসলিম তুর্কি, নন-মুসলিম ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, স্থায়ী বসবাসকারী গ্রিক বা আর্মেনীয় কেউই এই বাণিজ্য

নীতির সুফল পায়নি। ইউরোপের পুঁজিবাদী উদ্যমসমূহ তুর্কি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। এর ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক বিষয়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে শুরু করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতেরা।

শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সাম্রাজ্যের মাঝে সংস্কার চেতনা তার শক্তি হারাতে থাকে। স্ট্যাটফোর্ড ক্যানিং নানা সফলতা সত্ত্বেও ব্যর্থ হন কারাগারের উন্নয়ন, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন, সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে। এছাড়া খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মাঝে সত্যিকারের একতা আনয়নেও বিফল হন ক্যানিং। একসময়কার ব্যগ্র ও উৎসাহী সংস্কারক মনোবল হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়ে রাশিদ পাশা।

ঋণে জর্জরিত হয়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। সুলতান নিজে সংস্কারকাজে শ্রান্ত হয়ে জনবিষয় থেকে বিফল মনোরথে অবসর নেন। দুঃখজনকভাবে ক্যানিনকে ফিরিয়ে দেন।

হারেমের দেয়ালে আকৃষ্ট হয়ে জীবন যাপন শুরু করেন সুলতান। এতে বিস্ময় উদ্রেগ হয় ইংরেজ ভ্রমণকারী ও পরিদর্শক চার্লস ম্যাকফারলেনের "বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সুলতান আট সন্তানের জনক হয়ে যান। রাজকীয় হারেমে তিন বছরের একটু বেশি সময়ের মাঝে বিভিন্ন নারীতে উপগত হন সুলতান।" পরবর্তীতে দিনপঞ্জিতে আরো লিখেছেন, "অতি প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে ফায়ারিংয়ের বিপুল গর্জন শুনতে পাই আমরা। সুলতান আরেকটি পুত্রসন্তানের জনক হয়েছেন। মাত্র গত সপ্তাহেই একজন কন্যা জন্ম নিয়েছে তাঁর পক্ষে!"

তহবিল শূন্যতায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ক্যানিংয়ের সতর্কতা অবহেলা পুরাতন সেরাগলিও'তে ক্লান্ত সুলতান বসফরাসের ইউরোপীয় তীরে নতুন প্রাসাদ 'দোলনা বাইচে' নির্মাণ করেন। ইউরোপীয় নিও-রেনেসাঁ ধাঁচে নির্মিত এ প্রাসাদের মার্বেল হল স্বর্ণের পাতা, খ্রিস্টান, স্ফটিক সমেত চকচক করত। ফরাসি ও ইটালিয় চিন্তাকরেরা প্রাসাদের ছাদ অঙ্কন করেছিলেন; সিংহাসন কক্ষে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আয়না আর সুলতানের শয়নকক্ষে বিছানা ছিল খাঁটি রুপার তৈরি।

ভবিষ্যৎ সুলতানদের জন্য এ প্রাসাদ স্থায়ী বাসভবনে রূপ লাভ করে। ইউরোপীয় কায়দায় এখানে আরাম আয়েশে দিন যাপন করতেন সুলতান আবদুল মজিদ। সংগীতের প্রতি অনুরাগের কারণে আধুনিক সুর পরিবেশনের জন্য তুর্কি বাদকদলকে জার্মান ও ইটালীয় শিক্ষকেরা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। ফলে প্রাচীন মার্শাল বাতাবরণ দূর হয়। এছাড়াও ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত ইউরোপীয় অভিনেতা, ব্যালে ড্যান্সার ও অন্যান্য পরিবেশনা সুলতান উপভোগ করতেন প্রাসাদের সাথে লাগোয়া থিয়েটারে বসে। এরই মাঝে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বিশৃঙ্খার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়।

অবশেষে সময় আসে যখন মহান এলচি, (অর্থ রাষ্ট্রদূত, অথবা এক্ষেত্রে ক্যানিং) তরুণ সম্রাটের পূর্ব প্রতিজ্ঞা সম্পর্কের মোহ কেটে যায়। উদ্দেশ্যবিহীনতা সম্রাট ও তাঁর প্রধান উজিরের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসেবে দেখা দেয়। পামারস্টোন একই ভাবে ভীত হয়ে ওঠে যে, "সাম্রাজ্যের পতনের শেষ দিন এসে গেছে ভীরুতা, দুর্বলতা এবং সম্রাট ও তাঁর মন্ত্রীদের সদিচ্ছার অভাবের কল্যাণে।" নিজের রাষ্ট্রদূতকে কোনো সংস্কারের জন্য চাপ না দিতে উপদেশ দেয় পামারস্টোন। ক্যানিং স্বীকার করে নেয় যে, "বর্তমানের জন্য উন্নয়নের সমস্ত ক্রীড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এটি মেনে নেয়া আমার জন্য কষ্টকর যে আমার এখানে থাকার সব উদ্দেশ্য শেষ হয়ে গেছে।"

রাশিদ সংস্কারকাজে ব্যর্থ হয়; কিন্তু এতে তার ব্যক্তিগত দুর্বলতার চেয়েও বেশি কাজ করেছে তুর্কি জনমতের একসাথে চলার অনীহা। এছাড়া একে সমর্থন করার জন্য নিরপেক্ষভাবে শিক্ষিত শ্রেণীরও অভাব ছিল। এমনকি আমূল পরিবর্তনবাদীরাও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতা করে পুরোপুরি ইসলামি মতধারার একটি সভ্যতার কাছে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা তুলে ধরতে ভয় পাচ্ছিল।

এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে তারা। যেমনটা ক্যানিং নিজেও আন্দাজ করতে পেরেছিল যে, ধর্মীয় ও জাতিগত পার্থক্য সমূহ দূর করা হলে খ্রিস্টানদের সুবিধা না হয়ে বরঞ্চ তুর্কিরা আরো অসুবিধার পথে যাবে।

তাই স্ট্যাটফোর্ড ক্যানিং নিজের পদে ইস্তফা দিয়ে ১৮৫২ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে যায়। প্রত্যাশা করেছিল "হয়তো আর ফেরা হবে না।" কিন্তু আকস্মিকভাবে ঘটনা মোড় নেয়ায় মাত্র এক বছরের মাথায় লর্ড স্ট্যাটফোর্ড ডি রেডক্লিফ নামে ফিরে আসে ইস্তাম্বুলে। দশকজুড়ে যে শান্তির সময় সে কাটিয়ে গেছে ইস্তাম্বুলে হঠাৎ করেই তার অবসান হয়েছে। আরো একবার রাশিয়ার সাথে স্মরণীয় সমরে জড়িয়ে পড়ে অটোমান সাম্রাজ্য।

॥ ৩৩ ॥

নিজের রাজত্বকালের সূচনালগ্ন থেকেই রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের দিন গুনে পশ্চিমা শক্তিসমূহকে চাপ দিয়ে আসছিল এ সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়ার জন্য। কূটনৈতিক চাপ হিসেবে ব্রিটেনের কাছে প্রথম বিষয়টি উত্থাপন করে স্বেচ্ছাচারী নিকোলাস ১৮৪৪ সালে লন্ডন ভ্রমণের সময়ে। কিন্তু প্রত্যাখাত হয়। এখন ১৮৫৩ সালের শুরুতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হ্যামিলটন সিমারের সাথে অনানুষ্ঠানিক কিন্তু ঐতিহাসিক আলাপচারিতায় আবারো বিষয়টির অবতারণা করে জার।

অটোমান সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থা ও সম্ভাব্য পতনের উল্লেখ করে জার ব্যক্ত করে যে ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার এ ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে এগিয়ে আসা উচিত। এছাড়াও জার আরো উল্লেখ করে যেন একে অপরের অজ্ঞাতে কোনো পদক্ষেপ না নেয়া হয়। সবশেষে জার উপসংহারে বলে "আমাদের হাতে একজন অসুস্থ লোক—ভয়াবহ অসুস্থ। এটি দুর্ভাগ্য হবে যে যদি এসব দিনে সে আমাদের হাত ফসকে বেরিয়ে যায়। বিশেষ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আগেই যদি এমনটা ঘটে।"

এর উত্তরে সিমার পরামর্শ দেয় এমতাবস্থায় একজন চিকিৎসক প্রয়োজন। শল্যবিদ নয়, অসুস্থকে সুস্থ করার জন্য সাহায্য করতে হবে। জারের চ্যান্সেলর নেসেলরডও একই মত পোষণ করে জানিয়ে দেয় যে রোগীর অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। এটি যতটা সম্ভব দীর্ঘতর করা উচিত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড অ্যাবারডিনও এতে একমত হয়।

কয়েক দিন পরে জার নিজের পরিকল্পনাকে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রদূতকে নিশ্চয়তা দিয়ে জার জানিয়ে দেয় যে কনস্টান্টিনোপল নিয়ে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনের পরিকল্পনা বা স্বপ্ন কোনোটাই সমর্থন করে না নিকোলাস। রাশিয়ার জনগণের জন্য যথেষ্টই ভূখণ্ড রয়েছে ইতিমধ্যে। তাই আর প্রয়োজন নেই। একইভাবে তুর্কিদের কাছ থেকেও এখন আর কোনো ভয় নেই। আবার একই সাথে সাম্রাজ্যের কয়েকশ খ্রিস্টানের নিরাপত্তার দায়িত্বও তার হাতে, যাকে সে অবহেলা করতে পারে না। যদি সাম্রাজ্যের পতন হয় তাহলে আর ওঠে দাঁড়াতে পারবে না। তাই কোনো বিপর্যয় ভেঙে পড়ার পূর্বেই আগাম ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

"একজন ভদ্রজন ও বন্ধু হিসেবে রাষ্ট্রদূতের কাছে কনস্টান্টিনোপলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করে জার। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করে তুরস্কের ওপর ফরাসি আক্রমণ হলে এর সীমান্তে রাশিয়া বাহিনী অবতরণ করবে। আরো একটু বিস্তৃতভাবে জার ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দেয় ওয়ালাসিয়া, মলদোভিয়া, সার্বীয়া ও বুলগেরিয়ার ওপর জার নিরাপত্তার বেষ্টনী গড়ে তুলবে। মিশরকে ব্রিটেন দখল করে নিলে সেক্ষেত্রে রাশিয়া কোন বাধা আরোপ করবে না। এক্ষেত্রে সিমার আগ্রহী হয়ে ভাবতে বসে যে, মিশরকে ব্রিটেনের প্রয়োজন, "ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ও মাতৃভূমির মাঝে নিরাপদ ও সদা প্রস্তুত যোগাযোগব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য।"

এই প্ররোচনার উত্তরে পররাষ্ট্র সেক্রেটারি লর্ড জন রাসেল অষ্টাদশ শতকের শুরুতে স্প্যানিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মাঝে করা চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন আপাত দৃষ্টিতে "সন্তানহীন ও শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শাসককে মনে হয়েছিল মৃত্যুপথযাত্রী।" অথচ কার্যত

তা হয়নি। ইংল্যান্ডের হয়ে তাই রাশিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে লর্ড ব্যক্ত করে, “কনস্টান্টিনোপল দখলের সকল ইচ্ছে ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।”

এভাবেই ব্রিটিশ সরকার তুরস্ক ও রাশিয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মন্তব্য ব্যক্ত করে। এর কিছুদিন পরে লর্ড রাসেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে লর্ড ক্ল্যারেনডন একই মত ব্যক্ত করে।

রাষ্ট্রদূতের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে রাশিয়া, অস্ট্রিয়াকে সাথে নিয়ে ব্রিটেনের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। কেননা প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টান পবিত্র ভূমি ও অটোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টান জনগণের অভিভাবকত্ব প্রসঙ্গে ফ্রান্স রাশিয়ার ঘোষিত শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

জার নিকোলাস ও ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের মাঝে যথাক্রমে অর্থডক্স গ্রিক ও রোমান ক্যাথলিক গির্জা নিয়ে ধর্মীয় বিষয়ে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে; যা উভয় দেশই সমঝোতা করতে রাজি নয়। ফলে যুদ্ধ অনেকটা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। গসপেল কাহিনী অনুযায়ী জেরুজালেম ও বেথলেহেমের আশপাশে ও এর নিচে পবিত্র সমাধির উপস্থিতিতে এ ভূখণ্ড খ্রিস্টানদের তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তুর্কিরা এ অঞ্চলের প্রভু; কেননা এ অঞ্চলে মুসলিম তীর্থ ভূমি মক্কা ও মদিনা অবস্থিত। এ স্থান থেকে বার্ষিক কর আদায় করছে তুর্কি সরকার। এখন তুর্কি সরকারের দয়িত্ব প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টান গির্জাসমূহকে এ কর যথোচিতভাবে বণ্টন করে দেয়া। এই বণ্টন হয়ে দাঁড়ায় চিরস্থায়ী সংঘর্ষের কারণ।

১৭৪০ সালে ফ্রান্স সুলতানের কাছ থেকে প্যালেস্টাইনে ল্যাটিন গির্জা বিষয়ে সুবিধা আদায় করে নেয়। রাশিয়ার ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় ও ফ্রান্সের ধর্মীয় উন্মাদনা কমে যাওয়ায় গ্রিক অর্থডক্স গির্জা এ অধিকার দখল করে নেয়। এর যাজক সম্প্রদায়ও রাশিয়ার কাছ থেকে বেশি সমর্থন ও সুবিধা পেতে শুরু করে।

বেথলেহেমে অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদ ল্যাটিন সন্ন্যাসীরা অনুতাপ করে বলা শুরু করে, ত্রাণকর্তার জন্মস্থান পঞ্চাশ বছরের মতো পূর্ব থেকে ল্যাটিনদের তাড়িয়ে গ্রিকদের দিয়ে দেয়া হয়েছে এক ফরমান জারির মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতকজুড়ে এ অঞ্চলে ও সম্পত্তির ওপর গ্রিক প্রভাব বেড়ে যায়। এছাড়া অর্থডক্স পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়া থেকে তীর্থযাত্রীরা ইউরোপ ও এশিয়াতে তীর্থে অংশ নিতে থাকে। তাদের স্বর্ণ হয়ে দাঁড়ায় পবিত্র সমাধিস্থলের গির্জার সম্পদের উৎস। অন্যান্য পবিত্র অংশসমূহ জর্ডান অববাহিকা, বেথলেহেমের গোশালা, গেৎশিমানী বাগান এসব হয়ে ওঠে রাশিয়ার জন্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতা। শাসকদের জন্য রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে।...

শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে ফ্রান্স প্যালেস্টাইনের পবিত্র ভূমি উদ্ধারে তোড়জোড় শুরু করে। ১৮৫০ সালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট রাজকুমার লুইস নেপোলিয়ন পোর্তেতে রাষ্ট্রদূতকে চাপ প্রয়োগ করে সুলতানের কাছ থেকে ১৭৪০ সালের চুক্তির বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা আদায় করার জন্য। এভাবেই রাশিয়া ও ফ্রান্সের মাঝে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়।

ল্যাটিন সন্ন্যাসীদের বেথলেহেম গির্জার গ্রোটোতে গমন, প্রধান দরজার চাবি সংরক্ষণ, গোশালার চাবি, পবিত্র স্থানে রুপালি তারা স্থাপন, গেৎশিমানীতে কুমারীর সমাধিতে প্রদীপ ও একটি কাবার্ড রাখার অধিকার ফিরে পাওয়া নিয়ে প্রকৃতপক্ষে সংঘর্ষের শুরু হয়।

পোর্তেতে বিস্তর আলোচনার পর নতুন রাশিয়াবিরোধি প্রধান উজির গ্রিকদের জন্য নামমাত্র ও ফরাসিদের জন্য উল্লেখযোগ্য মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করে। এতে বেথেলহেমে ফরাসি তারকা স্থাপন ও ল্যাটিন যাজককের হাতে সমাধির চাবি অর্পণ করা হয়। বড়দিনের সময়ে জনসমক্ষে এক অনুষ্ঠানে এসব অর্পণ সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে অবশেষে গ্রিক ও রাশিয়ার মাঝে সমস্যার নিষ্পত্তি হয়।

এর মাধ্যমে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় শক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৮৫২ সালে জার নিকোলাস তৃতীয় নেপোলিয়নের সম্রাট হিসেবে অভিষেককে অ-স্বীকৃতি জানিয়ে দানিয়ুবের তীরে দুই কোর সৈন্যদল সমাবেশ করে। একই সময়ে সেবাস্তো পালে নিজের রণতরীকেও তৈরি করে রাখে। এরপর ১৮৫৩ সালে পোর্তের কাছে "শান্তি স্থাপনের" জন্য রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে। প্রিন্স মেনশিকভ্ এ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। ইংরেজ অনীহার জন্য যে বিখ্যাত ছিল। কূটনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের কঠিন কৌশল প্রয়োগ করতে চাইত মেনশিকভ্। "দ্য থান্ডারার" নামক যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক স্টাফদের নিয়ে পৌঁছে মেনশিকভ্ প্রমাণ করে দেয় যে তুর্কিদের দমন করতেই তার আগমন হয়েছে। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল মাত্র ধর্মীয় মধ্যস্থতা নয়, বরঞ্চ পবিত্র ভূমির ওপর গ্রিকদের অধিকার ফিরিয়ে আনা। এটি একটি দাবিতে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে অটোমান সাম্রাজ্যের সব অর্থডক্স খ্রিস্টানের ওপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব-ও নিশ্চিত হবে। এই জোরপূর্বক চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া ও পোর্তের মাঝে গোপন প্রতিরক্ষা মৈত্রী জোটও তৈরি হবে।

পোর্তে বিদেশী শক্তিকে তুরস্কের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জন্য হতাশা প্রকাশ করে। ফ্রান্স বসফরাসে নয় আজিয়ানের সালমিসে রণতরী পাঠিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ব্রিটেন লর্ড স্ট্যাটফোর্ড দ্য র‍্যাডক্লিফকে পোর্তেতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রেরণ করে।

১৮৫৩ সালের এপ্রিলে গৌরবোজ্জ্বল প্রত্যূষের শুরুতে ইস্তাম্বুলের কুয়াশা ঢাকা গম্বুজ ও মিনারের মাঝখান দিয়ে একটি যুদ্ধজাহাজ মারমারা সাগর পার

হয়ে ভেসে আসে। সুলতান ও তাঁর মন্ত্রীগণ জানতেন এ জাহাজে আরোহী হিসেবে কে ছিল। দিনের মধ্যভাগের মাঝেই, "বাইরের পৃথিবীতে হয়তো কোনো পরিবর্তন ছিল না। কিন্তু সবকিছুই মূলত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। লর্ড স্ট্যাটফোর্ড আরো একবার ব্রিটিশ দূতাবাসের প্রাসাদে পদার্পণ করেছে। এই ঘটনায় নিরাপত্তা বোধের পাশাপাশি ভক্তিমিশ্রিয় ভয় সঞ্চারিত হয় সকলের মাঝে।"

স্ট্যাটফোর্ড নিজেকে নিপুণ কৌশলী হিসেবে প্রমাণ করেন। উভয় দাবিকে ইস্যু অনুযায়ী পৃথক করা হয়—পবিত্র ভূমি নিয়ে বিতর্ক ও অভিভাবকত্ব নিয়ে চরম মীমাংসা। প্রথমটি কার্যত বড়দিনের সময় সমাধান করা হয়ে গেছে। এখন শুধু বাকি আছে পরাজিতদের কিছু অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা।

দুই বিবদমান শক্তির মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মহান এলচি ভদ্রভাবে উদ্ধত রাজকুমার মেনশিকভকে প্রশমিত করে তোলে। অপ্রত্যাশিতভাবে পবিত্র ভূমির রাশিয়ার দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেয়ার প্রস্তুতি প্রদর্শন করে লর্ড ক্যানিং। একই ভাবে "ফরাসি সম্মানের প্রতিও একই ভাবে মত ব্যক্ত করে ক্যানিং তার ফরাসি সহকর্মীর কাছে মধ্যস্থতার নীতি গ্রহণের আর্জি জানায়; যেন আন্তর্জাতিক চক্রের জড়িয়ে পড়ার ইস্যুগুলোও মাথায় রাখা হয়।

অবশেষে গির্জাসমূহ মেরামতের দায়িত্ব ও ব্যয় ভারের প্রশ্নে গ্রিক ও ল্যাটিনদের বিষয়ে ঐক্য ভঙ্গ হয়। এ বিষয়ে গ্রিকদের অধিকারকে কঠিন সুরে বাতিল ঘোষণা করে দেয় ল্যাটিনরা। অবশেষে তুর্কিরা উভয় পক্ষের মাঝে অবস্থান নিয়ে সুলতানের নামে এ কাজের ভার নিলে গ্রিকেরা একটি সমঝোতায় আসতে রাজি হয়। সিদ্ধান্ত হয় গ্রিক যাজকদের পরিদর্শনে কাজ সমাপ্ত হবে।

কিন্তু রাজকুমার মেনশিকভ্ তার প্রধান উদ্দেশ্য এখনো পূর্ণ করতে পারেনি। তাই সময় নষ্ট না করে পোর্তের কাছে আরেকটি কনভেনশনের জন্য তাগাদা দেয় মেনশিকভ্। কার্যত এটি ছিল গ্রিক খ্রিস্টানদের ওপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এখানে স্পষ্ট করে প্রায় ১২ মিলিয়ন অর্থডক্স রায়ার উল্লেখ করা হয়। একইভাবে ফ্রান্সও সংখ্যা নির্ণয় করে নিজের ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের অধিকার দাবি করে। মেনশিকভ্ সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে উভয় নিরাপত্তার স্বীকৃতি দাবি করে।

সাবধানতার সাথে এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কনস্টান্টিনোপলের ওপর রাজনৈতিক আধিপত্যের চিত্র তুলে ধরে ডাচ্ প্রতিনিধির কাছে। এদেরকে ব্যাখ্যা করে স্ট্যাটফোর্ড জানিয়ে দেয় যে, "পোর্তের স্বাধীনতার জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে এসব ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা।" এছাড়াও এই গোপন মৈত্রী জোট

ইউরোপের শান্তি বজায় রাখার জন্য অটোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার ওপর আঘাত হানবে। ১৮৪০ সালে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার সাথে রাশিয়াও এ ব্যাপারে একমত হয়েছিল।

রাজকুমার মেনশিকভ্ জারের মতই অধৈর্য হয়ে স্পষ্টবাদী ও প্রভুত্বের সুরে পোর্তেকে তার "অগাস্ট প্রভুর" দাবি মেনে নেয়ার জন্য কৌশল শুরু করে। চরমপত্রের ন্যায় উত্তর দেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক রদ করার হুমকি দিয়ে বসে মেনশিকভ্। প্রত্যাখ্যান বা বিলম্ব হলে মেনশিকভ্ ও রাশিয়া দূতাবাস পোর্তে ত্যাগ করবে বলেও জানিয়ে দেয় মেনশিকভ্। কিন্তু তুর্কি মন্ত্রীরা পাশে পেয়েছে মহান এলচি, যে কিনা তাদের ভয় শান্ত করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উদ্দেশ্য পূরণের পরামর্শ দেয়। সুলতানের মর্যাদা ও স্বাধীনতা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে দৃষ্টি বজায় রাখে জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত ক্যানিং।

ইতিমধ্যে সুলতান ব্রিটিশ কমান্ডারকে ভূমধ্যসাগরে তার রণতরী প্রস্তুত করে রাখার জন্য অনুরোধ জানান; যদি কনস্টান্টিনোপল আক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন এর ব্যবহার হবে। এদিকে জার নিকোলাস পোর্তের ওপর রেডক্লিফের প্রভুত্বব্যঞ্জক প্রভাবের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

রাশিয়ার পক্ষে তিক্ত সুরেও তুর্কিদের কাছ থেকে ভদ্রভাবে নোট আদান-প্রদানের পর মেনশিকভ সুলতানের কাছে দাবি জানায় প্রধান উজিরকে সরিয়ে রাশিয়ার সমর্থনকারী রাশিদ পাশাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য। এছাড়াও ইউরোপী শক্তি বাদ দিয়ে রাশিয়াও তুরস্কের মাঝে প্রত্যক্ষ মৈত্রী জোটেরও দাবি জানায় মেনশিকভ্। নিজের সাফল্য সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে মেনশিকভ্।

লর্ড ক্যানিং রাশিদকে সাহায্য করে মেনশিকভের জন্য খসড়া উত্তর প্রস্তুত করতে। এতে আরো কিছুদিন বিলম্ব করার জন্য সময় প্রার্থনা করে রাশিদ। রাশিদকে বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসেবে ধরে নেয়া মেনশিকভ্ এতে খেপে ওঠে ব্যর্থতার পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হতে জানিয়ে দিয়ে দুই-তিন দিনের জন্য প্রস্থান স্থগিত করে। এরই মাঝে সুলতানের নবগঠিত গ্র্যান্ড কাউন্সিল চরমাবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে বসে। আর এ কাউন্সিলের পঁয়তাল্লিশ জন সদস্যের মাঝে মাত্র তিনজন রাশিয়ার দাবি মেনে নেয়ার পক্ষে ভোট দেয়।

পরের দিন রাশিদ মেনশিকভকে মৌখিকভাবে তার প্রস্তাবসমূহের উত্তর জানিয়ে দেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র ভূমির ওপর রাশিয়ার দাবি কার্যত মেনে নেয়া হয়। কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্যের গ্রিক অর্থডক্স প্রজাও কোনো চুক্তিতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ব্যক্ত করে রাশিদ পাশা। কেননা এতে সুলতানের স্বাধীনতা রহিত হবে। মেনশিকভ্ তার "মিত্র" রাশিদের এহেন

ছল-চাতুরিতে অবমাননাবোধ সাপেক্ষে নিজের মিশন ভেঙে দেয়। পোর্তের প্রত্যাখ্যানের সমীচীন জবাব দেওয়ার হুমকি দিয়ে চিরতরে নিজের কূটনীতিক স্টাফদের নিয়ে ইয়টে ফিরে যায়। তার তাৎক্ষণিক প্রস্থানের বিজ্ঞাপনের জন্য ইয়টে ধোঁয়া শুরু হয়। কিন্তু তারপরেও শেষ মুহূর্তে তুর্কি আত্মসমর্পণের আশায় আরো চার দিন এ জায়গাতে অতিবাহিত করে রাজকুমার।

লর্ড স্ট্যাটফোর্ড এবার নিজে উদ্যোগ নিয়ে আর তিন ইউরোপীয় শক্তির প্রতিনিধিদের সভার ব্যবস্থা করে অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও প্রুশিয়া। রাশিয়ার দাবি মেনে না নেয়ার পক্ষে সবাই যখন পোর্তের সাথে একমত হয়, তখন অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধি যৌথভাবে মেনশিকভ্‌কে অনুরোধের নোট পাঠায় যেন উভয় দেশের মাঝে কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ না হয়। মেনশিকভ নিজের যাত্রা বিলম্ব করার জন্য সংশোধিত দাবি পেশ করে। কিন্তু বস্তুত এতে তার পূর্ব প্রস্তাবই প্রাধান্য পেয়েছে।

সুলতান মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে এবার রাশিয়ার দাবি "অগ্রহণীয়" বলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মেনশিকভ্‌ পরিবর্তনে প্রত্যাখ্যান করে অবশেষে ১৮৫৩ সালের ২১ মে দুপুরবেলা বসফরাস হয়ে কৃষ্ণসাগরে চলে যায়। একই সময়ে প্রাসাদোপম রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় দূতাবাসের দরজা থেকে জারের রাজকীয় ঈগল সংবলিত চিহ্ন নামিয়ে ফেলা হয়। রাশিয়ার পরাজয়ের জন্য মেনশিকভ্‌ দাবি করে এই শয়তান খ্রিস্টানবিরোধি, যে কিনা ইংরেজের কাঠামোতে স্বর্গ থেকে প্রেরিত হয়েছে কিছু সময়ের জন্য জার ও তার গির্জাকে পদদলিত করার জন্য।"

কার্যত এখানে শান্তির সমাপ্তি ঘটলেও যুদ্ধ শুরু হয়নি। রাশিয়ার সেনাবাহিনী প্রুত পার হয়ে মলদোভিয়া ও ওয়ালাসিয়ায় পৌঁছে গেছে বিনা বাধায়। ব্রিটিশ রণতরী ছোট ফরাসি স্কোয়াড্রন সাথে নিয়ে দার্দেনালেসের মুখে অবস্থান নিয়েছে। উভয় পক্ষই নিরাপত্তা রক্ষার ওপর দৃষ্টি রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কোনো ইশারা ছিল না।

কিন্তু কিছুদিন পরেই এই ভারসাম্য ভেঙে যুদ্ধতে পর্যবসিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ইস্তাম্বুলে বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। মসজিদে ইশতেহার বিলি হয়। এতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার আর্জি ছিল। উলেমাদের শত শত সদস্য, ধর্মতত্ত্বের এক দল শিক্ষার্থীসহযোগে সুলতানের কাছে প্রচারপত্র পাঠায়। যাতে পবিত্র যুদ্ধ শুরু করার তাগিদ দেয়া হয়। জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শঙ্কিত হয়ে মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রদূতদের সাহায্য কামনা করে।

নিজের রাজত্বকালের শুরু থেকেই সম্রাট নেপোলিয়ন পূর্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে বিবদমান ভূমিকা নিয়েছিল। এই সময়েও বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ফরাসি রাষ্ট্রদূত ক্যানিংয়ের কাছে শহরে অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ

রণতরী নিয়ে আসার দাবি জানায়। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করে স্ট্যাটফোর্ড। কেননা রণতরী আনা হলে ১৮৪১ সালের প্রণালি কনভেনশন ভঙ্গ হবে। কিন্তু এর মাঝামাঝি কোন জলযান প্রবেশের কথা উল্লেখ ছিল কনভেনশনে। তাই ক্যানিং চারটি স্টীমার নিয়ে আসে। দুটি ব্রিটিশ ও দুটি ফরাসি। গোল্ডেন হর্নে বাকিগুলোর সাথে যোগ দেয় নতুনগুলো। ফলে বিদ্রোহের আগুন নিভে যায় আর উলেমাদের অপরাধী সদস্যরা নির্বাসনে যায়।

কিন্তু এলচির শান্তির সমাধান স্থায়ী হয়নি। ভিয়েনাতে স্ট্যাটফোর্ডের উৎসাহে চার শক্তির সম্মতিক্রমে সেন্ট পিটার্রবুর্গে পোর্তে রাশিয়ার অন্যায্য দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে নোট পাঠায়। ভুলবশত এর নাম দেয়া হয়েছিল, "তুর্কি চরমপত্র।"

কিন্তু এই নোটটি জারের কাছে পৌঁছায়নি। যাত্রাপথে ভিয়েনাতে এক কনফারেন্সে চার শক্তি এটি অগ্রাহ্য করে। এর পরিবর্তে লর্ড ক্যানিংকে না জানিয়েই নিজেদের একটি ভিয়েনা নোট প্রস্তুত করে ইউরোপীয় শক্তি। জার এটি সমর্থন করলেও সুলতান মেনে নেননি। কেননা এতে পোর্তে এবং স্ট্যাটফোর্ড উভয়েই উপলব্ধি করে যে রাশিয়া ও তুরস্কের মাঝে অসম বিভেদ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সুলতান ও তাঁর প্রজাদের মাঝে রাশিয়ার অনুপ্রবেশের দরজা খুলে যাবে। ফলে সুলতানের গ্র্যান্ড কাউন্সিল পূর্বে তুর্কি চরমপত্রে সম্মতি জানালেও ভিয়েনা নোটকে সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল করে সংশোধনের প্রস্তাব করে; যা কার্যত রাশিয়ার জন্য নেতিবাচক হয়ে দাঁড়ায়।

এর ফলাফলে তুর্কি শহরে বিদ্রোহ ও লর্ড ক্যানিং এর স্টীমার নীতির অবতারণা ঘটে। কিন্তু এ সংবাদ পৌঁছার পূর্বেই মধ্য সেপ্টেম্বরে জার তুর্কিদের সংশোধিত ভিয়েনা নোট প্রত্যাখ্যান করলে এ সংবাদ পৌঁছে যায় লন্ডনে। একই সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্ল্যারেনডনের কাছে রাশিয়ার চ্যান্সেলর নেসেলরডের ব্যক্তব্য জার্মান গণমাধ্যমে ফাঁস হয়ে যায়। এর মাধ্যমে রাশিয়ার সত্যিকার আগ্রাসী মনোভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে। ক্ল্যারেনডন স্বীকার করে নেয় যে তুর্কিরা ভিয়েনা নোট প্রত্যাহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম জারের সমালোচনায় মুখর হয়ে পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানায়। ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার ভর্ৎসনাপূর্বক ভিয়েনা নোট পরিত্যাগ করে। ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য ভেঙে গিয়ে যুদ্ধের উপক্রম হয়।

নেপোলিনের রাষ্ট্রদূত সরকারের পক্ষ থেকে লন্ডনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে রণতরী প্রেরণের জন্য। ঘটনা সম্পর্কে স্ট্যাটফোর্ডের প্রতিবেদনের অপেক্ষা না করেই ব্রিটিশ সরকার নির্দেশ প্রেরণ করে। ক্ল্যারেনডন জোর দিয়ে দাবি জানায় যে, এই সিদ্ধান্ত ফরাসি সম্রাটের চাপ প্রয়োগে নেয়া হয়নি।

রাশিয়া যদি আরো এক পা এগিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয় তাহলে তা সম্পাদন করা অনিবার্য হয়ে যাবে। শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছু আশা তখনো বাকি ছিল।

এর একমাত্র ভরসা হিসেবে রণতরী এসে পৌঁছানোর পূর্বে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট ওলমুয়ে সম্মেলনে উপবেশন করে। একদম শেষ মুহূর্তে এসে যুদ্ধের ভয়াবহতার আশঙ্কায় জার শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মতি প্রদান করে। এতে নতুন প্রস্তাব সংযুক্ত করে জারের সম্মতি চাওয়া হয় যে খ্রিস্টানদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সুলতানের ওপর অর্পণ করা হবে। ফরাসি সম্রাটও এতে স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু ব্রিটেন রাশিয়ার মনোভাবকে বিশ্বাস না করতে পারায় স্ট্যাটফোর্ড নিজেও রণতরী প্রেরণের নির্দেশ দেয়। এর ফলে ইংল্যান্ডে রাশিয়াবিরোধি ভীতি বয়ে যায় জনমনে।

একই ভাবে পোর্তেতে রাশিয়া বিরোধিতার বীজ আরো কঠিন আকার ধারণ করে। যুদ্ধবাদী শক্তিরা নিজেদের দাবিতে অনড় হয়ে ওঠে; সুলতান এর প্রতিরোধে অসহায় হয়ে পড়েন। মন্ত্রিপরিষদের সভায় বসে ধর্মান্ধ হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় "যুদ্ধ ঘোষণা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।" সুলতানের সম্মতি নিয়ে শেখ-উল-ইসলাম ফতোয়া জারি করে। ১৮৫৩ সালের ৪ অক্টোবর রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পোর্তে। একই দিনে ক্যানিং রণতরী ডেকে পাঠানোর নির্দেশ পায়। এছাড়া সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য বিলম্ব করতে চাইলেও তার ফরাসি সহকর্মী প্যারিসের চাপে পড়ে রোধ করে স্ট্যাটফোর্ডকে। ফলে অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে ব্রিটিশ অ্যাডমিরালকে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রেরণ করে মহান এলচি। দার্দেনালেস হয়ে অ্যাংলো ফরাসি স্কোয়াড্রন এগিয়ে আসতে শুরু করে। গোল্ডেন হর্নে দেখা যায় রঙের খেলা।

যৌথবাহিনী পৌঁছানোর পর তুর্কি সামরিক বাহিনী জেনারেল ওমর পাশার নেতৃত্বে দানিয়ুব পার হয়। এর পূর্বে ওমরবিরোধি রাশিয়ার কমান্ডারকে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হওয়ার চরমপত্র দিয়েছিল। শীত এলে অভিযান বাতিলের পূর্বেই তারা চারটি দ্রুত বিজয় অভিযান সম্পন্ন করে। সেবাস্তোপুলে রাশিয়ার রণতরীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেয় জার।

এতকিছু হয়ে যাওয়ার পরেও ইউরোপীয় চার শক্তি ও লর্ড স্টাটফোর্ড দি র‍্যাডক্লিফ শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে চলেছে। জার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা নীতি ঘোষণা করে "তুর্কি আক্রমণের অপেক্ষা" করলেও স্ট্যাটফোর্ড একটি তুর্কি নৌ স্কোয়াড্রনকে থামিয়ে দেয় কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে অগ্রসর হতে। অন্যদিকে তুর্কিদের সিনোপ বন্দর থেকে ছোট জাহাজ বহরের যাত্রা থামানোর কোনো চেষ্টাই করেনি ব্রিটিশ বা ফরাসি অ্যাডমিরালগণ। এ সময় কৃষ্ণসাগরের কেন্দ্র থেকে রাশিয়ার নৌবাহিনীর শক্তি স্পষ্ট প্রদর্শিত হচ্ছিল। সেবাস্তোপোল সিনোপ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরত্বে অবস্থান করছিল।

এর পোতাশ্রয়ে পৌঁছে তুর্কি কমান্ডার ইস্তাম্বুলে সংবাদ প্রেরণ করে যে ছয়টি রাশীয় জাহাজ বন্দর ত্যাগ করেছে বিধায় আরো সৈন্য প্রয়োজন। তুর্কি জাহাজবহর প্রতিরোধে অক্ষমতা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রথমে গুলি ছুঁড়ে বসে। এর প্রতিউত্তরে ভয়াবহ রাশীয় গোলাবর্ষণ গুড়িয়ে দেয় তুর্কি বহর। প্রায় তিন হাজার তুর্কি একত্রে হাওয়া হয়ে যায়।

"সিনোপের গণহত্যা" নিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে সেন্ট পিটারসবুর্গ। "লা ব্যাতাইলে দি সিনোপ" নামে থিয়েটারে সংগীতায়োজন হয়। লন্ডনে এই দুর্ধর্ষ ও বিশ্বাসঘাতকতায় রাশিয়াবিরোধি ঝড়ের পালে হাওয়া লাগে। ফরাসি সম্রাট সামরিক পদক্ষেপের ঘোষণা করে জানিয়ে দেয় যে কৃষ্ণসাগর থেকে রাশিয়ার রণতরীকে ধুয়ে মুছে ফেলা হবে। এছাড়াও সম্রাট চাপ প্রয়োগ করে যেন ব্রিটিশ ও ফরাসি যৌথবাহিনী এই জলসীমার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। কূটনীতির পরিবর্তে পদক্ষেপ নেয়ার সময় এসে পড়ে। ১৮৫৪ সালে নববর্ষের একটু আগে যৌথ বাহিনী কৃষ্ণসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

রাশিয়া ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ওপর নির্ভর করে ছিল যে এটি যুদ্ধ নয়। জার যুদ্ধের সর্বশেষ প্রস্তুতির জন্য তাড়াহুড়া করা অবস্থাতেই ভিয়েনাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব প্রেরণ করে। চার শক্তি একত্রে প্রত্যাখ্যান করে এই প্রস্তাব। লন্ডন ও প্যারিস থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারিতে নিজের দূতাবাস প্রত্যাহার করে ব্রিটিশ ও ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ প্রদান করে জার। একই সময়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার গররাজি সত্ত্বেও রাশিয়াকে নির্দেশ দেয় দানিয়ুব অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের জন্য। এতে ব্যর্থ হলে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ধরে নেয়া হবে। এর উত্তরে জার কোনো কিছুই প্রেরণ করেনি।

মার্চ মাসের ২৭ তারিখে ফরাসি সম্রাট সিনেটে রাষ্ট্রীয়ভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ব্রিটেনের সাথে মিত্রতা করে অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেও জানিয়ে দেয় সম্রাট। একই ভাবে রানি ভিক্টোরিয়া সংসদে জানিয়ে দেয় যে, "সুলতানের সাহায্যার্থে এই সক্রিয় সমর্থন" দেয়া হবে। পরবর্তী দিনেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একরাত পরেই "পার্থিব সম্পদ নয়" অর্থডক্স বিশ্বাস রক্ষার্থে পবিত্র মিশনসুলভ যুদ্ধ ঘোষণা করে জার।

রাশিয়া বাহিনী দানিয়ুবের নিম্ন অববাহিকা পার হয়ে তুরস্কে আক্রমণ করে। প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হয় ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনী। অ্যাংলো-ফরাসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সুলতানের অঞ্চলসমূহের স্বাধীনতা ও ইউরোপের নিরাপত্তা রক্ষার্থে।

ইউরোপ ও অটোমান সাম্রাজ্যের যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে মিত্রহীন রাশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৮৫৪ সালের বসন্তে বৃহৎ রাশীয় সেনাবাহিনী দানিয়ুব হয়ে তুর্কি অঞ্চলে প্রবেশ করে সিলিস্ট্রিয়া দুর্গ অবরোধ করে। বুলগেরিয়ার ভানাতে একত্রিত হয় ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনী। রাশিয়ার আক্রমণকে তুর্কিদের নতুন সেনাবাহিনী প্রতি রোধে সক্ষম হয়। সংস্কার-পরবর্তী এ বাহিনী পুরোপুরি পশ্চিমাদের ন্যায় পারদর্শী না হলেও নতুন আত্মবিশ্বাস ও বিচক্ষণতা নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে অতীতের সুমহান গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। এ চেতনা অতীতের পবিত্র যোদ্ধাদের সমকক্ষই ছিল।

সিলিস্ট্রিয়া দুর্গ কঠিন চাপ সহ্য করেও সাহসী হয়ে অবরোধ রুখে দিতে সক্ষম হয়। কমান্ডার নিহত হলেও জীবিত নেতাদেরকে সুচতুরভাবে দিকনির্দেশনা দিতে থাকে দুই তরুণ ব্রিটিশ অফিসার। ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বে নিয়োজিত এই দুই অফিসার তুর্কি সৈন্যদের মাঝে বিশ্বস্ততা ও আত্মত্যাগের মনোভাব জাগিয়ে তোলে। ফলে তুর্কিরা রাশিয়ার খননকারীদের প্রতিরোধ করে, গণহত্যায় রুখে দাঁড়ায়, নতুনভাবে প্রতিরক্ষা বূহ্য গড়ে তোলে। এসব দেখে নতুন আগত ব্রিটিশ অফিসার শ্রদ্ধাভরে" বিপদের মাঝেও তুর্কিদের ঠাণ্ডা মাথা" দেখে বিস্মিত হয়।

ওমর পাশা, অটোমান সেনাবাহিনী পুনরায় শক্তিশালী করে শূমলা থেকে অগ্রসর হয়ে সিলিস্ট্রিয়ার অবরোধকারীদের বাধ্য করে খোলা ময়দানে যুদ্ধ শুরু করতে। যৌথবাহিনী যাতায়াতের সমস্যার কারণে নিজেদের ক্যাম্প থেকে গোলাগুলির শব্দ পেলেও যুদ্ধে এগিয়ে যেতে পারেনি। তারপর জুনের শেষ দিকে অনেক রাত পর্যন্ত কামানের শব্দ পাওয়া গেলেও পরের দিন সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ করে নিঃশব্দের মাঝে সিলিস্ট্রিয়া পতনের আশঙ্কা জাগে সবার মাঝে। রাশিয়া বাহিনী পাঁচ সপ্তাহ গোলাবর্ষণের পর অবরোধ তুলে নেয়।

এরই মাঝে দানিয়ুবের ওপরে ডান দিকে রাস্তুক ও বাম দিকে জির্যরজোভা, তুর্কি বাহিনী সমানসংখ্যক রাশীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। আরো একবার একদল ব্রিটিশ অফিসার অবস্থা বদলে দেয়। সাতজন এগিয়ে এসে তুর্কি কমান্ডার হাসান পাশাকে সেবার প্রস্তাব দেয়। হাসান পাশা পরিদর্শক দল প্রেরণের আদেশ দেয়। জেনারেল ক্যানন একজন ভারতীয় সেনা অফিসার বেহরাম পাশা নামে তুর্কি বাহিনীতে যোগ দিয়ে এক দল তুর্কি পদাতিক নিয়ে নদী পার হয়ে যায়। অপর পাড়ে কোনো বাধা না পেয়ে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে ভূমিকম্পের ন্যায় একদল রাশীয় সৈন্য অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের ওপর। একজন ব্রিটিশ অফিসার কয়েকজনকে সাথে নিয়ে রাশিয়া বাহিনীকে থামিয়ে রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাকি তুর্কি সৈন্য নদী পার হয়ে এসে পৌঁছায়।

ইতিমধ্যে নদী তীরের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য পাঁচজন ব্রিটিশ অফিসার বৃহৎ স্থলবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসে।

এর মাধ্যমে দানিয়ুবের তীরে প্রায় পাঁচ হাজার তুর্কির সমন্বিত শক্তি গঠিত হয়। এর দুই দিন পর রাশিয় জেনারেল রাজকুমার গর্চাকভ্ সিলিস্ট্রিয়া অবরোধ তুলে দেয়ার ফলে মুক্ত সৈন্যদের নিয়ে তুর্কি অপসারণে প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু রাতের মাঝেই গান বোটের বহর এসে পৌঁছায়। অপ্রত্যাশিতভাবে এ বহর পৌঁছে উভয় সেনাবাহিনীর মাঝে অবস্থান নেয়। দ্বিধায় পড়ে যায় গর্চাকভ। আর এই সুযোগে ব্রিটিশ ও তুর্কি বাহিনী নৌকা-সেতু তৈরি করে দানিয়ুব পার হয়ে রাশিয়া বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ অবস্থায় পিছু হটার নির্দেশ দিয়ে নিজের বাহিনী নিয়ে বুখারেস্ট চলে যায় গর্চাকভ। ফলে দানিয়ুবের নিম্নাঞ্চল তুর্কিদের হাতে এসে পড়ে। এক মাসের মাঝেই শেষতম রাশিয় সৈন্যও প্রুত পার হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে যুদ্ধের হুমকি পেয়ে রাশিয়া মলদোভিয়া ও ওয়ালাসিয়া থেকে নিজের প্রশাসন ও সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী যে কোন ধরনের রাশিয়া আক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক ব্রিটিশ চরমপত্রের উদ্দেশ্য এভাবে পূর্ণ হয়। জারের সম্মান নিগৃহীত হয়ে পড়ে ও পদমর্যাদায় আঘাত পড়ে। অহমিকায় লজ্জায় পড়ে যায় জার। কেননা এটি তার জন্য স্বীকার করে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে যে এ পরাজয় ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর জন্য নয়; বরঞ্চ অবহেলিত অটোমান সৈন্যদের সাহস ও পুনর্গঠিত সামরিক শক্তি বলেই হয়েছে—মাত্র কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসারের সহায়তায়।

অটোমান সাম্রাজ্যের জন্য এ যুদ্ধের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হয়। অটোমান ভূখণ্ড থেকে রাশিয়া বাহিনীর অপসারণসহ ভবিষ্যতেও বলকানে রাশিয়াদের প্রবেশের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। সুলতান ও তাঁর সেনাবাহিনী ইউরোপে বিজয়ী হয়েছেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আর কোনো পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল কি? তুর্কিদের দিক থেকে, না। পশ্চিমা শক্তির জন্যও সম্মানসূচক শান্তি অর্জিত হয়েছে। রাশিয়ার জন্য স্থলপথে একত্রিত ইউরোপীয় শক্তি ও নৌপথে শক্তিশালী ব্রিটেন ও ফরাসিদের জন্য পিছু হটা ব্যতীত আর কোনো বিকল্প ছিল না।

কিন্তু সম্রাট নেপোলিয়নের জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন ছিল। তার নতুন রাজবংশের প্রশংসা বা উন্নতির জন্য। আবার ব্রিটিশ জনগণও দেশপ্রেমের উৎসাহে এটি প্রার্থনা করছিল। সবার দৃষ্টি ছিল সেবাস্তোপোলের ওপর। গত পঁচিশ বছরে অসংখ্য অস্ত্রাগার ও দুর্গ, নির্মাণের মাধ্যমে এটি অভূতপূর্ব শক্তি অর্জন করেছে। অটোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ করার জন্য এর পোতাশ্রয়ে যে

রণতরী প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে দৃশ্যত ব্রিটিশ রাজকীয় উদ্দেশ্যকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। ফলে ব্রিটিশ কেবিনেট পেশাদার সতর্কতা ভুলে গিয়ে জনগণের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে প্রধান কমান্ডার লর্ড র‍্যাগলানকে নির্দেশ দেয়, "সেবাস্তোপোল অবরোধের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য।" এতে ফরাসি প্রধান কমান্ডার মার্শাল সেন্ট আর্নডও সমর্থন প্রদান করায় যৌথ সেনাবাহিনী ভার্না থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে কোনো বাধা ছাড়াই রাশিয়ার বন্দর ইউপাটোরিয়া দখলে অগ্রসর হয়। দানিয়ুব যুদ্ধ জেতা সম্পন্ন হয়েছে। ক্রিমিয়ান যুদ্ধ শুরু হয়েছে এখন।

এ যুদ্ধ শুরু করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে। তুরস্ক এর ক্ষেত্র প্রস্তুতে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলাফলেও উপকৃত হবে। পঁয়ষট্টি হাজার ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্য ও তুর্কিদের মাত্র এক ডিভিশনের বেশি সৈন্য নয়, লর্ড লুকান কমান্ডার হিসেবে অবতরণ করে। ব্রিটিশ সামরিক ফ্যাশনের রীতি অনুযায়ী তুর্কিদেরকে সামান্য বর্বর জ্ঞান করে একপাশে সরিয়ে দেয় লুকান।

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্রিমিয়ার যুদ্ধই পুরোপুরি গণমাধ্যমের আওতাধীন ছিল। ফলে পরবর্তী এক বছরের জন্য সব ব্রিটিশের চোখ ছিল সেবাস্তোপোলের নাটকীয় গাথার ওপর। যুদ্ধ হয় অ্যালমা, বালাক্লাভা, ইনকারম্যান এবং এর প্রভাব পড়ে রিডান ও মালাকোভ দুর্গের ওপর। সমস্তই হয় হোমারিক মাত্রায়; ছোট্ট এই দ্বীপপুঞ্জের রঙের খেলা হয়, ব্যান্ডের সংগীত বেজে ওঠে। হিরোদের নিয়ে জনগণ দেশপ্রেমে মেতে ওঠে, ট্র্যাজেডিতে দুঃখিত হয়, ক্ষোভে ফেটে এর দ্বিধা ও গুরুতর ভুল করা কর্কশ অ্যাংলো-ফরাসি কমান্ডারের ওপর। অহংকারে হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে যখন কামান গর্জন করে ওঠে আর মৃত্যু উপত্যকায় হালকা ব্রিগেড এগিয়ে যায়। ভয়ে কেঁপে ওঠে সকলে যখন নিষ্ঠুর, কষ্টকর, প্লেগবহুল শীতের মাঝে মানুষ ও পশু আর্তনাদ করে ওঠে। আবার আলোকবর্তিকা হাতে লেডি অব্য দ্য ল্যাম্পের কারণে স্টোভের আলোয় নিশ্চুপ হয়ে যায় মৃত্যুদূতের পাখা।

বালাক্লাভার প্রতিরক্ষায় তুর্কি বাহিনী নিয়োজিত হলেও অদক্ষ অফিসারদের কারণে পিছু হটে যায়। পরের বছর ওমর পাশার নেতৃত্বে সাহসের সাথে দুর্গ নির্মাণে কাজ করে তারা। রাশিয় বাহিনীকে রুখে দেয় তুর্কিরা। ফলে জার নিকোলাস অবমাননার হাতে পড়ে। এরপর পিতার মৃত্যু হলে জার হিসেবে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার শান্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

যুদ্ধের একেবারে বিলম্বে শেষ পর্যায়ে এসে মৈত্রী জোট ব্রিটিশ অফিসারের নেতৃত্বে বিশ হাজার তুর্কি সৈন্যকে যুদ্ধে ডাকে। কিন্তু যুদ্ধ করার জন্য নয়। ফরাসিদের দ্বারা মালাকোভ্ দুর্গ দখলের জন্য। ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যার মাধ্যমে সেবাস্তোপোলের পতন হয় ও ক্রিমিয়া অভিযান শেষ হয়।

ব্রিটিশরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে গোয়ার্তুমি করলেও ফরাসি-রা যুদ্ধ শেষের জন্য চাপ প্রয়োগ করে।

এর মাধ্যমে ১৮৫৬ সালের বসন্তে প্যারিস চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে ভৌগোলিক কোনো পরিবর্তন না এলেও দানিয়ুবের মূল ভূখণ্ড রাশিয়ার একক অভিভাবকত্ব থেকে বের হয়ে সুলতানের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে যৌথভাবে বৃহৎ শক্তিদের হাতে এসে পড়ে। অধিবাসীরা নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন, স্বাধীন ও জাতীয় প্রশাসন, ধর্মীয় উপাসনা ও বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কমিশনের অধীনে দানিয়ুবে স্বাধীন চলাচল স্বীকৃত হয়। কৃষ্ণসাগরেও একই ভাবে নিরপেক্ষ সকল বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করতে পারলেও নৌবাহিনীর চলাচল নিষিদ্ধ হয়। এর তীরভূমিতে নৌ অস্ত্রাগারের নির্মাণও বন্ধ হয়। দার্দেনালেস ও বসফরাস প্রণালীতে যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

সকল খ্রিস্টান শক্তি চুক্তি মোতাবেক অটোমান সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায়, মধ্যস্থতা বা প্রয়োজনে সামরিক আগ্রাসণের ক্ষেত্রে একমত হয়। বস্তুত ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যৌথ বাহিনীর জয় অথবা পরাজয় নিশ্চিত না হলেও প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে অন্তত আরো দুদশকের জন্য পূর্বের প্রশ্ন প্রশমিত হয়ে গেছে পশ্চিমা ও রাশিয়ার মাঝে। একই সময়ে অটোমান সাম্রাজ্যের ভেতরে স্বয়ং সুলতান নিজের খ্রিস্টান প্রজাদের নিরাপত্তার জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হয়ে উঠছেন। একঅর্থে এদের বিতর্কিত পদমর্যাদাই যুদ্ধের প্রারম্ভের জন্য দায়ী ছিল।

॥ ৩৪ ॥

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি ও প্যারিস চুক্তির মধ্যবর্তী সময়টুকুতে লর্ড স্ট্যাটফোর্ড পোর্তের ওপর চাপ দিতে থাকে অটোমান সাম্রাজ্যের সংস্কারকাজের জন্য। ১৮৫৬ সালের শুরুতে রাজকীয় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি স্বীকার করে নেয়া হয়। পোর্তে এর নকশা এমনভাবে প্রস্তুত করে যেন প্যারিসের আলোচনাকারী দলসমূহ সন্তুষ্ট হয় ও সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে পশ্চিমা বিশ্ব অটোমান সাম্রাজ্যের শুভ ইচ্ছাকে স্তুতিবাদ জানায়। তানজিমাত সংস্কারের ক্ষেত্রকে নিশ্চয়তা ও বিস্তৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের তুর্কি ম্যাগনাকার্টা সম্পন্ন হয়।

পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে সুস্পষ্টভাবে এই সনদে অটোমান প্রজাদের সমান ও স্বাধীন মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়। ধর্মীয়, ভাষা ও জাতিগত বিভেদ না করে কর প্রদান, শিক্ষা, ন্যায়বিচার, সম্পত্তির অধিকার, সরকারি চাকরিতে যোগ্যতা, প্রশাসনে নিয়োগ এবং শ্রেণী-মত সম্পর্ককীয় কুসংস্কার ভুলে সু-নাগরিক হতে উৎসাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত হয়। এছাড়াও দেশের আর্থিক ও মুদ্রা ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে

ইতিবাচক উৎসাহ, রাস্তা ও খাল নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট সংস্কারকাজের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর ফলে লর্ড স্ট্যাটফোর্ডের ক্যারিয়ারে সংস্কারকের পালক লেগে যায়। অটোমান সাম্রাজ্যের পুনর্জাগরণের জন্য তার পরিশ্রম সমাপ্ত হয়।

কিন্তু তার আশাবাদ বেশি দিন টিকে থাকেনি। প্রকৃতপক্ষে কোনো আশ্চর্য ঘটনা ঘটেনি। প্যারিস চুক্তিতে এই সনদকে ধরা হয়নি। শুধু "সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান জনগণের জন্য সুলতানের দয়ালু অভিব্যক্তি" হিসেবে গ্রণ করা হয়। কিন্তু এটি বাস্তবায়নের জন্য কোনো সরবরাহ প্রত্যাখ্যান করা হয়। শক্তিসমূহ "সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন বা প্রজাদের সাথে সুলতানের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথ হস্তক্ষেপ" করার সকল অধিকারকে অস্বীকৃতি জানায়।

সবাই এটিকে ফরাসিদের দ্বারা ব্রিটিশদের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখতে থাকে। যেনতেন ভাবে রাশিয়ার সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে লর্ড স্ট্যাটফোর্ড এটিকে দেখে সংস্কারের গায়ে মৃত্যু তীর হিসেবে। কেননা কোনো বিদেশি চাপ প্রয়োগ ব্যতীত পোর্তে সংস্কারকাজ ত্যাগ করবে। এ ফরমানের কোনো মূল্যই থাকবে না। প্যারিস চুক্তি নিয়ে স্ট্যাটফোর্ডের নিজস্ব উক্তি ছিল "এ চুক্তিকে সই করার চেয়ে আমি বরঞ্চ নিজের ডান হাত কেটে ফেলাকে শ্রেয় ভাবতাম।" আলোচনার শুরু থেকেই যুদ্ধ শেষের মতো দ্বন্দ্বে ভুগছিল মিত্র বাহিনী। পোর্তের ওপরে ফরাসিদের প্রভাব বেড়ে যাওয়াকেই, তুর্কিদের নিয়ে স্ট্যাটফোর্ড নিজের উচ্ছ্বাশার গায়ে কুঠারাঘাত বলে মনে করে।

এতদসত্ত্বেও এটি স্বীকায যে স্ট্যাটফোর্ডের কল্যাণেই পূর্ব ও পশ্চিম উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে যতটা সম্ভব একে অন্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। লর্ড স্ট্যাটফোর্ডের মিশন শেষ সময়ে এসে পৌঁছেছে। একেবারে শেষ হওয়ার পূর্বে লড স্ট্যাটফোর্ড ঐতিহাসিক এমনকি ব্যাঙ্গাত্মকও বলা যায়—পদক্ষেপ নেয়। সুলতান আবদুল মজিদকে লর্ড স্ট্যাটফোর্ড, রাণি ভিক্টোরিয়ার নামে অর্ডার অব দ্য নাইট অব দ্য গারটার প্রদান করে। ১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে লর্ড স্ট্যাটফোর্ড শেষবারের মতো তুরস্ক পরিত্যাগ করে।

ঘটনা এগিয়ে চলে নিজের গতিতে। ঋণের বোঝা বেড়ে যায়। তুরস্ক, যার সংস্কারক শাসকেরা কখনোই দক্ষ ছিলেন না আর্থিক বিষয়ে; ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয়ভাবে দেউলিয়ার পথে এগিয়ে যায়। রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেড়ে যায়। আভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদনযোগ্য সম্পদ কমে যায়। রাজকীয় খাজাঞ্চি প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে, সেনাবাহিনীর বেতন প্রদান অসম্ভব হয়ে পড়ে, জীবন-যাপনের ব্যয় বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় দরিদ্র জনগণ সংস্কারক ও বিদেশি

সবার ওপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের ব্যয় বহনের জন্য পোর্তে ব্রিটিশ ও ফরাসি মিত্রের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। এরপর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও দুদশক ধরে জাতীয় অর্থনীতি দক্ষ পরিচালনার অভাবে ইউরোপ থেকে ঋণ নেয়া অভ্যাসে পরিণত হয়ে শত শত মিলিয়ন পাউন্ডে পরিণত হয়। অপরিশোধিত ঋণ আকারে আরো বর্ধিত হয় অর্থ লগ্নিকারীদের উচ্চ কমিশন আর পাশাদের ঘুষের কল্যাণে।

১৮৬১ সালে আটত্রিশ বছর বয়সে সুলতান আবদুল মজিদ মৃত্যুবরণ করেন। শান্ত ও মানবিক স্বভাবের শাসক সুলতান ছিলেন পশ্চিমা ও সদ্ মনোভাবাসম্পন্ন। কিন্তু এসব অভিপ্রায়ের বাস্তব প্রয়োগের দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রাণশক্তির অভাব ছিল তাঁর মাঝে। সংস্কারক হিসেবে মুসলিম বা খ্রিস্টান প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি সুলতান। একই সাথে আভ্যন্তরীণ ঐক্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়ে সুলতান পিতার তানজিমাত সনদ পূরণ করতে ব্যর্থ হন।

সুলতানের ভ্রাতা আবদুল আজিজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান মজিদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলেও আজিজ প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিলেন। সুদর্শন ও পুরুষালী গঠনের সুলতান আবদুল আজিজ ছিলেন কম শিক্ষিত ও উত্তপ্ত মেজাজের অধিকারী। শাসনকালের শুরু নিজের দুই পূর্ব-পুরুষের ন্যায় সংস্কারকাজে মনোযোগ দান করেন। প্রাসাদের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দেখভালের দায়িত্ব নেন। কিন্তু শীঘ্রই এসব বাতিলের দলে চলে যায়। প্রাসাদের নিজের মৃত ভ্রাতার অসংখ্য উপপত্নীর পেনশন বন্ধ করে এর চেয়েও বৃহৎ একটি হারেম গড়ে তোলেন নিজের জন্য। যার জন্য তিন হাজার নপুংসক নিয়োগ করা হয়। ১৮৬৭ সালে বিদেশি শক্তি সমষ্টিগতভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফরাসি সরকার, ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়ার সমর্থনে সুলতানের কাছে সক্রিয় সংস্কার নীতির জন্য আর্জি প্রেরণ করে। সুলতান দৃঢ়ভাবে এ নোটের বিরোধিতা করলেও স্বাগত জানায় তাঁর দুইজন বিচক্ষণ মন্ত্রী: আলী এবং ফুয়াদ পাশা। উভয়ে মিলে পরবর্তী তিন বছরের মাঝে বিচার ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ হাই কাউন্সিলকে সুশৃঙ্খলিত করে তোলে।

কিন্তু একেবারে ভিন্ন ধরনের সংস্কার আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শাসক নয় বরং শাসিতের পক্ষ থেকে এর দাবি উচ্চারিত হয়; সামাজিক নয় সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে সংস্কারক সুলতান মাহমুদ পিতার সুলভ শাসনের মাধ্যমে নিজের জনগণের উন্নতিতে কাজ করে গেছেন। প্রথম থেকেই সুলতান এই প্যারাডক্স বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজের স্বাধীন কর্ম সম্পাদনের জন্য ধৈর্য ধরে সুলতানের একচ্ছত্র ক্ষমতার পথে সকল বাধাকে উৎপাটিত করতে হবে। এভাবে অটোমান পূর্বপুরুষদের চেয়েও বেশি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করে গেছেন সুলতান। একজন দৃঢ় মনোভাবের সুলতান

এসব ক্ষমতা দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে অন্তত উন্নতির প্রাথমিক পর্যায় শুরু করে গেছেন।

কিন্তু তাঁর কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য একই রকম দৃঢ় মনোভাবাপন্ন উত্তরসূরি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আবদুল মজিদ এসব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা সমস্ত বিকল্প শক্তির উৎস ধ্বংস করে একধরনের শূন্যতা রেখে গেছেন; যা কিনা শুধু তিনি বা তাঁর সমকক্ষ কোনো সুলতানই কেবল পূর্ণ করতে পারবে।

তানজিমাততে বর্ণিত সুলতানের প্রজাদের অধিকার ও স্বার্থের যথাযথ প্রয়োগের জন্য উলেমা বা প্রাদেশিক সরকারের কোন বিভাগ প্রয়োজন ছিল না; প্রয়োজন ছিল সুলতানের একক নির্দেশের। যা প্রায়ই অদক্ষ মন্ত্রীদের দ্বারা প্রভাবিত হতো। সমস্ত উপদেষ্টা কাজের মাধ্যম ও নিশ্চয়তা নির্ভর করত সুলতানের ওপর।

বস্তুত আবদুল মজিদ স্বেচ্ছায় না হলেও পিতার মতো নিরুঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করে গেছেন। আর এই সুযোগে অভিভাবকহীন ক্ষমতায় প্রবেশ করে বিরোধিরা। সুলতান আবদুল আজিজের শাসনকালে এরা পৌঁছে যায় শীর্ষচূড়ায়। একক ক্ষমতাবলে সমমনা কিছু আমলাদের সাথে নিয়ে সুলতান আজিজ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে কার্যত ঊনবিংশ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্যকে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করে।

দ্বিতীয় মাহমুদ ও পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণকারী আবদুল মজিদ চেয়েছিলেন বর্তমান প্রক্রিয়ার মাঝেই বিজ্ঞান, আইন, শিক্ষা ও সরকারের অনুষঙ্গে পশ্চিমা নীতি গ্রহণের মাধ্যমে উন্নতি করতে। কিন্তু এখন এই পর্যায়ে এসে প্রশাসনে সুলতানের সৃষ্ট পরিণত অভিজাত সম্প্রদায়ের মাঝে তরুণ বুদ্ধিজীবীর দল গড়ে উঠেছে। বিদেশি ভাষা ও ধ্যান-ধারণায় শিক্ষিত, পশ্চিমা জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ সম্প্রদায় সংস্কার সমস্যাকে তাত্ত্বিকভাবে পর্যালোচনা করে রাজনৈতিক সমাধান খোঁজার চেষ্টায় রত হয়েছে। পশ্চিম স্বাধীন গণতন্ত্রের নীতিসমূহের আলোকে সাংবিধানিক ও সংসদীয় সরকারের চর্চার মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। আবার এদিকে প্রতিক্রিয়াশীল আবদুল আজিজের শাসনকাল অতিবাহিত হতে হতে তানজিমাতে বর্ণিত সীমিত পশ্চিমা ধাঁচের সংস্কার বাতিল করে আরো এগিয়ে মৌলিক উপায়ে রাষ্ট্রের একনায়ক ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার উপায় নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এ তরুণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে স্বাধীনতা খুঁজতে গিয়ে, যেমনটা ইউরোপীয় জনগণ ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী বছরের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছে, তরুণ তুর্কিদের একটি দল গড়ে ওঠে। নিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত এ দল সাহসী ও নতুন দিকে অগ্রসর হতে চায়। তাদের স্লোগান হয়ে দাঁড়ায় "হারিয়েত" অর্থাৎ

"স্বাধীনতা"। "তানজিমাত" অর্থ ছিল "ন্যায়বিচার"। সীমিত সংস্কারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এমন পথে এগোতে থাকে, যার শেষ হবে বিপ্লবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের জন্য সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে পশ্চিমা স্বাধীনতার ধারণার অবতারণা করলেও এর সাথে সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছে ইসলামি ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদকে।

ব্যক্তিগত মতামতের জেরে বিভক্তি থাকায় একত্রিত হয়ে উদ্দেশ্য সফলের জন্য কিছু গঠন করতে ব্যর্থ হলেও ১৮৬৫ সালে ছোট্ট একটি প্রতিনিধিদল গঠিত হয়। বসফরাসের ওপরে বেলগ্রেডের জঙ্গলে পিকনিক পরিণত হয় ঐতিহাসিক ঘটনায়। "দেশপ্রেমিক সন্ধি" যা তুর্কিদের ইতিহাসে কার্যত প্রথম রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিগণিত হয়। তরুণ অটোমান নামে পরিচিত এ দলে শীঘ্রই আড়াইশো জন শিষ্য জুটে যায়। ইটালিতে কারবোনারিতে ও পোলান্ডে গোপন সংগঠনের মাধ্যমে বিপ্লবী কমিটি তৈরি হয়। নতুন সংস্কারকেরা রাজনীতিবিদ ছিল না। বুদ্ধিজীবী ছিল। যারা ওপর থেকে পরিবর্তন চাপিয়ে দেয়। নিচের দিক থেকে পরিবর্তন আনতে আগ্রহী ছিল। সাহিত্যের মাধ্যমে ও গণমাধ্যমের সাংবাদিকতার মাধ্যমে কাজ করত এ দল। ক্রিমিয়া যুদ্ধের কারণে তুর্কি প্রেসের প্রভাব ও বিস্তৃতি বেড়ে যায়।

তরুণ অটোমানদের মাঝে দুজন ছিল রাশিদ পাশার আশ্রিত জন। একজন ছিল ইব্রাহিম সিনাসি, যে কিনা ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়ে প্যারিসে ছিল। কবি ও নাট্যকার সিনাসি ইস্তাম্বুলে একটি প্রভাবশালী সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিল। আরেকজন জিয়া পাশা। প্রাসাদের গৃহকর্ম ও এ রকম ছোটখাটো আরো পদে কাজ করার পর ১৮৬৭ সালে প্যারিস, লন্ডন ও জেনেভাতে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যায় জিয়া। সাংবিধানিক সরকার ও সুলতান সৃষ্ট অটোমান জাতীয় সংসদের স্পষ্টবাদী সমর্থক হয়ে ওঠে জিয়া পাশা। বয়সে আরো তরুণ ও তার ধারণাকে কাজে পরিণতকারী ছিল নামিক কামাল। সিনিয়র অটোমান কর্মচারীর ঘরে জন্ম নেয়া নামিক রাজনৈতিক, সাংবাদিক ও রচনাকারী হিসেবে কাজ করে—স্বাধীনতা ও পিতৃভূমি শব্দ দুটির প্রচারক হয়ে উঠেছিল। আইনের অধীনে স্বাধীনতা ও নিজ সরকারের ধারণাকে এগিয়ে এনে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত নামিক কামাল। তার বৈপ্লবিক বার্তা ছিল জনগণের সার্বভৌমত্ব। এতে জড়িয়ে ছিল উপদেষ্টা নীতি। "অন্য কথায় সরকারের কাছ থেকে বিধান সভার ক্ষমতা হরণ করা হয়।"

ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে নিজের কর্মসূচিকে ইসলামের নীতির সাথে পুনর্মিলিত করা নামিক কামালের জন্য বেদনাদায়ক ছিল। ইসলামি অতীতে উদাহরণ খুঁজতে গিয়ে কোরআন থেকে আয়াত অন্বেষণ করতে থাকে উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিমূলক সরকার ব্যবস্থাকে সমর্থনের জন্য; সবাইকে দেখিয়ে দিতে

চায় যে, সংস্কার আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেও এমনটা অটোমান আইন ও ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী এটি যথার্থ ছিল না, তারপরেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয় নামিক। যারা কিনা পশ্চিমা মূল্যবোধের সাথে পরিচিত থাকায় প্রাচীন ইসলামের পুরোপুরি সন্তুষ্টি খুঁজে পায়নি।

লন্ডনে ও প্যারিসে নির্বাসনে থাকাকালীন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল নামিক কামাল। তার ভ্রমণ আরো দীর্ঘতর হয়েছিল তরুণ অটোমানদের মিত্র, ধনী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী মিশরীয় রাজকুমার মুস্তাফা ফাজিলের কল্যাণে। ইসমাইল পাশা পর্যন্ত মুস্তাফা ছিল মিশরীয় রাজবংশের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তার বড় ভাই চল্লিশ দিনের মাথায় সুলতানের কাছ থেকে "খেদিভ" উপাধি অর্জন করে সিংহাসনে আরোহণের নীতিতে পরিবর্তন আনে নিজের পুত্রের জন্য। ফাজিলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল শাসন করা। মিশরের খেদিভ হতে না পারলেও সাংবিধানিক তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার উচ্চাশা ছিল তার। প্যারিস থেকে ফরাসি ভাষায় সুলতানের কাছে পত্র পাঠিয়ে সাম্রাজ্যের অবস্থার জন্য ভর্ৎসনা করে সংবিধানের প্রয়োজন উল্লেখ করে ফাজিল। এই দলিল তুর্কি ভাষায় নামিক কামাল ও তার সহকর্মীরা অনুবাদ করে তার সম্পাদিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।

এক্ষেত্রে সরকারের প্রতিক্রিয়া হয় তীক্ষ্ণ। নতুন প্রেস আইন বলে আদেশ জারি হয় যে সংবাদপত্র চালানোর ওপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে ও পুলিশ আদালতে এহেন অপরাধের বিচার করবে প্রেস কমিশন। কামাল এবং জিয়া পাশা সরকারি কর্মচারী হিসেবে প্রদেশসমূহে বদলি হয়। কিন্তু এর পরিবর্তে রাজকুমার ফাজিলের নিমন্ত্রণে গোপনে প্যারিসে পালিয়ে যায় দুজন। এখানে নিজের বাসভবনকে তরুণ অটোমানদের হেডকোয়ার্টার তৈরির অনুমতি দিয়ে তাদেরকে ফরাসি রাজনৈতিক ও দাপ্তরিক চক্রে মেশার সুযোগ করে দেয় ফাজিল। এখানে আরো একজন বিরোধি সংবাদপত্রের সম্পাদক আলী সুয়াভির সাথে একত্রিত হয়ে ইস্তাম্বুলের ন্যায় সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকে। যার নাম ছিল তুর্কি ভাষায়—হারিয়েত, "মুক্তি"।

১৮৬৭ সালের গ্রীষ্মে সেনাবাহিনী প্রধান না হয়ে বরঞ্চ প্রথম অটোমান সুলতান হিসেবে রাষ্ট্রীয় সফরে প্যারিস ও লন্ডন ভ্রমণ করেন সুলতান আবদুল আজিজ। ফরাসি সরকারের নমনীয় অনুরোধে নামিক কামাল ও তার দল লন্ডন চলে যায়। সেখানে তাদের কার্যাবলিতে পরবর্তী কয়েক বছর আর্থিক সাহায্য প্রদান করে রাজকুমার ফাজিল। সুলতান লন্ডনে পৌঁছানোর পর নামিক কামাল ও তার দল ক্রিস্টাল প্রাসাদে আতশবাজি পোড়ানোর উৎসবের ভিড়ে অংশ নিলে লাল ফেজ টুপি সুলতানের মনোযোগ কেড়ে নেয়। পরিচয় জানতে চাইলে তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর দেয় "তারা আপনার বিরোধি দল।"

ভিয়েনা ভ্রমণের পর নামিক কামাল ১৮৭০ সালের শেষ দিকে তুরস্কে ফিরে আসে। এরই মাঝে আইন ও অর্থশাস্ত্রের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করে ফরাসি কাজকে তুর্কি ভাষায় অনুবাদ করে নামিক কামাল। দেশপ্রেমমূলক একটি নাটক রচনা করে কামাল। নাম হয় "ভাতান" অর্থ "পিতৃভূমি"। ইস্তাম্বুলের দর্শক মহোল্লাসে ফেটে পড়ে এ নাটক দেখে আর প্রভাবশালী সংবাদপত্র "ইবরেত"-তে প্রশংসা ঝড়ে পড়ে এ সম্পর্কে। পরবর্তীতে এ সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হয় নামিক কামাল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে সিলিস্ট্রিয়া দুর্গ, প্রতিরক্ষা বীরত্বপূর্ণ কাহিনী প্রদর্শিত হয় এ নাটকে। যেখানে "বিশ্বস্ততা"কে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; সুলতান বা ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ধারণা "জাতি"-র প্রতি। দাপ্তরিকভাবে এক প্রেস কনফারেন্সে একে রাজদ্রোহের সমমূল্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শেষ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়ার পর সংবাদপত্রটি বন্ধ করে দেয়া হয় ও নামিক কামালকে সাইপ্রাসে আটক রাখা হয়। এখানে আটকাবস্থায় পরবর্তী তিন বছরে অবসন্ন হয়ে পড়ে নামিক কামাল।

ইতিমধ্যে তানজিমাত যুগের শেষ আলোকিত দেশনায়ক আলী পাশা মৃত্যুবরণ করে ১৮৭১ সালে; তার সহকর্মী ফুয়াদ পাশা আরো দুই বছর পূর্বে দেহত্যাগ করেছিল। সুলতানের উজিরদের মধ্যে একমাত্র আলী আবদুল আজিজের ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। যার মৃত্যুতে সুলতান আবদুল আজিজ "অবশেষে একজন মুক্ত মানুষ" ভাবা শুরু করে নিজেকে। বস্তুত নিজের অশুভ ইচ্ছা পোর্তের বিরুদ্ধে ব্যবহার শুরু করে। ইউরোপীয় বিরোধিতা, ইসলামি প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব ও ব্যক্তিগত একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হয় সুলতান। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর পোর্তের ওপর ফরাসি সম্মান ও প্রভাব ধসে পড়ে। লর্ড রেডক্লিফের ভবিষদ্বাণী সত্যি পরিণত করে তানজিমাত ও পরবর্তী সনদের মৃত্যু ঘটে। ১৮৭১ সালে পরবর্তী সময় থেকে অটোমান সাম্রাজ্য পতনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে আর্থিক বিপর্যয়কে সঙ্গী করে।

রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টির ফলে শক্তি দিক পরিবর্তন করে প্রাসাদের মাঝে কেন্দ্রীভূত হয়। রাশিয়ার জারের ন্যায় শাসন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণকারী সুলতান হয় সর্বময় ক্ষমতার প্রভু।

প্রধান উজিরের কাছে নয়; মন্ত্রীরা বাধ্য হয় সুলতানের নীতি পূরণে। প্রধান উজির হিসেবে শুরুর দিকে সুলতান তাঁর বংশোদ্ভূত মাহমুদ নাদিমকে নিয়োগ দান করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং নীতিবিবর্জিত মাহমুদ নিজের প্রভাব ও সুলতানের ক্ষমতা হরণকারী হিসেবে আবির্ভূত সকল মন্ত্রীকে হয় পদচ্যুত করে নতুবা নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়।
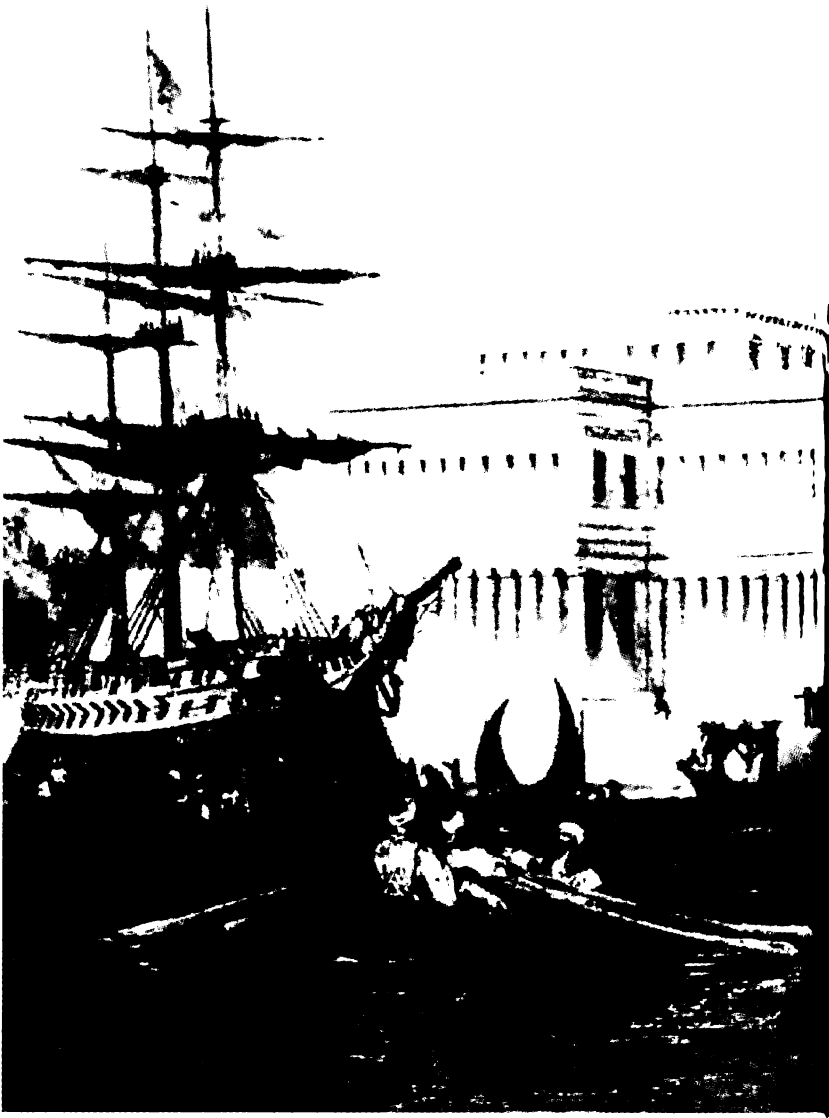
সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ নির্মিত দোলমা বাহচে প্রাসাদ। ১৮২৯ সালে গ্রিক স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় আর শেষ হয় সম্ভবত (চিত্রে যেমনটা দেখা যাচ্ছে) ১৮৩৮ এর পূর্বে। দোলমা বাহচে পুরোপুরি বাসভবনে পরিণত হয় যখন সুলতান প্রথম আবদুল মজিদ (১৮৩৯-৬১) ১৮৫৩ সালে টপকাপি প্রসাদ ত্যাগ করেন। প্রায় চার শতক ধরে সুলতানেরা টপকাপি প্রসাদেই বসবাস করতো।
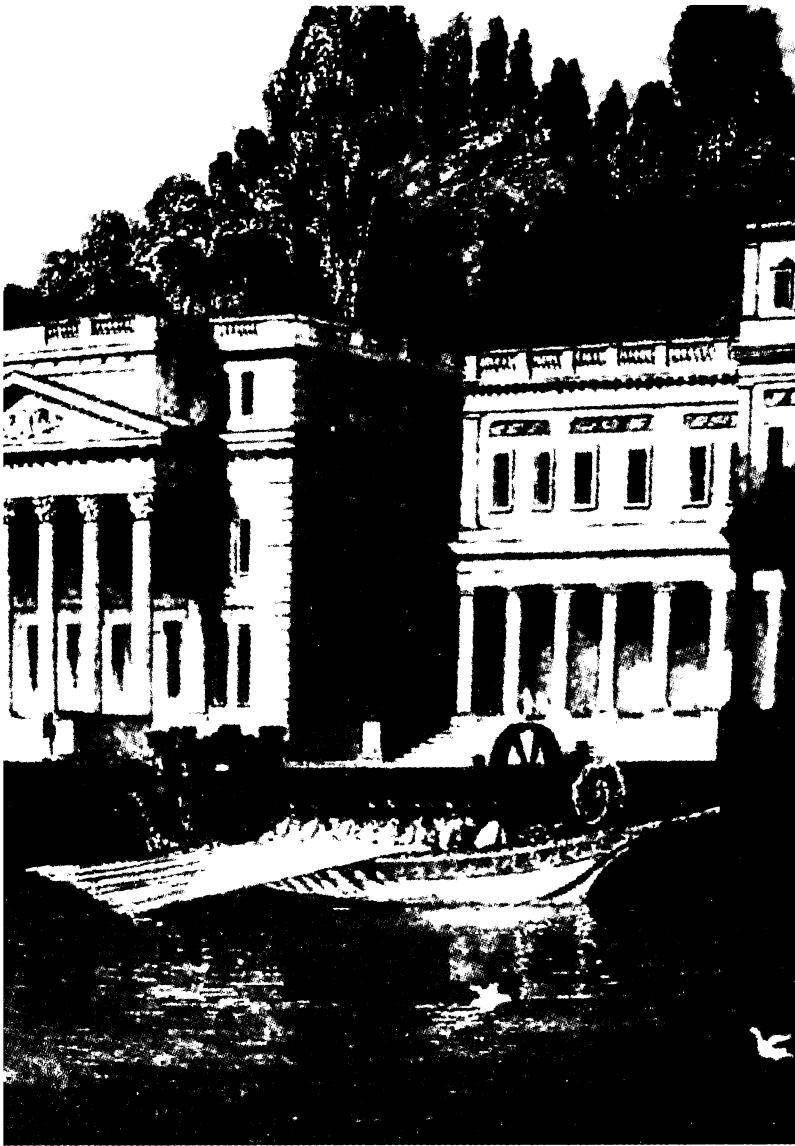
১৮৭২ সালে নাদিমকে অব্যাহতি প্রদান করে মাত্র তিন বছরের মাঝে ছয়জন প্রধান উজির পরিবর্তন করেন সুলতান। নিজের ইচ্ছের প্রতি তাদেরকে নত হতে বাধ্য করেন সুলতান এবং অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগে পরামর্শ গ্রহণে প্রত্যাখ্যান করেন। এদের মাঝে প্রথম এবং উল্লেখযোগ্য ছিল মিধাত পাশা। সাংবিধানিক সংস্কারের অনুসারী মিধাত প্রাদেশিক প্রশাসক হিসেবে প্রশাসনে সংস্কার নিয়ে আসে। ফলে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয় অধিক হারে। কিন্তু সুলতান শীঘ্রই মিধাতকে শক্তিশালী ও স্বাধীন হিসেবে গণ্য করে অব্যাহতি প্রদান করেন মাত্র তিন মাসের মাথায়। আবারও নাদিমকে পুনর্নিয়োগ করা হয়।

সুলতানের খেয়ালিপনা বৃদ্ধি পেয়ে মনে হতে থাকে যেন নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবার বাতিকে পেয়েছে তাঁকে। মানসিক ভারসাম্য নিয়ে সন্দেহ জাগতে শুরু করে। দিন দিন আরো বেশি আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকেন সুলতান; মন্ত্রীদেরকে তাঁর সামনে ভূমিতে শয়ান হতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন ও তাঁর পুত্রের পদ চুম্বনও করতে হতো; তাঁর মতো আজিজ নামধারী সকল কর্মচারীর কাছে দাবি করেন অন্য নাম গ্রহণ করতে; সৈন্যদের সাথে সত্যিকারভাবে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু করেন; বিপুল পরিমাণে ডিম খেতেন; মুরগি যুদ্ধ নিয়ে বাড়াবাড়ি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন।

ইউরোপের রাজধানী সমূহ ভ্রমণ সম্পন্ন করে দেশে ফিরে সে রকম জাঁকজমকের ব্যবস্থা করতে ওঠে পড়ে লেগে যান। বিদেশি রাজকীয় অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য ইউরোপীয় ধাঁচের দোলমা বাহচে প্রাসাদে এমন ব্যবস্থা করেন, যার ফলে বার্ষিক দুই মিলিয়ন অর্থ ব্যয় হতে শুরু করে। ইউরোপীয় স্থাপত্যবিদ্যা ও কারিগরী উৎকর্ষ চাক্ষুষ করে এসে সুলতান বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেন যুদ্ধজাহাজ ও সাম্রাজ্যজুড়ে রেলপথ স্থাপনের কাজে। রাষ্ট্রীয় আর্থিক সংকট বেড়ে যাওয়ায় ঘোষণা করেন যে, বাগদাদ রেলওয়ে নির্মাণে সুলতান ব্যক্তিগতভাবে অর্থ ব্যয় করবেন।

এ সময় ইউরোপীয় ব্যাংক থেকে অর্থ ধার নেয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। ইউরোপীয় অর্থলগ্নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তুরস্কের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আশাবাদী হয়ে এগুলোর উন্নতি সাধনে তুর্কিদের অদক্ষতা ও আর্থিক বিষয় পরিচালনায় বিচক্ষণতার অভাবকে আমল দেয়নি। এই ঋণের সুদ মেটাতে গিয়ে বস্তুত তুর্কিরা আরো বিদেশি ঋণ ও বন্ড ইস্যু করতে থাকে। ফলে রিচার্ড কোবজেনের ভাষায়, তুরস্ক "কখনোই কোনো সুদ পরিশোধ করতে পারেনি। কেননা সব অর্থই ঋণ নিয়েছিল সুদ পরিশোধ করতে।"

এই তুষার বল প্রক্রিয়াতে বিশ বছরের মাঝে অটোমান ঋণ চার মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দুইশ মিলিয়ন পাউন্ডে পৌঁছে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর সেভাবে

বৃদ্ধি পায়নি আর সরকারের বার্ষিক সম্পদের পঞ্চাশ শতাংশই এতে ধ্বংস হয়ে যেতে থাকে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়।

১৮৭৩ সালের পর আনাতোলিয়াতে খরা ও দুর্ভিক্ষ হতে থাকে। ফলে সামগ্রিক ভাবে দুঃখ-দুদর্শা ও অসন্তুষ্টি বেড়ে যায়। শীতের কবলে পড়ে অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়ে যে ইস্তাম্বুলের শহরতলিতে নেকড়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ভেড়া ও ষাঁড় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। গ্রামে মানুষ উপোস করতে থাকে এবং সৎকারবিহীন ভাবে রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে থাকতে শুরু করে। কৃষি ক্ষেত্রে ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় কর আদায় কমে যায়। এমন চরম অবস্থায় পৌঁছে যায় রাজ্যকোষ যে সরকারি কাজের জন্যও প্রয়োজনীয় ফান্ডের অভাব হয়ে পড়ে।

আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে ১৮৭৫ সালের অক্টোবর মাসে অটোমান সরকার সংবাদপত্রে ঘোষণা করে যে, বাজেটে ঘাটতির কবলে পড়ার কারণে পোর্তেকে ঋণদানকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের সুদের মাত্র অর্ধেক অংশ ক্যাশ হিসেবে পাবে। বাকি অর্ধেক অংশ পরবর্তী পাঁচ বছরে পাঁচ শতাংশ হারে সূদের মাধ্যমে বন্ডে পরিশোধ করা হবে। এতে বিদেশে অটোমান সরকারের ঋণ ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। আর দেশে সুলতান ও তাঁর সরকারের প্রতি চাকরিজীবী তুর্কিরা অসন্তোষে ফেটে পড়ে। আর্মেনীয় ও গ্রিকরা বাদ রয়ে যায়। কেননা তারা সরকারের বন্ডে অর্থ লগ্নি করেছিল।

আর্থিক অপ্রাচুর্যতার সমস্যা আরো বেড়ে যায় আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে। এতে আরো উসকানি জোগায় শস্যের খারাপ ফলন। ফলে কৃষকদের কর প্রদানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে হারজিগোভিনা। এ সংঘর্ষ বসনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। মন্টিনিগ্রো ও সার্বীয়া পোর্তের বিরুদ্ধে কোনো জটিল অভিযোগ না থাকলেও সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে। ফলে ১৮৭৬ সালের গ্রীষ্মে পুরো বুলগেরিয়াতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত এর মাধ্যমে বলকান বিপ্লব শুরু হয়, যা পরবর্তী প্রজন্মে একের পর এক যুদ্ধের ফলে গোটা বলকান অঞ্চলের চিত্র পাল্টে দেয়।

বুলগেরিয়াতে একজন বিদ্রোহী নেতা যে কিনা নিজেকে স্লাভ নেপোলিয়ন হিসেবে বিবেচনা করত, অনুসারীদের সন্ত্রাসী কায়দায় প্ররোচিত করে। মুসলিম তুর্কিদের নির্বিচারে হত্যা করে এ বাহিনী। কিন্তু দশ দিনের মাথায় এর চেয়েও ভয়ংকর পরিণতি বরণ করে নেয় তারা তুর্কি অনিয়মিত বাহিনীর প্রতিশোধ আক্রমণে। ইস্তাম্বুলে এহেন কার্যে ব্রিটিশ কমিশনার মন্তব্য করে ওঠে "সম্ভবত বর্তমান শতকের সবচেয়ে জঘণ্য অপরাধ।" মাত্র এক মাসের মাঝে বারো

হাজার খ্রিস্টানকে নির্বিচারে হত্যা করে তুর্কি বাহিনী। বাটাক পার্বত্য গ্রাম কলুষিত হয়ে ওঠে এ হত্যাযজ্ঞ, সম্ভ্রমহানি ও ধ্বংসলীলায়। এখানে একটি গির্জায় আশ্রয় নেয়া হাজারো খ্রিস্টানকে পুড়িয়ে মারে অনিয়মিত বাহিনী। সবশেষে প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় তাদের হাতে সাত হাজার গ্রামবাসীর মধ্যে পাঁচ হাজারই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীরে কাছে এ গল্প প্রথম প্রকাশ পায় ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য ডেইলি নিউজের সাংবাদিক দ্বারা। পাঠকদের কাছে এ মুখপাত্র বর্ণনা করে—একটি গির্জা প্রাঙ্গণের কথা "যেখানে তিন ফুট গভীর পর্যন্ত তৈরি হয়েছে গলিত মৃতদেহের স্তূপ—হাত, পা, মাথা সব যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। গির্জার মেঝেতে ছড়িয়ে আছে পচন ধরা মৃতদেহ।" এ ধরনের মধ্যযুগীয় বর্বরতা তুর্কিদের শতাব্দী পুরোনো "পবিত্র" যুদ্ধের সাধারণ চিত্র। স্বাধীনতাবাদী মি. গ্লাডস্টোন বেস্ট সেলিং পুস্তিকাতে তুলে আনেন "বুলগেরিয়ান হররস"-এর কথা।

অটোমান রাজকোষের শূন্যতার কারণে এমনটা ঘটলেও বুলগেরিয়ার এই হত্যাযজ্ঞ তুর্কিদেরকে নতুন ভাবমূর্তি দান করে। ব্রিটেনজুড়ে তুর্কি-ফোবিয়া শুরু হয়। ব্রিটিশ জনগণ তুর্কিদের বিরুদ্ধে বন্ধুত্বের মনোভাব পরিত্যাগ করে। এর ফলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ডার্বি জোর দিয়ে বলে ওঠে, "যদি রাশিয়াও পোর্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে মহারাণির সরকার এতে হস্তক্ষেপ করবে না।" বস্তুত গ্লাডস্টোনের পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর পোর্তের রাশীয় রাষ্ট্রদূত জারকে অবহিত করে যে "বুলগেরিয়ার হত্যালীলা রাশিয়াকে এমন কিছু এনে দিয়েছে যা পূর্বে ছিল না—ব্রিটিশ জনমতের সমর্থন।

১৮২০ সাল থেকে রাশিয়া বলকান প্রদেশসমূহে খ্রিস্টান স্লাভদের মাঝে বিদ্রোহের জন্য পরিশ্রম করে আসছে। আর এই সময়ে এসে স্বয়ং পোর্তের মাঝে রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষার উপায় পেয়ে গেছে। কেননা মাহমুদ নাদিম ও প্রধান উজির হিসেবে যে কোনো সংস্কার কার্যকেই পশ্চিমা প্রভাব বৃদ্ধির হাতিয়ার মনে করত। এ উদ্দেশ্যে মিধাত পাশাকে অপসারণের জন্যও রাশীয় রাষ্ট্রদূত ইগনাশিয়েভ ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল ও সফলও হয়েছে।

পুনরায় নাদিম এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে পর ইগনাশিয়েভ এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, "কনস্টান্টিনোপলের ঘটনাক্রমের নির্ধারক হয়ে ওঠে। যেখানে একজন প্রধান উজির ছিল রশিয়ার প্রতি উৎসর্গীত ও পশ্চিমাবিদ্বেষী সুলতান। উভয়ে ইগনাশিয়েভের পরামর্শ অনুসরণ করত।" (ইগনাশিয়েভের সহকর্মীর প্রতিবেদন)। ব্রিটিশ ও ফরাসি অর্থ লগ্নিকারীদের সমস্যাকে স্বাগত জানিয়ে তুর্কি সমস্যাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে ইগনাশিয়েভ। কিন্তু এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। কেননা মাহমুদ নাদিমের পতন হয় ও শীঘ্রই সুলতান আবদুল আজিজেরও পতন ঘটে।

১৮৭৬ সালে গ্রীষ্মের শুরুতে প্রায় ছয় হাজার ধর্মতত্ত্বের শিক্ষার্থী মাদ্রাসা ছেড়ে পোর্তের উদ্দেশে অগ্রসর হয়। প্রধান উজির মাহমুদ নাদিম ও প্রধান মুফতির পদত্যাগ দাবি করে তারা। এক্ষেত্রে আরো বলা হয় যে তাদের কেউ কেউ বিল্ডিংয়ের সামনের রেলিং পরীক্ষা করে দেখতে থাকে যে প্রধান উজিরকে ফাঁসি দেয়ার মতো যথেষ্ট উঁচু কিনা। ষোড়শ শতক থেকে তুরস্কের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ধর্মতত্ত্বের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ নতুন কিছু না হলেও এই বিদ্রোহ পূর্বের তুলনায় ভিন্ন ছিল। স্বেচ্ছায় পূর্বেই প্রস্তুতি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই অগ্রসর হয়েছে তারা। এভাবে ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে চলেছে তুরস্ক। এটি ভাবা হয় যে তাদেরকে আর্থিক ও সাংগঠনিক সহায়তা দিয়েছে মিধাত পাশা। তরুণ অটোমানদের সাংবিধানিক আন্দোলন এখন তার কাঁধে।

সুলতান শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে প্রধান মুফতি ও নাদিমকে অপসারণ করে রুশদী পাশাকে প্রধান উজির নিযুক্ত করে। মিধাত পাশা সরকারের কাজে ফিরে আসে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে। কিন্তু এটি একটি সূচনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এর পর থেকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ভাষ্য অনুযায়ী “সংবিধান” শব্দটি সবার মুখে মুখে ঘুরতে থাকে।” এক্ষেত্রে মিধাতের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা, সমতা ও দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার মাধ্যমে সত্যিকারের জাতীয় উপদেষ্টা সংসদ প্রতিষ্ঠা করা। সাম্রাজ্যজুড়ে যা প্রতিনিধিত্ব করবে জাতি, শ্রেণী বা মত বৈষ্যমের ঊর্ধ্বে ওঠে। এর ফলে সুলতান ও তাঁর মন্ত্রীরাও দায়িত্বশীল হয়ে পড়বে। বর্তমান একনায়কত্ব খর্ব হয়ে জাতির ইচ্ছাই প্রধান হয়ে উঠবে। যেমনটা ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রক্রিয়ার মাঝে।

একে যুক্তিযুক্ত করার জন্য কোরআন থেকে গণতন্ত্রের প্রেশক্রিপশনের উল্লেখ করা হয়। এর ব্যাখ্যাতে পাওয়া যায় যে সুলতানের বর্তমান একনায়কত্ব জনগণের অধিকার খর্ব করছে। ফলে পবিত্র আইন ভঙ্গ হচ্ছে। এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধি সর্বপ্রধানকে মানতে জনগণ বাধ্য নয়। মিধাতের প্রস্তাবের মাঝে ১৮৬৭ সালে রাজকুমার ফাজিল সুলতানের কাছে যে পত্র লিখেছিল তার ভাষ্যই প্রকাশিত হয়।

পরিকল্পনা নেয়া হয় যে “মুসলিম দেশপ্রেমিক”-দের স্বাক্ষরসংবলিত একটি ইশতেহার বিদেশে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কদের কাছে বণ্টন করা হবে। ফলে অটোমানদের শুভ ইচ্ছার প্রকাশ পাবে। কিন্তু এই সময়ে দেশের মাঝে গোপন রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কেননা এ ইশতেহারে “দুর্দশাগ্রস্ত পাগল” সুলতানের অপসারণের সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে।

বস্তুত এটি ছিল সুলতানের মন্ত্রীদের তাৎক্ষণিক অভিপ্রায়। নতুন প্রধান মুফতি সুলতানের অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈধতা প্রদান করে। এরপর

১৮৭৬ সালের ৩০ মে তারিখে প্রত্যুষে দোলমা বাহচে প্রাসাদের চারপাশে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য জড়ো হয় স্থলভাগের দিক থেকে। আর বসফরাসের দিকে জলযান অবস্থান নেয়। অন্যদিকে আরেকটি জলযান রাশিয়ার গ্রীষ্মকালীন দূতাবাসের সামনে অবস্থান নেয়। যাতে ইগনাশিয়েভ কোনো পদক্ষেপ নিতে না পারে। এরপর মিধাত ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হলে প্রধান মুফতি “মানসিক ভারসাম্যহীনতা, রাজনৈতিক বিষয় অবজ্ঞা, জনগণের করকে ব্যক্তিগত কাজে খরচ এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের প্রতি অদায়িত্বশীল আচরণের অভিযোগে সুলতানের পদত্যাগের ওপর ফতোয়া জারি করে। মন্ত্রীরা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকার পঞ্চম মুরাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ করে।

প্রভাতবেলা ১০১টি বন্দুকের সম্মিলিত শব্দে ঘোষিত হয় সুলতান পরিবর্তনের সংবাদ। আবদুল আজিজ কোনো বিরোধিতা না করে পদত্যাগপত্র রচনা করে বসফরাস পার হয়ে পুরাতন সেরাগলিও প্রাসাদে নির্বাসনে স্বীকৃতি প্রদান করে। রক্তপাতহীন এই অভ্যুত্থানে ইস্তাম্বুলের জনগণ প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। আরো একটু এগিয়ে একজন মন্ত্রী এ ঘটনাকে জানিসারিসদের দমনের মতোই আরেকটি “শুভ ঘটনা” হিসেবে উল্লেখ করে।

সুলতান মুরাদের অভিষেককে স্বাগত জানায় স্বাধীনতাবাদীরা। প্রাসাদের বিভিন্ন পদে তরুণ অটোমানদের অনেককেই নিয়োগ দেয়া হয়। বিশেষত সাইপ্রাস থেকে ফিরে এসে নামিক কামাল সুলতানের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি পদে নিয়োগ পায়। সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সবার আশা জাগরুক করে তোলে সুলতান মুরাদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই আশা অপূর্ণ থেকে যায়। একজন তরুণ হিসেবে মুরাদের মাঝে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ছিল। সুশিক্ষিত এবং পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী মুরাদ আবদুল আজিজের সাথে ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে বিদেশিদের প্রীতিপূর্ণ বিস্ময়ের উদ্রেগ করে তোলেন। কিন্তু ফিরে আসার পর দেশে-বিদেশে স্বাধীনতাবাদীদের সাথে যোগাযোগের কারণে সুলতান আজিজ মুরাদকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে। এর ফলে আবদুল আজিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মুরাদ অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়ে।

মানসিকভাবে বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত মুরাদ সিংহাসনে আরোহণের সংবাদে ভয়ে কেঁপে ওঠে। অবস্থা আরো মারাত্মক হয়ে যায় যখন কিছুদিন পরেই অস্থির মানসিক অবস্থায় আবদুল আজিজকে মৃত আবিষ্কার করা হয়। নিজের কব্জি কেটে শিরা ধ্বংস করে ফেলা আজিজ আত্মহত্যা করেছিলেন। নিজের দাড়ি কাটার বাহানা দিয়ে একজোড়া কাচি এনে এ কাজ করেছিলেন আবদুল আজিজ। এ ঘটনার জোর ধাক্কা লাগে নতুন সুলতানের মনোজগতে। এর পরই

তাঁর যুদ্ধ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে কেবিনেট মিটিংয়ের সময়ে এক বিক্ষুব্ধ সার্কাশান সেনা অফিসার হত্যা করে বসলে সুলতান প্রায় ভেঙে পড়েন।

মুরাদ, ওসমানীয় তরবারি হাতে নিয়ে সুলতান হিসেবে শপথ নেয়ার বিলম্ব থাকায় জনসমক্ষে আসতে বা কোনো দাপ্তরিক কাজ করতে পারতেন না। চিকিৎসক এসে পরীক্ষা করে যায় সুলতানকে, তুর্কি এবং বিদেশি উভয় চিকিৎসকের পরীক্ষার ফলাফলে প্রকাশ হয় তীব্র নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটেছে সুলতানের। সময়ই শুধু যার নিরাময়। কিন্তু দেশে এবং বিদেশে রাজনৈতিক সংকটে পড়ে মন্ত্রিপরিষদ বাধ্য হয় আরো একটি অপসারণ বিবেচনা করতে। যোগ্য এবং সক্রিয় শাসকের কামনায় ক্ষমতায় আসে মুরাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল হামিদ। যিনিও কিনা একই রকম গোপনীয়তায় বসবাস করতেন।

সহমন্ত্রীগণ মিধাতকে এ দায়িত্ব অর্পণ করে। আবদুল হামিদকে শাসক হিসেবে রাজি করানোর জন্য। কিন্তু আবদুল হামিদ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। সিংহাসনের প্রতি লোভ থাকলেও, কোনো শর্ত ছাড়াই সিংহাসনে আরোহণ করতে চেয়েছিলেন। মুরাদের শাসন অক্ষমতা সম্পর্কে কোনো মেডিক্যাল সনদ দেয়ার প্রতি জোরারোপ করেন আবদুল হামিদ। মিধাত পুনরায় আবদুল হামিদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় সাথে নিয়ে যায় প্রস্তাবিত নতুন সংবিধানের খসড়া, এ বছরের পূর্বে তার নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতকে বেলজিয়াম ও প্রুশিয়ার সংবিধানের ন্যায় এ সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে দেশনায়ক ও উলেমা সদস্যের কমিটি। আবদুল হামিদ তিনটি শর্তের ভিত্তিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন   তিনি সংবিধান ঘোষণা করবেন; দায়িত্বশীল উপদেষ্টাদের মাধ্যমে শাসন করবেন; ভাইয়ের প্রাসাদ সেক্রেটারিদের পুনর্নিয়োগ দান করবেন।

নামিক কামাল, এদেরই একজন সুলতান মুরাদের পদত্যাগের স্থগিতাদেশের পক্ষে চোখের জল ফেলতে থাকে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। প্রধান মুফতি ফতোয়া জারি করে। মানসিক অক্ষমতার দরুন তিন মাস শাসনকাল অতিবাহিত হওয়ার পর পদত্যাগ করেন মুরাদ। দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বসফরাসের ওপরে একটি প্রাসাদে পাঠিয়ে দেয়া হয় পঞ্চম মুরাদকে। এখানে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত জীবন অতিবাহিত করেন তিনি।

নতুন সুলতান ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অটোমান সাম্রাজ্যের জন্য নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন। প্রধান উজির হিসেবে মিধাত পাশাকে নিয়োগ দান করেন সুলতান হামিদ। কিন্তু শেষ দলিল পুরোপুরি মিধাতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হয়নি। প্রকৃত খসড়াতে সুলতান বিভিন্নভাবে রূপবদল করেন। পবিত্র আইনের প্রয়োগের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন; নিজস্ব সুবিধা সমূহ রক্ষা করেন; বেশ কিছু ধারা রদ করেন; অনেক ক্ষেত্রেই মিধাতের স্পষ্ট ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে

যান। ফলে সাংবিধানিক সরকারের দ্রুত সূচনা করায় ইতিবাচকতার অভাবে ব্যর্থ হন সুলতান। এসব অপূর্ণতা থেকে জন্ম নেয় ভবিষ্যৎ সমস্যাবলি।

এতদসত্ত্বেও একজন সুলতান সংবিধানকে স্বীকৃতি ও ঘোষণা প্রদান করলে শতকজুড়ে চলতে থাকা সংস্কারকাজের সাথে উপযুক্তভাবে মিশে যায়। অন্তত ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি হাতিয়ার প্রস্তুত হয়েছে। এর মৌলিক নীতি ছিল যে অটোমান সাম্রাজ্যের জনগণের অধিকার আছে তাদের বার্তা জানিয়ে দেয়ার। মিধাত পাশা সুলতানকে ধন্যবাদ জানিয়ে "দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধি নতুন যুগের সূচনায়" প্রশংসা করেন। পরবর্তী দিনে সমস্ত নজির ভঙ্গ করে গ্রিক এবং আর্মেনীয় যাজকদের ডেকে পাঠায়। সবাইকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে নতুন সংবিধানের মাঝে সকল ধর্ম-মতের সমানাধিকার থাকবে। গ্রিক যাজক প্রতিউত্তরে বলে ওঠে "আমরা আপনাকে অটোমান সাম্রাজ্যের পুনর্জীবনদানকারী রূপে বিবেচনা করি।" ইতিমধ্যে ইস্তাম্বুলের জনগণের উদ্দেশে কামানের গর্জন ঘোষণা করে যে, মুসলিম এবং খ্রিস্টান উভয়ের জন্য নতুন স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়ে আছে।

॥ ৩৫ ॥

সংবিধানের প্রতি এই সশব্দ স্যালুট যথাসময়ে হয়। সুলতান ইস্তাম্বুলে আয়োজিত ছয় শক্তির প্রতিনিধিদের নিরস্ত্র করতে তোড়জোড় শুরু করেন। এর প্রথম সেশনে ঘোষণা আসে। ব্রিটিশ উদ্যোগে এই সম্মেলন শুরু হয়েছিল। বলকানের অবস্থা পর্যালোচনা করে রাশিয়ার সাথে সমঝোতার জন্য সুলতানকে প্রস্তাব দেয়া হয় আরো ভালো নিরাপত্তার তাগিদে। ইউরোপে খ্রিস্টান প্রজাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রশাসনিক পরিবর্তনের কথা বলা হয় সুলতানকে।

১৮৭৬ সালে বলকান বিদ্রোহের ফলে সার্বীয়া ও মন্টিনিগ্রো রাশিয়ার প্ররোচনায় পোর্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। তিন মাসের মাঝেই তুর্কিরা সার্বীয়াদের পরাজিত করে। বেলগ্রেডে বিজয় অগ্রযাত্রায় বাধা পায় তুর্কিরা রাশিয়ার সরাসরি আক্রমণের ফলে। যুদ্ধবিরতিতে চাপ দেয় রাশিয়া। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট জার্মানির সহায়তায় বার্লিন স্মারকলিপি প্রস্তুত করে পোর্তের ওপর সংস্কার চাপিয়ে দিতে প্রস্তুতি নেয় ও ব্রিটিশ সহযোগিতা প্রার্থনা করে সংক্ষিপ্তভাবে।

সংক্ষিপ্ত ভাষণে এটি প্রত্যাখ্যান করে ব্রিটেন। কেননা ফ্রান্স ও ইটালিসহ ব্রিটেনকে'ও ত্রি-সামরিক শক্তি পূর্বে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করেনি। ফলে ব্রিটেন এ প্রস্তাবকে দেখে—ডিসরায়েলির ভাষায়—যেন "আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে তুর্কিদের গলায় ছুরি ঢোকাতে তাদেরকে অনুমতি দেয়া।" এর মাঝে অটোমান ভূখণ্ডে যৌথ সামরিক অনুপ্রবেশের ধারণা পাওয়া যায়। যা দেশের

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি। ব্রিটিশ সহায়তা সম্পর্কে পোর্তেকে নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে দার্দেনালেসের মুখে ভূমধ্যসাগরীয় রণতরীর একটি স্কোয়াড্রণকে পৌঁছানোর আদেশ দেয়া হয়। তারপর রাশিয়ার সুনিশ্চিত প্রস্তুতি গ্রহণ সত্ত্বেও যুদ্ধ এড়াতে ব্রিটেন "কনস্টান্টিনোপল কনফারেন্স" আহ্বান করে।

সংবিধানের ঘোষণা প্রতিনিধিদের পাল থেকে হাওয়া সরিয়ে নেয়। কিন্তু এ ঘোষণার বিশ্বস্ততাকে আমল না দিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা মঙ্গলজনক না থাকায় শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে একে রাজনৈতিক ছল হিসেবে দূর করে দেয় পশ্চিমা শক্তি। যেমনটা পূর্ববর্তী তানজিমাতের সময়ে হয়েছিল। তাই পশ্চিমা শক্তি সমূহ এ সংবিধান ঘোষণাকে সংকটের মুখে পশ্চিমের সমর্থন আদায়ের জন্যও রাশিয়ার সম্ভাব্য হুমকি বাতিলের জন্য তুর্কিদের শুভ ইচ্ছা হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। কিন্তু এই ঘোষণার পর তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে আর কিছুই করার মতো অবস্থা থাকে না।

১৮৭৭ সালের জানুয়ারিতে তাই আলোচনার পদক্ষেপ নেয়া হলেও কনফারেন্স প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এর কিছু পরেই—পোর্তে ও সার্বীয়া ভারসাম্য রক্ষার ওপর পৃথক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। যুদ্ধ প্রায় নিশ্চিত বিবেচনা করে ইস্তাম্বুল ত্যাগ করে ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড স্যালিসবুরি।

বস্তুত এটি এড়িয়ে যাওয়া ততটা সহজও ছিল না। বুলগেরিয়ার নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞের পর বিভিন্ন পর্যায়ের ব্রিটিশ মন্ত্রীদের মাঝে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। আবার এ অবস্থাকে আরো বেগবান করে তোলে তুর্কি সরকারের বিরুদ্ধে গ্লাডস্টোনের অভিযান। তার পুস্তিকাতে প্রকাশিত ও দেশের বিভিন্ন অংশে বক্তৃতার মাধ্যমে তুর্কি বিরোধিতা বেড়ে যায়। এতে খারাপ সরকার ব্যবস্থার জন্য তুর্কিদের দায়ী করে গ্লাডস্টোন। খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি নিষ্ঠুরতার কথা বর্ণনা করে সকলের সমর্থন আদায় করে নেয় যেন বুলগেরিয়াতে তুর্কিরা সকল নির্বাহীক ক্ষমতা হারায় এবং বিপুল হারে জনমত "কথা বলার অনুপযুক্ত তুর্কিদের বিরুদ্ধে রোষ কষায়িত হয়ে ওঠে। লর্ড স্ট্যাটফোর্ড দি রেডক্লিফ নিজেও গ্লাডস্টোনের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করে ব্রিটিশ নিরাপত্তার প্রভাব বাড়িয়ে বুলগেরিয়াসহ পুরো বলকান অঞ্চলের অটোমান প্রজাদের দমনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ডার্বি, যদিও নিজে গ্লাডস্টোনের ক্রুসেডের মাধ্যমে তুর্কিদের ইউরোপ থেকে বিতাড়নের পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়, সুলতানকে অবহিত করে তোলে যে এই অপরাধ ব্রিটিশ জনগণের মাঝে উষ্মা বাড়িয়ে তুলেছে। তাই ডার্বি অপরাধীদের শাস্তি ও দূর্ভাগ্যদের সহায়তার দাবি জানায় সুলতানের কাছে। এই ধরনের আচরণে রাশিয়া সন্তুষ্ট হয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর কামনা করতে থাকে। কিন্তু লর্ড

ডার্বি রাশিয়া সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়ে দেয় যে ইস্তাম্বুল ও বসফরাস অথবা মিশর ও সুয়েজ খালের ওপর কোনো হুমকি সহ্য করবে না ব্রিটেন। এ ব্যাপারে জার নিশ্চিত হয়ে যায় যে ব্রিটিশ সরকার পোর্তের বিপরীতে অন্য যে কোনো জায়গায় রাশিয়ার আক্রমণে হস্তক্ষেপ করবে না, আবার একই সাথে নিজের শান্তিবাদী মনোভাবও বজায় রেখেছে। বস্তুত ব্রিটিশ কেবিনেটে মন্ত্রীদের অধিকাংশ তুর্কিদের হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে বিরোধি ছিল।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার কার্যাবলিকে অবিশ্বাস করত। একজন দূরদর্শী হিসেবে ডিজরাইলী অটোমান সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখার পক্ষে ছিল। পূর্বের এই প্রশ্ন এখন খোদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা সুয়েজ খাল কাজ শুরু করার পর থেকে সাম্রাজ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য রাশিয়ার আগ্রাসনকে ঠেকিয়ে রাখা জরুরি হয়ে পড়ে।

প্রথম দিকে খানিকটা দোদুল্যমানতায় পড়ে গেলেও ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ পরিণত করে বিরোধি সংবাদপত্রের প্রকাশিত অনিশ্চিত প্রতিবেদন অতিরঞ্জিত প্রমাণিত হয়েছে। কেননা প্রতিনিধি পাঠিয়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে মৃতের সংখ্যা প্রাথমিক প্রতিবেদনের চেয়ে মাত্র অর্ধেক ছিল। কিন্তু এটি ব্রিটিশ সরকারের জন্য যুক্তিযুক্ত হবে চুক্তি ভঙ্গ করে নীতি পরিবর্তন করা? সবকিছুর ওপরে এখনো তুরস্কের নিরাপত্তার মাঝে ব্রিটিশ স্বার্থ লুকিয়ে আছে।

অ্যালিসবুরীতে রাজনৈতিক দলের বতৃতা প্রদানে গ্লাডস্টোনের "আদেশপ্রেমিক" সুলভ আচরণে উষ্মা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী। কেননা এতে ইংল্যান্ডের স্বার্থ ও ইউরোপের শান্তি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। লেডি ব্রাডফোর্ডের কাছে এক পত্রে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করে যে, "বুলগেরিয়ার ধ্বংস লীলার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিশ্বকে কসাইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে গ্লাডস্টোন্" অবশেষে গিল্ডহলে, লর্ড মেয়র পর্ব দিবসে, প্রধানমন্ত্রী তুর্কি স্বাধীনতা ও যুদ্ধের আহ্বানের বিরুদ্ধে স্পষ্ট মত প্রদান করে।

লর্ড ডার্বি বা স্যালিসবুরি নয়, বরঞ্চ প্রধানমন্ত্রী লর্ড বেকনসফিল্ডের কাছ থেকে এহেন সমর্থনকে ব্রিটিশ নীতি বলে মনে করতে থাকেন সুলতান। যেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্রিটিশ সমর্থন প্রদান করে কনফারেন্সে নেয়া যে কোনো শান্তি প্রক্রিয়া সুলতান প্রত্যাখ্যান করতে না পারে। অন্যদিকে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিজের মনোভাব পরিবর্তন না করে ঘোষণা করে যে, যদি রাশিয়া পোর্তের কাছ থেকে যথাযথ নিশ্চয়তা না পায়; তাহলে যে কোনো পদক্ষেপ নিতে জার দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই

যে রাশিয়ার জনগণও তাকে সমর্থন প্রদান করবে। এ ঘোষণায় ইউরোপ জুড়ে সতর্ক ঘণ্টা বেজে ওঠে।

কৌশলীভাবে জার শেষ এক পদক্ষেপের মাধ্যমে শক্তিদ্বয়ের মাঝে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু পোর্তে এ প্রস্তাব প্যারিস চুক্তির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে রাশিয়া। এরই মাঝে অস্ট্রিয়ার সাথে ঐকমত্যে পৌঁছে গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে স্পষ্ট করে বলকান অঞ্চলে উভয়ের স্বার্থ রক্ষিত হয় ও অস্টিয়া নিরপেক্ষতার বিনিময়ে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখলের অধিকার লাভ করে।

সুলতান আবদুল হামিদ শীঘ্রই নিজের ব্রিটিশ সমর্থনের প্রত্যাশায় আঘাতপ্রাপ্ত হন।

লর্ড বেকনস্‌ফিল্ড একটি বিভক্ত কেবিনেটে সভাপতিত্ব করতে বসে গ্লাডস্টোন ও তার সমমান ক্রুসেডারদের চাপে পড়ে যায় রাশিয়ার সাথে একত্রিত হয়ে তুর্কিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য। আবার একই সাথে রাণি ভিক্টোরিয়া নিজের মুকুট পরিত্যাগ করার হুমকি দিয়ে বসে। "বর্বরদের পদ চুম্বনকারী রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান হিসেবে থাকার" চেয়ে মুকুট পরিত্যাগ শ্রেয় বলে মনে করে বসে রাণি ভিক্টোরিয়া। সব শেষে উপসংহারে যোগ করে প্রধানমন্ত্রী বলে ওঠে, ব্রিটিশ সরকারের অবশ্য কর্তব্য রাশিয়ায় পদক্ষেপকে অস্বীকৃতি জানানো। একই ভাবে আক্রমণ করাটাও অনুচিত হবে। তাই তার কেবিনেটের নীতি হিসেবে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সুলতান আবদুল হামিদ তাই একাকী মিত্রবিহীন হয়ে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ লড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে দুই রাশিয়া বাহিনী তাঁর সাম্রাজ্যে আক্রমণ করে বসে। একদল ইউরোপে, প্রুত পার হয়ে ও আরেক বাহিনী এশিয়াতে, ককেশাস থেকে কার্জ আধাহান ও আরজুরামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তুর্কিরা যেহেতু কৃষ্ণসাগরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা রেখেছিল—সুলতান আবদুল আজিজের প্রস্তুতকৃত লোহার পাতে মোড়া জাহাজ নিয়ে আসা হয় এখানে—ইউরোপে স্থল আক্রমণও জরুরি হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি ছিল রুমানিয়া—জার আলেকজান্ডারের সংসদ রুমানিয়াতে সেনাবাহিনী প্রবেশে অনুমোদন প্রদান করে। তুর্কিরা রুমানিয়াতে দানিয়ুব দুর্গে গোলাবর্ষণ করে এর প্রতিহত করে। রুমানিয়া তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজেকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা করে বসে। এই ভূখণ্ড ও সেনাবাহিনী রাশিয়ার জন্য কার্যকরী সহায়তার উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয় পরবর্তী বুলগেরিয়া অভিযানে।

সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে জার আলেকজান্ডার স্বয়ং বুলগেরিয়াতে প্রবেশ করলে ত্রাণকর্তা হিসেবে সম্মান লাভ করে। রাশিয়া বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে বুলগেরিয়াবাসী তুর্কি প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন প্রশাসনে নিজেরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে ঘোষণা করে জার। "রাশিয় শাসকদের মান্য করো" বলে অবশেষে উল্লাস বাড়িয়ে দেয় আলেকজান্ডার।

তিরনোভাতে নিজেদের হেডকোয়ার্টার থেকে রাশিয়া জেনারেল পর্বতের মাঝে প্রধান শিপকা পাসের কাছে এসে তুর্কি প্রতিরক্ষা বাহিনীকে পরাজিত করে। এরপর তার বাহিনী বুলগেরীয় খ্রিস্টানদের সাথে নিয়ে তুর্কিদের ওপর লুণ্ঠন ও হামলা চালায় মারিতজা উপত্যকায়। ফলে আড্রিয়ানোপল ও ইস্তাম্বুলে হুমকি ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু ঢেউয়ের গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। পরবর্তী তুর্কি যুদ্ধে সুলতান দুজন যোগ্য জেনারেল নিয়োগ দান করেন। ক্রিটের গভর্নর মাহমুদ আলী ইউরোপে অটোমান কমান্ডার নিযুক্ত হয়। এখানে বুলগেরিয়ার মিত্রসহ রাশিয়া বাহিনীকে পরাজিত করে বলকান অঞ্চলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এর উত্তরে রাশিয়ার সেনাবাহিনী দানিয়ুব যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রিমিয়ার অবিসংবাদী ওসমান পাশার মোকাবেলায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

প্লেভনাতে আঙ্গুরক্ষেতের আগে এবং চারপাশে নিজের বাহিনী নিয়ে জড়ো হয় ওসমান পাশা। প্রাকৃতিক দুর্গবেষ্টিত এ প্রতিরক্ষা বূহ্যের ভেতরে দক্ষ প্রকৌশলীদের সহায়তায় একটি শক্তিশালী সামরিক দুর্গ গড়ে তোলে ওসমান। পরিখা খনন করে বন্দুক স্থাপন করে। ফলে প্লেভনা থেকে ওসমান বাহিনী বুলগেরিয়ার প্রধান পথ নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়।

জুলাই মাসে নিজেদের প্রথম আক্রমণে রাশিয়া বাহিনী শত্রুপক্ষকে দুর্বল বিবেচনা করায় ও অবরোধের সমস্যাসমূহ আমলে না নেয়ায় তুর্কি প্রতিরোধ বাহিনীর দক্ষতা দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। বিশেষভাবে নিজেদের ধীরগতির মাজল লোডিং বন্দুকের চেয়ে সুলতান আবদুল আজিজের আমেরিকা থেকে নিয়ে আসা তুর্কিদের আধুনিক ব্রিচ লোডিং রাইফেল দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয় রাশিয়া বাহিনী। ফলে প্লেভনা অবরোধের এক দিন শেষ না হতেই রাশিয়া বাহিনী স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

ওসমান পাশা ছয় সপ্তাহ সময় পেয়ে যায় নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য। একই ভাবে রাশিয়া বাহিনী রুমানিয়ার রাজকুমার চার্লসের সেনাবাহিনী থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে। এতে শর্ত হয় চার্লস যৌথ বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করবে। পরবর্তী আক্রমণ সংঘটিত হয় তিন পাশ থেকে। সব জায়গাতেই প্রত্যাশা করা হয় রুশো-রুমানিয়া বিজয়। বস্তুত ভয়ংকর অবরোধের প্রথম দুই দিন রুশ ও রুমানিয়ার পতাকা জাদুর মতো

কাজ করে চলে। কিন্তু তৃতীয় দিনে তুর্কিদের ভয়ংকর প্রতি-আক্রমণে রুমানিয়া, বাহিনী প্রত্যাহার করে। এই দ্বিতীয় পরাজয়ের পর রাশিয়া ঝড়ের গতিতে প্লেভনা দখলের আশা ত্যাগ করে ও রাজকীয় গার্ডের দক্ষ প্রকৌশলীর নেতৃত্বে রুমানিয়াদের সাথে নিয়ে দুর্গ ঘিরে ফেলে দুর্গবাসীদের অনাহারে মেরে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ওসমান হয়তো বাস্তবিক ভাবে নিজের সেনাবাহিনীর চেয়ে দ্বিগুণ শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে জয় লাভ করেও রাশিয়ার ওপর কঠিন শীতকালের অভিযান চাপিয়ে দেওয়ার পরে হয়তো প্লেভনা ত্যাগ করতে চাইত। কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে গণমাধ্যমের কল্যাণে ইউরোপের কল্পনা প্রসারিত হয়। তুর্কিদের সাম্প্রতিক বর্বর ভাবমূর্তি উল্টে গিয়ে ওসমানকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে মেনে নেয় সকলে। জনমত অটোমান সাম্রাজ্যের পক্ষে চলে আসে। পশ্চিমে সম্মানের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য সুলতান আবদুল হামিদ ওসমান'কে নির্দেশ প্রদান করেন যে কোনো মূল্যে প্লেভনাতে থেকে যেতে হবে—প্রতিজ্ঞা করেন বিশাল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করবেন। ওসমান নাছোড়বান্দার মতো রয়ে যায় দুর্গ আটকে, দক্ষিণে শেষ প্রবেশপথটিও রাশিয়া বন্ধ করে দেয়ার পূর্বে রসদ আনিয়ে রাখে ও দুর্গকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলে রাশিয়া। কিন্তু আবদুল হামিদের উদ্ধারকারী বাহিনী পৌঁছলেও রাশিয়া বাহিনী শীঘ্রই তাদেরকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে।

কঠিন শীতের মাঝে বলকান তুষারপাতের দয়ার ওপর বেঁচে থেকে রসদের আশা শেষ হয়। অস্ত্রশস্ত্র কমে আসে। খাবার এত কমে যায় যে সৈন্যরা কুকুর, বিড়াল, ইঁদুরের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে—যখন রাশিয়ার অফিসাররা ক্যাভিয়ার ভক্ষণ করছিল ওসমান বুঝতে পারে যে, তার একমাত্র শেষ আশা দুর্গ থেকে আকস্মিক আক্রমণ করে বের হয়ে আসা। এভাবে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে মধ্যরাতে তুর্কিরা নিঃশব্দে পশ্চিম দিকে উদয় হয়। ভিদ নদীর ওপর সেতু ফেলে সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে তুর্কি আউটপোস্টের ওপর হামলা চালাতে অগ্রসর হয়। এখানে উভয় পক্ষে হাতাহাতি, বেয়নেট যুদ্ধ শুরু হয়। ওসমান পাশা বুলেটের আঘাতে ক্ষতপ্রাপ্ত হয় আর তার ঘোড়া মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে গেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সকলে। নেতাবিহীন হয়ে অর্ধ-উপোসী সৈন্যদল ভেঙে পড়েও পালিয়ে যায়। রাশিয়া দুর্গ দখল করে নেয়।

প্লেভনার ওপর সাদা পতাকা উড়তে থাকে। বাহিনী প্রধান হিসেবে জার প্লেভনায় প্রবেশ করেও ওসমান পাশা আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে। রাশিয়া তাকে সম্মান জানালেও তার বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয় হাজারে হাজারে। গ্রেফতার এড়াতে তুষার পথে ছুটতে থাকা অবস্থার মারা যায় সকলে। বেশি

মাত্রায় জখম হওয়া সৈন্যরা বুলগেরিয়ার কসাইয়ের হাতের নিচে পড়ে থাকে পেছনের ক্যাম্প হাসপাতালে।

১৮৭৭ সালের শেষ দিকে প্লেভনা আত্মসমর্পণ করলে শত হাজার রাশিয়া সেনাবাহিনী মুক্তি লাভ করে। এক দল বলকান পার হয়ে সোফিয়া দখলে অগ্রসর হয়। আরেকদল শিপকা পাসের কাছে এসে তুর্কি বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে আড্রিয়ানোপল পৌঁছে যায় আর এভাবে ইস্তাম্বুলও হুমকির মুখে পড়ে। সার্বীয়া আবারো যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে নিশ দখল করার জন্য। হার্জেগোভিনাতে মন্টিনিগ্রো জয়ী হয়। বলকানের সব অঞ্চলে স্লাভীয় সৈন্যরা জয়ী হতে থাকে। সুলতানের গ্রিক অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্রোহের মাধ্যমে যুদ্ধের হুমকি দেয় গ্রিকেরা ক্রিটসহ। এশিয়াতে রাশিয়া বাহিনী ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো তুর্কিদের হাত থেকে কার্জ দখল করে নেয় আর্দাহান ও আরজুহুরামসহ। এভাবে পূর্ব আর্মেনীয়ার বেশিরভাগ তাদের দখলে চলে যায়।

আড্রিয়ানোপল থেকে গ্রান্ড ডিউক নিকোলাসের রাশিয়া বাহিনী কোনো তুর্কি প্রতিরোধ না থাকায় ইস্তাম্বুলের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আর লন্ডন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ১৮৭১ সালের চুক্তি অনুযায়ী শক্তিবর্গ তুর্কিদেরকে আক্রমণ করতে পারলেও প্রুশিয়া এতে বাদ সাধে। পোর্তে বিশেষত ব্রিটেনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সমর্থন না দেয়ার জন্য। প্রাসাদ নিয়ন্ত্রিত সংবাদ সংস্থা ব্রিটিশদেরকে "কাপুরুষ" হিসেবে ব্যঙ্গ করতে শুরু করে।

পূর্বের মতোই ব্রিটিশ কেবিনেট যুদ্ধ পক্ষ ও শান্তি পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। লর্ড বেকনসফিল্ড যে কোন মূল্যে ইস্তাম্বুলে রাশিয়ার দখলদারিত্ব ঠেকাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। শহরে পশ্চিম থেকে হাজার হাজার শরণার্থী এসে জড়ো হতে থাকে। নারী পুরুষ, অসুস্থ, তুষারাক্রান্ত ও অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে রাশিয়ার অগ্রযাত্রার পূর্বেই পালিয়ে এসেছে। এদের মাঝে শুধু আরা সোফিয়া মসজিদেই পাঁচ হাজার ভিড় করে সংস্থানের আশায়। ধর্মতত্ত্বের শিক্ষার্থীরা খেপে ওঠে। সুলতান স্বয়ং প্রয়োজন হলে উপায়ান্তর না দেখে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে। আবদুল হামিদ ব্যক্তিগতভাবে রাণি-ভিক্টোরিয়াকে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করার অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধ জারের ওপর বর্তায়। জার এই ইস্যু যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ডারদের ওপর ছেড়ে দেয় কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে।

এখানে গ্র্যান্ড ডিউক নিকোলাস শর্ত মেনে নেয়া ব্যতীত যুদ্ধবিরতি আলোচনায় না বসার দাবি জানায়। শহরের দেয়াল থেকে মাত্র দশ মাইল দূরত্বে মারমারা সাগর তীরে অবস্থিত সান স্টেফানো গ্রামে নিজের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে নিকোলাস। তাকে প্রতিহত করার জন অবশেষে লর্ড বেকনস্

ফিল্ড মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মারমারা সাগরে পাঁচটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। এখানে ব্রিটিশ জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় আগত জাহাজসমূহ রাশিয়ার আয়ত্তের ভেতরে প্রিন্সেস আইল্যান্ডে নোঙ্গর করে।

এরই মাঝে রাশিয়া ও তুরস্ক যুদ্ধবিরতিতে চুক্তিতে পৌঁছেছে। যাকে "কমেডি" হিসেবে উপহাস করে লর্ড বেকনস্ ফিল্ড। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য নিকোলাস তার যাত্রা অব্যাহত রাখত। এর ফলে সংসদ থেকে লর্ড বেকনসফিল্ড ছয় মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক সাহায্য ব্রিটিশ বাহিনীকে প্রদান করে ও গালিপল্লীতে, যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে পৌঁছানোর জন্য নৌবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়।

সংসদ স্কয়ারের চারপাশে দেশপ্রেমিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে ধরে। বস্তুত ব্রিটিশ জনমত রাশিয়ার কাছ থেকে এ নতুন হুমকি পেয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ও তুর্কিদের সপক্ষে ফিরে যায়। ক্রিমিয়া যুদ্ধে চেতনা গণজাগরণে ঢেউ তোলে। লন্ডনে মিউজিক হলগুলো মুখর হয়ে ওঠে নতুন গানে :

আমরা লড়াই করতে চাই না;
কিন্তু উগ্রবাদীদের জন্য; যদি আমরা
যুদ্ধি করি-ও;
আমাদের আছে লোকবল,
আমাদের আছে জাহাজ,
আর আমাদের আছে অর্থ।

উগ্র দেশপ্রেমকে সন্তুষ্ঠ করে ব্রিটিশ হুমকির মুখে রাশিয়া ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকে। এছাড়াও জার সুলতানের তার প্রেরণ করে যে শহর দখলের কোনো অভিপ্রায় ছিল না তার। এভাবে রাশিয়া তার ভাগ্য বরণ করে নিতে ব্যর্থ হয়; এই কারণে ব্রিটেন ও রাষ্ট্রদূত স্যার হেনরি লেয়ার্ডকে দোষারূপ করে রাশিয়া। লেয়ার্ডকে রাশিয়া নাম দেয় মি. লাইহার্ড (Lie-Hard), কঠিন মিথ্যাবাদী।

১৮৭৮ এর ৩ মার্চে সান স্টেফানোতে রাশিয়া ও পোর্তের মাঝে দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর শর্ত মোতাবেক রাশিয়া কার্যত ইউরোপ থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের নাম ও নিশানা মুছে দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। পশ্চিমা শক্তিবর্গ যা প্রথমে আঁচ করতে পারেনি। এতে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের বাদ দিয়ে স্লাভ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। এখানে বৃহৎ আকারের দুটি বলকান রাষ্ট্রের কথা বলা হয়। বেশির ভাগ স্লাভ নিয়ে গঠিত এ রাষ্ট্রদ্বয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতানের কাছে কর প্রদানের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে।

একটি ছিল মন্টিনিগ্রো ও অপরটি সার্বীয়া। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা সুলতানের প্রজা হিসেবে রয়ে যায়; কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা পায়। রুমানিয়ার স্বাধীনতাকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় কিন্তু ল্যাটিন রাষ্ট্র হিসেবে বেসাবারিয়া হারায় ও রাশিয়ার সুবিধা মাথায় রেখে ভূখণ্ড আদান-প্রদান করে নেয়।

প্রধান সুবিধা ভোগ করে বুলগেরিয়া। একে এত বৃহৎ আকারে পরিবর্ধিত করা হয় যে প্রায় মধ্যযুগীয় বুলগেরিয়া সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। দানিয়ুবের দক্ষিণে সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে, কৃষ্ণসাগর থেকে আজিয়ান ও উভয় সাগরের বন্দর নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায় বুলগেরিয়া। থ্রেস ও মেসিডোনিয়ার অনেকটুকু যুক্ত করে পশ্চিমে আলবেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে বুলগেরিয়া। সুলতানের সার্বভৌমত্বের অধীনে থাকলে, স্বায়ত্তশাসিত দেশ হিসেবে বুলগেরিয়া থাকবে রাশিয়ার নির্বাচিত রাজকুমারের অধীনে বলেও ঠিক করা হয়। রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের ফলে বলকানের হৃদয়ের মাঝে রাশিয়া হিসেবেই পরিগণিত হবে এটি। পূর্বে ইস্তাম্বুলকে আক্রমণের আশঙ্কাও থেকে যাবে।

ইউরোপে তুরস্কের যেটুকু বাকি থাকবে তা এভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এর প্রধান দুই শহরের মাঝে বুলগেরিয়া বাধা হিসেবে কাজ করবে।

ইউরোপ ও বলকানজুড়ে সান ষ্টেফানো চুক্তিকে মানবজাতি তত্ত্বের নীতি ভঙ্গকারী হিসেবে দেখা শুরু হয়। শুধু ঐতিহাসিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মীয় অসংগতি ও এর বিভিন্ন অস্লাভ জনগণের মাঝে বেড়ে ওঠা জাতীয় অনুভূতিকে অবহেলা করা হয়।

কিন্তু লর্ড বেকনসফিল্ড পূর্বে অনুমান করতে পেরেছিল যে রাশিয়া একচেটিয়াভাবে সুলতানের ওপর প্রভুত্ব চাপিয়ে দেবে। প্রথম থেকেই রাশিয়াকে তাই লর্ড বেকনসফিল্ড জানিয়ে দেয় যে তুরস্কের সাথে যে কোনো চুক্তি করার এগ তা ইউরোপকে দেখাতে হবে। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ১৮৫৬ ও ১৮৭১-এর চুক্তির জন্য দায়ী। যা তাদের সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তন করা যাবে না। রাশিয়া ইতিমধ্যেই এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস গঠনে সম্মতি প্রদান করলেও চাপ দিতে থাকে যে কোন কোন ধারা আলোচিত হবে তা-ও নির্ধারণ করবে রাশিয়া। এর বিপক্ষে ব্রিটিশ সরকার চাপ প্রয়োগ করে পুরো চুক্তি প্রদর্শনের জন্য। রাশিয়া এতে প্রত্যাখ্যান করলে লর্ড বেকনসফিল্ড পদক্ষেপ নেয়ার মনস্থির করে। রিজার্ভ সৈন্য ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক অংশকে নির্দেশ দেয়া হয় সুয়েজ খাল হয়ে মাল্টাতে অগ্রসর হবার জন্য।

ব্রিটেনের এই শক্তি প্রদর্শনের সাথে কাকতালীয়ভাবে মিশে যায় অস্ট্রিয়া—হাঙ্গেরি; বলকান ভূ-খণ্ডে নিজস্ব স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হয় তারা।

ফলে কনফারেন্সের পরিকল্পনা নেয়া হয়। ব্রিটেন মোটের ওপর রুমানিয়া ও গ্রিকদের দাবি উত্থাপনের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। গ্রিকদের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন ঘোষণা করে যেন স্লাভ দেশে পরিণত হওয়ার বিপক্ষে নিজেদের সব প্রভাব একত্রিত করে তারা। বলকান মুসলিম জনগণ রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে ন্যায়বিচারের দাবি জানায়। আলবেনীয়রা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভূখণ্ড প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ করে। এই ধরনের আবহাওয়ায় জার নিজের আচরণ পরিবর্তন করে। একটি গোপন ঐকমত্যের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ও রাশিয়া সরকার লন্ডনে "মহান বুলগেরিয়ার" পরিকল্পনাকে সংশোধন করে, যা শীঘ্রই প্রকাশিত হয়। এভাবে ১৮৭৮ সালে বার্লিনে ইউরোপীয় কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিসমার্কের উত্থান ঘটে।

এক মাসের মধ্যে ছয় বৃহৎ শক্তি বার্লিন চুক্তি স্বাক্ষর করে। রাশিয়া "মহান বুলগেরিয়ার" পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে। এর পরিবর্তে বুলগেরিয়াকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। এদের মাঝে উত্তরাংশ একাই দানিয়ুবের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়। কৃষ্ণসাগর, সার্বীয়া ও মেসিডোনিয়ার সীমান্তসমূহ, বলকান পার্বত্য অঞ্চল—আজিয়ানে ভূমি ব্যতীত, সুলতানের সার্বভৌমত্বের অধীনে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। শাসক রাজকুমার শুধু রাশিয়া নির্বাচন করবে না, পোর্তে দ্বারাও সামগ্রিকভাবে শক্তিবর্গের অনুমতি নিয়ে। দ্বিতীয় স্বায়ত্তশাসিত বুলগেরীয় প্রদেশের নাম হয় পূর্ব রুমেলিয়া বলকান পার্বত্যাঞ্চলের দক্ষিণে গঠিত হয় ও অটোমান সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় সীমানা হিসেবে "সুলতানের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাবলয়ের মাঝে অবস্থিত হয়।"

রাশিয়া প্রথমে এতে বাধা প্রদান করে। কিন্তু অবশেষে বেকনসফিল্ডের দৃঢ়তার কাছে পরাজিত য রাশিয়া। বিসমার্ক মন্তব্য করে ওঠে, "ইউরোপে আরো একবার তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত হলো।" পূর্ব রুমেলিয়া গঠনের ভার আরোপ করা হয় একটি ইউরোপীয় কমিশনের ওপর। এর ফলে পূর্বে যেমন রাশিয়ার অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়, ঠিক তেমনি পশ্চিমেও অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাশিয়ার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা করা হয় যুদ্ধের পূর্বে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মাঝে গোপন চুক্তি অনুযায়ী। এই দুই প্রদেশে তুর্কি ছিল অল্পসংখ্যক। কিন্তু মুসলিম, স্লাভ ও খ্রিস্টান ছিল বেশি। তাই বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে।

বার্লিনেও সান স্টেফানোর ন্যায় প্রধান ভুক্তভোগী হয় রুমানিয়া। এখানে রাশিয়া সফলতার সাথে প্রুত পর্যন্ত নিজের সীমান্ত বাড়ানোর জন্য রুমানিয়ার স্বাধীনতার বিনিময়ে বেসারাবিয়া আদায় করে নেয়। দানিয়ুবের উত্তরে এ ভূখণ্ড ঐতিহাসিক ও মানবজাতি তত্ত্ব অনুযায়ী রুমানিয়ার ছিল। এর বিনিময়ে রাশিয়া ডোবরুজা ত্যাগ করে। এখানে বুলগেরীয় ও তুর্কি জনসংখ্যাই বেশি।

অবশেষে পুরস্কার হিসেবে বার্লিনে গ্রীসকে কোনো ভূখণ্ড না দেয়া হলেও ব্রিটিশ মধ্যস্থতা এক্ষেত্রে ধন্যবাদ প্রাপ্য। ইপিরাস ও থেসালিতে সুবিধাজনকভাবে তুর্কিদের সাথে একত্রিত করা হয়। মেসিডোনিয়া তুর্কিকে দেয়া হলে অন্তত বুলগেরিয়ার শাসনের ভয় দূর হয়। অন্যদিকে ক্রিট, যা গ্রিস আশা করছিল, খ্রিস্টান জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তুর্কি শাসনাধীনে নেয়া হয়।

বার্লিন চুক্তি অবশেষে কূটনীতির মাধ্যমে যেতে সক্ষম হয়েছে। লর্ড বেকনসফিল্ড একে প্রশংসা করে মন্তব্য করে ওঠে, "সম্মানপূর্বক শান্তি"। একই ভাবে এই শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিসমার্কের প্রভাব ও সমান ভূমিকা রেখেছে। বলকানের পশ্চিমে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির শক্তি বৃদ্ধি করে বিসর্মাক। কার্যত এ অঞ্চলে শৃঙ্খলা আনয়নে তুর্কিদের অদক্ষ ছিল। হয়তো খ্রিস্টান ও মুসলিম অধ্যুষিত মিশ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন অস্ট্রিয়া দক্ষ হাতে সামলাতে পারবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ইউরোপ থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে দেয় বার্লিন কংগ্রেস। মোটের ওপর অবশেষে রাশিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হয়ে পড়ে। যদিও প্রথম দিকে ইউরোপীয়দের নিরপেক্ষতাই এর সূচনা করেছিল। যাই হোক বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব খানিকটা বিরাজ করার সুযোগ পেলেও শাসন—কখনোই নয়।

এরপর উন্মেষ ঘটে বলকান জাতীয়তাবাদ, রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ নয়। জাতীয় সচেতনতার চেতনা, যা কিনা শতাব্দীর শুরুতে সার্ব ও গ্রিকদের বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল; পশ্চিমা ইউরোপের অনুকরণে পদক্ষেপ নেয় নিজেদের বাকি গোষ্ঠীর স্বাধীনতা আনয়নের জন্য। বার্লিন চুক্তির নীতি ছিল "বলকান-বলকান জনগণের জন্য।"

এর মাধ্যমে ছোট ছোট বলকান স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া রোধ হয়। কেননা অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ এতে শক্তিশালী হবে। যেহেতু কখনো না কখনো এসব ক্ষুদ্র জাতি রাষ্ট্র কোনো সাম্রাজ্যের অধীনে স্বেচ্ছায় আশ্রয় গ্রহণ করবে।

এটা ছিল বেকনসফিল্ডের প্রত্যাশা যে নতুন বুলগেরিয়া রাশিয়ার বিপক্ষে তুর্কি প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে। পরবর্তীতে বিসমার্ক মনে করেন "সব জাতি তুর্কিদের হাত থেকে মুক্তির জন্য সানন্দে রাশিয়ার সহায়তা গ্রহণ করলেও মুক্ত হওয়ার পরে সুলতানের উত্তরাধিকার হিসেবে জারকে মেনে নেয়ার কোনো প্রবণতা ছিল না তাদের মাঝে।"

এশিয়াতে সান স্টেফানো চুক্তি মোতাবেক রাশিয়া তুর্কিদেরকে আরজুরাম ফিরিয়ে দিলেও কার্জ, আর্দাহান, বায়েজীদ ও বাতুম রেখে দেয়। এরপর বেকনস ফিল্ডের প্রচেষ্টাতেই প্রধানত, বায়েজীদ ফিরে পায় তুরস্ক। আরো পূর্বে

এগিয়ে পারস্য পৌঁছানোর জন্য এ দুর্গ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে বাতুম রাশিয়ার দখলে থাকলেও জারের উদ্যোগে মুক্ত বন্দর ঘোষিত হয়। বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে কোনো দুর্গবেষ্টিত ছিল না এ বন্দর। এর বিনিময়ে ব্রিটেন দার্দেনালেসে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে অনুমতি প্রদান করে। পূর্ব আর্মেনীয়াতে তুর্কিরা যেসব ভূখণ্ড পেয়েছে তার উন্নয়ন ও সংস্কারের পক্ষে প্রতিজ্ঞা করে। এছাড়াও কুর্দি ও সার্কাশানদের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

নিরাপত্তারক্ষকের ভূমিকা পালন করায় ব্রিটেনের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস শুরুর পূর্বে গোপনে পোর্তের সাথে একটি কনভেনশনে উন্নীত হয়। এ মোতাবেক ব্রিটেন সুলতানের সাথে একত্রিত হয়ে তাঁর এশীয় ভূখণ্ড প্রতিরক্ষার জন্য সাইপ্রাস দ্বীপ দখল ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ করে। এর বিনিময়ে সুলতানকে বার্ষিক উদ্বৃত্ত কর প্রদান করার পাশাপাশি সুলতানের প্রতিজ্ঞা আদায় করে নেয় ব্রিটেন। ভবিষ্যতে ব্রিটেনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এর ফলে প্রথমবারের মতো "নতুন জিব্রাল্টার" তৈরি হয় পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে রাশিয়াকে হটিয়ে দেয়ার জন্য। এই ভিত্তি স্থানের নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যেন এশিয়াতে তুর্কি সাম্রাজ্যই কেবল রক্ষা পাবে না; বরঞ্চ ভারতে ব্রিটিশ মুসলিম সাম্রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও জোরদার হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্বে ব্রিটিশদের হৃত সম্মান ফিরিয়ে আনা। অটোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ প্রতিহত করতে ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজকীয় বাহিনী প্রহরার দায়িত্ব নেয়।

ইতিমধ্যে ইস্তাম্বুলে অটোমান সরকারের কেন্দ্রে নতুন সংবিধান নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সন্দেহ যথার্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। বস্তুত এক্ষত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে যদি পঞ্চম মুরাদের মানসিক অবস্থা সালতানাতের বোঝা আর সংকটের মতো একই হারে উন্নত হতো, তিনি তার তরুণ দৃঢ়চেতা মনোভাব দিয়ে সংস্কার সমর্থন করতে পারতেন।

কিন্তু তাঁর ভ্রাতা আবদুল হামিদের এ-জাতীয় কোনো মনোবাসনা ছিল না। প্রবৃত্তি ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসকারী আবদুল হামিদ সংবিধানকে মনে করতে থাকে সুবিধাবাদীদের চাতুরি আর এর সংশোধনে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে তিনি নিজের ক্ষমতাকে নিরাপদ করতে চেয়েছেন, জনগণের নয়। কনস্টান্টিনোপল কনফারেন্সে এটিকে ব্যবহার করেছেন শক্তিবর্গের মাঝে বিভক্তি ঠেকানোর জন্য। কনফান্সে শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মিধাত পাশাকে প্রধান উজিরের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তৎক্ষণাৎ জনগণের বিদ্রোহের ভয়ে ইয়টে তুলে

ইটালিতে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অনুতাপের বিষয় এই যে সংবিধানের ক্ষমতাবলেই সুলতান এ পদক্ষেপ নিয়েছেন। একদম শেষ মুহূর্তে সুলতানের চাপ প্রয়োগে সংবিধানে নতুন ধারা সন্নিবেশিত হয়। বিরোধিতা সত্ত্বেও এর ফলে সুলতান ক্ষমতা পেয়ে যায়, "সাম্রাজ্যের ভূখণ্ড থেকে পুলিশ প্রশাসনের বিশ্বস্ত তথ্য সাপেক্ষে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ প্রমাণিত ব্যক্তিকে বিতাড়িত করার।" তিন বছর পরে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনে মিধাতকে মৃত্যদন্ড প্রদান করা হয় ও চেষ্টাও হয়। এর পরিবর্তে আজীবন কারাদণ্ডের জন্য আরবীয় দুর্গ পাঠানো হলে ১৮৮৪ সালে সেখানেই তাকে হত্যা করা হয়।

এভাবেই তানজিমাত সনদসম্পর্কিত সকলের মৃত্যু ঘটে। ভবিষ্যৎ অটোমান রাষ্ট্রের মাঝে মিধাতের ন্যায় দৃঢ় কোনো রাষ্ট্রনেতার জায়গা থাকে না। কেননা আবদুল হামিদ মনে করত জাতি সুলতানের কাছে দায়বদ্ধ, সুলতান জাতির কাছে নয়। তিনি একাই কেবল কোনো সংবিধান চাপিয়ে দিতে পারেন জাতির ওপর। সরকারের পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার একমাত্র সুলতানের একার।

এর শর্ত অনুযায়ী ইতিহাসে কোনো ইসলামিক দেশে প্রথমবারের মতো আবদুল হামিদ সাধারণ নির্বাচনের আদেশ প্রদান করেন। প্রথম অটোমান সংসদ বসে ১৮৭৭-এর মার্চ মাসে। পঁচিশ জন মনোনীত অফিসার নিয়ে সিনেট গঠিত হয়। একশ বিশজন ডেপুটি নিয়ে চেম্বার প্রতিষ্ঠিত হয়। দাপ্তরিক চাপ প্রয়োগে নির্বাচন হয় ও অসাংবিধানিক উপায়ে। এতদসত্ত্বেও মিধাত যেমনটা চেয়েছিল এতে খ্রিস্টান, ইহুদি, তুর্কি, আরবীয় সকল সম্প্রদায়ের কণ্ঠ যোগ হয়, যদিও সংখ্যা অনুসারে বিভক্ত ছিল না। আবদুল হামিদ নিজের সংসদকে পাপেট ভবন হিসেবে দেখতে থাকেন। আইনী বৈধতা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে নির্বাচন চাপিয়ে দিয়েছেন।

তার পরেও শীঘ্রিই এটি নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তোলে। অটোমান সাম্রাজ্যের নিকট প্রত্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ প্রথমবারের মতো একত্রিত হয়। একে অন্যের সাথে ধ্যান-ধারণা অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান শুরু হয়, সমস্যার আবিষ্কার করে সাধারণভাবে একত্রে বেদনা ও সহভাগিতা হতে থাকে। ফলাফল বক্তৃতাতে সুলতানকে নয় কিন্তু প্রায় তাঁর মন্ত্রী ও পাশাদের ওপর আক্রমণ শুরু করে প্রতিনিধিরা। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভিন্ন দমন-নিপীড়নে দায়ী করে। পুরো দেশজুড়ে আগে যা কখনো হয়নি সরকারের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ডেপুটিদের মাঝে বুদ্ধিমান, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও স্বাধীন চেতনাধারী ব্যক্তিরা ছিল। একজন সংস্কারক সুলতানকে এসব ব্যক্তি হয়তো গঠনগত আভ্যন্তরীণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে

দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারত। এভাবে চেম্বার সংবিধানকে সমর্থন করে চলে। পাশাদের শাসনের প্রতি এদের বিরোধিতা-এতটাই বেড়ে যায় যে, দাবি তৈরি হয় যেন নির্দিষ্ট মন্ত্রীরা চেম্বারে উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগের উত্তর প্রদান করে।

এহেন ঘটনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুলতান মাত্র তিন মাসের মাথায় সংসদ ভেঙে দেন। ছয় মাস পরে ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে এটি পুনরায় চালু হয়। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ সংকটে পৌঁছে যাওয়ায় এটি পরিচালনা করা সহজ হয়ে যায়। সংসদের শুরু সুলতান এক বক্তব্যে "জাতিসমূহের প্রতিনিধিবর্গের" কাছে অনুরোধ করেন "আমার প্রজাদের সহযোগিতা ও দেশপ্রেমিক প্রয়োজন আমার সাথে আমাদের বৈধ অধিকারকে নিরাপদ করার জন্য... ঈশ্বর আমাদের প্রচেষ্টায় আশীর্বাদ করুন।" এরপর আছে সরকারদের মাঝে আলোচনার ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতি—তাই চেম্বারকে জানানো হয়, ১৮৭৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এখন ডেপুটিরা আবার সরব হয়ে ওঠে। এ সময়ে তিনজন মন্ত্রীর নাম উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দাবি করা হয় চেম্বারে উপস্থিত হয়ে উত্তরদানের জন্য। এবার সুলতান অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংসদ স্থগিত করে দেন। পরবর্তী ত্রিশ বছর আর এর কোনো সক্রিয়তা ছিল না।

সিনেটর ও ডেপুটিদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির কাছে আবদুল হামিদ বিষাদগ্রস্ত হয়ে সুলতান আবদুল মজিদের বিপরীতে সুলতান মাহমুদের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি ঘোষণা করেন, "আমি এখন বুঝতে পারছি, শুধু শক্তি প্রয়োগ করেই কাউকে পরিচালনা করা সম্ভব, যাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ঈশ্বর আমার ওপর অর্পণ করেছেন।" পরবর্তীতে একজন ইউরোপীয় সংবাদকর্মীর কাছে সুলতান বলেন তিনি সংস্কার বিরোধি ছিলেন না; "কিন্তু অতিরিক্ত স্বাধীনতা, যে কিনা এর সাথে পরিচিত নয়, তার পক্ষে ততটাই ক্ষতিকর যতটা স্বাধীনতা না থাকাটা।"

অতএব নবজাতক সনদের ওপর সুলতান ব্যক্তিগত শাসন কায়েম করেন। আলোকিত তানজিমাত যুগের শেষ চিহ্ন তরুণ অটোমানরা শেষ হয়ে যায়। নির্যাতন আর নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ফলে তাদের আর কোনো অস্তিত্বই থাকে না। দেশে "গোয়েন্দা সেনাবাহিনী" কবলে পড়ে নামিক কামাল নিজেও নির্বাসনে চলে যায়; তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করে—বিদেশে "নির্বাসনে যাওয়া সেনাবাহিনী বিপ্লবীতে পরিণত হয়।" তার বন্ধু জিয়ার ভাষায় কিছুই নহে বরঞ্চ বেদনা অপেক্ষা করে আছে এ সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ততার ওপর; নির্ভেজাল পাগলামি উৎসর্গ করা হয়েছে এই রাষ্ট্র ও এর জনগণের ওপর।

অধ্যায় ছয়

সর্বশেষ সুলতান

॥ ৩৬ ॥

আবদুল হামিদ মানুষ হিসেবে ছিলেন অসুখী ও একজন অমানবিক সুলতান। সাত বছর বয়সে মাতাকে হারানোর পর সুলতান সম্পর্কে বলা হতো যে, "তিনি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কখনো ভালোবাসবেন না।" কিশোর বয়স থেকেই সমবয়সীদের থেকে দূরে নিজের মতো বাস করতেন। যদিও পূর্বপুরুষদের মতো খাঁচাসুলভ প্রাসাদে বেড়ে উঠেননি—চাচা সুলতান আবদুল আজিজের সাথে ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন। তথাপি নিজের ভেতরে তৈরি খাঁচায় আবদ্ধ ছিলেন সুলতান।

এই মনোভাব প্রকাশ্যে বের হয়ে আসে ও কঠিন আকার ধারণ করে যখন তিনি সিংহাসনে অভিষেকের পর বসফরাসের ওপরের ঢালুতে উঁচু দেয়ালবেষ্টিত ইলজিজ প্রাসাদে বসবাস ও এখান থেকেই শাসন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। ভেতরের দিকে তাকিয়ে আবদুল হামিদ ওলমা বাহচে প্রাসাদের দিকে পিঠ দিয়ে বসতেন, নিচের পানিতে যেটির জৌলুশ ফুটে উঠতো। এর পরিবর্তে নিজের জন্য "তারকাখচিত উন্মুক্ত মঞ্চ"-কে আরো বিস্তৃত করে তোলেন। একদা কোনো এক সুলতান প্রিয়তমার জন্য তৈরি করেছিলেন এ স্থান। এর চারপাশের সমস্ত বাড়ি ভেঙে ফেল—দুটি খ্রিস্টান সমাধিস্থানসহ প্যাভিলিওন ও সেক্রেটারিয়েট, সরকারি অফিস, ব্যারাক ও গার্ড হাউস নির্মাণ করেন। ক্ষমতার নতুন পীঠস্থান হিসেবে সেরাগলিও হিসেবে কাজ করার জন্য একে প্রস্তুত করা হয়। এখানে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অটোমান সাম্রাজ্য শাসন করবেন তিনি—একজন নিরঙ্কুশ প্রভু, অটোমান ইতিহাসে যার জুড়ি মেলা ভার।

এটি ছিল অনেকটা ভয়ের কেন্দ্রস্বরূপ—আবদুল হামিদ অযৌক্তিকভাবে নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে ভীত ছিলেন। সমস্ত মানুষও তাদের অভিপ্রায়ের প্রতি সাধারণ ভাবে অবিশ্বাসী মনোভাবের কারণে চারপাশের ওপর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন সুলতান। রাজত্বের শুরুর দিকে সুলতানের মানসিক

অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কেননা তরুণ অটোমানদের নেতা আলী সুয়াভী নির্বাসন থেকে ফিরে এসে ইস্তাম্বুলে স্বাধীনতার দাবিতে বিদ্রোহ শুরু করে। আলীর উদ্দেশ্য ছিল আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করে পঞ্চম মুরাদকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা।

বিপুলসংখ্যক সশস্ত্র সমর্থনকারী নিয়ে আলী বসফরাসের তীরে যে প্রাসাদে মুরাদ আটক ছিল সেখানে প্রবেশ করে তাঁকে আর্জি জানায় তরবারি হাতে আলীকে অনুসরণ করার জন্য। কিন্তু ভীত রাজকুমার ভয়ে কেঁপে ওঠে হারেমে ফিরে যায়। এই বিলম্বের ফলে পুলিশ বাহিনী এসে পৌঁছায়। তাদের কমান্ডার মুগুড় দিয়ে মেরে আলী সুয়াভীকে মাটিতে ফেলে দেয় ও হত্যা করে। আলীর অনুসারীদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলা হয় বা আঘাত করা হয়। ও বাকিদের জন্য কোর্ট মার্শাল বসে। মুরাদকে নিরাপদে ইলজিজ প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়।

আলী সুয়াভীর এ ধরনের অভ্যুত্থানে সুলতান এতটাই ভীত হয়ে উঠেন যে, যখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত একটি কূটনৈতিক বিষয়ে সুলতানের উপস্থিতি কামনা করে, সুলতান অসম্ভব ভয় পেয়ে যান। ভাবতে থাকেন হয়তো তাঁকে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। যেন মুরাদ পুনরায় সিংহাসনে আসীন হতে পারে। স্যার হেনরি থেয়ার্ড ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত পরবর্তীতে স্মৃতি রোমন্থন করে বলে যে, সুলতানকে পাওয়া যায় তাঁর বিশাল হলের এক কোণায় ভয়ে দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়।

এর পর আবদুল হামিদের সন্দেহ ও ভয় এক ধরনের মানসিক অসুস্থতায় পৌঁছে যায়। ইলজিজকে কার্যত একটি দুর্গে পরিণত করা হয়। ভেতর থেকে তালাবদ্ধ করে এর চারপাশে আরো একটি দ্বিতীয় দেয়াল নির্মাণ করা হয়। এতে পাহারা রত হয় তাঁর নিজস্ব হাজারো সৈন্যের আলবেনীয় বাহিনী। দেয়ালের ওপর প্রতিটি সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকানোর জন্য পর্যবেক্ষণ পোস্ট বসে। শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী বসফরাস ও গোল্ডেন হর্নকে নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। ফলে যে কোন হুমকির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা জোরদার হয়। অবস্থা এমন একপর্যায়ে পৌঁছে যায় যে খুব কমই সুলতান ইলজিজ প্রাসাদের বাইরে বের হতেন। এর দরজার কাছে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ফলে প্রতি শুক্রবার শহুরে মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়।

বির্মষ, নিশ্চুপ আর ফ্যাকাসে হয়ে দিন দিন সবকিছুতেই সন্দিহান হয়ে ওঠে আবদুল হামিদ। চারপাশে সবকিছুতে আর সবার বিরুদ্ধেই সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে সুলতানের মনে। নিজের চারপাশে জড়ো করেন গোয়েন্দা সেনাবাহিনী, গোপন পুলিশ বাহিনী আর আনঅফিসিয়াল তথ্য সংগ্রহকারী;

যারা প্রতিদিনের সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে সুলতানকে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে বলা হতো ইস্তাম্বুলের অর্ধেক জনগোষ্ঠী বাকি অর্ধেকের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে থাকে।

আবদুল হামিদ দেশের সমস্ত বিষয়ের ওপর নিজের কঠিন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলেন। ভোর থেকে শুরু করে রাত অব্দি কাজ করতেন। ডিসপেপসিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে খানিকটা বিরতি নিয়ে কেবল হালকা খাবার ও পানি গ্রহণ করতেন। এ পানি আনা হতো কুসংস্কারবশত মাত্র একটি পবিত্র ঝরনা থেকে; যাকে একজন গণৎকার কলেরা ও প্লেগ মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছিল। নিজের যাবতীয় পত্র-বিনিময় নিজে করতেন; প্রতিটি যোগাযোগের তুচ্ছ বিষয়টুকু পর্যন্ত স্বয়ং সম্পাদন করতেন, ব্যবসায়ীদের অ্যাকাউন্ট, পিটিশন, ভবিষ্যৎ ব্যবসার পরিকল্পনা সমস্ত কিছুই সুলতান ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদন করতেন।

সকল মন্ত্রী ও অফিসারকে অবিশ্বাস করতেন সুলতান। একে অন্যের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োগ করতেন। ফলে কেউই একত্রে কোনো বিশ্বাসঘাতকতার জাল বুনতে পারত না। নিজের হাতে একক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে সরাসরি মন্ত্রীদের নির্দেশ প্রদান করতেন সুলতান ব্যক্তিগত কর্মসচিবের মাধ্যমে। এর ফলে প্রায়ই প্রধান উজিরের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বেধে যেত। ফলে প্রধান উজির তার প্রাচীন পদমর্যাদা হারিয়ে ফেলে। তাই পূর্বের মতো সুলতান ও তাঁর মন্ত্রীদের মাঝে উপস্থিত হয়ে সুলতানের মতোই ক্ষমতা ভোগ করা বন্ধ হয় প্রধান উজিরের।

এ রকমটাই ছিল একজন একনায়ক সুলতানের শাসন। যিনি কিনা নিজেকে স্বর্গ নিযুক্ত শাসক হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাঁর ছিল কার্যত একটি পুলিশি রাষ্ট্র ও ইলদিজকে কেন্দ্র করে একটি আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুলতান। এছাড়াও আরো একটি শক্তিশালী হাতিয়ার পেয়েছিলেন তিনি যা থেকে পূর্বপুরুষেরা বঞ্চিত ছিল। একটি টেলিগ্রাফ। প্রথমে ক্রিমিয়া যুদ্ধে মিত্রপক্ষ ব্যবহার করলে সাম্রাজ্য জুড়ে ফরাসি সহায়তায় এটি কাজ শুরু করে। আবদুল হামিদ একে পুরোপুরি ব্যবহার শুরু করেন পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এছাড়া বিদ্যালয়ে টেলিগ্রাফ চালনাকারীদের জন্য কোর্স অন্তর্ভুক্ত হয়। পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে টেলিগ্রাফ তার বসানো হয়। প্রায় বিশ হাজার মাইল সংযুক্ত করার মাধ্যমে যা পূর্বে কোন সুলতান পারেননি, সুলতান আবদুল হামিদ সরাসরি প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রকে পরিচালনা করতে থাকেন। একজন গভর্নর আর নিজর মতো করে শাসন করার ক্ষমতায় রইল না। কেননা টেলিগ্রাফের কল্যাণে সুলতান, "তাকে আদেশ করতেন, খুঁজে বের করতেন তার কার্যাবলি, তাকে ডেকে পাঠাতে পারতেন, অধস্তনদের নির্দেশ দিতেন

তার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন পেশ করতে এবং সর্বতোভাবে সকল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন।” নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ওপর তাই সুলতানের কোনো রাজনৈতিক বিরোধি বা সংবিধান গত বিধি-নিষেধ ছিল না।

এতদসত্ত্বেও রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। তানজিমাত যুগের পূর্বপুরুষদের ন্যায় আধুনিকায়নের জন্য পশ্চিমামুখী ছিলেন সুলতান। বিশেষত নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কারিগরী ও আইনের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন সুলতান। এখানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বলে বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছেন সমস্ত সংস্কারকাজের। যা পূর্বতন সংস্কারকরা পরিকল্পনা করলেও বাস্তবায়ন করতে পারেননি তেমনটা। সাম্রাজ্যের যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তা হলো সুপরিসরে বিস্তৃত সরকারি কার্যাবলি। যেন জনগণের বিষয়াদি, ও আইন ও আর্থিক বিষয়ে সুলতানের ইচ্ছেনুযায়ী প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমেই কেবল উন্নয়ন অব্যাহত রাখা যেত।

পশ্চিমের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য—বস্তুত তাঁর নিজের খ্রিস্টান জনগণের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য—সুলতানের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার। নিজের চারপাশে সুলতানের প্রয়োজন ছিল নির্ভর যোগ্য ও শিক্ষিত সরকারি অফিসার। এই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যের উচ্চশিক্ষার প্রথম কেন্দ্র মুলকিয়েকে পুনরায় ঢেলে সাজান। যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতার সময়কার তুলনায় বারো গুণ বেশি শিক্ষার্থী হয় এখানে।

সামরিক ক্ষেত্রে হারবিয়ে—যুদ্ধ মহাবিদ্যালয়ও একইভাবে বর্ধিত হয়। নৌ ও সামরিক প্রকৌশল ও চিকিৎসা বিদ্যালয়ও সমান মাত্রায় উন্নতি করে। আঠারোটি নতুন উচ্চ ও পেশাদার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যেখানে ফিন্যান্স, ফাইন আর্টস সিভিল ইনজিনিয়ারিং, পুলিশ ও কাস্টমস্ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। অবশেষে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যার অর্ধশতক পূর্বে তানজিমাতের মাধ্যমে পরিকল্পনা করা হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। এর কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেড়ে যায়। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রাঙ্কো-তার্কিশ গালাতাসারিতে পুরোপুরি তুর্কি ভাষার আধিপত্য কায়েম হয়। রাজকীয় অটোমানদের জন্য অভিজাত পাবলিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যেখানে শাসক শ্রেণীর পরিবারের সদস্যরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করত। বিখ্যাত তুর্কি বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ হতো এখানে।

আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে সুলতান আবদুল হামিদ প্রথম দিকে ততটা সফলতা পাননি। কেননা এক্ষেত্রে বিদেশি কমিটির স্বীকৃতির জন্য সংস্কার আনা হলে সন্ধি শর্তে আত্মসমর্পণ নীতি বাধাগ্রস্ত হতো। তাই বিদেশি

মিশনসমূহ মিশ্র একটি কোর্টে বিচার পেতে আগ্রহী ছিল না। তাই সুবিধাসমূহ পূর্বের মতোই বলবৎ রইল। যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে সংবাদপত্র, সাময়িকী ও বই মুদ্রিত হতে থাকে। যদিও সবকিছুর ওপর কঠিন সেন্সর আরোপ করা হতো, যা পায় পুরুষত্বহীনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল— রাজনৈতিক আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। তার পরেও এদের প্রচারপত্রের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অরাজনৈতিক বিষয় যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কে পড়ার সুযোগ পেয়ে জনগণের চেতনা দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে ওঠে।

আর্থিক দিকে অটোমান সাম্রাজ্য এখন ইউরোপের দয়ার ওপর নির্ভর। বার্লিন কংগ্রেসে প্রথমবারের মতো অটোমান ঋণের ঘাটতি নিয়ে আলোচনা হয়। এ লক্ষ্যে ইস্তাম্বুলে একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়; যেন পোর্তের সুবিধানুযায়ী বন্ড হোল্ডারদের যোগ্য সমাধান হয়। এর মাধ্যমে দেশে ইউরোপীয়দের দ্বারা অটোমান সার্বভৌমত্ব দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অবমাননাকর সম্ভাবনা দেখা দেয়। আবদুল হামিদের জন্য এটি সহ্য করা কষ্টকর হয়ে যায় যে অটোমান অহংকার ধূলি-ধূসরিত হবে। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের রাজকোষের প্রায় কপর্দকহীনতা উপলব্ধি করে বিদেশি ফান্ডের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। এর ফলে বিদেশে তুর্কি সম্মানও খানিকটা পুনরুদ্ধার হবে।

১৮৮১ সালে মুহারেম আদেশ জারির মাধ্যমে ইউরোপীয় বন্ডহোল্ডারদের সাথে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে কাউন্সিল অব দ্য পাবলিক ডেট প্রতিষ্ঠা হয়। অটোমান এবং বিদেশি উভয় প্রতিনিধি থাকে এখানে। সুলতান এমনভাবে এ ডিক্রি জারি করেন যেন তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা অটুট রেখে তুর্কিদের ওপর ইউরোপীয় শুভ ইচ্ছা আরোপিত হয়। এ আর্থিক কমিশন পোর্তে এবং ঋণদানকারীদের উভয় পক্ষই একমত হয় যে, কোনো রকম কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হবে না।

এর শর্তসমূহ অটোমান রাজকোষের অনুকূলে ছিল। ঋণের পরিমাণ প্রকৃত সংখ্যার অর্ধেক লেখা হয়। যা ছিল মাত্র এক শ মিলিয়ন পাউন্ড। ৪ শতাংশ হারে সুদ যা প্রকৃতপক্ষে ছিল ১ শতাংশের মতো। এর পরিবর্তে রাজকোষ কাউন্সিলের কাছে সরকারের বার্ষিক কর আদায়ের বৃহৎ একটি সমর্পণ করে, সুদ প্রদান করার জন্য। এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত ছিল লবণ ও তামাকের একক বাজার, বুলগেরিয়া ও পূর্ব রুমেলিয়ার পরিশোধিত কর, সাইপ্রাস সরকারের উদ্বৃত্ত করসহ আরো অসংখ্য কর। কিন্তু সুদ ও ঋণের অর্থ ফেরত দেওয়ার পরেও এসব করের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে পুনরায় তা তুর্কি রাজকোষে জমা দেয়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যদি এ ঋণ কাউন্সিল পোর্তের ওপর বিশাল একটি বোঝা চাপিয়ে দেয়; তথাপি তুর্কিরা প্রাতিষ্ঠানিক শ্রদ্ধাবশত এর নিয়ম-

কানুন মেনে চলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যাই হোক আবদুল হামিদের জারীকৃত মুহারেম থেকে বের হতে অটোমান সরকারের লেগে যায় পরবর্তী চল্লিশটি বছর।

কার্যত এরপর থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে আর্থিক সহায়তা করতে থাকে ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীগণ এই কাউন্সিলের মাধ্যমে। তুরস্কে খুব দ্রুত সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। যদিও এর প্রধান সুবিধাভোগী ছিল বিদেশিরা তারপরেও মুসলিম তুর্কিরাও উপকৃত হতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের কাজের সংস্থান বেড়ে যায়। অবহেলিত কৃষি ও শিল্প সম্পদ উত্তোলন শুরু করে বিদেশি সুবিধাবাদীরা। বার্সাতে সিল্ক শিল্পের পুনর্জীবন ঘটে। ফরাসি রাজধানী কৃষ্ণসাগরের উপকূলে কয়লাখনিতে উত্তোলন শুরু করে। তামাক চাষের ক্ষেত্রে একনায়কত্ব কায়েম করে ফ্রাঙ্কো-অস্ট্রিয়া কোম্পানি। যদিও এখানে মেসিডোনিয়া থেকে শুরু করে লেভান্ত ও উত্তর-পূর্ব আনাতোলিয়ার শত শত হাজার হাজার মুসলিম তুর্কি চাকরি লাভ করে। সাম্রাজ্যজুড়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নতি লাভ করে। যা মূলত শুরু করেছিলেন সুলতান আবদুল আজিজ। আবদুল হামিদের সময়কালে সাম্রাজের প্রধান শহরগুলোর প্রায় হাজার মাইল একত্রে সংযোগ করা হয়। ১৮৮৮ সালে তুরস্কের সাথে পশ্চিম ইউরোপের প্রথম রেল সংযোগ ঘটে। ভিয়েনা থেকে ইস্তাম্বুলে বিপুল বাজনা বাদ্যের মাঝে প্রথম প্রবেশ করে—ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের প্রথম দিককার রেল।

কিন্তু সুলতান আবদুল হামিদ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে বাধার ভেতরে এই নাটকীয় যোগসংযোগকে পুরোপুরি স্বাগত জানাতে পারেননি। ধীরে ধীরে পররাষ্ট্রনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ গ্রহণ করছিলেন সুলতান বস্তুত নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ও পশ্চিমা শক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কেননা এরাই রাশিয়ার সাথে শেষ যুদ্ধে তাঁকে ফেলে রেখেছিল। আর এদের উদ্দেশ্য তাঁর মাঝে অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটেনবিমুখ ছিলেন সুলতান। ব্রিটেন সুলতানের দৃষ্টিতে, যুদ্ধে সমর্থন না করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; যার কারণে দেশ প্রায় দেউলিয়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে আর তাঁর নিজের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব কমে গেছে; যার উপদেষ্টারা নিয়মিত আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলিয়ে সাম্রাজ্যের ওপর প্রাদেশকি সংস্কার চাপিয়ে দিয়েছে। নির্দিষ্টভাবে “মি. গ্লাডস্টোনের ওপর ভীত ছিলেন সুলতান।” ১৮৮০ সালে গ্লাডস্টোন পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং সুলতান ও তাঁর সরকারকে দেখতে থাকে “প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাভাষণের মেঝে হীন সুড়ঙ্গ।”

১৮৮৫ সালে টোরিরা ক্ষমতায় ফিরে এলে রাষ্ট্রদূত স্যার উইলিয়াম হোয়াইট লর্ড স্যালেসবুরির কাছে লন্ডন, প্যারিস ও ভিয়েনা সরকারের প্রভাব পোর্তের ওপর একেবারে কমে যাবে বলে মন্তব্য করে। আবদুল হামিদ নিজেও

ঐতিহ্যবাহী মিত্রকে এড়িয়ে ঐতিহ্যবাহী শত্রু রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। পোর্তের ওপর রাশিয়ার প্রভাব বেড়ে যায়। এছাড়া সুলতান আরো একটি নতুন ভরসার জায়গা খুঁজে পান—জার্মানি। বিসমার্ক নিয়ন্ত্রিত জার্মানি, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে একত্রে গড়ে তুলেছে ত্রি-মৈত্রী জোট, "তিনজন সম্রাট"। পোর্তের ওপর জার্মান প্রভাব আনুষ্ঠানিক রূপ পায় যখন অটোমান সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব বর্তায় জার্মান অফিসারদের ওপর।

বার্লিনের পরবর্তী সময়ে, আবদুল হামিদ চুক্তির শর্ত পূরণে গড়িমসি শুরু করেন। ১৮৮০ সালে মন্টিনিগ্রোতে প্রথম সমস্যা বাধে। চুক্তি অনুযায়ী আড্রিয়াটিকের তীরে একটি বন্দরসহ একে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। রাশিয়ার নৌবাহিনী যেন ঘাটি না গড়তে পারে; তাই শর্ত হয় একে মন্টিনিগ্রোবাসী বা বিদেশি যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করতে পারবে না। আবদুল হামিদ বন্দর সমর্পণে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর প্রত্যাখ্যানের উত্তরে পশ্চিমা শক্তি তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন শুরু করে। এরই মাঝে ব্রিটেন গ্লাডস্টোনের রাষ্ট্রদূত ভিসকাউন্টের মাধ্যমে হুমকি প্রদান করে যে যদি সুলতান সমর্পণে স্বীকৃত না হয় তাহলে ব্রিটিশ সৈন্য আরো একটি তুর্কি বন্দর স্মূর্ণা দখল করে নেবে। সুলতান এরপরেও অনড় থাকেন নিজ সিদ্ধান্তে। কিন্তু ব্রিটিশ রণতরী যাত্রা শুরুর শেষ মুহূর্তে ছোট্ট একটি নৌকায় পাগলের মতো হাতে কাগজ নাড়তে নাড়তে সুলতানের দূত এসে হাজির হয়—সুলতান সমর্পণে রাজি হয়েছেন।

একই রকম বিলম্ব করা হয় গ্রিস সীমান্তের ক্ষেত্রেও। এখানে শক্তিবর্গের মাঝের অনৈক্যকে ব্যবহার করার জন্য আবদুল হামিদের কৌশল সফল হয়। গ্রিসকে পুরো থেসালি ও ইপিরাস প্রদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন সুলতান। বিস্তর আলোচনা শেষে, গ্রিক সেনাবাহিনী জড়ো হওয়া শুরু করলে সুলতান পুরো থেসালি ও ইপিরাসের এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিতে সম্মত হন। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল বাদে। কিন্তু গ্রিক'রা এরপরেও আশানুরূপ ক্রিট পায়নি।

বুলগেরিয়া, সুলতানের নিকটতম ইউরোপীয় প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সুলতান চাইলে যে কোনো সময়ে আক্রমণ করতে পারতেন সাম্রাজ্যের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। কিন্তু প্রতিবারই সুলতান নেতিবাচক মনোভাবের কারণে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। উত্তর বুলগেরিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহে প্রথমে ধরা হয়েছিল যে রাশিয়ার প্রভাব আধিপত্য করতে পারবে। এর রাজকুমার ছিল বাটেনবার্গের আলেকজান্ডার। প্রথম দিকে রাশিয়ার সমর্থন ছিল তার প্রতি। রাশিয়ার কৌশল ছিল জনগণের বিরুদ্ধে রাজকুমারকে ব্যবহার করা। কিন্তু আলেকজান্ডার রাশিয়ার আধিপত্যকে ভেঙে দিয়ে অভিযোগ করে ওঠে, "রাশিয়ার সব ফেনা এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে ও পুরো দেশকে দূষিত করে ফেলেছে।" আবার

বুলগেরিয়াবাসীও এই অপরিচিত প্রভুকে বেশি দিন সহ্য করেনি। তারা তুর্কিদের হাতে রায়া হিসেবে থাকার চেয়ে কি রাশিয়ার কাছে নিচু শ্রেণীর এশীয় হিসেবে ভালো আছে? শীঘ্রই তারা 'ত্রাণকর্তা আলেকজান্ডারের" ছায়াতলে এসে দাঁড়ায়। নিজেদের ঘরের দেয়ালে তার ছবি টানিয়ে দেশের মাঝে ঘণ্টা বাজাতে থাকে, "বুলগেরিয়া বুলগেরিয়াবাসীর জন্য!"

এর ফলে উত্তর ও দক্ষিণ বুলগেরিয়ার মাঝে এক ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠে। বলকান পার্বত্যঞ্চলের দক্ষিণাংশ পূর্ব রুমেলিয়ার ধনী ভূখণ্ডে অবস্থিত। স্বায়ত্তশাসিত বুলগেরিয়া রাষ্ট্র এখনো সুলতানের হাতে। রাশিয়া সেনাবাহিনী শুধু সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছিল। এরপর আবদুল হামিদ-এর গভর্নর হিসেবে গাভ্রিল 'পাশাকে নিয়োগ দান করেন। তুর্কিদের কাছে যে কিনা "বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাষ্ট্রপ্রধান" হিসেবে মিশ্র আদালতে পরিচিত ছিল। ফিলিপ্পোপোলিসে পৌঁছানোর পর আনুষ্ঠানিকভাবে তুর্কি ফেজ ও বুলগেরিয়ার কল্পকের আদান-প্রদান হয়। জাতীয়তাবাদী অধিবাসীরা তাকে মেনে নিয়েছিল; নচেৎ সুলতান হয়তো রুমেলিয়াতে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিতেন।

এতদসত্ত্বেও তারা ঐক্যের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে টের পেয়ে পোর্তে নিজের ভেটো চাপ দিতে থাকে রুমালিয়ার আইনের ওপর। এরই মাঝে উসকানিমূলকভাবে সুলতান বুলগেরিয়া পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ করা করে বলেন। এর প্রতিবাদ করে জনগণ রাজধানী ফিলিপ্পোপোলিসে পতাকা উত্তোলন অব্যাহত রাখে। সেনাবাহিনীও কোনো বিরোধিতা না করায় রুক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটে যায়। কয়েক দিন পরে রাজা আলেকজান্ডার বিদ্রোহীদের নেতা স্টামবুলভে্ এর চাপে রাজধানীতে ঘুরে বেড়ায়। পূর্ব রুমেলিয়ার নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় তাকে। ইতিমধ্যে তুর্কি গভর্নর গাভ্রিলকে রাস্তায় এনে বিজয় উৎসব পালিত হয়। পাশে তরবারি রেখে তুরস্কের সীমান্তে ফেজ টুপি সমেত পৌঁছে দেয়া হয় গাভ্রিলকে।

বার্লিন চুক্তি ভঙ্গ হয় অটোমান সাম্রাজ্যে। বুলগেরিয়াবাসী প্রস্তুত হয়ে যায় সুলতানের বাহিনীর জন্য। কেননা তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে সুলতান নিশ্চয়ই চুক্তি সঠিকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু কোনো তুর্কি বাহিনীর আগমন হয়নি। কেননা সুলতান বুলগেরিয়া হত্যাকাণ্ডের ভয় পাচ্ছিলেন। এর পরিবর্তে ভাগ্য মেনে নিয়ে রাজকুমার আলেকজান্ডাকে পাঁচ বছর সময়সীমার জন্য পূর্ব রুমেলিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এর পর থেকে দুই রাষ্ট্রের সংসদ এক হয়ে সোফিয়াতে অধিবেশন বসে।

বুলগেরিয়ার ভূখণ্ডের এহেন সম্প্রসারণে ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠে প্রতিবেশী সার্বীয়া। এর শাসক রাজকুমার মিলান ভৌগোলিক সীমা দাবি করে বুলগেরিয়া সীমান্তে আক্রমণ করে বসে। বুলগেরিয়া সমস্যায় পড়ে যায়। কেননা রাশিয়া

বুলগেরীয় সেনাবাহিনী থেকে নিজের অফিসারদের প্রত্যাহার করে নেয়। তারপরেও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজকুমার আলেকজান্ডারের নেতৃত্ব ও উৎসাহে অধিক অভিজ্ঞ সার্বীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে একরোখাভাবে যুদ্ধ করতে থাকে। তিন দিনের মাঝে সার্বীয় সীমান্তে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় সৈন্যদের। এরপর বেলগ্রেডের কাছে চলে আসলে অস্ট্রিয়া সার্বীয়ার নিরাপত্তারক্ষক হিসেবে শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসে। ফলে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে অগ্নি-দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে বুলগেরিয়া জাতির বিজয় সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়বারের মতো আবদুল হামিদ নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ নষ্ট করেন। সুলতানের এ-জাতীয় মনোভাব আবার আরেক অর্থে পশ্চিমা শক্তির সুবিধা এনে দেয়। বিশেষ করে ব্রিটেনের জন্য। লর্ড স্যালিসব্যুরি এগিয়ে আসে একত্রিত ও জাতীয়তাবাদী বুলগেরিয়া গঠনে। কেননা বলকানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুর্কিদের তুলনায় বুলগেরিয়া কার্যকর প্রতিরক্ষা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ভাষায় তুর্কিদের তরবারি "নিঃশব্দে শুকিয়ে গেছে।"

জার আলেকজান্ডারের ওপর খেপে ওঠে তাকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করে। পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে রাজকুমারকে এরপর রাশীয় সীমান্তে নিয়ে আসে। কিন্তু স্টামবুলভ জনগণের উৎসাহে তাকে ফিরিয়ে আনে অপহরণকারীদেরসহ। এরপর ষড়যন্ত্রকারীদের আটক করা হয়। কিন্তু আলেকজান্ডার দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিজের অবস্থার প্রতি চিন্তিত হয়ে, এমনকি গুপ্তঘাতকের ভয়ে নিজের পদত্যাগ নিশ্চিত করে। জারের কাছে বার্তায় জানিয়ে দেয় "যেহেতু রাশিয়া আমাকে মুকুট দিয়েছিল, আমি প্রস্তুত আছি এটি তার প্রভুকে ফিরিয়ে দিতে।" এরপর পরবর্তী শাসকদের নাম লিখে বুলগেরিয়া ছেড়ে চলে যায় চিরতরে।

॥ ৩৭ ॥

ইতিমধ্যে স্বেচ্ছায় না হলে দ্ব্যর্থবোধক কূটনীতির জন্য সুলতান আফ্রিকা মহাদেশ থেকেও ফিরে আসেন। এখানে সুলতানকে তিউনিস হারাতে হবে, যার ওপরে ফ্রান্সের নজর ছিল আর সবকিছুর ওপরে—মিশর; "সুলতানের মুকুটে সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্ন।" মিশরের দায়িত্বে আছে ইসমাইল পাশা, যার ওপরে সুলতানের সামান্য মাত্র শাসন অবশিষ্ট আছে। গত অর্ধশতক ধরে মাহমুদ আলীর রাজবংশ মিশর শাসন করে আসছে। ইসমাইল, সাম্প্রতিক সুলতানদের মতোই, ঋণে জর্জরিত হয়ে গেছে অপব্যবহারের দরুন। যার পরিমাণ প্রায় শত মিলিয়ন পাউন্ডের কাছাকাছি। ১৮৭৬ সালের মাঝে, তুর্কি

সরকার এর জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল, ইসমাইল কার্যত প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় পৌঁছে যায়। আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করা হয় মিশরীয় পাবলিক ঋণের জন্য। ফলে ইসমাইল বাধ্য হয় তার আর্থিক কার্যবলির ওপর ফরাসি ও ব্রিটিশ দ্বৈত কন্ট্রোলার জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে। ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকারের চাপ প্রয়োগে নতুন কেবিনেট গঠন করা হয়, ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী ও ফরাসি পাবলিক ওয়ার্কস মন্ত্রীকে নিয়ে। ১৮৭৯ সালে ইসমাইল দুই মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে সম্পূর্ণ মিশরীয় কেবিনেট প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে, ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে পরামর্শ দেয়, "পদত্যাগ করে মিশর ছেড়ে যেতে।" অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি এতে সমর্থন প্রদান করে।

যদি শর্ত মোতাবেক, ইসমাইল পদত্যাগ করতে প্রত্যাখ্যান করে দুই সরকার সুলতানের কাছে যেতে বাধ্য হবে। সময় পাওয়ার আশায় ইসমাইল স্বয়ং—মোটা অঙ্কের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে প্রতনিধি পাঠিয়ে সুলতানকে অবহিত করে যে, দুই বিদেশি শক্তি তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা লঙ্ঘন করতে চায়। স্বভাব গত অদক্ষতার ফলে আবদুল হামিদ ধরে নেন যে শক্তিদ্বয় এহেন সিদ্ধান্ত সুলতানের অনুমতি ব্যতীত নিতে পারে না। নিজের সম্মান ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে মন্ত্রিপরিষদের সভা আহ্বান করেন সুলতান; যারা একবাক্যে স্বীকার করে যে যতটা সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে এ ধরনের পদক্ষেপ। আবদুল হামিদ আলোচনা স্থগিত করে দেয়।

কিন্তু তাঁর মন্ত্রীদের মাঝে মাত্র একজন, গ্রিক খ্রিস্টান, কারাথিওডোরি যে কিনা বার্লিনে সুলতানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিল, সাহসের সাথে বলে ওঠে যে, প্রয়োজনের সময় যে কোনো বিলম্ব সিদ্ধান্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। শক্তিবর্গ সুলতানের বিনা অনুমতিতেই কোনো পদক্ষেপ নিয়ে বসতে পারে।

সময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সুলতান এক ফরমান জারির মাধ্যমে ইসমাইল পাশাকে পদচ্যুত করে পুত্র তৌফিককে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। ফলে একেবারে শেষ মুহূর্তে শক্তিবর্গকে আক্রমণ করতে রুখে দেয়ার পাশাপাশি নিজের মুখ রক্ষা করেন।

এর দুই বছর পরে আবার এক সংকট মুহূর্ত উপস্থিত হয়ে সুলতানের ক্ষমতা নাড়িয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর অবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট মিশরীয় সৈন্যরা অভ্যুত্থানের ডাক দেয় কর্নেল আহমেদ আরাবির নেতৃত্বে নতুন খেদিভ তৌফিকের বিরুদ্ধে। এতে খেদিভের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বরখাস্ত হয়ে যায়। বিদ্রোহের পর গ্লাডস্টোন ও তার আক্রমণ বিরোধি মন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে কূটনৈতিক স্তরে পদক্ষেপ নিতে অভিপ্রায় করে।

কেননা গ্লাডস্টোনের মতে মিশরে যে কোনো ধরনের সামরিক অভিযানের দায়িত্ব সুলতানের একার।

১৮৮২-এর প্রথম দিকে গ্লাডস্টোনের ও ফরাসিদের চাপে পড়ে ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার খেদিভের প্রতি তাদের সমর্থন নিশ্চিত করে বর্তমান আর্থিক নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়।

এর ফলে মিশরে আবারো বিদ্রোহ দানা বাঁধে। আরাবী "মিশর, মিশরীয়দের জন্য" দাবি তুলে খেদিভকে চাপ প্রয়োগ করে জাতীয়তাবাদী সরকার গড়ে তুলে তাকে যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এবার আলেকজান্দ্রিয়ায় যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে। এই আশায় যে শৃঙ্খলা ফিরে এসে খেদিভের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এতে তারা ব্যর্থ হয়। এটি বিশ্বাস করা হতো যে আরাবী সমস্ত খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিল। সেনা অফিসাররা খেদিভকে পদত্যাগের জন্য চাপ দিতে থাকে। যুদ্ধজাহাজের উপস্থিতিতে মিশরীয় জনগণ ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। একজন শেখ রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে "ওহ মুসলিম আসো এবং আমাকে সাহায্য করো খ্রিস্টানদের হত্যা করতে।" ইউরোপীয়দের উৎপীড়ন করা হয় আর তারা পালিয়ে এদিক-এদিক আশ্রয় নেয়। একদিনের রায়টে ঝড় ভেঙে পড়ে তাদের ওপর। নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয় পঞ্চাশ জন ইউরোপীয়কে।

পরিষ্কারভাবে সময় এসে গেছে শক্তিবলে আরাবীকে দমন করার জন্য। যেহেতু ফ্রান্স– সন্দেহ করা হয় যে জাতীয়তাবাদীদের সাথে একমত হয়ে হাত মিলিয়েছিল সহযোগিতা করতে প্রত্যাখ্যান করে, পুরো দায়িত্ব বর্তায় ব্রিটেনের কাঁধে। এর ফলে গ্লাডস্টোনের ওপর চাপ আসতে থাকে কঠিন পদক্ষেপ নেয়ার জন্য। ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল সিমারকে নির্দেশ দেয়া হয় আরাবীর কাছে দাবি করতে যেন আলেকজান্দ্রিয়া দুর্গ খালি করে দেয়া হয়। এ দাবি প্রত্যাখ্যান হলে অ্যাডমিরাল নির্দেশানুযায়ী শহরে বোমাবর্ষণ শুরু করে। ফরাসি সরকার বোমাবর্ষণে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে নৌবাহিনী সরিয়ে নেয়—আবদুল হামিদ তৃপ্তি নিয়ে ভাবতে থাকেন যে তাঁর সাম্রাজ্য চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে প্রধান খ্রিস্টান শক্তিদের মাঝে মতভিন্নতার জন্য।

এর পূর্বে ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার ইস্তাম্বুলে কনফারেন্স আহ্বান করেছিল মিশরীয় সংকট নিরসনে সুলতানের সহযোগিতার আশায়। সুলতান কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করে মিশরে দুজন পৃথক কমিশনার পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। তাঁর প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত মিশরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সেনা আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করা হয় ও সুলতানকে আমন্ত্রণ করা হয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে এই উদ্দেশ্যে। যখন তিন সপ্তাহ পর অবশেষে সুলতান একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন,

আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমাবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে—এমন পদক্ষেপ সুলতান কল্পনাও করতে পারেননি যে ব্রিটেন তাঁর বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করতে পারে।

ব্রিটেন একা দায়িত্ব গ্রহণ করলেও ব্যয়ভার অ্যাংলো-ফরাসি দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে থাকে, "মিশরের বর্তমান অরাজকতা ও সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতির পরিবর্তন করে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনায়।" গ্লাডস্টোনের সরকার সাময়িকভাবে মিশর দখল করার পরিকল্পনা করে। যেন ভবিষ্যতের সৎ সরকার নিরাপদে থাকে। পরবর্তী দুমাস ধরে সামরিক প্রস্তুতি চলাকালে পোর্তেতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড ডাফেরিন যথেষ্ট চেষ্টা করে সুলতানকে রাজি করাতে, যেন এটি একটি যৌথ দখল অভিযানে রূপ নেয়। এর ফলে মিশরে সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকৃত হওয়ার পাশাপাশি অটোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের শ্রদ্ধা নিশ্চিত হবে। এ লক্ষ্যে একটি সামরিক কনভেনশন তৈরি করে সুলতানের স্বাক্ষরের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আবদুল হামিদ তুচ্ছ সংশোধনের একগুয়েমি করে বিলম্ব করতে থাকেন। এতটাই দেরি হয়ে যায় যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড গ্রানভিল নিজের রাষ্ট্রদূতের কাছে মন্তব্য করে বসে "প্রয়োজনীয় সময় কেটে যাচ্ছে; হিজ ম্যাজেস্টি এখনো মিশরে সৈন্য পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারছেন না।"

১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখে তাই জেনারেল স্যার গারনেন্ট হোলসলি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে সুয়েজ খালে নামিয়ে দেয় ইসমালিয়ার উদ্দেশ্যে। এখানে তেল-এল-কাবিরের যুদ্ধে আরাবির সৈন্যবাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয় ব্রিটিশ বাহিনী। পরবর্তী দিনে ব্রিটিশ অশ্বারোহী বাহিনী প্রবেশ করে কায়রোতে এখানে সুলতান আবারো একটি সুযোগে হারিয়ে ফেলেন; ব্রিটেনের বিরুদ্ধে নিজের উষ্মার প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু খেদিভ বিজয়ের বেশে আবারো নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করে।

শুরু থেকেই ব্রিটিশ সরকার সত্যিকার অর্থেই স্থানীয় প্রশাসনকে পুনরায় শৃঙ্খলিত করার পরে নিজের বাহিনী প্রত্যাহারের ওপর বদ্ধপরিকর ছিল। আবদুল হামিদ কায়রোতে নিজের চর পাঠিয়ে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করলে, ব্রিটিশ সরকার মিশরীয় সরকার তৈরির পরিকল্পনা শুরু করে। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্ধারণ করে দুই থেকে তিন বছর পর। ১৮৮৫ সালে ইংল্যান্ডে কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী লর্ড স্যালিসব্যুরি স্যার হেনরি ড্রামোন্ড উল্ফকে ইস্তাম্বুলে একটি বিশেষ মিশনে প্রেরণ করেন। হেনরির দায়িত্ব হয় উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অ্যাংলো-তার্কিশ বন্ধুত্বের ভিত্তিতে এগ্রিমেন্ট তৈরি করা। এর মাধ্যমে সুলতানের অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি মিশরের ওপর ব্রিটিশ প্রভাবও বজায় থাকবে।
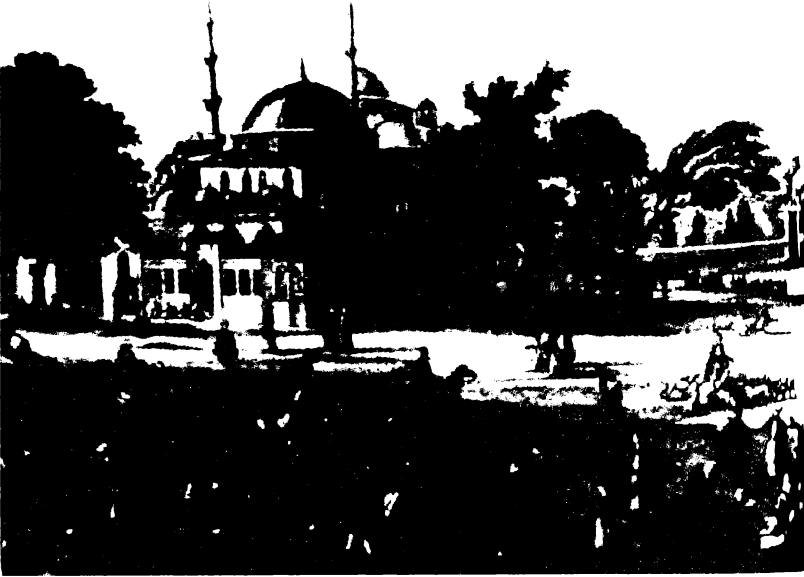
বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা স্বরূপ হিপোড্রোম, ইস্তাম্বুল। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে স্কোয়ার, হিসেব ব্যতিত এটি ব্যবহারের তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ২৬০-১৫০ দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনিয়মিত চতুর্ভূজ অনানুষ্ঠানিক বাজারে পরিণত হয়। বিশেষ ভাবে দর্শনীয় বা পাশের অত্যাশ্চর্য মসজিদে সুলতান আহমেদ, কনস্টান্টিনোপল গম্বুজ এবং মিশরীয় সমাধি ফলক, ডানদিকে দেখা যাচ্ছে চমৎকার অথচ অদ্ভুত অটোমানীয় দালান নকশা।

প্রাথমিকভাবে মিশরে তুর্কি ও ব্রিটিশ কমিশনার পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদের কাজ হবে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে সংস্কারকাজ তদারকি করা। কিন্তু জরুরি আলোচনা শুরু করার পূর্বে কিছু সময় পার হয়ে যায়। এর ফলে ১৮৮৭ সালে অ্যাংলো-তার্কিশ কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে তিন বছরের মাঝে মিশরে আভ্যন্তরীণ ও বিদেশি হুমকি মোকাবেলা করার পর ব্রিটিশ বাহিনী এ অঞ্চল পরিত্যাগ করবে। কিন্তু আবারো কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে পুনরায় প্রবেশের ক্ষমতা থাকবে ব্রিটিশ বাহিনীর। প্রত্যাহারের পাশাপাশি মিশরীয় নিরপেক্ষতার আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তাও থাকবে।

কিন্তু মিশরে ব্রিটেন বিশেষ মর্যাদা লাভ করায়, এর বিরোধিতা শুরু করে ফ্রান্স। ফরাসি রাষ্ট্রদূত পোর্তেতে সুলতানের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। একই ভাবে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকেও সম্মতি প্রদানের প্রত্যাখ্যানের ওপর চাপ দিতে থাকে ফরাসি রাষ্ট্রদূত। এভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আবদুল হামিদ আরো একবার একেবারে শেষ মুহূর্তে তুর্কিদের হয়ে কনভেনশন অনুমোদনে প্রত্যাখ্যান করেন। স্যার হেনরি দায়িত্ব অপূর্ণ থাকা অবস্থাতেই ইংল্যান্ড ফিরে যায়। ব্রিটিশ সৈন্যরা বিতাড়িত হওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করে মিশর দখল অব্যাহত রাখে।

আবদুল হামিদ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক বিজয় লাভ করা আনন্দে অহংকারী হয়ে উঠলেও শীঘ্রই অনুধাবন করেন যে তিনি ঘোরতর ভুল করে ফেলেছেন। লর্ড স্যালিসব্যুরির পুনরায় আলোচনায় বসায় অনুরোধ পাঠান সুলতান। প্রধানমন্ত্রী নম্র কিন্তু দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তী পাঁচ বছরে তুরস্ক দ্বারা ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য ফ্রান্স বা রাশিয়া কিছুই করতে পারেনি। ফলে অ্যাংলো-মিশরীয় সরকারের মাঝে এমন সব সমস্যা দানা বাঁধতে থাকে, যা নিবারণের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌ ঘাঁটি তৈরি করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, দেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। পূর্বের প্রাচীন প্রশ্নও তার গতিপথ পরিবর্তন করে ফেলে। শক্তি স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ তুরস্ক থেকে মিশরের ওপর স্থির হয়, বসফরাস থেকে সুয়েজ খাল, নিকট থেকে দূর প্রাচ্যে পরিবর্তিত হয়। তুরস্কের ওপর থেকে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ হুমকি সরে গিয়ে এমনকি বলকান ও ভূমধ্যসাগরের ওপর গত শতাব্দীজুড়ে থাকা রাশিয়ার বিপদসংকেত ও দিক পরিবর্তন করে। কেননা সাম্রাজ্যের নকশায় আরো পূর্বে সরে গিয়ে এশিয়াতে নজর দেয় রাশিয়া। ফলে ভারতীয় সীমান্তে অ্যাংলো-রাশান দ্বন্দ্ব বেঁধে ওঠে। মিশরীয় নিয়ন্ত্রণাধীন জলসীমা তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কার্যত মিশর এখন ব্রিটিশ শাসন কায়েম হয়েছে। এর আগে ২৭০ বছর ধরে এটি অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

সুলতান নিজের চারপাশে জ্ঞানী ও দক্ষ উপদেষ্টা বিবর্জিত হয়ে পড়েছিলেন। বিচক্ষণতার ও বিশ্বাসের অভাবে একের পর এক সুযোগ হারিয়ে ফেলেন পররাষ্টনীতির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে মিশর হয়ে দাঁড়ায় এক অন্যান্য উদাহরণ। ব্রিটেন প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করলেও সুলতান, নিজের ও সাম্রাজ্যের স্বার্থ পূরণে প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। বুলগেরিয়ার ওপর অধিকার পরিত্যাগ করার ফলে সুলতান এই উপসংহারে পৌঁছে যান যে পশ্চিমে অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয় ও শাসনের অবসান শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু একই সাথে মিশরের আশা ও পরিত্যাগ করা অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক ছিল।

মিশরের ওপর সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতা এখন শুধু আনুষ্ঠানিক আর প্রতীকী অর্থেই টিকে আছে। তাই খ্রিস্টান ইউরোপে নিজের সাম্রাজ্য প্রাচীর থেকে মুখ ফিরিয়ে সুলতান এশিয়াতে মুসলিম অংশের দিকে দৃষ্টি ফেরান। যেন সাম্রাজ্যের এ অংশটুকু অন্তত রক্ষা পায়। কেননা সাম্রাজ্যের এ অংশটুকুর বিশাল ভূখণ্ড অক্ষতই ছিল বলা চলে। নিজের ক্ষমতার কেন্দ্রভার সরিয়ে পূর্বে ইসলামের দিকে নিবদ্ধ করেন সুলতান। এশিয়া শুধু তাঁর জাতি এবং রাজবংশের জন্মস্থানই নয়; তাঁর এবং তাঁর বিপুল জনসংখ্যার ধর্মও এখানে জড়িত ছিল। তাদের সুলতান শুধু তাদের জীবন ও ভূমির প্রতিরক্ষক নন; তাদের বিশ্বাসেরও রক্ষাকর্তা।

এখানেই মিশরের গুরুত্ব নিহিত। কায়রো হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ইসলামের আত্মিক কেন্দ্র হিসেবে ছিল আর গত কয়েক শতক ধরে তুর্কি দখলীকরণের ফলে খলিফার আসনে আছে তুর্কি সুলতানেরা। ১৫১৭ সালে অটোমান বিজয়ী সুলতান প্রথম সেলিমকে আব্বাসীয় খলিফার শেষ উত্তরাধিকারী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন। এ থেকেই এ প্রথার সূচনাসহ মক্কা শরিফ সুলতানদের আহ্বান করে ইসলামের পবিত্র ভূমির অভিভাবক হওয়ার জন্য।

এর মাধ্যমে ওসমান হাউস পুরো মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করে। ইস্তাম্বুল খলিফাদের বাসগৃহ আর ইসলামের শহর হিসেবে স্বীকৃতি পায় অথবা "ইসলামবোল"। এ কারণে প্রতিটি অটোমান সুলতান, সুলতান ও খলিফার দ্বৈত রীতি অনুসরণ করত। মুসলিম শক্তিরাও এ অধিকারকে সাধারণভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই পর্যায়ে এসে সুলতান আবদুল হামিদ ওসমান হাউসের ক্ষমতা ও সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য খলিফাসুলভ হাতিয়ার ব্যবহার করে মুসলিম বিশ্ব ও এশিয়াতে অগ্রযাত্রা করতে মনস্থির করেন। কিন্তু এ সময় নির্বাচনটি ভুল ছিল। কেননা সুলতান মিশরকেই পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন; যেটি কিনা খলিফা হিসেবে সুলতানের ক্ষমতার উৎস ছিল।

আবদুল হামিদের নীতি পরিবর্তন মুসলিম বিশ্বে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। পশ্চিমা ও রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম ভূখণ্ডে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে

চলেছে; উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া ও ভারত পর্যন্ত। এ অঞ্চলের ভুক্তভোগীদের জন্য তুরস্ক হয়ে দাঁড়ায় আশ্রয়স্থল। কেননা তারা দেখতে থাকে এ সাম্রাজ্য এখনো টিকে আছে। আর্নল্ড টয়েনবির ভাষায়, "বর্তমানের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী, দক্ষ ও আলোকিত মুসলিম রাষ্ট্র।" রাষ্ট্র ও ধর্মের মাঝের প্রাচীন বিভক্তির প্রশ্ন নিয়ে তানজিমাত সংস্কারকদের ব্যর্থতাকে আবদুল হামিদ একনায়ক ক্ষমতার বলে ধুয়ে-মুছে ফেলে দেন। আধুনিক কারিগরি-বিজ্ঞানের সাথে এ ক্ষমতাকেও সুলতান আরোপ করেন। এক ধরনের "সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্রের" আকারে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকাংশ প্রজাই ভাবতে থাকে যে সুলতান একটি শক্তিশালী ও ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক শাসন কায়েম করেছেন। বিদেশি প্রভাব ও হস্তক্ষেপ মুক্ত শাসনামলকে তারা নিজেদের বলে ভাবতে ও শ্রদ্ধা করতে থাকে। সুলতান খলিফার মাঝে প্রজাগণ মুসলিমসুলভ কঠোরতা, মিতাচারিতা ও ধর্মীয়ভাব প্রভৃতি গুণাবলি খুঁজে পায়। সুলতানকে শ্রদ্ধা করতে পেরে তারা গর্বিত হয়ে ওঠে। অন্যান্যদের দৃষ্টিতে, সুলতান নিজের মন্ত্রীদের শ্রদ্ধাই শুধু লাভ করেননি; বরঞ্চ উলেমাদের সমর্থনও পেয়েছিলেন। কিছু "ধর্মীয় মানুষ"ও সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদেরকে মানুষ শ্রদ্ধা করত; বিদ্বান ও মনীষী, দরবেশ সন্ন্যাসী প্রভৃতি শ্রেণীর জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল সুলতানের ভূখণ্ডজুড়ে।

নিজের রাজধানীতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে সুলতান পশ্চিমের দুনিয়া থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সুলতানের সেন্সর আরোপিত প্রকাশনা যাবতীয় পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান, কার্যাবলি আর বিপথে পরিচালনাকারী মতাদর্শসমূহ এড়িয়ে চলত। তাঁর বুদ্ধিজীবি সমাজ মধ্যযুগীয় ইসলামিক অতীতের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করত। তরুণ অটোমানরা স্বীকার করে নেয় যে ইসলামের প্রতিষ্ঠানসমূহে সংস্কার ও আধুনিকতা প্রবর্তনের চিন্তা তারা পশ্চিম থেকে আয়ত্ত করেছে। আবদুল হামিদ এ ধরনের কোনো কিছু স্বীকার করে নেননি। হামিদিয়ান ধারা ছিল যে, ইউরোপীয় সভ্যতার উৎসই হচ্ছে আরব সভ্যতা। ইউরোপীয় সভ্যতা ইসলাম থেকে শুধু সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নয় আরবীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানও নিয়ে নিয়েছে—বীজগণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যাসহ আধুনিক আবিষ্কার যেমন কম্পাস ও গানপাউডার, সাহিত্য ও ইতিহাস; এমন সব কিছুই যা পশ্চিমে কদর করা হয়। ইউরোপ থেকে মুসলিমদের তাহলে কী প্রয়োজন? নিজেদের অল্প সংখ্যক আবিষ্কার ব্যতীত ইউরোপীয়রা শুধু উন্নতি করার চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। একটি পুস্তকে এই তত্ত্বই পুনরায় বলা হয়, "সাম্প্রতিক সভ্যতার ভিত্তি মোহাম্মদের ঐতিহ্য আর কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

এ বার্তা পুরো মুসলিম বিশ্বে আবেদন সৃষ্টি করে—এ বার্তাই পরবর্তীতে প্যান-ইসলামিজমে পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে অটোমান সাম্রাজ্য অক্ষত এশীয় ভূখণ্ড নিয়ে হয়ে দাঁড়ায় মুসলমানদের নেতৃত্ব, উৎসাহ ও ভরসার কেন্দ্র। রাজত্বের শুরু থেকেই আবদুল হামিদ নিজের ও তাঁর সাম্রাজ্যের জন্য এমন একটি ভূমিকা আশা করে আসছেন। এখন এই আনাতোলীয় ভূমিতে ফিরে গিয়ে যেখান থেকে তুর্কিরা প্রথম ইউরোপে পা রেখেছিল—সুলতান অধ্যবসায়ী হয়ে উঠেন। সাম্রাজ্যের কাছে এবং দূরে সকল ইসলামি সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন।

প্রথাগতভাবে কোনো তুর্কি বা নিজের প্রত্যক্ষ প্রজা নয়; বরঞ্চ প্রধান উজির হিসেবে সার্কাশান দেশনেতা জেনারেল খয়ের এদ-দিনকে নিয়োগ দেওয়ার পরে সুলতান নিজের ইসলামি নীতির প্রকাশ করেন। তিউনিসের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে কিনা সফলতা অর্জন করেছিল। সাহসের সাথে ফরমান জারি করে সুলতান ঘোষণা করেন ইসলামের সকল সুন্নি মুসলিমের প্রতি নিজের খলিফা সম্পর্কীয় দায়িত্ব। নিজের দরবার ও প্রশাসনে খ্রিস্টানদের পরিবর্তে মুসলিম নিয়োগ করে নয়, বরঞ্চ তুর্কি ব্যতীত অন্যান্য জাতিকে নিয়োগ করে সুলতান অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। বিশেষ করে আরবীয় শেখদের সুলতান সম্মান জানিয়েছেন রাজকীয় সেরাগলিওতে কোয়ার্টার প্রদান করে। মুসলিমদের বিশ্বস্ততা আদায়ের জন্য অধিক হারে দেশের মাঝে আরবীয়, কুর্দি, আলবেনীয় ও অন্যান্য মুসলিমদের সমস্যা নিয়ে সুলতান জড়িয়ে পড়েন। একই ভাবে বিদেশে মুসলিম জনগণের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করেন সুলতান। ইউরোপের প্রাক্তন অসুস্থ ব্যক্তি নিজের ইসলামিক সীমান্তে ফিরে এসেছেন; এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার জন্য। কিন্তু এহেন কার্যাবলিতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ইউরোপ ও পশ্চিমা সভ্য জগৎ। কেননা সীমান্তের মাঝে এখনো খ্রিস্টান জনগণ রয়ে গেছে যাদের সুলতান অবিশ্বাস করতেন ও নিজের লক্ষ্য পূরণে পথের কাঁটা ভাবতেন—আর্মেনীয় জনগণ।

আর্মেনীয়া, ভৌগোলিকভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে অবস্থিত হয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে নিজের জাতীয় স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিল। এখন এর জনগণ তুরস্ক, রাশিয়া ও পারস্যের মাঝে বণ্টিত হয়ে গেছে; নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কোনো আর্মেনীয়া রাষ্ট্র টিকে নেই। অটোমান সাম্রাজ্যে আর্মেনীয় জনগণের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন। অটোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকের ছয়টি প্রদেশে দেড় মিলিয়ন আর্মেনীয় জনগণের জমি ছিল। কিন্তু কোনো প্রদেশেই আর্মেনীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠসুলভ কোনো সুবিধা পায়নি। তাদের নিজেদের জমিতেই মুসলিমদের মাঝে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে বাস করত আর্মেনীয় জনগণ। আর্মেনীয়রা যোদ্ধা জাতি ছিল না। যেমনটা ছিল বলকানের নিপীড়িত

খ্রিস্টানরা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত আর্মেনীয় কৃষক সমাজ রাজনৈতিকভাবে শান্ত ছিল। প্রশান্ত ভাব ও মিতব্যয়ীতার জন্য শহরে তাদের ব্যবসায়ী ভ্রাতা সম্প্রদায়ের মতোই খ্যাতি লাভ করেছিল।

এতদসত্ত্বেও আর্য জাতি হিসেবে নিজস্ব ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ত আর্মেনীয় জনগণের নিজ জাতি নিয়ে গর্ববোধ ছিল প্রখর। নিজেদেরকে তারা ইউরোপীয় বলে মনে করত আর সময়ের সাথে সাথে পশ্চিমা শিক্ষ ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকৃতও হয়েছিল। শুধু ক্যাথলিক ইউরোপে নয়, পূর্বে অ্যামেরিকান প্রোটোস্টান্ট মিশনারীদের মাধ্যমে এ শিক্ষা লাভ করে আর্মেনীয় জনগণ। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বার্লিনের কংগ্রেসে নিজেদের প্রতিনিধিও প্রেরণ করে তারা। একজন খ্রিস্টান গভর্নর জেনারেল নিয়োগের আবেদন জানায় আর্মেনীয় প্রতিনিধিদল; যার মাধ্যমে পূর্ব প্রদেশসমূহে তাদের স্বার্থ রক্ষা পাবে— যেমনটা আছে লেবাননে ১৮৬১ সালে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা লাভের পর থেকে। এই অনুরোধের কোনো উত্তর না পাওয়া গেলেও ইউরোপীয় শক্তিবর্গ স্থানীয়ভাবে আর্মেনীয়দের উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। এছাড়া সার্কাশশান ও কুর্দিদের হাত থেকে নিরাপত্তারও প্রয়োজন ছিল তাদের। ফলে বার্লিন চুক্তির শর্তানুযায়ী পোর্তে বাধ্য হয় এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শক্তিবর্গকে এ ব্যাপারে প্রতিবেদন পেশ করতে।

কিন্তু এ ধরনের কোনো প্রতিজ্ঞা পালন করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না সুলতান আবদুল হামিদের। একমাত্র দায়িত্ব যেটি সুলতান পালন করেছিলেন তা হলো প্রতিটি আর্মেনীয় প্রদেশে একজন করে খ্রিস্টান উপ-গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু কার্যত এ ব্যক্তি সুলতানের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই ছিল না—সুলতানের আদেশ মান্য করত; নিজের প্রস্তাব মতো কোনো পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা হতো তাকে। ফলে মর্মান্তিকভাবে এ গভর্নর ইভেত ইফেন্দি বা "মি. ইয়েস" নামে পরিচিতি পায়। এটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে বার্লিন চুক্তি মোতাবেক কোনো সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের কোনো ইচ্ছে নেই সুলতানের। বিশেষত সেসব রাষ্ট্রদূতের চাপ প্রয়োগে যারা কিনা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে চায় ও আর্মেনীয়দের অধিকতর উন্নতি করতে চায়। এটি এক ধরনের কুখ্যাতি হয়ে দাঁড়ায় যে যখনই কোনো রাষ্ট্রদূতের কোনো প্রতিনিধি আর্মেনীয়দের সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য বরখাস্ত হতো; সুলতান তাকে অধিকতর উচ্চ ও আকর্ষণীয় পদে নিয়োগ দান করত।

সাইপ্রাস কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার পূর্ব প্রদেশসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এসব প্রতিবেদনে সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় যে তুর্কি

বিচারালয়ে আর্মেনীয়রা অনেক অবিচার সহ্য করছে। এছাড়াও দুর্নীতিগ্রস্ত তুর্কি ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কর আদায়ের ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য করছে আর্মেনীয়দের সাথে। এর ওপরে আবার এসব জেলাতে তুর্কি কর্তৃপক্ষ ততটা শক্তিশালীও নয়। ফলে আর্মেনীয়রা শক্তিশালী কুর্দি গোত্রপ্রধান ও অন্যান্য গোত্রদের হাতে নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করছে। কুর্দিদের নিরস্ত্র করতে তাই পুলিশ বাহিনীর পুনর্গঠনের দাবি জানায় ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের প্রতিবাদকে অনাবশ্যক বাগবাহুল্য হিসেবে তুলে ধরে পোর্তে। ভান করা হয় যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কুর্দিস্তানে যোগ্য অফিসারদের পাঠিয়ে, "সুলতানের বিশ্বস্ত প্রজাদের" নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এতে আরো সংযুক্ত করা হয় যে, "যে ধরনের সামান্য অপরাধই—যা পৃথিবীর সব দেশেই হয়ে থাকে—আর্মেনীয়াতে ঘটুক না কেন, কিছু অতিরিক্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি একে নিজেদের ওপর নিয়ে নেয়। সত্যিকার অপরাধের পাশাপাশি কল্পিত অপরাধ আবিষ্কার করে ইউরোপের দৃষ্টিতে তুলে ধরে আর কনসালের সামনেও প্রদর্শন করে যেন সত্যিই এ রকমটাই হয়েছিল।"

এ ধরনের উসকানিমূলক প্রতিক্রিয়ায় ১৮৮০ সালে চুক্তিধারী ছয়টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত যৌথভাবে একটি নোট প্রেরণ করে। যেখানে সমালোচনা করার পাশাপাশি "আর্মেনীয়দের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য" নির্দিষ্ট সংস্কার পদক্ষেপের জন্য দাবি জানানো হয়। সুলতান আবদুল হামিদ বিদেশিদের প্রতি বিতৃষ্ণাবশত যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়বরণ করছেন ও প্রতিশোধের জন্য কনফারেন্স টেবিলে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে নিজস্ব সীমান্তের মাঝে খ্রিস্টান প্রজাদের জন্য বিদেশি সমর্থন বরদাস্ত করবেন না। লর্ড স্যালিসব্যুরি নিজেদের নিশ্চয়তা পূরণে ব্যর্থ হওয়াকে স্বীকৃতি দিতে শক্তিবর্গ-কে চাপ প্রয়োগ করে অনুতাপ করে বলে ওঠে যে, "টরাস পর্বতমালায় আবার রণতরী নিয়ে যেতে পারতাম!" গ্লাডস্টোন ক্ষমতায় ফিরে এসে প্রথমেই নিজের সামরিক উপদেষ্টাদের পদমর্যাদা হ্রাস করে পরে উভয়কে চাকরিচ্যুত করে। একটি প্রতিবেদনে তুর্কিদের গৃহীত পদক্ষেপকে বর্ণনা করা হয় "পুরোপুরি মিথ্যা" হিসেবে; কেননা তাদের স্থানীয় অফিসারদের অনেকেই পড়তেও জানত না, লিখতেও পারত না।

১৮৮২ সালে শক্তিবর্গ আরো একবার প্রচেষ্টা চালায় আরো একটি সংস্কার পরিকল্পনায় স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। কিন্তু এ সময় নিজেদের মাঝে থেকেই বিরোধিতার সূত্রপাত ঘটে। বিসমার্ক ব্রিটেনের সাথে যে কোনো সহযোগিতা করতে রাজি হয়; কেবল আর্মেনীয়দের সংস্কারের জন্য চাপ প্রয়োগ ব্যতীত। এই প্রত্যাখ্যানে গ্লাডস্টোন নিশ্চুপ হয়ে যায়। এর পরিবর্তে আর্মেনীয়রা চেষ্টা করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করতে। তুর্কিদের কাছে পরিষ্কার তুরে ধরে যে

রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন হয়, ব্যক্তিগত নিরাপত্তাই তাদের কাম্য। তারা ঘোষণা করে যে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার তাদের কোনো ইচ্ছে ছিল না। রাশিয়াও এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দেয়নি। কিন্তু পরবর্তী দশক ধরে নিজেদের মুসলিম প্রতিবেশী ও সুলতানের সরকারের হাতে পড়ে আর্মেনীয়দের অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে।

পরিষ্কারভাবেই এখন সময় এসে গেছে তুরস্কে নিজেদের জন্য রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার। স্থানীয়ভাবে জাতীয়তাবাদী দল ও গোপন সোসাইটি গড়ে তুলতে শুরু করে আর্মেনীয়রা। রাশিয়াতে সহ-আর্মেনীয়দের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করতে থাকে এ ব্যাপারে। বিশেষ করে ককেশাস অঞ্চলের, যেখানকার বিপ্লবের ধারণা ছিল সমাজতন্ত্র ও বিপ্লব; নিজেদের ক্ষেত্রেও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল তারা। শীঘ্রিই এরা আরজুয়াম ও ভান সীমান্তে ছড়িয়ে পড়ে তুর্কি আর্মেনীয়দের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে নিজেদের "বাসভূমি" প্রতিরক্ষার জন্য।

১৮৮১ সালে "পিতৃভূমির রক্ষক" নামে সংস্থা গড়ে ওঠে আরজুয়ামে। এর লক্ষ্য ছিল কুর্দি ও তুর্কিদের হাত থেকে আর্মেনীয় জনগণকে রক্ষা করা। বিপ্লবের মন্ত্র ছিল "স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু!" ১৮৮৫ সালে ভানে প্রথম আর্মেনীয়ার রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। এদের ধ্যান-ধারণা বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে লন্ডনে গড়ে ওঠে "আর্মেনিয়ান প্যাট্রিয়টিক সোসাইটি অব ইউরোপ।" তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল" আর্মেনীয়দের জন্য বিপ্লবের মাধ্যমে নিজেদের ওপর শাসন করার অধিকার আদায় করা।" কিন্তু শান্তভাবে বৃহৎ শক্তিবর্গের ওপর তাকিয়ে ছিল এ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য। ১৮৮৭ সালে জেনেভাতে আর্মেনীয় অভিবাসীরা মার্কসীয় লাইনে আরো নিষ্ঠুর সংগঠন গড়ে তোলে। অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল হিসেবে এর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কি ভূখণ্ড কর্তন করার মাধ্যমে একত্রিত আর্মেনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এর মাউথপিস হয় বিদেশে প্রচারিত "হানচাক" বা "ঘণ্টা" নামধারী একটি জার্নাল। এর মাধ্যমেই দলের নামকরণ হয়—হানচাক।

হানচাক একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীসহ সুদূর আমেরিকাতে'ও তাদের গোয়েন্দা ছিল। কিন্তু ককেশাসে এর চর্চা ছিল বেশি। কিছু বিদ্রোহী দল সক্রিয় হয়ে অটোমান ভূখণ্ডে লুণ্ঠন চালিয়ে অটোমান কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল করত। আরজুরাম "তুর্কি আর্মেনীয়ার রাজধানী"- তে শুধু নয় আরো পশ্চিমে ইস্তাম্বুলসহ তুরস্কের অন্যান্য শহরেও এটি ছড়িয়ে পড়ে। এরই ফললো ১৮৯০ সালে টিফলিসে আর্মেনীয়ান রেভল্যুশনারী ফেডারেশন" গড়ে ওঠে। যার শিষ্যরা দাশনাকস্ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রথমে বেশ কিছু র‍্যাডিকাল দলের সমষ্টি ছিল এটি। কিন্তু

পরবর্তীতে দাশনাকেরা তাত্ত্বিকভাবে জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে। ফলে সমাজতান্ত্রিক হানচাকদের থেকে আলাদা হয়ে যায়; কিন্তু সাধারণভাবে আর্মেনীয় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামই ছিল সকলের লক্ষ্য। আরো একটু তারা ঘোষণা করে বলে, "আর্মেনীয়রা আর অনুনয় করবে না। অস্ত্র হাতে দাবি জানাবে।" বিদেশি শক্তির সাহায্যের আশায় না থেকে; কার্যত আদৌ যার কোনো আশা ছিল না, নিজের জাতির ভাগ্য তুলে নেয় নিজের হাতে।

আর্মেনীয় প্রজাদের বিরুদ্ধাচারণের সম্মত জবাব দেওয়ার জন্য সুলতান আবদুল হামিদ মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মাঝের বিভেদকে কাজে লাগানোর শর্তে পরিকল্পনা করেন। স্বেচ্ছায় বিভক্তি তৈরির হাতিয়ার হিসেবে কুর্দিদের ব্যবহার করার জন্য ১৮৯১ সালে কুর্দি গোত্র থেকে অনিয়মিত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। আর্মেনীয়দের ওপর আক্রমণ করার ক্ষমতা ছিল তাদের। হামিদিয়ে নামধারী, "সুলতানের জনগণ" একটি অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলে। ১৮৯২ সালের শেষ নাগাদ এদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় পনেরো হাজার আর প্রতিবছর এ সংখ্যা বাড়তেই থাকে। জাঁকালো উর্দিধারী এসব বন্য, মানুষ ইস্তাম্বুলের খ্রিস্টান কোয়ার্টারে গর্বিত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আর্মেনীয়াতে, আর্মেনীয়দের দমন করাকে নিজেদের দাপ্তরিক দায়িত্ব ঘোষণা করে ভীতির সঞ্চার করে এ বাহিনী। খ্রিস্টান জনগণের বিরুদ্ধে যেকোনো নিপীড়নের ঘটনায় আইনি সহায়তা পাওয়ার নিশ্চয়তাও ছিল তাদের।

১৮৯৩ সালের দিকে আর্মেনীয় বিপ্লবীরা তুচ্ছ লুণ্ঠন কার্য বাদ দিয়ে মুসলিম বিদ্রোহের সূচনা করে। কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম আনাতোলিয়ায় শহরের দেয়ালে দেয়ালে রাজদ্রোহমূলক প্ল্যাকার্ড লিখে সুলতানের দমন নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সকল মুসলিমকে আহ্বান জানায়। কিন্তু কার্যত এতে আনাতোলিয়াজুড়ে বিপুলসংখ্যক আর্মেনীয়কেই শুধু বন্দি করা হয়। আর্মেনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা ছিল। কিন্তু এ রকম বিশৃঙ্খলায় ১৮৯৪ সালে সুলতানের নির্দেশে ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়।

মুশ-এর দক্ষিণে সামুন অঞ্চলে কুর্দি গোত্রপ্রধানেরা নিরাপত্তার বিনিময়ে আর্মেনীয় জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে থাকে। ফলে একটি সংস্থায় পরিণত হয় এরা। এর ওপরে আবার তুর্কি কর্তৃপক্ষ সরকারের কর দাবি করতে থাকে—ঘটনার পাকেচক্রে কিছু বছর ধরে যা বন্ধ ছিল। আর্মেনীয়রা এ ধরনের দ্বৈত কর প্রদানে প্রত্যাখ্যান করলে তুর্কি সেনাবাহিনী কুর্দি গোত্রপ্রধানদের সাথে একত্রিত হয়ে দল গড়ে তোলে। আর শীঘ্রই নির্বিচারে নিধন শুরু করে আর্মেনীয়দের। পুরো অঞ্চলের দৈর্ঘ্য-প্রস্থজুড়ে আর্মেনীয়দের বন্যপশুর" মতে উপত্যকা আর পর্বতজুড়ে শিকার করে তাদের। কোনো আত্মসমর্পণকে আমল না দিয়ে বেয়নেট দিয়ে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আঘাত

করতে থাকে। নারীদের সম্ভ্রমহানি করে পাথরের সাথে পিষে মারে শিশুদের। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয় তুর্কি সৈন্যরা। এই অভিযানের জন্য তুর্কি কমান্ডার জেকী পাশা, সুলতানের কাছ থেকে বিশেষ সম্মান লাভ করে।

এহেন প্রথম আর্মেনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে। পোর্তে এ ঘটনাকে সামান্য বলে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইউরোপজুড়ে এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামীরা প্রতিবাদ গড়ে তোলে। তিন বৃহৎ শক্তি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া—অনুসন্ধানের জন্য কমিটি গঠনে চাপ দেয়। এ লক্ষ্যে সুলতান ১৮৯৫ সালে "আর্মেনীয় দস্যুদের অপরাধ নিয়ে অনুসন্ধানের" জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। সুলতান আশা করেন এর মাধ্যমে অগ্রগামী তদন্ত বন্ধ হয়ে পোর্তের নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপিত হবে। বিচারের নামে এই প্রহসনে লন্ডন ও প্যারিসে জনমতের চাপে, শক্তিবর্গ আর্মেনীয় সংস্কার কর্মসূচির পদক্ষেপ নেয়। সুলতান একে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কাগজতুল্য প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই ছিল না এটি।

অন্যদিকে হানচাকের নেতৃত্বে আর্মেনীয়রা ইস্তাম্বুলের রাস্তায় প্রতিবাদ সভা করে। পোর্তের কাছে নিজেদের প্রতিবাদ ও সংস্কারের দাবি জানিয়ে দেয়। কিন্তু ধৈর্যসুলভ এ প্রতিবাদ কর্মসূচি হঠাৎ করে অশান্ত হয়ে ওঠে; যখন সামুন থেকে আগত একজন "স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু!" বলে চিৎকার করে ওঠে। সমবেত জনতা একত্রে চিৎকার করে ওঠে একই সুরে, বিপ্লবী গান গেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলে পুলিশ বাহিনী এসে ঘটনাস্থলেই অনেককে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। এরই মাঝে আবার ধর্মান্ধ মুসলিমেরা রাস্তায় নেমে আর্মেনীয়দের ধাওয়া করতে থাকে আর নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। দশ দিনব্যাপী এ রকম জিঘাংসা আর ভীতিমূলক কার্যাবলি চলতে থাকায় হাজারো আর্মেনীয় জনগণ নিজেদের গির্জায় আশ্রয় নেয়।

একই সময়ে ত্রেবিজন্ডে বিদেশি নৌযানে হামলা করে মুসলিমরা। ক্যাপ্টেন অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখে সাঁতার কেটে মুসলিম মাঝিরা তার জাহাজে ওঠে সকলকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলে। শহরে প্রায় হাজার খানেক আর্মেনীয়কে হত্যা করা হয়। তাদের অনেকেই নিজ গৃহে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। পার্বত্যাঞ্চল থেকে ল্যাজ গোত্র এসে তুর্কি সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়ে পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী গুলিবর্ষণ করে চলে আর্মেনীয়দের কোয়ার্টারে। একইভাবে বাজারেও আর্মেনীয়দের দোকানপাট লুট করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

পূর্ব তুরস্কজুড়ে শুরু হয় শৃঙ্খলিত নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ। একই সময়ে সুলতান শক্তিবর্গের কাছ থেকে সংস্কার কর্মসূচি মেনে নেয়ার অভিনয় করেন।

অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে যে কোনো সামরিক অভিযানের মতো বিউগলের সুরে রুটিন মতো শুরু ও শেষ হতো এসব। বস্তুত তারা তাই ছিল। কেননা সুলতানের আর্মেনীয় প্রজাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াদের ওপর কোনো পুলিশি তৎপরতা দেখা যায়নি। এর পরিবর্তে বরঞ্চ সুলতানের নির্দেশেই আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে হিসাব কষে এগোতে শুরু করে তুর্কি কর্তৃপক্ষ। পূর্ব দিকের ছয়টি আর্মেনীয় প্রদেশে একযোগে কাজ শুরু করে সুলতানের সামরিক বাহিনী।

তাদের কৌশল ছিল সুলতানের নীতি অনুযায়ী মুসলিম জনগণের মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা। আবদুল হামিদ আর্মেনীয়াতে গোয়েন্দা পাঠিয়ে সুচারুরূপে দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দেন। এটি তাদের সাধারণ রুটিনে পরিণত নয় যে শহরের বড় মসজিদে মুসলিম জনগণের সমাবেশ করে সুলতানের নামে আর্মেনীয় জনগণকে ইসলামের ওপর আঘাতকারী বিদ্রোহী হিসেবে তুলে ধরা। এছাড়াও ঘোষণা করা হয় যে তাদের সুলতান; অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সাথে আছেন। পবিত্র আইনানুযায়ী বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বিশ্বাসীরা লুট করতে পারবে। তুর্কি সৈন্যরা মুসলিমদেরকে উৎসাহিত করে তোলে খ্রিস্টান প্রতিবেশীদের সম্পত্তি হস্তগত করে নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলতে। আর যে কোনো প্রতিরোধের মুখে নিজেদের বিশ্বাসের নামে খ্রিস্টানদের হত্যা করার অধিকারও লাভ করে তারা। আর্মেনীয়াজুড়ে, "ভেড়াদের ওপর নেকড়ের দলের আক্রমণ" বেড়ে যায়।

অন্যদিকে আবদুল হামিদ মুসলিম নীতিকে আরো দূষিত করে বেয়নেটের মুখে শত্রুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার সুযোগ দেয়। জীবন ও মৃত্যুর মাঝে এ ধরনের ছেলেখেলা পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের চাপের মুখে আবদুল মজিদে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিরোধের শক্ত চেতনা ধারণা না করায় গ্রামের আর্মেনীয় পরিবারসমূহ বিকল্প হিসেবে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এ পদ্ধতি মেনে নেয়া শুরু করে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের স্বাধীন পরিচয় ত্যাগ করে তারা।

এ সমস্ত অভিযান পরিচালনার ভার ছিল সুলতানের অসৎ উপদেষ্টা, শাকির পাশার হাতে। একদা সেন্ট পিটারসবুর্গে সুলতানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছিল এই শাকির পাশা। সুলতানের অভিনীত সংস্কার পরিকল্পনার সাথে একত্রিত ভাবে শাকির পাশার দায়িত্ব ছিল "এশিয়াটিক তুরস্কের নির্দিষ্ট অঞ্চলে ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করা। এই পরিচয়ের ছদ্মবেশে তার আসল দায়িত্ব ছিল প্রতিটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আর্মেনীয় বা নিজেদের হীন অবস্থার প্রতি সচেতন হয়ে উঠছে; এই সচেতনতাকে আমূল ধ্বংস করা ও আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মাধ্যমে তাদের জমিতে মুসলিম তুর্কিদের বসতি বৃদ্ধি করা।

বিউগল বেজে ওঠার মাধ্যমে শুরু ও শেষ হওয়া প্রতিটি অভিযানের পদ্ধতি একই ছিল। প্রথমে একটি শহরে তুর্কি বাহিনীর আগমন ঘটে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালানোর উদ্দেশ্যে। এরপর কুর্দি অনিয়মিত বাহিনী ও গোত্রীয় জনগণ এসে লুটতরাজ চালাতে থাকে; অবশেষে আগুনের মাধ্যমে সামগ্রিক হত্যাকাণ্ড ঘটতে থাকে; পলায়নরত আর্মেনীয়দের পার্শ্ববর্তী প্রদেশের গ্রাম ও ভূখণ্ডে খুঁজে বের করে নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। এভাবে ১৮৯৫ সালের শীতকালজুড়ে পূর্ব তুরস্কের প্রায় বিশটি নির্দিষ্ট জেলা জুড়ে আর্মেনীয় জনগণ হত্যা ও তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। প্রায়ই শুক্রবারকে বেছে নেয়া হতো এসব অভিযানের জন্য। নামাজের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া মুসলমানদের জানানো হতো যে আর্মেনীয়রা তাদেরকে নির্বিচারে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। এর বিপরীতে আর্মেনীয়দেরকেই কচুকাটা করা হতো। ভুক্তভোগীদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ থেকে শত হাজারের মাঝামাঝি। কেননা ক্ষত, রোগ আর উপবাসী হয়েও অনেকে মৃত্যুবরণ করে।

তেরোটি বৃহৎ শহরের প্রতিটিতে মৃতদের সংখ্যা চার ফিগারের। আরজুরামে একটি বাজারে মুসলিমরা প্রায় এক হাজার দোকান লুট করে আর পরদিন প্রায় তিনশত খ্রিস্টানকে একত্রে একটি গণকবরে সমাহিত করা হয়।

উর্ফাতে ঘটে সবচেয়ে জঘণ্য আর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। এখানে মোট জনসংখ্যার তিন ভাগ ছিল আর্মেনীয় খ্রিস্টান। ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, দুই মাস ধরে নিজেদের কোয়ার্টারে অবরুদ্ধ থাকার পর নেতৃস্থানীয় আর্মেনীয়রা ক্যাথেড্রালে জড়ো হয়ে তুর্কি অফিশিয়াল নিরাপত্তার জন্য আবেদনপত্র প্রস্তুত করে। প্রতিজ্ঞা করার পর তুর্কি দায়িত্বরত অফিসার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ক্যাথেড্রাল ঘিরে ফেলে। এরপর তাদের বড় একটি অংশ উন্মত্তের মতো আর্মেনীয় কোয়ার্টারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এরপর বাড়িঘর তছনছ করে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমার ওপরে সকল পুরুষকে হত্যা করা হয়। এরপর তরুণ আর্মেনীয়ানদের বড় একটি অংশ একজন শেখের সামনে নিয়ে আসা হয়। তাদেরকে নিচে ফেলে হাত ও পা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে, এরপর কোরআনের আয়াত উচ্চারণ করতে করতে "মক্কার ভেড়া উৎসর্গের রীতি অনুযায়ী তাদের গলা কেটে ফেলা হয়।"

দিনের অভিযান শেষ করার বিউগল বেজে উঠলে প্রায় তিন হাজার শরণার্থী আশ্রয়ের আশায় ক্যাথেড্রালে ভিড় করে। কিন্তু পরদিন সকালে—একটি রবিবারে—ধর্ম উন্মাদ জনতা গির্জায় ঢুকে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়; পবিত্র অংশ ভেঙে ফেলে হত্যাকারীরা চিৎকার করতে থাকে" খ্রিস্টকে ডেকে পাঠাও, নিজেকে মোহাম্মদের চেয়ে বড় নবী প্রমাণ করতে বলো।"

এরপর মৃতদেহের স্তূপের ওপর খড়ের চাদর বিছিয়ে ত্রিশ ক্যান পেট্রোলিয়াম দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। গ্যালারির কাঠের কাজ করা অংশ শিশু ও নারীরা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, হতচকিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেয় আর আগুন লেগে শীঘ্রই ভস্মীভূত হয়ে যায়। নিয়ম অনুসারে দুপুর তিনটা ত্রিশে আবারো বিউগল বেজে ওঠে। আর মুসলিম অফিসাররা আর্মেনীয় কোয়ার্টারের কাছে জড়ো হয়ে ঘোষণা করে যে হত্যাযজ্ঞ শেষ হয়েছে। তারা ১২৬টি পরিবারকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে; একজন নারী বা শিশুও বেঁচে নেই। আর শহরে সম্পূর্ণ ধ্বংসযজ্ঞের সংখ্যা, ক্যাথেড্রালের মৃতদেহসহ দাঁড়ায় আট হাজার মৃত খ্রিস্টান আর্মেনীয়।

শুধু একটি স্থানে আর্মেনীয়রা নিজেরাই আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে। সিলিসিয়া প্রদেশের জৈতুন পর্বত। এখানে হানচাকসহ আর্মেনীয়দের বড় একটি বাহিনী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধে একটি তুর্কি বাহিনীকে পরাজিত করে জৈতুন দুর্গ থেকে তুর্কি বাহিনী হটিয়ে দেয়। চারশত তুর্কিকে বন্দি করে ইউনিফর্ম বদলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি তুর্কি গ্রামে লুটতরাজ করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এভাবে এ প্রদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আর্মেনীয়রা। এরপর একটি বৃহৎ তুর্কি বাহিনী জৈতুন পর্বতে অগ্রসর হয়। আর্মেনীয়রা দুর্গ ছেড়ে চলে যায়। আর এতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ইস্তাম্বুলে আর্মেনীয় সম্প্রদায় বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে মধ্যস্থতার আবেদন জানায়। আর কর্তৃপক্ষের সাথে ঐকমত্য গড়ে ওঠে যে ক্ষমা ঘোষণার স্বার্থে প্রতিটি জেলায় তুর্কি এবং আর্মেনীয় উভয় পক্ষই অস্ত্রসমর্পণ করবে।

১৮৯৬ সালের আগস্ট মাসে খোদ ইস্তাম্বুলে আর্মেনীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পূর্ব বছরের ন্যায় এবারো ঘটনার সূত্রপাতের জন্য একটি আর্মেনীয় বিপ্লবী দলকে দায়ী করে তুর্কি কর্তৃপক্ষ। দাশনাকদের ছোট্ট একটি দল মধ্যাহ্নভোজনের সময় অটোমান ব্যাংকে সাহস দেখিয়ে প্রবেশ করে অর্থ পরিবর্তনের অজুহাতে। এটি ছিল ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদের একটি প্রতিষ্ঠান। বাহকেরা তাদের সাথে বস্তা ভর্তি সোনা ও রুপার মুদ্রা বহন করার অভিনয় করে। এরপর একটি বাঁশি বেজে উঠলে পঁচিশ জন সশস্ত্র ব্যক্তি এসে জড়ো হয় তাদের অনুসরণ করে। বন্দুকের গুলি ছুড়ে প্রকাশ করে যে বস্তায় আসলে বোমা, গোলাবারুদ আর ডিনমাইট রাখা ছিল। নিজেকে ব্যাংক ডাকাত নয় বরঞ্চ আর্মেনীয় দেশপ্রেমিক ঘোষণা করে তাদের অভিযানের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে। দুটি দলিলে নিজেদের বর্ণনা করে। দুটি দলিলে নিজেদের দুঃখগাথা বর্ণনা করে ছয়জন ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতের সামনে পেশ করার জন্য নিয়ে এসেছিল তারা। রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি তুলে ধরে ঘোষণা করে যে

আটচল্লিশ ঘণ্টার মাঝে বিদেশি হস্তক্ষেপ না ঘটলে কোনো আত্মাহুতিতে ভয় না পেয়ে" ব্যাংক উড়িয়ে দেবে।

এরই মাঝে ব্যাংকের প্রধান পরিচালক স্যার এডগার ভিনসেন্ট স্কাইলাইট দিয়ে পালিয়ে পাশের দালানে চলে যায়। সহকর্মীদের শত্রু হাতে রেখে পোর্তের দিকে অগ্রসর হয় ভিনসেন্ট। এখানে এসে এডগার এ নিশ্চয়তা আদায় করে যে দাশনাকেরা থাকাকালীন ব্যাংকে কোনো পুলিশি আক্রমণ ঘটবে না। এভাবে তাদের জন্য আলোচনার অনুমতি আদায় করে নেয় ভিনসেন্ট। আলোচনাকারী হিসেবে রাশীয় দূতাবাসের প্রধান দোভাষীকে আনা হয়। পরবর্তী এ দোভাষী সুলতানের কাছ থেকে দাশনাকদের জন্য ক্ষমা ও দেশ ত্যাগের অনুমতি আদায় করে দেয়। অবশেষে আলোচনার নিশ্চয়তা দিয়ে তাদেরকে ব্যাংক থেকে বের করে নিয়ে যায় দোভাষী। অস্ত্র হাতে নিয়ে বোমা রেখে দাশনাকেরা নিঃশব্দে স্যার ভিনসেন্টের ইয়টে্ ওঠে যায়। পরবর্তীতে ফ্রান্সে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাদের।

তরুণ আদর্শবাদী হিসেবে রাজনীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ দাশনাকেরা স্বদেশিদের উপকার না করে বরঞ্চ শত্রুদের সুবিধা আদায় করে দেয়। এরপর দুই দিন ধরে রাজপথ ভেসে যায় রক্তস্রোতে। বিশৃঙ্খল দুর্বত্ত, ধর্ম উন্মাদ আর জঘন্য অনিয়মিত বাহিনী রাজধানীর আর্মেনীয়দের কোয়ার্টারে হামলা করে হত্যা প্রদর্শনী শুরু করে। পুলিশ অথবা সৈন্যবাহিনী এক্ষেত্রে বাধা তো দেয়নি, বস্তুত সাহায্য ও সমর্থন করেছে। নিজেদের পথের মাঝে পড়েছে এমন সব আর্মেনীয়দের হত্যা করে তারা। তারপর ছুড়ে ফেলে দেয়, চারপাশে পড়ে থাকে প্রায় ছয় হাজার মৃতদেহ। নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় দিনে ছয় শক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা পোর্তের কাছে প্রতিবাদ জানায়। প্রথমে এ ব্যাপারে কোনো আমল দেয়া হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা খবর আসে যে নিজেদের জনগণের সুরক্ষার জন্য ব্রিটিশরা মেরিন নামিয়েছে। ফলে হত্যাকার্য বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অবশেষে রাষ্ট্রদূতেরা নিজেদের গৃহের দরজায় চোখের সামনে দেখতে পায় আর্মেনীয়দের ওপর কী অত্যাচার চলেছে এতদিন। যা দ্বিমুখী সুলতান নিজের দাপ্তরিক মদদ প্রদানের মাধ্যমে সংঘটিত করার পাশাপাশি পৃথিবীর কাছ থেকে লুকিয়েও রেখেছে। ছয় শক্তিবর্গের প্রতিনিধি একত্রিত হয়ে সুলতানের কাছে একটি খোলা বার্তা প্রেরণ করে। জনসমক্ষে এই হত্যাকাণ্ডের অবসান দাবি করা হয়। এছাড়াও হুমকি দেয়া হয় যে, "এটি নিয়মিত হলে রাজবংশ আর সিংহাসন বিপদে পতিত হবে।"

এ ঘটনার সমাপ্তি শেষে প্রতিনিধিবর্গ পোর্তের কাছে যৌথ নোটের প্রথমটি প্রেরণ করে। যথাযোগ্য প্রমাণ সরবরাহ করার মাধ্যমে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে বস্তুত "ইস্তাম্বুলে ব্যাঘাত" কোনো ধর্ম উন্মাদের স্বতঃস্ফূর্ত সংঘর্ষ নয়' বরঞ্চ

একটি বিশেষ বাহিনীর কর্ম এটি। "কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির নিচে এবং তারেই গোয়েন্দারের সহযোগিতায়" এসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এই "ভয়াবহ অস্ত্র, যেটি যে কোনো সময় কোনো বিদেশি কলোনিতেও ঘটতে পারে অথবা "যারা এর সৃষ্টি করেছে তাদের দিকেও মোড় নিতে পারে।" শক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা তাই পোর্তের কাছে দাবি জানায় যে, "এই সংস্কার উৎপত্তি অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রধান অভিনেতা ও প্ররোচনাকারীকে খুঁজে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করতে হবে।" এছাড়াও এ ধরনের অনুসন্ধানের জন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা সংগ্রহ করার প্রস্তাব দেয় প্রতিনিধিবর্গ। কূটনৈতিক ভাষায় প্রতিনিধিবর্গ জানিয়ে দেয় যে, আবদুল হামিদ স্বয়ং এর রচয়িতা অথবা অন্ততপক্ষে ইস্তাম্বুলের হত্যাযজ্ঞের প্ররোচনাকারী। এ নোটের ছলপূর্ণ প্রতিউত্তর জানিয়ে দেখানো হয় যে আর্মেনীয়রা মুসলিমদের ওপর আঘাত করেছে আর প্রতিজ্ঞা করা হয় যে উভয় পক্ষকে বিশেষ বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। শক্তিবর্গকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সুলতানের আজ্ঞা পালনকারী জনসংখ্যার তলানি থেকে কয়েকজনকে আটক করা হয়।

ইতিমধ্যে ব্রিটেনে স্বাধীনতা মতবাদীরা সুলতানের সিংহাসনচ্যুতির জন্য চিৎকার করতে থাকে। মি. গ্লাডস্টোন, ছিয়াশি বছর বয়সে অবসর ভুলে লিভারপুলে "কথা বলার অযোগ্য তুর্কিদের" বিরুদ্ধে শেষতম বক্তৃতা করার প্রয়াস নেয়। তুর্কিদের সাম্রাজ্য "মানচিত্র থেকে মুছে যাওয়া উচিত।" "সভ্যতার প্রতি অপমান" আর "মানবজাতির প্রতি অভিশাপ" এ সাম্রাজ্য। গ্লাডস্টোন সুলতানকে, "আবদুল, মহান গুপ্তঘাতক, হিসেবে ঘোষণা করে। ফরাসিরা শাস্তি দেওয়ার জন্য ঘোষণা করে। "লাল সুলতান" গ্লাডস্টোন, সাইপ্রাস কনভেনশন অনুযায়ী ব্রিটেনের দায়িত্ব পালনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। প্রয়োজনে একাকী হলেও ব্রিটেনের উচিত পোর্তের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা বলে মত প্রকাশ করে গ্লাডস্টোন। প্রথম দিকে দার্দেনালেসে ব্রিটিশ রণতরী পাঠাবার কথা হলেও শীঘ্রই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো বৃহৎ শক্তিই আর্মেনীয়াদের হয়ে শক্তি প্রয়োগে রাজি নয়। লর্ড স্যালিসব্যুরি কেবল আবদুল হামিদকে "বিশৃঙ্খল দেশের চরম ভাগ্য" হিসেবে মৃদু তিরস্কার জানায়।

যদিও স্যালিসব্যুরি সুলতানের অপসারণের জন্য রাশিয়ার সমর্থন আদায় করেছিল, প্রণালিসম্পর্কিত কোনো ছাড় দিতে চায়নি। অন্যদিকে রাশিয়া ও এ ধারণা পরিত্যাগ করেনি যে স্বাধীন আর্মেনীয়া এশিয়া মাইনরে ইউরোপের নতুন বুলগেরিয়ার ভূমিকা পালন করবে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বলকান নিয়ে এতটাই জড়িত যে অভিযানের ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। ফ্রান্স, অটোমান সাম্রাজ্যে বিনিয়োগের কারণে সাম্যাবস্থার প্রতি আগ্রহ দেখায়। জার্মানি এশিয়া মাইনরে

সুবিধাপ্রাপ্তির আশায় সুলতানের নিরাপত্তারক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে অটোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তির পরিকল্পনা অথবা এর ভূখণ্ডের ওপর কিছু মাত্রায় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা তাই কোনো সুফল বয়ে আনে না। ১৮৯৭ সালের সর্বশেষ কনফারেন্সের ব্যর্থতা শেষে পোর্তের ওপর সর্বশেষ একটি সংস্কার কর্মসূচি চাপিয়ে দেয়া ঐকমত্য ছাড়া ভাগ্যহীন আর্মেনীয়দের জন্য আর কিছুই করা হয়নি।

আরো একবার ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মাঝে অনৈক্য ও সিদ্ধান্তহীনতার ফলে দোদুল্যমান অটোমান সাম্রাজ্য নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পায়। আবদুল হামিদ একগুয়ে হয়ে পশ্চিমের ওপর নেতিবাচক একটি বিজয় লাভ করেন। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় অমানবিক এ পদক্ষেপ সভ্য জগতের দৃষ্টিতে চিরস্থায়ী কলঙ্ক বয়ে আনে তাঁর জন্য।

॥ ৩৮ ॥

ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মাঝে মাত্র একটি মিত্র দরবারের মাঝে সুলতানের সমর্থন বজায় রাখে। জার্মানি। যদিও বিসমার্ক বিশ বছর পূর্ব থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের ওপর দৃষ্টি রেখেছে; তথাপি এখন পর্যন্ত তুরস্কের বিনিময়ে কোন জার্মান সম্প্রসারণ নকশা ইতিবাচক কোনো ফল প্রকাশ করেনি। এটি বরঞ্চ ব্রিটেনের রাজনৈতিক প্রভাবের অংশবিশেষ হরণ করার চেষ্টায় রত হয়। বিসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যের ভূমিকাকে ইউরোপের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুলে ধরে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সাম্রাজ্য ও বলকান রাষ্ট্রসমূহের মাঝে আধিপত্যবাদী মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয় জার্মানি। এখানে তার প্রধান স্বার্থ হলো রাশিয়ার সাথে ক্ষমতাবি ভারসাম্য বজায় রাখা। এখানে অটোমান সাম্রাজ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই।

কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম, ১৮৮৮ সালে রাজকীয় সিংহাসনে আরোহণ করায় আরো জাঁকজমকপূর্ণ এক স্বপ্ন লালন করা শুরু করে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মার্শাল ভন দার গলট্জ কাইজারকে উৎসাহ জোগায়। গত পাঁচ বছর ধরে মার্শাল ভন এক দল জার্মান অফিসার নিয়ে তুর্কি সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও আধুনিকায়নের কাজ করে আসছে। এক্ষেত্রে অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও জার্মানিতে তৈরি। কাইজার আরো ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা তৈরি করে। এশীয় তুরস্কে জার্মান প্রভাব ছড়িয়ে দেয়া হবে; কৌশলগত শুধু নয় অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কারিগরি ক্ষেত্রেও এ প্রভাব সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করে কাইজার। বিসমার্ককে বরখাস্ত করে কাইজার উচ্চাকাঙ্ক্ষী এ কর্মসূচি নিয়ে কার্যে অগ্রসর হয়। কেননা বিসর্মাক ইউরোপীয় সীমান্তের বাইরে এ ধরনের কোনো প্যান-জার্মানিক আন্দোলন

নিয়ে পরিতাপে রত হয়। যাই হোক কাইজারের মহাপরিকল্পনার প্রধান হাতিয়ার ছিল বাগদাদ রেলপথ। এ রেলপথ বার্লিনকে পারস্য উপসাগরের সাথে সংযুক্ত করবে। একই ভাবে এ সময় আবদুল হামিদ এই রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে কাইজারের সাথে তা খাপে খাপে মিলে যায়। আবদুল হামিদের মনোবাসনা ছিল এসকল রেলপথের সাথে রাস্তা ও টেলিগ্রাফ ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা গেলে একই সাথে তাঁর এশীয় ভূখণ্ডের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

রেলওয়ে নির্মাণকাজের প্রতিটি স্টেজে ডয়েশ ব্যাংক গ্রুপকে বিভিন্ন ছাড় প্রদান করে সুলতান। এর মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকজুড়ে অটোমান সাম্রাজ্যে আগমন ঘটে জার্মান বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের। এছাড়া বিসমার্কের বিরোধিতা সত্ত্বেও অভিষেকের পরের বছরেই কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সাথে ইস্তাম্বুলে সাক্ষাৎ করে। সুলতান কিছুদিন পূর্ব থেকেই নিজের রাজ খাজানার বন্ড জার্মানি ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা শুরু করেছেন—জার্মানি জাতির সবকিছুতেই প্রসণ্ণের হাসি হাসতে থাকেন। এবার তাদের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে পরিপূর্ণ রাজকীয় সম্ভাসনে আপ্যায়ন করেন। তাদের সম্মানে ইলজিজ্-এর ভেতরের ভূমিতেই পায় প্রাসাদ সমতূল্য শামিয়ানা প্রস্তুত করেন। প্যারিস থেকে আনা রত্নখচিত স্বর্ণ নির্মিত প্লেটে সুস্বাদু ইউরোপীয় খাবার পরিবেশ করা হয় সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সম্মানে। প্রাসাদের বাগান তোলা সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের ব্যূকে উপহার দেন সুলতান-সম্রাজ্ঞীকে। বিস্ময়ের সাথে প্রতিটি পাপড়িতে মুক্তা আবিষ্কার করে সম্রাজ্ঞী।

নয় বছর পরে কাইজার উলহেম সুলতানের ভূখণ্ডে দ্বিতীয়বার পদর্পণ করে। এ সময় বাগদাদ রেলওয়ে নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে কন্যা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, আনাতোলিয়ার মধ্যভাগ পর্যন্ত। হামবুর্গ থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত জার্মানি স্টিম শিপ চলাচল শুরু করেছে। জার্মানি ও তুরস্কের মাঝে পণ্য আমদানির সম্পর্ক অটুট হয়েছে। ফলে আনাতোলিয়ার জনগণ সবক্ষেত্রে উপকৃত হচ্ছে। এছাড়াও আবদুল হামিদ দ্বিগুণ উৎসাহে কাইজারকে সাদর সম্ভাষণ জানান; কেননা সাম্প্রতিক আর্মেনীয় হত্যাকাণ্ডে ইউরোপীয়দের মাঝে একমাত্র জার্মানি সুলতানের সাথে ততটা বিরোধিতা করেনি।

এবার অটোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও ভ্রমণ করে কাইজার। খ্রিস্টান তীর্থযাত্রী ও ক্রুসেডীয় নাইটের ছদ্মবেশে পবিত্র নগরী জেরুজালেমে কাইজারের আগমন হয়ে ওঠে দর্শনীয়। ভূমিতে হাঁটু ঠেকিয়ে প্রার্থনা করার পরে একটি লূথেরান গির্জার উদ্বোধন করে কাইজার। এরপর সূক্ষ্মতার সাথে বেশ বদল করে মুসলিম নগরী দামাস্কাসে প্রবেশ করে পাগড়ি পরিহিত অবস্থায়

সালাদিনের সমাধি ভ্রমণ করে কাইজার। সুলতান-খলিফার-ইসলামি নীতিকে সমর্থন করে কাইজার তিনশত মিলিয়ন মুসলিম চির নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিজ্ঞা করে। ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে বাগদাদ রেলওয়ের পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন ছাড় লাভ করে। কন্যা থেকে টরাস, পর্বতমালা হয়ে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত অগ্রযাত্রা শুরু হয় এ রেলপথের।

সুয়েজ খালে ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য নিশ্চিত করে আনাতোলিয়া রেলপথ নিয়ে ততটা মাথা ঘামায়নি ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু মেসোপটেমিয়া ও উপসাগর পর্যন্ত এর সম্ভাব্য সম্প্রসারণে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাইসরয় লর্ড কার্জন ভারতীয় সরকার ও কুয়েতের শেখের মাঝে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে শুরু করে। এর মাধ্যমে কুয়েতের শেখ রাজি হয় ব্রিটিশ অনুমতি ব্যতীত কোনো ভূমি পরিত্যাগ না করতে ও কোনো বিদেশি প্রতিনিধি গ্রহণ না করতে। ওমানের সুলতানের ওপরেও একই সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়। ফলে ব্রিটিশ স্বার্থ কার্যকরভাবে বাগদাদ রেলওয়ে অগ্রসরের পক্ষে বাধা প্রদান করে। এদিকে রাশিয়া ও এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে যে, হয়তো এ রেলপথ ককেশাস অঞ্চলে তুর্কিরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। ফলাফলস্বরূপ রাশিয়া ককেশাসকে বাধ্য করে "কৃষ্ণসাগর চুক্তি" মেনে নিতে। এর ফলে উত্তর আনাতোলিয়াতে রাশিয়ার স্বার্থ সংরক্ষিত হলেও জার এতদসম্পর্কিত সিন্ডিকেটকে স্বীকৃতি দিলেই কেবলমাত্র রেলওয়ের কাজ এগিয়ে যেতে পারবে।

মুসলিম বিশ্বের ওপর নেতৃত্ব করার জন্য আবদুল হামিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আরেকটি গোপন কর্মসূচি ছিল হেজাজ রেলপথ। দামাস্কাস থেকে শুরু হয়ে মক্কা ও মদিনাতে সকল তীর্থপথ সংযুক্ত করবে এ রেলপথ। এর ফলে খলিফা হিসেবে সুলতানের সম্মান বেড়ে যাবে নিজের ও বাইরের ভূখণ্ডসমূহে—একই সাথে আরব ও ইয়েমেনসহ অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম জনগণের ওপর সুলতানের রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়ে যাবে।

এ রকম ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মিত এ রেলপথের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করবে মুসলিম বিশ্ব ও মুসলিম শ্রম দ্বারা এটি নির্মিত হবে। তুর্কি সেনাবাহিনীও এতে কাজ করবে—কিন্তু বিদেশি কারিগরি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এর দেখাশোনা করবে। ১৯০১ সালে শুরু হয়ে আট বছরের মধ্যে মদিনা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ শেষ হয়। কাছে এবং দূরের মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র অটোমান উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়ে আর এর পাশাপাশি খলিফের প্রতি জনসমর্থনও বৃদ্ধি পায়।

আর্মেনীয়দের প্রতি সমর্থন প্রদানে প্রত্যাখ্যান করে জার্মানি। একইভাবে ক্রিট ও মেসিডোনিয়ার ক্ষেত্রে সংস্কার কাজের জন্য ইউরোপ সুলতানের ওপর চাপ প্রয়োগ করলে, এটিও প্রত্যাখ্যান করে জার্মানি। ক্রিট দ্বীপেও তুর্কি

নিপীড়ন চলতে থাকায় গ্রিক স্বাধীনতাযুদ্ধের পর থেকেই সময়ে সময়ে বিদ্রোহ দানা বেধে ওঠে। এখানকার বেশির ভাগ জনগণ গ্রিক ভাষী খ্রিস্টান হওয়াতে হয়তো বার্লিন চুক্তির মাধ্যমে গ্রীসের সাথে সংযুক্ত হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে মাত্র এর দশ শতাংশ মুসলিম জনগণের কথা মাথায় রেখে তুর্কি সরকার এখানে শাসন করছে।

সুলতান আর্মেনীয়দের মতোই আচরণ করতে চেয়েছিলেন তাঁর ক্রিট দেশীয় খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি। কিন্তু যোদ্ধা জাতি হওয়ায় ক্রিটবাসী শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাই সুলতান তাদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান গভর্নর নিয়োগের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার সময়সীমা সীমিত হয়ে শীঘ্রই এ পদে পুনরায় একজন মুসলমানের আগমন ঘটে। ক্রিটের অধিকাংশ লোক খ্রিস্টান গভর্নর হারিয়ে গ্রিসের সাথে সংযুক্তির জন্য দাবি জানাতে থাকে।

তুরস্কের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে গ্রীস সরকার ও দাবির প্রতি সমর্থন না দিলেও ১৮৮৯ সালে ঘটনা বদলে যায়। ক্রিট দ্বীপে সংঘর্ষের ফলে বিপুলসংখ্যক শরণার্থী এথেন্সে বন্যার ন্যায় প্রবেশ করে গ্রিস সরকার পোর্তের কাছে দাবি জানায় ক্রিটবাসীদের জন্য সরকার ব্যবস্থা উন্নত করতে। সুলতান এক ফরমান জারির মাধ্যমে পূর্বের শূন্য প্রতিজ্ঞাসমূহ পালনের পাশাপাশি নতুন কিছু সংস্কার কর্মসূচির প্রস্তাব করেন। এর ফলে ক্রিটবাসীরা সন্তুষ্ট না হলেও কিছু সময়ের জন্য বিদ্রোহ দমন হয়। এর ভিত্তিতে সুলতান পরিকল্পনা নেয় বিশ বছর পূর্বে বুলগেরিয়ার ন্যায় ক্রিট দ্বীপে অনিয়মিত মুসলিম সৈন্য প্রেরণের।

এভাবে ১৮৯৬ সালে খ্রিস্টানরা আবারো একটি বিদ্রোহে সরব হয়ে ওঠে, যা মূলত সর্বশেষ হিসেবে প্রমাণিত হয়। কানিয়াতে খ্রিস্টান কোয়ার্টারসমূহে আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনী। নির্বিচারে হত্যা করার মাধ্যমে সবকিছু ধ্বংস করা হয়। ফলে অনিয়মিত মুসলিম বাহিনীর মদদপুষ্ট হয়ে ক্রিটবাসী মুসলিমরা খ্রিস্টানদের সাথে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। খ্রিস্টানরা শক্তিবর্গের কাছে আবেদন জানিয়ে গ্রিসের সাথে সংযুক্ত হতে চায়। এতে গ্রিস সরকার ক্রিট দ্বীপে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। প্রথমে টর্পেডোর ছোট জাহাজ বহর পাঠিয়ে তুর্কি সৈন্য প্রবেশে বাধা আরোপ করে গ্রিক বাহিনী। তারপর দ্বীপ দখলের জন্য স্থলবাহিনীর আগমন ঘটে। পাঁচ বৃহৎ শক্তির অ্যাডমিরালগণ নিজেদের জাহাজ ক্রিট জলসীমায় থাকাতে কানিয়া বন্দর দখল করে নেয়। তাদের পূর্বে জার্মান ও রাশিয়া সরকার গ্রিক সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিলেও ব্রিটিশ সরকার ও অন্যান্য শক্তিবর্গ ক্রিটবাসীদের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি অব্যাহত রাখে। এ শর্ত পূরণ হলেই কেবলমাত্র গ্রিক ও তুর্কি সৈন্যের বিশাল অংশ প্রত্যাহার করা হবে। এবার সুলতানকে সমর্থন প্রদান করতেই হয়।

এরই মাঝে আবার খোদ গ্রিসের ভেতরে জনমত গড়ে ওঠে তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ শুরু করার জন্য। রাজা অথবা সুলতান কেউই যুদ্ধে রাজি না থাকলেও, গ্রিস সরকার হেলেনিক জাতীয়তাবাদী উপাদানের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হয়। জাতীয়তাবাদী দল সীমান্ত পার হয়ে মেসিডোনিয়া ও থেসালিতে প্রবেশ করলে, ১৮৯৭ সালে তুরস্ক গ্রিসের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। ত্রিশ দিনব্যাপী এ যুদ্ধ গ্রিকদের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনে। তুর্কিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও গ্রিক নৌবাহিনী তেমন সুবিধা করতে পারেনি। সম্ভবত শক্তিবর্গের ওপর থেকে চাপও এতে ভূমিকা রেখেছে। স্থলযুদ্ধে ইপিরাস ও থেসালি থেকে গ্রিক বাহিনী বিশৃঙ্খলভাবে পিছু হটে। তুর্কিরা দ্রুত অগ্রসর হওয়াতে এথেন্সে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করে। ছয় মাস পরে ইস্তাম্বুলে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে গ্রিকদের ওপর আর্থিক ব্যয়ভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু তুর্কিরা থেসালি ও ইপিরাস ছেড়ে চলে যায়। একই সাথে গ্রিক রাজবংশ প্রাণে বেঁচে যায় আর অন্যদিকে সুলতানের সম্মান বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন বছর ধরে পরাজয়ের পর জার্মান সহায়তায় সুলতান অবশেষে বিজয় লাভ করতে সমর্থ হন। ক্রিট দ্বীপে সংঘর্ষ আরো এক বছর ধরে স্থায়ী হয়। সুলতানের সাথে সখ্যতাবশত জার্মানি ও অস্ট্রিয়া বৃহৎ শক্তিবর্গের দল থেকে সরে আসে। দ্বীপ থেকে তাদের নিজস্ব বাহিনী প্রত্যাহার করে।

বাকি শক্তিসমূহও সুলতানের সার্বভৌমত্বের অধীনে ক্রিটবাসীদের জন্য যথাযথ গভর্নর প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। মুসলিম নেতৃত্বাধীন দুর্বৃত্ত হামলায় ব্রিটিশ ভাইস-কনসালের মৃত্যু হলে পর শক্তিবর্গ সুলতানকে নির্দেশ দেয় তুর্কি বাহিনীকে দ্বীপ থেকে প্রত্যাহারের জন্য। কার্যত তাই করে তুর্কি বাহিনী।

গ্রিসের রাজকুমার জর্জকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আবদুল হামিদ ক্রিট হারিয়ে ফেলেন। এথেন্স ক্রিট দ্বীপের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত হয়ে ওঠে। উনিশ শত বছর পূর্বে রোমান বিজয়ের পর এই প্রথম এমনটা ঘটল।

ইউরোপে আর মাত্র একটি অটোমান রাজ্য টিকে আছে। মেসিডোনিয়া। তুর্কি শাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করার পর এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বুলগেরিয়া ও সার্বীয়া প্রভুত উন্নতি সাধন করেছে। মেসিডোনিয়া এখন নিয়ন্ত্রণ করছে আরো বেশি, ভয়ানক, হঠকারী আর দুর্নীতিপরায়ণ এক গভর্নর। এখানকার তুর্কি সৈন্যদেরকে ঠিকমতো বেতন-ভাতা প্রদান না করায় জনগণের ওপর বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠেছে তারা। খ্রিস্টান প্রজাদের জন্য আদালতে প্রায় কোনো ন্যায়বিচার হয়ই না বলতে গেলে। আর আইন ভঙ্গকারী মুসলিমরা দিনে দিন আরো বেশি দুর্বিনীত হয়ে উঠছে। খ্রিস্টান প্রজাদের জমি কেড়ে নেয় তারা;

যার কোনো সমাধান হয় না। এহেন অত্যাচার বন্ধে আবদুল হামিদ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ফলাফলস্বরূপ বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান জনগণ পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে প্রবেশ শুরু করে। বিশেষত বুলগেরিয়াতে। দেখা যায় সোফিয়ার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই ছিল সীমান্ত থেকে আগত শরণার্থী।

মেসিডোনিয়া ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সংমিশ্রণে এখানকার জনগণ ব্যস্ত থাকত একে অন্যের সাথে জমি নিয়ে বিরোধের মাঝে। তুর্কি প্রাদেশিক সরকারও এতে ভূমিকা পালন করত। এ অঞ্চলের তৃতীয় সীমান্তে ছিল গ্রিস। ফলে গ্রিস সংস্কৃতিও পূর্বে এখানে আধিপত্য করত। কিন্তু সাম্প্রতিক গ্রিক-তুর্কি যুদ্ধের ফলে গ্রিস প্রভাব কমে গিয়ে স্লাভ প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কেননা অধিকাংশ খ্রিস্টান ছিল স্লাভ। পরবর্তীতে বুলগেরীয় জাতীয়তাবাদী ধারণাও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই বিরোধের সুযোগ নেয় পোর্তে। বুলগেরীয়দের উৎসাহ প্রদান করে ১৮৯০ সালে গ্রিক প্রভাব অপসারণের জন্য সাতজন বুলগেরীয় বিশপ তৈরির নির্দেশ জারি হয়। ইতিমধ্যে স্লাভ জনগণ নিজেদের গির্জার জন্য প্রথমবারের মতো বিশপ নির্বাচন করে। ফলে মেসিডোনিয়াতে গ্রিক ও স্লাভদের মাঝে দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ হয়ে আসছে এ সময় তা আরো তীব্রতর হয়। এতে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে আবদুল হামিদের নীতি। আলবেনিয়ার মুসলিম জনগণকে উৎসাহিত করে সুলতান গ্রিক ও স্লাভদের অঞ্চলে আক্রমণের জন্য।

সালোনিকাতে মেসিডোনীয় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে; যার দাবি ছিল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন। এর প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটি গড়ে ওঠে সোফিয়াতে আর ১৮৯৫ সালে মেসিডোনিয়াতে বিপুল হারে লুণ্ঠন চালানো হয়। বুলগেরীয় ডাকাতদল পার্বত্য ঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে থাকে; তুর্কি গ্রামসমূহ আক্রমণ করলে আবার গ্রিক ডাকাতদল পাল্টা আক্রমণ চালায়। তুর্কি অনিয়মিত বাহিনী নিজেদের ইচ্ছেমতো উভয় পক্ষেই যোগদান করে। ফলে মেসিডোনিয়ার গ্রামাঞ্চল তছনছ হয়ে যায়। পুরো প্রদেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা। অতঃপর ১৯০৩ সালে সালোনিকাতে সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ গড়ে উঠলে ইস্তাম্বুল থেকে তুর্কি বাহিনী পাঠিয়ে দমন করা হয়।

অবশেষে শক্তিবর্গ এক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া দেয়। বস্তুত স্লাভ জনগণ ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটা করেছিল; যেন তুর্কি শাসনের অবসান ঘটে। বস্তুত মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়েই এ ব্যাপারে একমত হয় যে ইউরোপে তুর্কিদের আর কোনো প্রদেশ রাখা হবে না। সুলতান আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা সমাধানে ইন্সপেক্টর জেনারেল শক্তিবর্গের মাঝে বিভক্তি দেখা দেয়। জার্মানি বা

অস্ট্রিয়া কেউই স্বায়ত্তশাসিত মেসিডোনিয়ার ধারণাকে সমর্থন দেয়নি। সুলতানের মিত্র হিসেবে বরঞ্চ অস্ট্রিয়া, রাশিয়াকে সাথে নিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নম্র প্রশাসনিক সংস্কারের প্রস্তাব দেয়।

অন্যদিকে ব্রিটেন ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। খ্রিস্টান গভর্নরের অধীনে খ্রিস্টান জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য দাবি জানিয়ে তুর্কি অনিয়মিত বাহিনীর প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে দেয় সুলতানকে। ভিয়েনার কাছে এক কনফারেন্সে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া ব্রিটিশ প্রস্তাবকে সংশোধন করে অবশেষে তুর্কি সরকারের সহায়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দুজন "সিভিল এজেন্ট" নিয়োগের ব্যাপারে একমত হয়। এদের একজন হবে রাশিয়ার ও একজন হবে অস্ট্রিয়ার। একজন ইউরোপীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব দান করবে; প্রদেশের নীতিনির্ধারণে প্রতিটি বৃহৎ শক্তি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করবে; জাতীয় দাবি মাথায় রেখে প্রশাসন প্রস্তুত হবে ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতি উৎসাহী করা হবে বলেও ঠিক করা হয়। শহরে সংস্কার কর্মসূচির জন্য মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সমন্বয়ে একটি মিশ্র কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ব্রিটেন ব্যতীত আর সব বৃহৎ শক্তিই তুর্কি সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। এছাড়া প্রস্তাবে সাহায্য করতে ও নিজেদের প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানে সম্মত হয় বৃহৎ শক্তিবর্গ।

এমতাবস্থায় সুলতানের স্বীকৃতি প্রদান না করে উপায় থাকে না। কিন্তু পোর্তে চিরাচরিতভাবে এ সমঝোতার বাস্তবায়নে বিলম্ব করতে থাকে, বাধা আরোপ করতে থাকে। আলোচনার দুবছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও কোনো কার্যকর সংস্কার করা হয়নি। বস্তুত অস্ট্রিয়া ও জার্মানি এ ব্যাপারে কোনো প্রচেষ্টা চালায়নি। শুধু নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ই পোর্তের ওপর চাপ প্রয়োগ করে অথবা সুলতানকে রক্ষা করার কৌশল অবলম্বন করে। তাই এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া মেসিডোনিয়ার অবস্থা উন্নয়নে আদৌ সম্মত নয়। এ অঞ্চলে তুর্কি শাসন হটিয়ে কোনো আন্তর্জাতিকভাবে স্থির শাসকের ভয়ে ভীত অস্ট্রিয়া ও জার্মানি চেষ্টা করে যত দিন সম্ভব এ অরাজকতা চালিয়ে নিয়ে। মূল পরিকল্পনা ছিল আজিয়ান ও পূর্ব দিকে অস্ট্রিয়ার প্রভাব বাড়িয়ে তোলা। এ লক্ষ্যে ১৯০৮ সালে অস্ট্রিয়াবাসী পোর্তের কাছে দাবি জানায় মেসিডোনিয়াতে অর্থনৈতিক ছাড় প্রদানের জন্য। এর পরিবর্তে সাহায্য ও সংস্কারের জন্য ইউরোপীয়দের চাপের বিরুদ্ধে পোর্তেকে সমর্থনের প্রতিজ্ঞা করে অস্ট্রিয়া।

মেসিডোনিয়ার অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৫ সালে ব্রিটেন সুলতানের কাছে প্রদেশের আর্থিক সংস্কারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশনের প্রস্তাব জানায়। শক্তিবর্গ এ কমিশন

মনোনয়ন করবে ও তুর্কি ইন্সপেক্টর জেনারেলের অধীনেও কয়েকজন বিদেশি প্রতিনিধি নিয়ে এ কমিশন গঠিত হবে। প্রথমে এ ধরনের নির্দেশ ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করেন সুলতান। এর পরিবর্তে শুল্ক কর বৃদ্ধির দাবি জানান। কিন্তু যখন শক্তিবর্গ—তারপরেও জার্মানি এতে সায় দেয়নি—নৌ-প্রতিবাদে একত্রিত হয়ে মিটিলেন ও লেমনসের শুল্ক বিভাগ অবরোধ করে, তখনই শুধুমাত্র সুলতান চারজন ইউরোপীয় আর্থিক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সালোনিকাতে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধিকে সাহায্য করতে দিতে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক কমিশনের কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার আরো প্রস্তাব দেয় যে মেসিডোনিয়ার গভর্নর তুর্কি প্রজা হলেও শক্তিবর্গের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নিয়োগ পাবে। প্রদেশের কর থেকে পাওয়া অর্থের মাধ্যমে বেতন প্রদানের ভিত্তিতে এক দল ইউরোপীয় অফিসার গভর্নরের সাথে কাজ করবে। ফ্রান্স ও রাশিয়া এতে একমত হয়।

ইতিমধ্যে শুধু খ্রিস্টানরা নয়, মেসিডোনিয়ার মুসলিম জনগণও সুলতানের কাছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাতে থাকে। তাঁর ইন্সপেক্টর জেনারেল হিলমি পাশা, একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলো। খ্রিস্টান ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার জন্য মৌলিক সংস্কারকাজের পদক্ষেপ নেয় হিলমি পাশা। কিন্তু আবদুল হামিদ একগুঁয়ে ভাবে এদেরকে অবহেলা করে যান। ক্রিট প্রদেশে অন্তত মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করেছিলেন সুলতান। কিন্তু মেসিডোনিয়াতে কল্যাণের কথা চিন্তা না করাতে শুধু খ্রিস্টানরা নয়, মুসলমান প্রজারাও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মর্মান্তিক সত্য এই যে ইউরোপের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরানোর নীতিতে অটল থাকায় আবদুল হামিদ ইউরোপের এ প্রদেশেরসহ মুসলিমদের মাঝে ও ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেন। যা ক্রমান্বয়ে বিদ্রোহে রূপ নিয়ে সুলতানের নিজের উপরেই আঘাত হানে।

সুলতানের সবচেয়ে মূল্যবান অর্জনই ছিল এর উৎস ক্ষেত্র—তুর্কি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও সম্প্রসারণ। নাগরিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি শেষে প্রজন্মের মাঝে গড়ে ওঠে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সুলতানের নিজের প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই শিক্ষার্থীরা একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা শুরু করে ও রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলন তার শিকড় ছড়িয়ে দেয়। ১৮৮৯ সালে ফরাসি-বিপ্লবের শত বছর পূর্তির বছরে ইস্তাম্বুলের সামরিক মেডিক্যাল কলেজের চারজন শিক্ষার্থী একত্রিত হয়ে প্রথম শৃঙ্খলিত বিরোধি দল গড়ে তোলে। ইটালিয় কারবোনারির আদলে গঠিত হয়ে, যেমনটা পূর্বে তরুণ অটোমানরা চেষ্টা করেছিল এ দল শীঘ্রই ইস্তাম্বুলের নাগরিক, সামরিক, নৌ, চিকিৎসা ও অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়ের

মাঝে থেকে শিষ্য জোগাড় করে ফেলে। এরপর প্যারিসে অবস্থিত প্রথম স্বাধীনতাবাদী দলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। এ সদস্যরা আবদুল হামিদ সংসদ ভেঙে দেয়ার পর থেকেই প্যারিসে বসবাস করছিল। পরবর্তীতে এদের সাথে আরো যোগ দেয় আহমেদ রিজা। বার্সার শিক্ষা ব্যবস্থার একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক; রাজনৈতিক কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল।

তাদের একজন, সংসদের প্রাক্তন সদস্য তরুণ তুর্কি নামে ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য একটি জার্নাল প্রকাশ করতে থাকে। নাম "লা জুন তারকুই"। অন্যদিকে রিজা অন্যান্য নির্বাসনকারীদের সাথে নিয়ে বিদেশি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে প্রকাশ ও চোরাচালান শুরু করে "মেসভেরেত" নামক জার্নাল; অর্থ "আলোচনা" সাব টাইটেল দেয়া হয় শৃঙ্খলা ও উন্নতি। পরবর্তীতে বিরোধি দল এতে যোগ করে একতা। সব জাতি ও মতের মানুষের জন্য একতা ও উন্নয়নের কমিটি গঠন করা ছিল এর উদ্দেশ্য।

১৮৯৬ সালে সুলতানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য বেশ কিছু ষড়যন্ত্রকারী ও রাজনৈতিক পক্ষ পরিকল্পনা করে। এরই মাঝে বিরোধি দল প্যারিস থেকে কায়রো, জেনেভা, আর কিছুটা সীমিত পরিসরে লন্ডনেও ছড়িয়ে যায়। কিন্তু তাদের মাঝে একতা না থাকায় পরিকল্পনা সফলতা লাভ করতে পারে না।

কিন্তু ইস্তাম্বুল ও এমনকি রাজকীয় অটোমান লিসি অব গালাতাসারির শিক্ষার্থীদের মাঝে ধ্বংস চেতনা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার শাসন কার্যে অভিজাতদের পুত্রেরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে "সম্রাট দীর্ঘজীবী হোক!" এই স্লোগান দিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ১৯০৬ সালের দিকে তারা স্লোগান দিতে থাকে, "সম্রাটের পতন হোক!" প্রাসাদের প্রভাবমুক্ত প্রাদেশিক বিদ্যালয়সমূহে এ চেতনা আরো কঠিন হয়ে ফুটে ওঠে। এভাবে মেসিডোনিয়াতে বিপ্লবের জন্ম হয়। সালোনিকাতে একতা ও উন্নয়ন কমিটি ফ্রিম্যাসন, ইহুদি ও দনমেহস (ইহুদি, মুসলিমে পরিণত হয়েছে) প্রভৃতি দলের সমর্থন পেতে থাকে। সুলতান অপরিণামদর্শী হয়ে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হন যে বিপ্লবের চেতনা তাঁর শক্তির উৎস অটোমান সেনাবাহিনীর মাঝেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বেতন-ভাতা, অস্ত্র ও যন্ত্রপাতির অভাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের মাঝেও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। ফলে বিপ্লবের সম্ভাবনা গড়ে ওঠে।

১৯০৮-এর শুরুর দিকে মেসিডোনিয়াতে তৃতীয় সেনাবাহিনী দলের মাঝে সামরিক সংঘর্ষ তৈরি হয়। এই বছরেরই গ্রীষ্মে জার ও ফ্রান্সের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের মাঝে রিভালে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে প্রদেশের ওপর স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিদেশি হুমকির ভয় দেখা দেয়; ফলে সাম্রাজ্য ভেতর এবং বাহির উভয় দিক থেকে হুমকির মাঝে পড়ে। এটি সামরিক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করে—মুক্তি, পিতৃভূমি, সংবিধান ও জাতি প্রভৃতি রাজনৈতিক

নীতির সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠে সকলে। আবদুল হামিদ নিজের অসংখ্য গোয়েন্দার কাছ থেকে এ-সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষেও দীর্ঘকাল নিশ্চুপ বসে থাকেন। ফলে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়া ব্যতীত আর কিছুই করার থাকে না।

সালোনিকার পেছনে রাসনা পাহাড়ে দুজন তরুণ তুর্কি মেজর মুক্তির দাবিতে জনমত গড়ে তোলে। একজন ছিল অ্যানভার বে, স্বল্পবাক ও সাহসী সৈন্য হিসেবে খ্যাতি আছে তার। অন্যজন নিয়াজীকে একতা ও উন্নয়ন কমিটির প্রথম দিককার শিষ্য। বিভিন্ন ছদ্মবেশে আনাতোলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সুলতান বিরোধিদের মাঝ থেকে শিষ্য সংগ্রহ করে নিয়াজী বে। এখন নিজের প্রতি বিশ্বস্ত পাহাড়ি সেনাবাহিনী, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও নিজের ব্যাটালিয়ন থেকে আর্থিক সাহায্য ও সংগ্রহ করে নিয়াজী বে। অবশেষে দুই অফিসার বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সালোনিকাতে একতা ও উন্নয়ন কমিটি এ বিদ্রোহকে সমর্থন করে ১৮৭৬ সালের সংবিধান পুনরায় চালু করার রাজনৈতিক দাবি জানাতে থাকে।

আবদুল হামিদ বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে বৃহৎ একটি বাহিনী প্রেরণ করে। এ বাহিনীর কমান্ডার শামসী পাশা দিনের আলোতে নিজের অফিসার দ্বারা খুন হয়ে যায়। একই ভাগ্যবরণ করে নেয় অন্য প্রতিক্রিয়াশীল অফিসাররাও। ইতিমধ্যে আলবেনীয়রা যাদের ওপর মিত্র হিসেবে নির্ভর করেছিলেন সুলতান, থ্রেসের দ্বিতীয় সেনাদলের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ১৯০৮ সালের ২১ জুলাই সুলতানের একতা ও উন্নয়ন কমিটি টেলিগ্রাম পাঠায়। এতে পুনরায় সাংবিধানিক শাসন কার্যকর করার দাবি জানানো হয়। নচেৎ সুলতানের অপসারণের জন্য ইস্তাম্বুলে বৃহৎ সামরিক বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার হুমকি প্রদান করা হয়।

আবদুল হামিদ, প্রাচীন মুসলিম রীতি অনুযায়ী শেখ-উল-ইসলামের দরবারে জানতে চান যে মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সম্রাটের এখতিয়ারের মাঝে পড়ে কিনা। পুরো বিষয় বিবেচনাপূর্বক প্রধান মুফতি এ মর্মে রায় প্রদান করে সংস্কার ও নিজের অভাব-অভিযোগ প্রেরণ করে সৈন্যরা পবিত্র আইন ভঙ্গ করেনি। আবদুল হামিদ মন্ত্রিপরিষদের সভা আহ্বান করেন। যা তিন দিনব্যাপী চলতে থাকে। কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য সৈন্যদের দাবির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে সংবিধানের পক্ষে মত প্রদান করে। কেননা এর বিপক্ষে গেলে গৃহযুদ্ধ বাধার আশঙ্কা থেকে যায়। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতার জন্য সুলতানের হাতে আর একমাত্র অস্ত্র থাকে প্রধান জ্যোতিষির রায়। রাজ জ্যোতিষীও সুলতানকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে ভাগ্যতারকারাও এর পক্ষে আছে। তাই সুলতান মেসিডোনিয়াতে টেলিগ্রামের উত্তরে জানিয়ে দেন যে

সংবিধান আবারো কার্যকর করা হবে; কোরআনের নামে শপথ করেন সুলতান। ১৮৭৭ সালে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া সংসদ পুনরায় শুরু হয়। সাধারণ নির্বাচন হয়। সুলতান আবদুল হামিদ নিজের সিংহাসন বাঁচাতে সক্ষম হন।

মেসিডোনিয়াতে অ্যানভার বে স্লোগান রচনা করে, "এখন থেকে আমরা সবাই ভাই-ভাই। এখানে আর কোনো বুলগারস, গ্রিক, রোমান, ইহুদি কিংবা মুসলিম নেই। একই নীল আকাশের নিচে আমরা সকলে সমান। অটোমান হওয়াতেই আমরা গৌরব বোধ করি।" এক শহরে বুলগেরীয় কমিটির সভাপতি গ্রিক আর্চবিশপকে বুকে টেনে নেয়; আবার আরেকটি শহরে বিপ্লবের একজন অফিসার, একজন খ্রিস্টানকে অপমান করাতে একজন তুর্কিকে গ্রেফতার করে। একটি খ্রিস্টান সমাধি ক্ষেত্রে তুর্কি ও আর্মেনীয়রা নিজ নিজ যাজকদের স্মরণে প্রার্থণা করে; যারা আর্মেনীয় হত্যাযজ্ঞের বলি হয়েছিল।" ইস্তাম্বুল শহরজুড়ে বয়ে যায় বিপ্লবের বাণী, "সংবিধান দীর্ঘজীবী হোক!" আর "গোয়েন্দাদের পতন হোক!" আর পুলিশি রাষ্ট্রের এসব ভয়ানক চর শীঘ্রই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সংবাদপত্রসমূহ আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে, সেন্সরশীপ ওঠে গেছে। কয়েক দিন ধরে এ উন্মাদনা বয়ে চলে, শহরের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়িতে চেপে একই সাথে বসে যাত্রা করে মুসলিম মোল্লা, ইহুদি রাব্বি আর খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা। পথিমধ্যে ভিড়ের কারণে থেমে গেলে খ্রিস্টান ও মুসলিম একসাথে হাত তুলে প্রার্থনা করে ওঠে। একক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় সংবিধানের সুরক্ষা আর মুক্তির আশীর্বাদের জন্য প্রশংসা করে ওঠে সর্বশক্তিমানের।

কিন্তু এ আশীর্বাদ স্বয়ং সুলতানের ওপরেও বর্তায়। নিজের রাজধানীতে গর্জন ওঠে, "সুলতান দীর্ঘজীবী হোক!" সবকিছুর শেষে সুলতান আবদুল হামিদ তরুণ তুর্কিদের কাছ থেকে বেশ কিছু শক্তি কেড়ে নেন। নিজের জনগণের চোখে সুলতানের আসন হয় শক্তিশালী- সাংবিধানিক শাসক, যিনি তাদের জন্য মুক্তি কায়েম করেছেন। মানুষের ভিড় জমে যায় ইলদিজ প্রাসাদের সামনে। সুলতানকে একনজর দেখার জন্য সকলে চিৎকার করে ওঠে, যা থেকে তিনি কদাচিৎ বের হতেন। পরের দিন তিনি এমনটিই করেন। গত কয়েক দশকেও তিনি যা করেননি, সুলতান এবার তাই করেন। জনগণের হর্ষধ্বনির মাঝে আয়া সোফিয়ার বিশাল মসজিদে শুক্রবারের নামাজে যোগ দেন। সব জাতি ও মতের সংমিশ্রণে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের গঠিত সংসদ পথ চলা শুরু করে। এবার তুরস্ক নিশ্চিতভাবে একটি আশীর্বাদিত শতক পেতে যাচ্ছে।

এতদসত্ত্বেও বাস্তবে রূপ নিতে এখনো ঢের পথ বাকি আছে। ঘটনার এই পর্যায়ে এসে তরুণ তুর্কিদের কোনো ক্ষমতা নেই তুরস্কে সরকার গঠন করার।

কিছুসংখ্যক দেশপ্রেমিক তরুণ অফিসার ও অল্পসংখ্যক নাগরিক সমর্থনে তরুণ তুর্কিরা শুধু অযোগ্য ও অসৎ সুলতানের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য অভ্যুত্থান করতে পেরেছে। এর পরিবর্তে এসেছে আরো সুদক্ষ সাংবিধানিক সরকার; যেন সাম্রাজ্যের জন্য নিয়ত বর্ধমান হুমকিসমূহ মোকাবেলা করা যায়। কনজারভেটিভ ও তাত্ত্বিক, কোনো উৎসাহ না পাওয়ায় তরুণ তুর্কির দল কোনো বৈপ্লবিক-সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

শাসক শ্রেণীর অভিজাত অংশের মাঝে থেকে তরুণ অটোমানদের উদ্ভব হয়েছিল। নিজেদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা ও সরকার আহরণ করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু তরুণ তুর্কিদের মাঝে এমন কোনো শাসন দক্ষতা নেই আবদুল হামিদের নিজস্ব শিক্ষা, সামরিক ও নাগরিক সংস্কারের আওতায় গড়ে ওঠা পেশাজীবী আমলাদের মাঝ থেকে জন্ম নেয়া এ তরুণ তুর্কিদের শাসন কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা উভয় ক্ষেত্রেই কমতি আছে। এই প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের ভূমিকা হলো সিংহাসনের পেছনে থেকে সংবিধানের দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখা, যেখানে বয়োবৃদ্ধ তুর্কিরা শাসন পরিচালনা করছে। ক্ষমতা তাই পোর্তের বর্তমান সরকারের হাতেই কুক্ষিগত আছে। প্রাসাদের পরিবর্তে কমিটি এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

কিন্তু সুলতানের নামে সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রধান উজির ও শেখ-উল-ইসলামের পাশাপাশি যুদ্ধ ও সেনা মন্ত্রী নিয়োগের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। এ ধরনের ক্ষমতার চর্চা করলে সেনাবাহিনীর ওপর সুলতানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে। কমিটি ও এর তরুণ অফিসারদের ক্ষমতা খর্ব হবে। এ কারণে কমিটি এ সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক উল্লেখ করে বাতিল করে দেয়; সুলতানের প্রধান উজিরকে অপসারণ করে কামিল পাশা, অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনেতাকে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া বছর শেষে স্থগিত নির্বাচনের মাধ্যমে তাকে যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবেও নিয়োগ করা হয়।

একতার প্রশ্নে তরুণ তুর্কিরা প্রথমেই সবার মাঝে অটোমানীয় চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে; একটি বহুজাতিক দেশের মাঝে সকল জাতি ও ধর্মের-বর্ণের-লোকের ওপর এ চেতনা স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়। কিন্তু এ স্বপ্ন ভেঙে যায় তিন দিক থেকে সমস্যার জন্য। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে সংযুক্ত করে নিয়েছিল। তাই নিজেদের জনগণকে এ ধরনের কাজে অংশ নিতে বাধা প্রদান করে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সরকার। বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে রাজকুমার ফার্ডিনান্দকে "বুলগেরিয়ার জার" ঘোষণা করা হয় মধ্যযুগীয় বুলগেরীয় সাম্রাজ্যের আদেশে, ক্রিট, গ্রিসের সাথে একত্রিত হওয়ার ঘোষণা করে। জাতীয়তাবাদী চেতনা অটোমানীয় চেতনাকে নস্যাৎ করে দেয়।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯) তুর্কিদের কাছে আর্মেনিয় ভাষায় পিটার নামে পরিচিত। সুলতানের গঠন বৈশিষ্ট্য ছিল আর্মেনিয়। হতে পারে সুলতানের মাতাও আর্মেনিয় ছিলেন।

১৯০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর সুলতান আবদুল হামিদ নতুন তুর্কি সংসদের উদ্বোধন করেন। পুরাতন বাইজেন্টাইন সনেট হাউসের পাশে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কি ও অন্যান্য জাতির মাঝে থেকে সমানসংখ্যক ডেপুটি নির্বাচন করা হয়। কমিটি এর অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করে। এই সনেটের রাষ্ট্রপ্রধান হয় আহমেদ রিজা। উদ্বোধনী বক্তৃতায় সুলতান ভান করেন যেন তিনি প্রথমবার সংসদ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন; কেননা জনগণ তখনো সাংবিধানিক সরকারের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত ছিল না। এখন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সবার মাঝে সংসদ পুনর্জাগরণের প্রত্যাশা গড়ে উঠেছে। তাই সন্দেহাতীতভাবে সুলতান এর নবযাত্রা ঘোষণা করছেন, "যারা এর বিরুদ্ধে আছে তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও।" নিজের সমস্ত ডেপুটিদেরকে সুলতান ইলদিজ প্রাসাদে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করেন। আহমেদ রিজার সাথে নিজের পবিত্র ঝরনার পানি সহভাগিতা করেন। ফলে আহমেদ রিজা সঁত্যি সত্যি ভাবতে থাকে যে সুলতান এবার সৎভাবেই সাংবিধানিক শাসন কায়েম করতে মনস্থির করেছেন।

কিন্তু এ ভ্রম সত্যিই দূর হয়ে যায় কিছুদিনের মাঝেই। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে ওঠে। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল মোহাম্মদীয় সমাজ গড়ে তোলা। ইসলামের নীতি ও পবিত্র আইনের শাসনের জন্য দৃঢ়ভাবে একত্রিত হতে থাকে এরা। সমস্ত স্বাধীনতাবাদী সংস্কারের বিরোধিতা করে "ভলকান" নামক একটি যন্ত্রের পৃষ্ঠায় লিখে সংসদে ধর্মীয় ও কনজারভেটিভ অংশ এবং সেনাবাহিনীর মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে সুলতানের বিভিন্ন সমর্থনকারী যেমন চাকরিচ্যুত গোয়েন্দা, সরকারি কর্মচারী ও দরবারের লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯০৯-এর এপ্রিলে, প্রথম সেনাবাহিনীর সৈন্যদল ইস্তাম্বুলে বিদ্রোহ করে বসে। নিজেদের অফিসারদের নিয়ে ডেপুটিদের চেম্বারের সামনের স্কয়ারে একত্রিত হয়ে পবিত্র আইন বলবৎ করার দাবি জানাতে থাকে। শীঘ্রই এ সংখ্য বেড়ে যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় ও অন্যান্য উগ্রবাদীরা দলে দলে এসে এ ভিড়ে সমবেত চিৎকার করতে থাকে, "সংবিধান নিপাত যাক!" "কমিটি নিপাত যাক!" তাদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্যই ছিল এটি। সেনাবাহিনী ও প্রতিবাদকারীরা চেম্বার কক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে একতাবদ্ধ ডেপুটিরা পালিয়ে যায়; প্রধান উজির পদত্যাগ করে আর কমিটির সদস্যদের বাদ দিয়ে নতুন মন্ত্রণালয় গড়ে ওঠে। আবদুল হামিদ দর্য়াদ্র হৃদয়ে বিদ্রোহীদের ক্ষমা প্রদান করে দাবি মেনে নেন। একই সাথে পুনরায় শাসন কায়েম করার জন্য আভানা ও সিলিসিয়াতে সংঘর্ষ দানা বাধে। প্রায় হাজারো আর্মেনীয় আবারো অকাতরে-নির্বিচারে খুন হয়ে যায়।

আবারো প্রতি-বিপ্লব শুরু হয়। এ সংবাদ সালোনিকাতে পৌঁছানোর সাথে সাথে কমিটি সংবিধান রক্ষায় তৎপর হয়ে ওঠে। মাহমুদ শেভকত পাশার শক্তিশালী নেতৃত্বে তৃতীয় সেনাবাহিনী দল ইস্তাম্বুলের উদ্দেশে অগ্রসর হয় "স্বাধীনতাকামী সেনাবাহিনী" নাম ধারণ করে। মাহমুদের সাথে অফিসার হিসেবে আরো যোগ দেয় নিয়াজী, অ্যানভার আর মুস্তাফা কামাল। এ সৈন্যবাহিনী রাজধানী অবরোধে অগ্রসর হলে ডেপুটিরা সান স্টেফানোতে এসে জড়ো হয়। জাতীয় সংসদের আকারে সভা বসে জাতির ইচ্ছার প্রতিমূর্তি হিসেবে এ নির্দেশ অনুমোদন দেয়া হয়। যার খসড়া প্রণয়ন করে জেনারেল মাহমুদ পাশা। বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে মার্শাল'ল জারি করে মাহমুদ।

২৫ এপ্রিলে মাহমুদ বাহিনী রাজধানীতে প্রবেশ করে। এখানকার প্রধান দুটি ব্যারাকে সালোনিকা থেকে আগত সৈনরা থাকত। তারা যথেষ্ট শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে, পাঁচ ঘণ্টার মাঝে কামান দাগা হয়। ইলদিজ প্রাসাদ শীঘ্রই স্বাধীনতাকামী সৈন্যদের হাতে এসে পড়ে আর পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসে এর জনগণের ওপর। পরের দিন সকালে স্বাধীনতাকামী সৈন্যরা রাস্তায় নেমে আসে, তাদের সামনে বিশাল শোভাযাত্রায় আসতে থাকে সুলতানের খোঁজা বাহিনী, গোয়েন্দা আর দাসেরা।

জাতীয় সংসদ ক্যামেরার মাধ্যমে একত্রিত হয় সুলতানের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য। সংসদ অবশেষে সুলতানের অপসারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। পবিত্র আইনের সমর্থনের জন্য সংসদ শেখ-উল-ইসলামকে প্রশ্ন করে কোরআন ও পবিত্র আইন অপসারণকারী, বিশ্বাসীদের নেতার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া যায়? যে কিনা জনগণের সম্পত্তিকে অযৌক্তিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে; অবৈধভাবে অরাজকতা সৃষ্টি করে নিজের প্রজাদের হত্যা করেছে, বন্দি করেছে; যে কিনা "সংশোধনের শপথ নিয়েও তা ভঙ্গ করেছে ও জনগণের শান্তি নষ্ট করে রক্তপাতের উদ্যোগ নিয়েছে;" এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর অপসারণ কি সম্ভব? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মুফতি একটিই জবাব প্রদান করে—হ্যাঁ।

সর্বসম্মতিক্রমে সংসদ থেকে কমিশন এসে সুলতানের জন্য অপেক্ষা করে। প্রাসাদের বিশাল কক্ষে প্রবেশ করে তারা; যেখানে সুলতানের ব্যক্তিগত কর্মসচিব ও ত্রিশজন কৃষ্ণ খোঁজা অপেক্ষা করছিল। আবদুল হামিদ পেছনের পর্দা সরিয়ে নিজের বারো বছর বয়সী পুত্রের হাত ধরে প্রবেশ করে এ কক্ষে। প্রতিনিধিদলের নেতা সুলতানকে স্যালুট করে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে সম্ভাষণ জানায়। এরপর সুলতানের সামনে ফতোয়া পড়ে শোনানো হয়। ফতোয়া মোতাবেক সুলতানের পদত্যাগ ও এরপর তাঁর ভ্রাতা রেশাদের সিংহাসনে অভিষেক ঘোষণা করা হয়। শ্রদ্ধাভরে সুলতান উচ্চারণ করেন,

“এটাই ভাগ্য।” তারপর অধিক উত্তেজিত স্বরে জানতে চান, তাঁর জীবন কি রক্ষা পাবে? ডেপুটিরা এর উত্তরে জানায় তুর্কি জনগণ ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে কাজ করা সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এ ব্যাপারে; তবে তারা মহানুভব। এরপর আত্মপক্ষ সমর্থনে সুলতান আবদুল হামিদ হতাশাভরে উচ্চারণ করে ওঠে, “দুষ্কৃতিকারীদের ঈশ্বর শাস্তি দিন!” ব্যক্তিগতভাবে একজন কমিশনার এর প্রতিধ্বনি করে ওঠে, “তিনি তাই করুন!” ছোট্ট রাজকুমার কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সুলতানের জীবন রক্ষা পায়। মধ্য রাতে সুলতানকে রেলস্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় এর আগে আর কখনো এখানে আসেননি সুলতান। এরপর সালোনিকাতে। দুজন ছোট রাজকুমার আর গৃহস্থালি ও হারেমের কয়েকজন প্রিয়তমাসহ একজন ইহুদির বাসভবন ভিলা আলা তিনিতে ঠাঁই হয় সুলতানের।

এভাবেই অটোমান শেষ দিকের সুলতানের পরাজয় ঘটে। প্রথমে একটি রক্তপাতহীন বিপ্লব, এরপর একটি বিশ্বাসঘাতক প্রতি-বিপ্লবে প্ররোচনাদান করে এই সাম্রাজ্যের ভাগ্য হিসেবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে শিকড় তৈরি করা স্বাধীনতাকামী একটি আন্দোলন নিজের সকল বাধা সত্ত্বেও অযোগ্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী বলকান রাষ্ট্রসমূহ সফল উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল। মর্মান্তিক সত্য এই যে আবদুল হামিদ নিজের রাজত্বকে কী পরিমাণ মূল্য দিতে হবে তা চিন্তা না করেই সাম্রাজ্যের শিক্ষা ও প্রশাসনে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিলেন।

সমস্ত অমানবিকতা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সুলতান আবদুল হামিদ নিজের পূর্ব-পুরুষদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে সম্মানের প্রাপ্য।

যুদ্ধ ও বিদেশি শক্তির হাত থেকে নিজের অবশিষ্ট সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সুলতান। বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য ইতিবাচক সামরিক শক্তি দিয়ে বিদেশিদের পরাজিত না করতে পারলেও সুলতান হয়তো নেতিবাচক কূটনীতি দিয়ে সফল হতেন। যে কোনো মূল্যে শান্তি স্থাপন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আর বস্তুত এক প্রজন্মে তিনি তা নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন।

এ কারণে খ্রিস্টান প্রজাদের স্বার্থে বিদেশি হস্তক্ষেপ রুখে দিয়েছিলেন সুলতান। কিন্তু নিজের মুসলিম প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সুলতান কোনো প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ না করে আধুনিকায়নে মনোযোগ দিয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে তাঁকে তানজিমাতের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে ঊনবিংশ শতকের সংস্কারক সুলতান হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মহান সংস্কারক দ্বিতীয় মাহমুদ সব সময় বিশ্বাস করতেন যে তাঁর গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োজন। শতাব্দীজুড়ে চলা সংস্কার আন্দোলন, তাত্ত্বিক সংঘর্ষ

ও শক্তিশালী ও দুর্বল সুলতানদের বিরোধিতা নিয়ে দ্বিতীয় মাহমুদের এ ধারণা আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। আবদুল হামিদের অভিষেকের মাধ্যমেই এসব দ্বন্দ্ব থেমে গেছে; যিনি মনে করতেন—যদি সীমাবদ্ধতা থাকে ও ওপর থেকেই চাপিয়ে দিতে হবে। নিচের থেকে উৎসাহ দিলে কোনো কাজ হবে না।

স্বাধীনতাবাদী বা ধর্মীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের একনায়কত্বের ফলে পূর্বের সুলতানরা উদ্যোগ নিয়েও যা করতে পারেননি সুলতান সেই সংস্কারের ফল চোখের সামনে পরিপুষ্ট হতে দেখে যান। এটি সত্য যে সমাজের নিচের দিকে কল্যাণের ক্ষেত্রে কোনো কাজ করেননি সুলতান; বেশির ভাগ তুর্কি জনসাধারণ দরিদ্র, নিরক্ষর আর পিছিয়ে পড়া ছিল। আবার এও সত্যি যে সমাজের উঁচু স্তরে শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করে যান সুলতান। তুরস্ক অবশেষে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নাগরিক আইন পায়। আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন ছিল। নিজের খলিফা সুলতান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জনগণের সত্যিকার প্রয়োজনের প্রতি অন্ধ হয়ে ছিলেন সুলতান। কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে তুর্কিরা নতুনভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে। সৈন্য এবং সরকারি কর্মচারী শুধু নয়, বিভিন্ন পেশাজীবী দল যেমন ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী গড়ে ওঠে; যাদের চেতনা বিস্তৃত ও সচেতন হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করতে শেখে ও দিগন্ত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে ঘটে তরুণ তুর্কিদের বিপ্লব।

এমনটাই ছিল হামিদীয় স্বৈরতান্ত্রিক প্রজন্ম। স্বাধীনতাবিরোধি আর নিষ্ঠুর হওয়া সত্ত্বেও আবদুল হামিদ তুরস্কের জন্য স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন। দেশে এবং বিদেশে প্রজন্মব্যাপী শান্তি বজায় রেখে আবদুল হামিদ একটি শূন্যস্থান পূরণ করে গেছেন। যা পূর্ণ করা প্রয়োজন ছিল। মানবিক, সাংস্কৃতিক ও কারিগরি উভয় ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করে গেছেন; টেলিগ্রাফ, রেলপথ, প্রকাশনা সংস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে আধুনিক একটি কাঠামো দাঁড় করিয়ে গেছেন সুলতান। ফলে তুরস্ক তার ইচ্ছেমতো উন্মোষ ঘটাতে পারবে নিজের স্বাধীনতা চেতনার। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়ে গেছে; মঞ্চ প্রস্তুত; অভিনেতাদের-ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের হাতে শুধু দৃশ্যায়নের ভার অর্পণ করা হয়েছে।

॥ ৩৯ ॥

সাম্রাজ্যের প্রভু এখন একতা ও উন্নয়ন কমিটি। এর যোগ্য নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছে শেভকত পাশা। দুবছরের জন্য রাষ্ট্রে মার্শাল'ল জারি করে

সামরিক শাসক হিসেবে শাসন করে শেভকত। সকল সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও মন্ত্রণালয়, কেবিনেট এমনকি আর্থিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ওপরেও তার শাসন কায়েম হয়। কিন্তু এসব ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি শেভকত পাশা। দেশপ্রেমিক মনোভাবের ও সংবিধান বিশ্বাসী শেভকত কমিটির নাগরিক উপাদানের সাথে একত্রিত হয়ে দায়িত্ব পালন করে। সাম্রাজ্যের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গেছে এ কার্যক্রম।

প্রথমেই ১৮৭৬ সালের সংবিধানে সনদ সংশোধনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ডেপুটিদের চেম্বারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া ও সুলতানের ঐতিহ্যবাহী ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। সংসদের সামনে পবিত্র আইনের ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; জাতি ও দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা শপথ নিতে হবে সুলতানকে এ মর্মে শর্ত আরোপ করা হয়। মন্ত্রী নিয়োগ বা অপসারণের একচেটিয়া ক্ষমতা সুলতানের হাত থেকে নিয়ে নেয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্য অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনোনয়নে বিশেষ আইন হয়। কিন্তু প্রধান উজির ও শেখ-উল-ইসলাম নিয়োগের ক্ষমতা সুলতানের হাতেই থাকে। যদিও প্রধান উজিরের দায়িত্ব হিসেবে ঠিক করা হয় নিজের কেবিনেটে কর্মী নিয়োগের সূচিপত্র সুলতানের সামনে পেশ করারও আনুষ্ঠানিক অনুমোদন গ্রহণ করার। একই ভাবে অনুমোদনের মাধ্যমে ডেপুটিরা চেম্বারের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। চুক্তি তৈরি করার সুলতানের প্রাক্তন ক্ষমতা এখন সংসদের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করবে। অবশেষে দেশের নিরাপত্তার খাতিরে নির্বাসনে পাঠানোর সুলতানের যে অধিকার ছিল—যার মাধ্যমে সুলতান আবদুল হামিদ ক্ষমতার অপব্যবহার করে মিধাত পাশাও আরো অসংখ্য জনকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন—এতটাই সংশোধন করা হয় যে প্রায় রদ করার পর্যায়ে চলে যায়।

সুলতানের সরকার চালানোর ক্ষমতা তাই হ্রাস পেয়ে সংসদীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সাংবিধানিক রাজা হিসেবে রাজত্ব করতে থাকেন; কিন্তু শাসক হিসেবে শাসন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষিত মন্ত্রিপরিষদের ওপর বর্তায়। যে কোনো ধরনের মতানৈক্য হলে একজন কেবিনেট মন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হয়ে পড়ে। তাই ডেপুটিদের ওপরই শেষ কথা বলার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

একই সাথে চেম্বার নিজের অবস্থানকেই সুসংহত করার জন্য আইন পাস করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বিরোধি দলকে দমন করা ও অতিরিক্ত স্বাধীনতা খর্ব করা। যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত পদক্ষেপ বা একত্রিত হয়ে সভা, প্রতিবাদ প্রভৃতির সুযোগ দূর হয়। এর মধ্যে প্রেসের ওপর সীমাবদ্ধতাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যদিও এটি সেন্সরশিপ ছিল না। একতা ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার স্বার্থে গোত্র অথবা জাতিভিত্তিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয়। এর মাধ্যমে বলকান অঞ্চলে তৎক্ষণাৎ গ্রিক, বুলগেরীয় ও অন্যান্য ক্ষুদ্র গোষ্ঠীদের ক্লাব বন্ধ করে দেয়া হয়। সেনাবাহিনীকে "ব্যাটালিয়নের পিছু নেয়া" নামে একটি পদক্ষেপ নেয়া হয়। এর মাধ্যমে বলকান ব্রিগান্ডদের মতো ডাকাত দলগুলোকে দমনের উদ্যোগ নেয়া হয়। অবশেষে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন মতের সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো অ-মুসলিমদেরকে তুর্কি সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়।

কিন্তু জাতীয়তাবাদের ধারা প্রায় প্রাপ্তবয়স্কের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাই বহুজাতিক অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের স্বপ্নের ক্ষেত্রে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তালাত, একতামূলক দলগুলোর মাঝে সবচেয়ে বাস্তববাদী নেতা, সালোনিকা কমিটির একটি গোপন সভায় জানিয়ে দেয় যে, "উপলব্ধির বাইরের একটি আদর্শ... বিশ্বস্ত ওসমানলিয় তৈরিতে আমাদের পদক্ষেপ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে; আর এসব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে যত দিন পর্যন্ত বলকান অঞ্চলের ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো মেসিডোনিয়ান জনগণের সাথে পৃথক হওয়ার ধারণা ছড়াতে থাকবে।' অটোমানে রূপান্তর প্রক্রিয়া তাই নতুন আকার ধারণ করে। কমিটির মতে, যেমনটা ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড গ্রের কাছে বর্ণনা করেছিল— "অটোমান অর্থ অনিবার্যভাবেই তুর্কি আর অটোমানে রূপান্তরের বর্তমান প্রক্রিয়া হলো একটি তুর্কি মর্টারের মাঝে নন-তুর্কি উপাদান ভরা।" বস্তুত একে তুর্কিবাদও বলা চলে। কেননা আরবীয়, আলবেনীয় ও অন্যান্য অ-তুর্কি মুসলিমের ওপর তুর্কি ভাষা চাপিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং অটোমানদের পরাজয় আর ইসলামি মতবাদ হ্রাস পাওয়ার এ রকম একটি সময়ে "তুর্কিবাদ" নামে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে।

ঊনবিংশ শতকের সংস্কার-পরবর্তী শাসনকাল ছোট্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের মাঝে থেকে নিজের সমর্থন আদায় করেছিল। এ অভিজাতরা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আর ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু রাজনৈতিক গুরুত্ব আমূল বদলে গেছে। একতাবাদীরা প্রাথমিকভাবে একটি দেশীয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। এটি ছিল অটোমান নয়, তুর্কি; বহুজাতিক নয় জাতীয়তাবাদী; অভিজাত নয়, জনপ্রিয়তার প্রতি উচ্চাকাঙ্খী; যারা নিজেদের শক্তির জন্য মিশ্র শ্রেণী গঠন ও সমাজের ওপর নির্ভর করেছিল।

পুরো দেশজুড়ে মূলত এদের সমর্থনকারী ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী; হামিদীয় শাসনামলে যাদের সম্প্রসারণ হয়েছিল। একতাবাদী পরবর্তীতে তুর্কি সাধারণ জনগণের মাঝেও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বীজ রোপন করে দেয়। তাদের ছিল একটি নিরপেক্ষ সরকার। যেটি কিনা রাস্তায় কোনো মানুষ দেখলে জরুরি

পদক্ষেপ নিত। যেমনটা করত অতীতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। শহরের জনগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের দাবি পূরণে সভা করত, প্রতিবাদ করত।

কিন্তু এসব কোনো কিছুই আপামর জনসাধারণের প্রত্যক্ষ কোনো উপকার করেনি। তরুণ তুর্কি বিপ্লবীরা দেখতে পায় যে সংবিধান নামক যে জাদুর কাঠির জন্য তারা অস্ত্র ধরেছিল, তা কোনো নতুন সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসেনি। পুরাতন প্রতিষ্ঠানসমূহও বাতিল হয়ে যায়নি। তরুণ অটোমান ও তানজিমাত সংস্কারকদের তুলনায় তারা তাত্ত্বিক নয়, নীতি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে। বিশেষ করে কাজে বিশ্বাস ও তাদের মাঝে বুদ্ধিজীবীদের অভাব থাকায় মৌলিক নীতি ও চূড়ান্ত ব্যাপারে ততটা উদ্বিগ্ন ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যের বর্তমান অংশটুকু টিকিয়ে রাখাই তাদের কাছে প্রধান ছিল।

এই একটি প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা রয়ে গেছে—এর মুক্তির উপায় কী? এখন এর পরিচয় কী? ইতিহাসের এই মোড়ে এসে তুর্কিরা এখন যে সভ্যতায় বাস করছে তা কী হবে ইসলাম অথবা পশ্চিমা অথবা উভয়ের সংমিশ্রণ? অটোমানবাদ জাতি, ভাষা ও ধর্মের ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে পাঁচ শতাব্দী ধরে টিকে থাকা এ সাম্রাজ্য এখন পুরোনো হয়ে গেছে এবং প্রায় শেষলগ্নে এসে গেছে। ইউরোপীয় জাতিবাদ ধারণা এখানে বাসা বেঁধেছে। ইসলামপ্রীতি, যার জন্য আবদুল হামিদ উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এশিয়াতে একতা তৈরির জন্য, তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। তাই তুর্কি বিশ্বস্ততা কার প্রতি ধাবিত হবে?

এর উত্তর নিঃসন্দেহে লুকিয়ে আছে তুর্কি রাষ্ট্রের নতুন ধারণার মাঝে। যেভাবে বলকান জনগণ জাতি হিসেবে দলবদ্ধ হয়েছে; একই ভাবে তুর্কি জনগণ নিজেদের জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগরিত হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক একতার ভিত্তিতে নিজের পরিচয় খুঁজে ফিরছে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে তরুণ তুর্কি কবি মাহমুদ এমিন। তুর্কি শব্দটির প্রতি নতুন করে শ্রদ্ধা আর গৌরবের বোধ জাগিয়ে তোলে মাহমুদ। গর্বিত স্বরে উচ্চরণ করে এমিন "আমি একজন তুর্কি, আমার বিশ্বাস এবং আমার জাতিই সর্বশক্তিমান। এবং আবারো ' "আমরা তুর্কি এই রক্ত এবং এই নামেই আমরা বাস করি।"

এ ধরনের সাহিত্য ও নতুন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের শাখা তুর্কোলজি থেকে মানব ইতিহাসে নিজেদের ভূমিকা নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে তুর্কিরা। এতে আলোকপাত করা হয় তাদের জাতি "তূরো-আর্য"র ওপর। এর মাধ্যমে গোত্রীয় আত্মীয়তা ও রাজনীতির ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন লালন করতে থাকে তুর্কিভাষী জনগণ। শুধু মধ্য এশিয়াতে নয়, মঙ্গোলিয়া, চীন, রাশিয়া পার হয়ে হাঙ্গেরি হয়ে ইউরোপ ও পার্শ্ববর্তী সব রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে এ চেতনা।

বস্তুত তরুণ তুর্কিদের মাঝে "তুর্কিবাদ" ধারণাই প্রোথিত হয়। অটোমান সাম্রাজ্যের ওপর তাই তুর্কিবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধারণা তুর্কি সমিতিগুলোর প্রভাবশালী সাময়িকী প্রকাশ হতে থাকে। ১৯১২ সালে অ-রাজনৈতিক ক্লাবগুলো একত্রিত হয়ে "তুর্কি গৃহ" নামে সংগঠন গড়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য ছিল "জাতীয় শিক্ষার অগ্রযাত্রা সাধন ও তুর্কিদের বিজ্ঞান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদণ্ড বৃদ্ধি করা, যারা ইসলামের অগ্রগণ্য মানুষের মাঝে প্রধান এবং তুর্কি ভাষা ও জাতির উন্নতি সাধনে নিরলস কাজ করা।"

ইতিমধ্যে একতা ও উন্নয়ন কমিটির ভেতরে এবং বাইরে দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৯১১ সালের আগ পর্যন্ত কোন বিরোধি পার্টি এর প্রতি হুমকি হয়ে উঠেনি। "নতুন দল" নামকরণ করে এ দল কনজারভেটিভ ধ্যান-ধারণা পোষণ করত। জনসমুখে কমিটির নীতি ও সাংবিধানিক কার্যাবলি নিয়ে সমালোচনা শুরু করে নতুন দল। সাংবিধানিক কাঠামোর মাঝেই "ঐতিহাসিক অটোমান রীতি" প্রবর্তনের দাবি জানায়; সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু ধারার সংশোধনীয় মাধ্যমে "খলিফা ও সালতানাতের পবিত্র আইন" বলবৎ করার ও দাবি জানায় নতুন দল। এ দলের একজন নেতা দেশজুড়ে তিনটি আচরণ মেনে চলত প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম উন্মাদ, অতি উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উন্নতি; বর্তমান ঐতিহ্য ও প্রথা টিকিয়ে রাখার জন্য। এই দলের এহেন আচরণ বেশি প্রয়োজন ছিল। দলীয় কংগ্রেসে এরকম দলসমূহ নিয়ে আলোচনায় উষ্মা প্রকাশ পায়—সালোনিকাতে সর্বশেষটি আয়োজনের কথা হয়।

এরপর পরই "স্বাধীন ইউনিয়ন" নামে নতুন দল গঠন করে দামাদ ফরিদ পাশা। উন্নয়ন ও একতা কমিটি বিরোধিদের নিয়ে এ দল গঠন করা হয়। দুটি বিরোধি দলের মধ্যে প্রথমবারের মতো নির্বাচন হয় তুরস্কে। এর স্বাধীনতাবাদী প্রার্থী ভোট ধসের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এর উত্তরে কমিটি সংসদ ভেঙে দেয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১২ সালের বসন্তে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শাসক দল এখানে চাপ প্রয়োগ করেছিল। বিভিন্ন ভাবে ঘুষ ও ছাড় প্রদানের মাধ্যেমে এ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য লজ্জাকর পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়; বিরোধি পার্টির সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হয় যেন ভোটের ধস নামে। মাত্র ছয়জন স্বাধীনতাবাদী প্রার্থী ছিল। কমিটির বিরুদ্ধে তাই বিরোধি দল আন্দোলন শুরু করে দেয়।

এই বিরোধি আন্দোলন একটি সামরিক ষড়যন্ত্রের ফসল। একদল তরুণ অফিসারকে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয় আলবেনিয়া বিদ্রোহীদের সমর্থন প্রদান করার জন্য। ইস্তাম্বুলের ত্রাণকর্তা অফিসারদের মধ্য থেকে এদের উদ্ভব হয়। এদের উদ্দেশ্য ছিল একতা ও উন্নয়ন কমিটির ক্ষমতা ধ্বংস করে, মুক্ত ও আইনগত নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। একই সাথে রাজনীতি থেকে সেনাবাহিনীর অপসারণও দাবি করে তারা।

আলবেনিয়া প্রশ্নে মাহমুদ শেভকত পাশা যুদ্ধমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে। এরপর চেম্বারে বিশ্বাস ভোট (Vote of Confidence) অনুষ্ঠিত হয়, যা বিরোধিদের শান্ত করতে ব্যর্থ হয়। ত্রাণকর্তা অফিসারেরা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রেসের কাছে ইমাতেহার ও সুলতানের কাছে ঘোষণা পৌঁছে যায়, সামরিক প্রস্তুতি ও আন্দোলন সম্পর্কে প্রমাণ দেয়া হয়। কেবিনেট পদত্যাগ করে। ত্রাণকর্তা অফিসাররা নিজেদের দুজন পছন্দের প্রার্থীর নাম ঠিক করে দেয় প্রধান উজিরের মাধ্যমে সুলতানের অনুমোদনের জন্য। সুলতান নাম ঘোষণা করেন; মুক্তার পাশা ও কামিল পাশা। দেশের ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেয়া হয়—আবার শীঘ্রই তা কার্যকর হয়। প্রতিটি অফিসার শপথ নেয় যে, কোনো ধরনের রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ করবে না বা রাষ্ট্রীয় কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। সংসদ বাতিল হয়ে যায় ও সুলতান নতুন নির্বাচন ঘোষণা করেন।

কিন্তু ইতিমধে আভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলের মাঝেও সাম্রাজ্য, বিদেশিদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অটোমান সাম্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করার চেষ্টাকারী নতুন দেশ হলো ইটালি। যুদ্ধ মঞ্চ উত্তর আফ্রিকা। এখানে অটোমান ভূখণ্ড তিউনিসিয়া ফরাসিদের সামান্তরাজ্য হিসেবে ছিল। এখন ইটালিয়রা "লিবিয়া"র জন্য দাবি জানায়। এর দুই ঐতিহাসিক রোমান প্রদেশ ত্রিপোলিতানিয়া ও সেরিনাইকা ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শেষ আফ্রিকা ভূখণ্ড। কিছুকাল পূর্বে থেকেই ব্যবসা ও শান্তি বজায় রাখার মনোভাব দেখিয়ে ইটালিয়রা ত্রিপোলি'তে অনুপ্রবেশ শুরু করে। কিন্তু গণমাধ্যমের মাধ্যমে জানা যায় যে ত্রিপোলীকে ইটালি এখন তার "প্রমিজড্ ল্যান্ড" হিসেবে দাবি করছে। তুর্কিরা এর যথাযথ প্রতিরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে; ফলে যে কোনো মুহূর্তে "বেশি পেকে যাওয়া ফলের মতো নিজের ওপরেই এসে পড়বে।"

১৯১১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরে চরমক্ষণ এসে উপস্থিত হয়। ইটালির সরকার চরমপত্র প্রেরণ করে। এতে প্রদেশ দখলের জন্য ইটালির অভিপ্রায় ব্যক্তি করা হয়। কেননা "এর বিশৃঙ্খল ও অবহেলিত অবস্থা" ইটালির প্রজাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে পোর্তের সম্মতি দাবি করে ইটালি। পোর্তে সময় পাওয়ার জন্য প্রতিউত্তরে জানায়, ইটালির দাবিসমূহ নিয়ে আলোচনাতে পোর্তে প্রস্তুত আছে এবং অটোমান সার্বভৌমত্বের এ অংশে অর্থনৈতিক সুবিধা দিতেও ঘোষণা করে পোর্তে। ইটালির সরকার জনসমক্ষে শ্রদ্ধা পোষণ করে এ ব্যাপারে।

কিন্তু ইটালিতে জাতীয়তাবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল; অর্থনৈতিক স্বার্থও কাজ করেছে এর পেছনে। ফলে অটোমান সাম্রাজ্যের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইটালি একদিন পরে। তুর্কি এ প্রদেশ রক্ষার মতো অবস্থায় ছিল না। কেননা নৌশক্তির অপ্রতুলতার দরুন সেনাবাহিনী ও গোলাবারুদ পাঠানো যেত না। আবদুল হামিদের সময়ে নৌ-শক্তি হ্রাস পাওয়ায় আড্রিয়াটিক সাগরে ইটালিয় নৌ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ও ত্রিপোলীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বাহিনী প্রেরণ করে ইটালি। ব্রিটেনের মাধ্যমে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করায় মিশরের স্থলসীমার ওপর দিয়েও তুর্কি বাহিনীর চলাচল নিষিদ্ধ। তাই একদল তুর্কি অফিসার পাঠানো ব্যতীত আর কিছুই করার থাকে না পোর্তের। এদের মাঝে অ্যানভার ও মুস্তাফা কামাল ছিল।"

ইটালিয়রা দ্রুত উপকূল ও বন্দর দখল করে নেয়। কিন্তু তুর্কিরা মরুভূমির আরবীয় গোত্রদের সাহায্য পায়; এদেরকে তুর্কি অফিসারেরা সামরিক কায়দায় সংগঠিত করে তোলে। গেরিলা কৌশল শিখিয়ে দেয়া হয় এসব আরবীয়কে। ফলে শত্রুর আউটপোস্ট, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান আরোপ করা হয়। ফলাফল দুই মাসের মাঝে অচলাবস্থা তৈরি হয়।

তাই ১৯১২ সালের বসন্তে ইটালিয়রা রণতরীর দিক পরিবর্তন করে তুর্কি বন্দর লেভান্ত, বৈরুত ও স্মূর্ণাতে বোমাবর্ষণ শুরু করার জন্য; গ্রিক দ্বীপমালা বাদ দিয়ে রোডস্, কোজ ও অন্যান্য দ্বীপ দখল করে নেয় ইটালিয়রা। দার্দেনালেসের প্রহরায় নিযুক্ত দুটি দুর্গের ওপরও বোমা বর্ষণ করে তারা। এতে তুর্কিরা প্রণালি পথ বন্ধ করে দেয়; কেননা বসফরাসের দিকে রাশিয়াও পদক্ষেপ নিতে পারে। এতদসত্ত্বেও শরতের মাঝে ইটালিয়রা যুদ্ধে জয়ী হয়। ১৯১২ সালের ১৮ অক্টোবর তুর্কিরা ইটালিয়দের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে ত্রিপোলি ইটালিকে হস্তান্তর করা হয়। লিবিয়ার বাকি অংশ থেকে তুর্কি প্রত্যাহারকে স্থগিত করা হয়।

আফ্রিকাতে শান্তি স্থাপন করা তুর্কিদের জন্য জরুরি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ঠিক তার পরের দিন অটোমান সাম্রাজ্য বলকানে গ্রিস, সার্বীয়া ও বুলগেরিয়ার সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসে প্রথম ও শেষবারের মতো একত্রে বলকান লিগ গড়ে তোলে এসব রাষ্ট্র। এরপর মেসিডোনিয়াতে সামরিক আক্রমণ চালায়; এখানে তরুণ তুর্কিদের বদৌলতে অবস্থা পূর্বের তুলনায় খানিকটা ভালো। লিগের উদ্দেশ্য ছিল এর খ্রিস্টান জনগণকে তুর্কি শাসনের হাত থেকে রক্ষা করা। একই সাথে নিজেদের ভৌগোলিক সীমারেখা বৃদ্ধিও উদ্দেশ্য ছিল। এ সময় তুর্কি সামরিক বাহিনী ছিল বাইরে যুদ্ধরত আর দেশে চলছিল আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দল। তাই নিশ্চিতভাবে সঠিক সময়টি বেছে নিয়েছিল বলকান লীগ। এই মৈত্রী জোটের ভিত্তি হয় দুটি চুক্তি। প্রথমটি হয় বুলগেরিয়া ও সার্বীয়ার মাঝে ও আরেকটি হয় গ্রিস ও বুলগেরিয়ার মাঝে।

পোর্তের কাছে লিগ দাবি জানায় প্রদেশের জন্য নিরপেক্ষ খ্রিস্টান গভর্নর জেনারেল; স্থানীয় আইন সংসদ; স্থানীয় সেনাবাহিনী ও শক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ সংস্কারকাজের বাস্তবায়ন। নীতিগতভাবে পোর্তে সম্মতি প্রদান করলেও কোনো ধরনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। সংসদ পুনরায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে মত গৃহীত হয়।

কিন্তু তুর্কি সংবাদপত্রে যুদ্ধের সপক্ষে জনমত প্রতিফলিত হয়। এহেন ছাড় দেয়ার অবমাননা থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধকেই স্বাগত জানায় সকলে। শক্তিবর্গ, বার্লিন চুক্তির মাঝে রক্ষিত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বলকান সরকারগণ সংস্কার সম্পর্কে সব প্রতিজ্ঞা নিয়ে সন্দেহবাদী হয়ে ওঠে। নিজেদের জনগণের মাঝেও যুদ্ধের প্রতি সমর্থন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্যের জন্য এটি মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। ইউরোপে তুর্কি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বলকান রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় ছিল নগণ্য। এছাড়াও যুদ্ধের জন্য তুর্কি সেনাবাহিনী প্রস্তুতি ভালো না থাকায় একত্রিত হতে দেরি হয়। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় যুদ্ধের ক্ষমতা ক্ষয়ে গেছে তুর্কি বাহিনীর। নেতৃত্ব বাধা পেয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কারণে। এছাড়াও অ্যানভারসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার উত্তর আফ্রিকাতে থাকায় দুর্বল নেতৃত্বের ধকল সামলাচ্ছে তুর্কি সেনাবাহিনী।

সেনাবাহিনীর কাছে আধুনিক জার্মানি থেকে প্রস্তুতকৃত আধুনিক অস্ত্র থাকলেও এর যোগ্য ব্যবহারের জন্য সুদক্ষ স্টাফের অভাব ছিল। সৈন্য রসদ সরবরাহ করার দপ্তরকে সামগ্রিকভাবে অবহেলা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনী গ্রীষ্মের হালকা কাপড় পরনে বলকান শীত সহ্য করার মতো ইউনিফর্ম পর্যন্ত ছিল না তুর্কি বাহিনীর। অবশেষে ব্যর্থতার আরেকটি কারণ ছিল তুর্কি সেনাবাহিনীর নিজেদের মাঝে বিভক্তি। সাম্প্রতিক সময়ে খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় শত্রুর কারণের প্রতি সমব্যথী হয়ে ওঠে তারা। অন্যদিকে বলকান সেনাবাহিনী ইউরোপকে বিস্মিত করে দেয় মাত্র গত কয়েক বছরের মাঝে নিজেদের প্রভুত উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে। পশ্চিমা ধাঁচের প্রশিক্ষণ ও সদ্য পাওয়া রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী চেতনাও কাজ করেছে এ সফলতার পেছনে। অজেয় তুর্কিদের পুরোনো প্রবাদ চিরকালের মতো মুছে যায়; ইউরোপ দ্বারা নয় এককালের নিজের নিষ্পেষিত প্রজারাই তুর্কি সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটায়।

প্রথম বলকান যুদ্ধে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিন দিক থেকে পরিচালিত এ আক্রমণে তুর্কি বাহিনী একের পর এক পরাজিত হয়ে মাত্র ছয় সপ্তাহ টিকে ছিল। জার্মান-শিক্ষিত মুকুটধারী রাজকুমার কনস্টানটাইনের নেতৃত্বে গ্রিক বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হয়ে

শক্তিশালী তুর্কি বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়ে গোলাবারুদ ও যোগাযোগের বাহন কব্জা করে নেয়। তুর্কিরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে নিলে গ্রিক বন্দুক তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এরপর গ্রিক বাহিনী তুর্কি বাহিনীর পিছু নিয়ে সীমান্ত পার করে দেয়। ফলে সালোনিকা স্বাধীন হয়ে যায়। শহরে বিজয়ী বাহিনী প্রবেশ করে এর পৃষ্ঠপোষক সেইন্ট দিমিট্রিয়সের পর্বদিনে। রাস্তায় উল্লসিত গ্রিক জনতা গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে সৈন্যদের স্বাগত জানায়। প্রায় পাঁচশত বছরব্যাপী তুর্কি আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে নীল এবং সাদা গ্রিক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় প্রতিটি বাড়ির জানালা আর ছাদে। অর্ধ-চন্দ্র এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় চিরকালের তরে।

ইতিমধ্যে উত্তর দিকে ভার্দার উপত্যকার নিচে সার্বীয় বাহিনী এগিয়ে আসে কুমানোভো ও মনাস্টিরে তুর্কি বাহিনীকে পরাজিত করতে। যার অবশিষ্টাংশ দশ হাজার বন্দি হারানোর পর আলবেনিয়া সীমান্তে পালিয়ে যায়। পূর্ব দিকে বুলগেরীয়রা সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে থ্রেস আক্রমণ করে। কার্ক-কিলিসাতে দুই দিনব্যাপী চলা যুদ্ধে তুর্কি বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর লুলে বারগালে প্রধান তুর্কি বাহিনীর মোকাবেলা করে চাতালজা লাইনে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ অঞ্চলের অবস্থান কৃষ্ণসাগর আর মারমারা সাগরের মাঝখানে। ইস্তাম্বুলের আগে এটিই তুর্কিদের শেষ প্রতিরক্ষা বূহ্য। এখানে ক্রাপ বন্দুক ও এশিয়া থেকে আগত নতুন সৈন্যদের কল্যাণে চিরকাল অবরোধের মুখে একগুয়ে হয়ে ওঠা তুর্কি সৈন্যরা বুলগেরীয়দের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। ফলে ১৯১২ সালের ৩ ডিসেম্বর সার্ব ও বুলগেরীয়দের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে তুর্কিরা। কিন্তু গ্রিকদের সাথে এ রকম কোনো সুরাহা হয়নি।

এর পরিপ্রেক্ষিতে লন্ডনে কনফারেন্স বসে। ১৯১৩-এর ১ জানুয়ারি পোর্তে নিজের শান্তি প্রস্তাব পেশ করে। এখানে আড্রিয়ানোপলের, প্রাক্তন রাজধানী, অবস্থানের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এটিই ইউরোপে, সাম্রাজ্যের একমাত্র শহর—আলবেনিয়াতে স্কুটারি ও ইপিরালে জানিনা ব্যতীত যেখানে অবরোধকারীরা এখনো পৌঁছাতে পারেনি। এর পশ্চিমে থ্রেস পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকলেও তুর্কি প্রতিনিধিরা চাপ দিতে থাকে যেন আড্রিয়ানোপল ভিলায়েত অটোমান সাম্রাজ্যের অধিকারে থাকে। কিন্তু শক্তিবর্গ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পোর্তেকে জানিয়ে দেয় যেন আড্রিয়ানোপল বুলগেরিয়া কাছে সমর্পণ করা হয়।

এ ধরনের কোনো অন্যায় পদক্ষেপ রুখে দেয়ার জন্য তরুণ তুর্কিরা এ স্বাধীন রাজ্যের প্রশাসক কামিল পাশার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৯১৩-এর ২৩ জানুয়ারিতে, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য। উত্তর আফ্রিকা থেকে ঘুরে এসে অ্যানভার ছোট্ট এক দল সামরিক অফিসার নিয়ে পোর্তের বিরুদ্ধে দর্শনীয়

আক্রমণ শুরু করে। কেবিনেট চেম্বারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধমন্ত্রী নাজিম পাশাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে সৈন্যরা। অস্ত্রের মুখে কামিল পাশাকে পদত্যাগে বাধ্য করে। এরপর সুলতানের কাছ থেকে মাহমুদ শেভকত পাশাকে প্রধান উজির হিসেবে পুনর্নিয়োগের সিদ্ধান্ত আদায় করে অ্যানভার ও তার সৈন্যরা। অফিসে ফিরে এসে কমিটি শক্তিবর্গের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। বলকান রাষ্ট্রসমূহ ও যুদ্ধ বিরতি প্রত্যাহার করে। ফলে আবারো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

এরপর দীর্ঘ প্রতিরোধ সত্ত্বেও আড্রিয়ানোপল অবশেষে সার্ব-বুলগেরীয় যৌথ বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এরই মাঝে জানিনা গ্রিকদের হাতেও স্কুটারি দখল করে নেয় মন্টিনিগ্রোবাসী। আবারো লন্ডন কনফারেন্স শুরু হয়। এবার চুক্তির ফলে ইউরোপে অটোমান সাম্রাজ্যের আর কিছুই বাকি রইল না। থ্রেসের ছোট্ট একটু অংশ কেবল কৃষ্ণসাগর ও মারমারা সাগর বরাবর রয়ে গেল। আলবেনিয়া ও আজিয়ানো তুর্কি দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ পরবর্তী আলোচনার জন্য স্থগিত রইল।

কিন্তু মৈত্রী জোট বেশি দিন টিকে থাকেনি। নিজেদের বিজয় উপভোগ করার জন্য শীঘ্রই আবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বলকান রাষ্ট্রসমূহ। তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে বুলগেরিয়া আবারো অতীতে উদ্ধত ও গর্বিত বুলগেরিয়া ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। রাশিয়া চেষ্টা করে তাদের থামাতে। এ ব্যাপারে রাশিয়া বুলগেরিয়াকে সতর্ক করে দেয় যে যুদ্ধ আবারো শুরু হলে রুমানিয়া আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ফলে তুর্কিরা আবারো বুলগেরিয়াতে ঢোকার সুযোগ পাবে। কিন্তু বুলগেরীয় সামরিক সরকার নিজের অস্ত্রের ওপর আত্মবিশ্বাস রেখে গ্রিক ও সার্বীয়দের প্রতি ঘৃণাবশত সকল পরামর্শকে এক পাশে সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। প্রাক্তন মিত্রদ্বয়কে একত্রে পরাজিত করার অভিপ্রায় ছিল তার।

গ্রিক সালোনিকা দখলের জন্য নিজের মনোভাব লুকিয়ে রাখেনি বুলগেরিয়া। ওপরন্তু প্রথমেই চেষ্টা করেছিল সৈন্য পাঠিয়ে এ দুর্গ দখল করার। কিন্তু বিলম্বে পৌঁছানোর ফলে শহরে যৌথ বাহিনী হিসেবে রয়ে যায় গ্রিক ও বুলগেরিয়া। তখন থেকে এমনকি লন্ডন চুক্তির আগ পর্যন্ত উভয় পক্ষ এ শহর ও মেসিডোনিয়া উপকূল নিয়ে একে অন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। গ্রিসের বাইরে স্ট্রুমা উপত্যকায় উভয়ের মাঝে একচোট সংঘর্ষও হয়ে গেছে। কিন্তু সালোনিকা দখলের পর মেসিডোনিয়ার দক্ষিণাংশ পর্যন্ত ভূমি গ্রিক যে কোনো মূল্যে নিজের দখলে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

অন্যদিকে সার্বীয়া, ভাঙ্গার উপত্যকায়, বুলগেরীয় সাহায্য ব্যতীত তুর্কিদেরকে পরাজিত করে। তাই যুদ্ধ-পূর্ব সার্বীয়া-বুলগেরিয়া চুক্তি অনুযায়ী মেসিডোনিয়াতে নিজের ক্ষুদ্র একটি অংশ বজায় রাখার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হয়। তাই বলকান অঞ্চলে ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে সার্বীয়া সমস্যায় পড়ে যাবে। আবার আলবেনিয়া প্রস্তাবিত স্বাধীনতা লাভ করলে আড্রিয়াটিকেও কোনো ভূমি লাভ করতে বঞ্চিত হবে সার্বীয়া। তাই গ্রিস ও সার্বীয়া মৈত্রী গড়ে তোলে। উভয় পক্ষই একে অন্যকে সামরিক সাহায্য করতে ঐকমত্যে পৌঁছায় সম্ভাব্য বুলগেরীয় হামলার বিরুদ্ধে। যুদ্ধ সফল হলে কোন কোন অঞ্চল নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নেবে সে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পাশাপাশি তুর্কি সমর্থন আদায়ের জন্য প্রস্তাব দেয় এ মৈত্রী জোট। কিন্তু বুলগেরিয়া রাশিয়ার সতর্ক সংকেত অগ্রাহ্য করে ১৯১৩ সালের ১০ জুন পূর্বঘোষণা ছাড়াই মেসিডোনিয়া থেকে দ্বৈত আক্রমণ শুরু করে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল গ্রিক ও সার্বীয়দের মৈত্রী জোট ভেঙে ফেলা। ফলে শুরু হয় দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ।

"সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী হিসেবে রেকর্ড হওয়া এ অভিযান" মাত্র এক মাস স্থায়ী হয়। নাটকীয়ভাবে বুলগেরিয়া পরাজয় বরণ করে বলকান অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠেই গ্রিক ও সার্বীয়া নদী উপত্যকা হয়ে উত্তরে ও পর্বত পার হয়ে পূর্বে সালোনিকা পর্যন্ত এগিয়ে যায় বিভিন্ন বিজয়ের ফলে। রাজা কনস্টানটাইনের নেতৃত্বে গ্রিক বাহিনী বাইজেন্টাইন চেতনা ধারণ করে সেরেসের মধ্য দিয়ে পূর্বে এগিয়ে যায়। আগুন ছড়িয়ে ও নির্বিচারে হত্যা করার মাধ্যমে তাদের সামনের বুলগেরিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় তাদের রণতরী মেসিডোনিয়াতে কাভালা বন্দর ও পূর্ব থ্রেসে দিদিয়াগাহ বন্দর দখল করে নেয়। স্থলবাহিনী মারিতজা নদী পর্যন্ত থ্রেসীয় উপকূল পার হতে চলে যায়। রাশিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রুমানিয়াও এ যুদ্ধে যোগদান করে বসে। লন্ডন চুক্তির প্রতি অসন্তুষ্টি থাকায় ও বলকানে বুলগেরীয় আধিপত্য ভেঙে দেওয়ার জন্য দানিয়ুবে বাহিনী পাঠায় রুমানিয়া। সিসিস্ট্রিয়া দুর্গ দখল করে রুমানিয়া বাহিনী প্লেভনা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। সোফিয়ায় কাছাকাছি বারো মাইল গিয়ে তাদের যাত্রা থেমে যায়। পশ্চিম থেকে সার্বীয়া সীমান্ত পার হয়ে দানিয়ুব দুর্গ ভিদিনের ওপর হুমকি আরোপ করে। অবশেষে তুর্কিরা চুক্তির প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে। অ্যানভারের নেতৃত্বে তরুণ তুর্কিদের একটি দল আড্রিয়ানোপল পুনর্দখলের জন্য অগ্রসর হয় ও পূর্ব থ্রেসের ওপর তুর্কি প্রভুত্ব কায়েমের জন্য এগিয়ে চলে।

বিজয়ী শত্রুরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলায় রাশিয়ার মধ্যস্থতায় বুলগেরিয়া বাধ্য হয় শান্তি আনয়ন করতে। বুখারেস্ট চুক্তির মাধ্যমে সকলকে দাবি অনুযায়ী ভূখণ্ড প্রদান করে বুলগেরিয়া। পূর্ব বছরে যুদ্ধের বিজয় থেকে শুধু স্ট্রুমিতসা উপত্যকা ও থ্রেসির উপকূলের একটি অংশ রেখে দেয় বুলগেরিয়া। সার্বীয়া মেসিডোনিয়ার বিশাল একটি অঞ্চল পেয়ে যায়। গ্রিস এর

থেকেও বড় অংশ ও পশ্চিম থ্রেসে খাবালা বন্দর লাভ করে। রুমানিয়াকে দোবরুজা পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয়। আরেকটি পৃথক চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক আড্রিয়ানোপল ও কার্ককিলিসা ফিরে পায়। এছাড়াও পূর্ব থ্রেসের অংশবিশেষ পায় তুর্কিরা, এখানে দোমাটিকা ছিল। আর এর মাধ্যমে সোফিয়া পর্যন্ত রেলপথ এখানেই শেষ হয়ে যায়।

॥ ৪০ ॥

অটোমান সাম্রাজ্য ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শুরু হতে যাচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৩ সালের জুন মাসে একতাবাদী প্রধান উজির মাহমুদ শেভকত পাশাকে হত্যা করা হয়। পোর্তেতে নাজিম পাশা হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়া হয় এর মাধ্যমে। এর পর থেকে একতা ও উন্নয়ন কমিটির তরুণ তুর্কিরাই সাম্রাজ্যের ওপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করে। এমনতর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেমনটা ছিলেন সুলতান আবদুল হামিদ। কোনো বিরোধি দল ছাড়াই একতা ও উন্নয়ন দলের আমূল পরিবর্তন বাদী উপাদান নিয়ে দক্ষ ও নিষ্ঠুর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় অটোমান সাম্রাজ্যের ওপর।

এর প্রধান ছিল তিনজনের মাঝে কনিষ্ঠ অ্যানভার। মাত্র বিশের গোড়ায় বয়স হলেও বিপ্লবের নায়কে পরিণত হওয়া অ্যানভার তরুণ তুর্কিদের মুক্তির প্রতীক হিসেবে খ্যাতি পায়। নিজের ভাগকে নেপোলিয়নীয় ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে বিবেচনা করত অ্যানভার। যুদ্ধমন্ত্রী, জেনারেল, পাশা প্রভৃতি পদ গ্রহণ করার পর নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে অটোমান রাজকুমারীকে বিবাহ করার মাধ্যমে জামাত হিসেবে উপাধি পায় অ্যানভার। সম্মান বৃদ্ধির সাথে সাথে জৌলুশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার সম্পর্কে বলা হতো, "অ্যানভার পাশা অ্যানভারবেকে হত্যা করেছে।" নিজের পারিবারিক উৎস বিস্মৃত হয়ে একজন রেলওয়ে মুটে বাহকের পুত্র অথবা রেলওয়ে কর্মচারীর পুত্র—অ্যানভার সামরিক বিজ্ঞান বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে সেনাবাহিনীর নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। নিজের সৈন্যদের মাঝে বিশ্বস্ততা গড়ে তোলার উৎসাহ দিত অ্যানভার। ঠাণ্ডা এবং অবিচলিত স্বভাবের সুদর্শন অ্যানভার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ছিল দ্রুতগতির, কর্মে বিশ্বাসী হিসেবে যুদ্ধে ভয় পেত না। নিজের অফিসে তুর্কি সেনাবাহিনী পুনর্জন্মের ও সংস্কারের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিল অ্যানভার।

দ্বিতীয় জন ছিল অ্যানভারের চেয়ে নয় বছরের বড়—জামাল পাশা। অটোমান সামরিক পরিবারের সন্তান জামাল নিজেও একজন দক্ষ ও পেশাদার সেনা ছিল। কালো দাড়ি ও খাটো দেহাবয়বের অধিকারী জামালের প্রাণশক্তি

ছিল তুলনাহীন। কালো, মর্মভেদী চোখের দৃষ্টি দিয়ে চারপাশ পরখ করে দ্রুত প্রতিজ্ঞা স্থির করার অভ্যাস ছিল তার। ইস্তাম্বুলের সামরিক গভর্নর হিসেবে সামরিক অভ্যুত্থানের পর পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজানো ও দলের উদ্দেশ্য পূরণে এর ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেয় জামাল পাশা। পরবর্তীতে সিরিয়াতে-ও সেনাবাহিনী ও মেরিন মন্ত্রী হিসেবে সফল হয় জামাল পাশা। এখানে রাজবংশীয় রাজকুমারের মতো শাসন করে স্বৈরতান্ত্রিক জামাল। নম্র স্বভাবের কর্তৃত্বপরায়ণ জামাল ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধি খাটিয়ে কখনো কখনো নিজের দায়িত্ব ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিষ্ঠুর হতেও দ্বিধা করত না।

সমান ক্ষমতাসম্পন্ন তিন জন পাশার মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ছিল একজন সাধারণ নাগরিক, তালাত পাশা। আড্রিয়ানোপল থেকে আগত তালাত নিজের কৃষকসুলভ অতীতকে নিয়ে গর্ব করত। বিশ্বাস করা হতো যে তার মাঝে জিপসি পূর্বপুরুষের রক্ত ছিল। স্থানীয় শিক্ষায় শিক্ষিত তালাত প্রথমে পোস্টম্যান হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে। এরপর টেলিগ্রাফ অপারেটর থেকে সালোনিকা পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসে উচ্চ পদে আসীন হয়। এর মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হয় তালাত। বিপ্লবের পর একতা ও উন্নয়ন কমিটি সংস্থার বিশেষ দায়িত্ব পালন করে তালাত। দলীয় শৃঙ্খলা ও পরিচালনাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী তালাত আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী হয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনের ওপর বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে। পৌরুষদ্বীপ্ত ও উপভোগ করার স্বভাববিশিষ্ট তালাত পাশার দেহাবয়ব ছিল শক্তিশালী। উষ্ণ ব্যবহার ও কৌতুকপ্রিয়তা দিয়ে সাধারণভাবে ক্ষুরধার বুদ্ধি আর নিষ্ঠুরতাকে ঢেকে রাখত তালাত পাশা। নিজের জ্যাতাভিমান ছিল তীক্ষ্ণ। তাই দেশের স্বার্থে নিজের কর্মতৎপরতার জন্য "তুর্কি বিপ্লবের ডানটন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল।"

উপরোক্ত তিনজন ব্যতীত কাউন্সিলে প্রভাবশালীদের মাঝে আরো ছিল জাভিদ, জন্মগতভাবে ইহুদি হলেও মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। দক্ষ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করত জাভিদ। প্রধান উজির ছিল মিশরীয় খেদিভ বংশোদ্ভূত রাজকুমার সাঈদ হালিম। মাহমুদ শেভকতের স্থলাভিষিক্ত হয় হালিম। ভদ্রজনোচিত অবয়বধারী হালিম অর্থডক্স বা গোঁড়া মুসলিম হিসেবে একতাবাদীদের উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে একাধারে সাম্রাজ্যের মুসলিম জনগণ ও পোর্তের বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত।

একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ শেখ-উল-ইসলাম নিয়োগের ক্ষেত্রে একতাবাদীরা পূর্ব ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ নতুন পদক্ষেপ নেয়। ঐতিহ্যগত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের প্রধান এই পদ গ্রহণকারী হতো ইসলামি তত্ত্ব ও আইন বিশারদ। সুলতান সরাসরি এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিয়োগ দান করতেন ও সংসদীয় শাসনতন্ত্রের ঊর্ধ্বে থাকত। উলেমাদের মাঝ থেকে

নির্বাচন করা হতো তাকে। এই কারণে গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথে বাধা হিসেবে কাজ করত। এই বাধা দূর করণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একতাবাদীরা এই পদের জন্য নির্বাচিত করে মুস্তাফা হায়রী বে'কে। মুস্তাফা এই পদের প্রতীক পরিধানে ও পরিচয় প্রদানে প্রত্যাখ্যান করত। তাই রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে পাগড়ি পরিত্যাগ করে মুস্তাফা। সংসদ সদস্য হিসেবে একটি নিরপেক্ষ বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় ফাউন্ডেশন ও আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করত মুস্তাফা। একতাবাদীরা এভাবে প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে সামাজিক ও রাজনৈতিক আধুনিকায়নের জন্য নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে ধর্মের ওপর নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

প্রাসাদের ক্ষেত্রেও এসব নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। প্রতি-বিপ্লবের সময় একতাবাদী বিরোধিরা এখানে এসে জড়ো হয়েছিল। পরবর্তীতে কৃষ্ণ খোঁজাকে তাই সামরিক আইনে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেয়া হয়। ১৯১৪ সালের জানুয়ারি থেকে রাজ-পরিবারের সদস্যদের রাজনীতি ও যে কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। চলাচলের স্বাধীনতাও হয়ে পড়ে সীমিত। একই সাথে সুলতানের পরিষদবর্গের অনেকেই কমিটির শিষ্য রাজদরবার কার্যত কমিটির নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

প্রশাসনিকভাবে একতাবাদী ত্রি-শাসক দমন-নিপীড়ন বা নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গঠনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রাদেশিক ও স্থানীয় ভাবে নতুন প্রশাসন গঠিত হয়। ইস্তাম্বুলকে আধুনিক করে তোলা হয়। আগুন নির্বাপন যন্ত্র, সরকারি যাতায়াত ব্যবস্থাসহ মিউনিসিপ্যাল নগরের সমস্ত সুবিধা প্রবর্তন করা হয়। পুলিশ বাহিনীর পুনর্গঠন করে মেসিডোনিয়াতে আবদুল হামিদ যেমন নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন, তেমনি পুরো সাম্রাজ্যেও গঠন করা হয়। বিদেশি উপদেষ্টারা এক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করে। আইন ক্ষেত্রে সংস্কার নিশ্চিত করা হয়। প্রতিটি স্তরে সরকারি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রথমবারের মতো ইস্তাম্বুলে নারীদের জন্য বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সামনের বছরগুলোতে এর ওপর ভিত্তি করেই নারী দাসত্বমোচন আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। ফলে পেশাজীবী স্তরে নারীদের আগমন ঘটে আর নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সবশেষে, সংবিধান চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য সাম্রাজ্যজুড়ে সংসদীয় নির্বাচন হয় ১৯১৩ এর শীতকালে। আর তৃতীয় অটোমান সংসদ বসে ১৯১৪ সালের বসন্তে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত "কম-বেশি বুদ্ধিমান প্রভুত্বকারী"র "বাধ্যগত হাতিয়ার" হিসেবে একে খারিজ করে দেয়। বস্তুত এখানে একটি মাত্র সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল থাকলেও সীমিত পরিসরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসহ

বিভিন্ন উপাদান অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউরোপে পরাজয়ের পর থেকে সাম্রাজ্যের জনগণের মধ্যে মুসলিম তুর্কির অংশই বেশি ছিল। তুর্কি সংসদীয় ডেপুটিবৃন্দ দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। একে রক্ষার জন্য আমূল পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহী ছিল সবাই।

সবচেয়ে বেশি সংস্কার প্রয়োজন ছিল সেনাবাহিনীতে। এখানকার প্রশাসক ছিল অ্যানভার। জার্মান সামরিক মিশনের অধীনে প্রশিক্ষণ নেয়া তরুণ অফিসার বিপ্লবের পর তুর্কি সামরিক প্রতিনিধি দলের একজন হয়ে বার্লিনে যায় অ্যানভার। অ্যানভার জার্মান সামরিক বাহিনী দেখে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। জার্মান সামরিক প্রক্রিয়ার শক্তি ও দক্ষতা দেখে অভিভূত অ্যানভার নিজ দেশে এর অনুকরণ শুরু করে। দুটি বলকান যুদ্ধের পর তুর্কি বাহিনী প্রায় হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল।

তুর্কি সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসার'রা সিনিয়রদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। কেননা এরা যুদ্ধের সময় প্রায় দ্বিধায় ভুগত। এমনকি পরাজিতের ন্যায় মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ করত। ফলে অ্যানভারের নেতৃত্বে তরুণ অফিসারেরা সিনিয়রদের অতিরিক্ত সাবধানবাণীতে কর্ণপাত না করে আড্রিয়ানোপল পুনর্দখল করে নেয়। যুদ্ধমন্ত্রী উজ্জত পাশা পুরাতন সৈন্য অফিসারদের বহিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করলে ও নিজে এ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। কেননা তার মতে, "যাদের বহিষ্কার করা হবে তারা সকলে আমার বন্ধু।" তাই অ্যানভারকে ইজ্জত পাশার স্থলে সাময়িকভাবে যুদ্ধমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয় ১৯১৪ এর জানুয়ারির প্রথম দিকে। সুলতান স্বয়ং সংবাদপত্রে এ নিয়োগের কথা পড়ার পর মনোভাব ব্যক্ত করেন "এটি অচিন্তনীয়। সে বড় বেশি তরুণ।" কয়েক ঘণ্টা পরে ৩২ বছর বয়সে যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে জনগণের সামনে আসে অ্যানভার। এর পর এক রাজকীয় আদেশ বলে সাম্রাজ্যজুড়ে বহিষ্কারাদেশ সূচিত হয়। শত শত অফিসারকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়, এদের মাঝে "মেসেডোনিয়াতে শোচনীয় পরাজয়ে বরণকারী সেনানেতারা ও পঞ্চান্নের ওপরে অনেক জেনারেল ছিল।" এছাড়া অ্যানভার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পূর্বে অটোমান সেনাবাহিনীতে যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন অফিসার থাকত। কিন্তু এখন থেকে কেবল যুদ্ধবিদ্যালয় পারদর্শী অফিসারাই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল জার্মান সেনাবাহিনী থেকে চল্লিশ জন অফিসার তুর্কি সরকারের অনুরোধে নতুন ও বিশেষ মিশনে তুরস্কে আগমন করে। এর নেতৃত্বে ছিল জার্মান মেজর জেনারেল লিমানভন স্যান্ডারস। এর ফলে তৎক্ষণাৎ কূটনৈতিক সংকট শুরু হয়। কেননা ধারণা করা হতে থাকে স্যান্ডারস তুর্কি প্রথম সেনা দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। এ দল ইস্তাম্বুলের ও আশপাশের দুর্গ প্রতিরক্ষার দায়িত্বে

নিয়োজিত। জার্মান সরকারের মনোভাব যাই থাকুক না কেন স্যান্ডারস্ ছিল মূলত একজন সৈন্য। কোনো ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না তার মাঝে। কিন্তু এক্ষেত্রে রাশিয়ার উদ্বিগ্নতা বেড়ে যায়। কেননা একজন জার্মান জেনারেল প্রণালি নিয়ন্ত্রণ শুরু করলে ইস্তাম্বুলে জার্মানি সরকারের আধিপত্য বেড়ে যাবে।

তাই সাজোনোভ, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এতে বিরোধিতা শুরু করে। সাজোনোভ তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ও জার্মানির সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনায় দাবি করে বসে যে ভন স্যান্ডারস ও তার মিশনকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থানান্তর করা হোক। ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকারও এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে সাজোনোভের সাথে একমত পোষণ করে। তাই মুখ রক্ষা করা সমঝোতার জন্য ভন স্যান্ডারস্‌কে জার্মান সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তুর্কি সেনাবাহিনীতে ফিল্ড মার্শাল হয়ে যায় স্যান্ডারস্। ফলে সামান্য সেনাদলের নেতৃত্ব থেকে সরে গিয়ে তুর্কি সেনাবাহিনীর পরিদর্শক জেনারেলে পরিণত হয় ভন।

এতদসত্ত্বেও জার্মান ও স্লাভদের মাঝে বৈরিতা বেড়ে যাওয়ায় রাশিয়ার বিরোধিতার পেছনে বাস্তবসম্মত কারণ রয়েছে। কায়রোতে ব্রিটিশ আধিপত্যের মতো ইস্তাম্বুলের ওপর জার্মান আধিপত্যের ভয়ে ভীত হয়ে সাজোনোভ এর পর থেকে প্রণালি নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা চালাতে থাকে; যেন তুরস্ক ও রাশিয়া উভয়ের স্বার্থ এতে রক্ষা পায়।

এখানে ব্রিটেন মেনে চলে সতর্কীকরণ নীতি। পূর্ববর্তী কয়েক দশক ধরে ব্রিটেন নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করে এসেছে ইউরোপের অসুস্থ মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ইউরোপীয় অংশে ক্ষুদ্রগোষ্ঠীদের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করেছে ব্রিটেন। মেসিডোনিয়া সংকটের মুহূর্তে ১৯০৭ সালে "কূটনৈতিক বিপ্লব" সমেত অ্যাংলো-রাশিয়া আঁতাত গড়ে ওঠে। পারস্যে-অ্যাংলো-রাশিয়া স্বার্থ নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও এটি ১৯০৪ সালের অ্যাংলো-ফরাসি আঁতাতের সাথে যৌথভাবে ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ত্রি-আঁতাত জোট গড়ে ওঠে। রাশিয়ার সাথে ব্রিটেনের নতুন সম্পর্ক নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড গ্রে মত পোষণ করে যে, এটি এতটাই নাজুক; যেন মনে হয় অটোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখার প্রাচীন ব্রিটিশ নীতিতে সংশোধন আনতে হবে। ১৯০৮ সালে এডওয়ার্ড ইস্তাম্বুলে এক সাক্ষাৎকারে জানায় "আমরা লর্ড বেকনসফিল্ডের পুরাতন নীতিতে ফিরে যেতে পারিনা। আমরা রাশিয়া বিরোধি এমন কোনো সন্দেহের উদ্রেক না করেই আমাদেরকে তুর্কি সমর্থনকারী হতে হবে।"

কিন্তু গ্রে তরুণ তুর্কিদের সংবিধান বিপ্লবকে শুরুতে উক্ত অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, অন্যদিকে নিজের দুই মিত্রের তুর্কি স্বার্থ ভঙ্গ হয়—রাশিয়ার স্বার্থ

প্রণালিও ফরাসিদের স্বার্থ রক্ষিত আছে সিরিয়া ও লেভান্তে—ব্রিটেন যে কোনো ধরনের আক্রমণ এড়িয়ে চলে। ফলাফলস্বরূপ নতুন সরকার ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্রিটিশভক্ত হয়ে পড়ে "সংসদের জননী" আখ্যা দিয়ে সমস্ত ব্রিটিশ পরামর্শ মেনে নিতে থাকে পোর্তে।

যাই হোক, এর পরও ব্রিটিশ নীতি হয় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দয়ার্দ্র আচরণ করা। ১৯০৮-এর নভেম্বরে তরুণ তুর্কিরা উচ্চপদস্থ দুজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে লন্ডনে। অ্যাংলো-তুর্কি মৈত্রী জোটের প্রস্তাব নিয়ে যায় এ প্রতিনিধিদ্বয়; যাদের আশা ছিল ফ্রান্সকে'ও এর অন্তর্ভুক্ত করা। গ্রে নতুন সরকারকে নিজের শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটিশ পরামর্শের প্রস্তাব দেয়। বস্তুত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এসব পরামর্শ বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু একাধারে মৈত্রী জোটের শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে নিজের হস্ত পরিষ্কার রাখাই ছিল ব্রিটিশ নীতি।

১৯০৯-এর জুলাইতে একই ধরনের আরো একটি পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রতি বিপ্লবের পর তুর্কি সংসদীয় প্রতিনিধিদল জার্মান প্রভাব নিয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠে। এরকমভাবে এদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রথম বলকান যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর ইউরোপের অসুস্থ মানুষটি কার্যত মৃত্যুবরণ করেছিল এবং একে বাঁচাবার উপায় ছিল না। লন্ডন কনফারেন্সে গ্রে বিস্মিত হয়ে চিন্তা করতে থাকে যদি তরুণ তুর্কিরা ইউরোপে তুরস্কের পরিচালনা না করতে পারে অন্য কোনো শক্তির এতটা উদ্দেশ্য নেই, তা করার।

পশ্চিমা দৃষ্টি এখন ইউরোপের ওপরেই নিবদ্ধ। তরুণ তুর্কিরা তাই অনুধাবন করতে পারে যে পশ্চিমা ইউরোপীয় শক্তি আর তাদেরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না; যদি না তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। একই সাথে দুর্বল, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অসচ্ছলতার দরুন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোনো একটি বৃহৎ শক্তির সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতীত তাদের টিকে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়বে।

১৯১৩ সালের জুন মাসে প্রধান উজির তৌফিক পাশা পুনরায় অ্যাংলো তুর্কি জোটের কথা উঠায় একে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এক্ষেত্রে কারণ ছিল, ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার লুইস ম্যালেটটে এর ভাষায়, "এ মুহূর্তে তুরস্কের সাথে জোটবদ্ধ হলে একত্রিত ইউরোপ আমাদের বিরোধিতা করবে এবং আমাদের এবং তুরস্ক উভয়ের কারণ হবে।"

গ্রের দৃষ্টিতে এ সময় তুরস্ক ছিল, "এশিয়ার অসুস্থ ব্যক্তি"। ১৯১৩ সাল জুড়ে রাশিয়া ব্যতীত ব্রিটেন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইটালি তুর্কিদের সাথে আলোচনা করে এবং একে অন্যের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কের এশীয় অংশে অর্থনৈতিক প্রভাবশীল অঞ্চল গড়ে তোলে। এছাড়াও বস্তুত শক্তিবর্গ নিজেদের মাঝে এশিয়াতে তুর্কি ভূখণ্ড ভাগ-বাটোয়ারা করায় নীল-

নকশাও প্রস্তুত করে নেয়। এদের মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল আগস্ট-এর কাছাকাছি বাগদাদ রেলপথ নিয়ে অ্যাংলো-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ রেলপথ ও পার্শ্ববর্তী সমস্ত বাণিজ্যিক প্রভাবের ওপর জার্মানি অধিকার পায়; আনাতোলিয়া ও সিলিসিয়ান অংশসহ। কিন্তু এ ব্যাপারেও নিশ্চয়তা আদায় করা হয় বসরার বেশি আর এগোবে না জার্মানি। এর মাধ্যমে মেসোপটেমিয়া ও পারস্য উপসাগরে ব্রিটেনের রাজকীয় স্বার্থ নিরাপদ হয়।

কিন্তু এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল নিয়ে কোনো চুক্তি তৈরি হয়নি। রাশিয়া, নিজের ক্ষেত্রে প্রণালি পথ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কেননা যে কোনো ধরনের যুদ্ধে এ পথ হুমকির মাঝে পড়লে তা মিত্র হিসেবে ব্রিটেন ও রাশিয়ার জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করার। তাই রাশিয়ার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় বিপদ-জার্মানিরা এখানেই হুমকিস্বরূপ দেখা দিতে পারে। কিন্তু এই বিপদের মোকাবেলায় ব্রিটেন কিছুই করেনি। কেননা তুরস্কের নিরপেক্ষতার স্বপ্নে বিভোর ছিল ব্রিটিশ সরকার।

ইস্তাম্বুলে রাষ্ট্রদূত ব্যারন ভন ওয়াগেনহেইমের মাধ্যমে জার্মানি তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যারন ততটাই আধিপত্য স্থাপন করে যতটা করতে চেয়েছিল ভন স্যান্ডারস সামরিক ক্ষেত্রে। বস্তুত ফিল্ড মার্শাল ও ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে স্যান্ডারসের ক্ষমতা পূর্ব থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাষ্ট্রদূতের মতোই নিজেকে "ব্যক্তিগত প্রতিনিধি" হিসেবে দাবি করে স্যান্ডারস কাইজারের তরফ থেকে। ধীরে ধীরে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জার্মানির পরিকল্পনা হলো প্রণালি পথ নিয়ন্ত্রণ করা। অতীতের মতোই এ অঞ্চল এখনো পূর্ব-দিকের প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কিন্তু ব্রিটিশরা যতই নেতিবাচক প্রবৃত্তি দেখাক না কেন রাশিয়া ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসে। ১৯১৪-এর বসন্তে ইস্তাম্বুলে রাশিয়া রাষ্ট্রদূত, তুর্কি মন্ত্রীদের সাথে প্রণালি নিয়ে উভয়ের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে আলোচনায় বসে। রাশিয়া, তুরস্ককে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে সম্মত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে, মিত্র হিসেবে শত্রুর সম্মুখে প্রণালি পথ বন্ধ করে দেবে তুরস্ক। বিজয়ের পর (যদিও সেটা পরবর্তীতে নিশ্চিত হবে) তুরস্ক এশিয়াতে জার্মানি ছাড় গ্রহণ করবে ও নিজের সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

রাশিয়ার প্রস্তাবে আগ্রহী তালাত। ১৯১৪-এর মে মাসে আনুষ্ঠানিক তুর্ক-রাশীয় জোটের প্রস্তাব জানায় তালাত সেন্ট পিটারস্‌বুর্গ ভ্রমণের সময়। পরবর্তী মাসে জামাল প্যারিস গমন করে এখানে ত্রি-আঁতাত জোটের সকল শক্তির সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব জানায় জামাল। এক্ষেত্রে সতর্কীকরণ শুনতে পায় জামাল—যাকে এক অর্থে প্রত্যাখ্যান বলা যায়—এটি নির্ভর করবে প্রত্যেকের সিদ্ধান্তের ওপর, ফ্রান্স এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

বস্তুত কোনো চুক্তি হয়নি তাই। বলকান রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তে তুর্কিদেরকে ভৌগোলিক নিশ্চয়তা প্রদানে প্রত্যাখ্যান করে ফ্রান্স। ব্রিটিশ সরকারও এতে একমত হয়ে তুরস্ককে চাপ প্রদান করে নিরপেক্ষ থাকার জন্য। এছাড়াও ব্রিটেনের আশা ছিল তুরস্ক হয়তো নিজের স্বার্থেই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে।

ষষ্ঠ এবং শেষবারের মতো ইউরোপীয় জোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হলো তুরস্কের। তালাতে এবং জামাল শূন্য হাতে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসে। শীঘ্রই তাই তিন শাসকের শেষ জন অ্যানভার-এর কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। জার্মানির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে রাশিয়া ও অটোমান সাম্রাজ্যের ওপর নেমে আসে অশুভ সংকেত। কার্যত এভাবেই ইউরোপীয় যুদ্ধ নিশ্চিত হয়ে যায়।

১৯১৪-এর জুন মাসের ২৮ তারিখে অস্ত্রীয় রাজবংশের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রান্সিস ফার্দিনান্ড সস্ত্রীক খুন হয়ে যায় বসনিয়ার সারাজেভোতে ভ্রমণের সময়ে। এই গুপ্তঘাতক ছিল সার্বীয়া'র একটি গোপন সংগঠনের শিক্ষার্থী। বসনিয়া ও হার্জিগোভিনাকে অস্ট্রিয়ার সাথে সংযুক্তির বিরোধিতা করে একটি প্যান-সার্ব রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য ছিল তার, দক্ষিণ স্লাভ জাতীয় রাষ্ট্র। কেন্দ্রীয় শক্তি স্থানীয়ভাবে এই সংঘর্ষ দমন করার চেষ্টা চালিয়েছিল । জার্মানি অস্ট্রিয়াকে একটি শূন্য চেক প্রদান করে। আর অস্ট্রিয়া সার্বীয়াকে চরমপত্র প্রদান করে। দক্ষিণ স্লাভ সোসাইটি বন্ধ করার দাবি জানায় অস্ট্রিয়া। এর পাশাপাশি এ উদ্দেশ্যে অস্ত্রীয় সহযোগিতা গ্রহণ করার ওপর চাপ প্রয়োগ করে। এর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয় স্যার এডওয়ার্ড গ্রে, "একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরেকটি রাষ্ট্র এমতরো দলিল পাঠাতে পারে, আমি আর দেখিনি।" তার দৃষ্টিতে এর মাঝে ইউরোপীয় শান্তির প্রতি হুমকি ছিল। কিন্তু বেলগ্রেডের কাছ থেকে শান্তিজনক প্রতিউত্তর প্রত্যাখান করে অস্ট্রিয়া আর সার্বীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ২৮ জুলাই।

জার্মানি প্রথম দিকে রাশিয়ার কাছ থেকে কোন আক্রমণ প্রত্যাশা করেনি। কেননা তার মতে রাশিয়া এ সময় প্রস্তুত ছিল না। কাইজার এ ব্যাপারে বুঝতে ভুল করে যে কেন্দ্রীয় শক্তি সার্বীয়া দখল করতে চাইলে রাশিয়া তা প্রতিহত করবে। কেননা বলকান দ্বীপপুঞ্জে স্লাভদের ওপর রাশিয়া তার প্রভাব হারাবে; এমন পদক্ষেপ না নিলে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অস্ট্রিয়াকে থামাবার আর উপায় নেই।

৩১ জুলাই জার্মানিকে প্রাথমিকভাবে সতর্কীকরণ পাঠাবার পর সাধারণভাবে সৈন্য সমাবেশের ঘোষণা প্রদান করে। ১ আগস্ট জার্মানি রাশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সকে জার্মানি নিরপেক্ষ থাকার দাবি জানালে ফ্রান্স প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ৩ আগস্ট। জার্মান বাহিনী

বেলজিয়ামে অনুপ্রবেশ করলে ব্রিটেন বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য ৪ আগষ্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেই শুরু হয়, গ্রের মতানুসারে "মানবজাতির ওপর ভেঙে পড়া সবচেয়ে বড় বিপর্যয়।"

এর দুই দিন পূর্বে, বিশেষ ভাবে অ্যানভারের উদ্যোগে গোপনে তুরস্ক ও জার্মানির মাঝে চুক্তি হয়। এর শর্ত অনুযায়ী তুরস্ক যুদ্ধে জাড়িয়ে পড়বে কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে; যদিও রাশিয়া অস্ট্রিয়া-সার্বীয়া সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আগস্ট মাসের ৪ তারিখে এহনে চুক্তির কথা না জানলেও তুরস্ক সৈন্য সমাবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে জানতে পেরে গ্রে ইস্তাম্বুলে নিজের প্রতিনিধির মাধ্যমে তুর্কিদের নিরপেক্ষতার জন্য চাপ দিতে তাকে। গ্রে এ ব্যাপারে প্রতিনিধিকে সতর্ক করে দেয় যে, "তুরস্কের পুরাতন বন্ধুর কাছ থেকে পরামর্শ পৌঁছে দিতে সাবধান থাকে। এমনটা যেন না ভাবা হয় যে আমরা হুমকি দিচ্ছি।"

এতদসত্ত্বেও ইস্তাম্বুলের ওপর জার্মান প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করে গ্রে বুঝতে পারে যে, "অ্যানভার পাশা তুরস্ককে জার্মানির সাথে দেখতে চায়; তাই অ্যানভারকে হত্যা করতে পারলেই তুরস্ককে জার্মানির সাথে একত্রিত হতে বাধা দেয়া যাবে।" ত্রি-শাসকের বাকি দুজন এগিয়ে আসে অ্যানভারকে সমর্থন দিতে। জার্মানি জাটের আমন্ত্রণ দিলে তালাত জামালকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি নিজেই দেখো, ফ্রান্সের কাছ থেকে কোনো আশা নেই আমাদের। ফ্রান্স যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে, তুমি জার্মানিকেও সেভাবে ফিরিয়ে দেবে?" জামাল এর উত্তরে জানায়, "বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য কোনো জোটকেই আমি প্রত্যাখ্যান করব না।" অন্যদিকে যত দেরিতে সম্ভব যুদ্ধে অংশ নিতে চায় তুরস্ক; যেন প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায় প্রস্তুতির জন্য। এতে জার্মানি একমত পোষণ করে আর তুর্কি সরকার জোট সম্পর্কে গোপন রেখে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে। কিন্তু সৈন্য সমাবেশ শুরু করে।

ইতিমধ্যে সুলতান ওসমান ও রেশাদিয়ে নামক দুটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে নেওয়ায় ব্রিটেনের ওপর রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে তুরস্কবাসী। এ জাহাজদ্বয় ইংরেজ শিপইয়ার্ডে তুরস্কের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ব্রিটেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায়—কৃষ্ণসাগরে নৌবাহিনীর ভারসাম্যে সমস্যা সৃষ্টি হবে, যদি জাহাজদ্বয় তুর্কির হাতে থাকে—এদের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেয়। এর বিনিময়ে সাড়ে সাত মিলিয়ন পাউন্ড দেয়া হয় তুরস্ককে। পোর্তে ব্রিটেনকে দায়ী করে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করার দায়ে। জনগণ একে মনে করে সম্পূর্ণ চুরি হিসেবে আর জার্মান সমর্থনকারী একটি সংবাদপত্র "হাজারো অভিশাপ বর্ষণ করে।"

এই ঘটনা ব্রিটেনের পরিবর্তে জার্মানি সমর্থন বাড়াতে সাহায্য করে ত্রি-শাসককে। ফলে তুর্কিবাসী জার্মানির সাথে একাত্মতা বোধ করতে থাকে।

আগস্ট মাসের ১০ তারিখে দুটি জার্মান যুদ্ধজাহাজ ভূমধ্যসাগরে থাকাকালীন ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এদের পিছু নেয়। উপায়ন্তর না দেখে দার্দেনালেসে ঢোকার অনুমতি চায় জার্মান জাহাজদ্বয়। অ্যানভার এতে সম্মতি দিয়ে দুর্গকে নির্দেশ দেয় পিছু ধাওয়াকারী ব্রিটিশ জাহাজ দেখলেই যেন গুলি ছোড়া হয়।

জোটবদ্ধ রাষ্ট্রদূতরা একে চুক্তির বরখেলাপ বলে বিরোধিতা করতে চেষ্টা করে। তাই পরের দিন ঘোষণা করা হয় যে জাহাজদ্বয়কে তুরস্কের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। জার্মান সংবাদপত্রসমূহকে জানিয়ে দেয় যে, ব্রিটেন যে জাহাজদ্বয় চুরি করে নিয়ে গেছে তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে এই দুই জার্মান জাহাজ। এই বিক্রির শর্ত হয় যে জার্মান কমান্ডার অ্যাডমিরাল শোচন তুর্কি জাহাজবহরের কমান্ডার ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল লিম্পাসের জায়গা নেবে। দুই জার্মান জাহাজকে নামকরণ করা হয় ইয়াভুজ ও মেদিলি। এদের নাবিকেরা তুর্কি ফেজ পরিহিত হয়ে মারমারা পার হয়ে ইস্তাম্বুলে এসে নোঙ্গর করে।

মেরিন মন্ত্রণালয় থেকে রাজনৈতিক চাপ প্রতিরোধ না করতে পেরে ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল লিম্পস সমস্ত ব্রিটিশ নাবিককের নিয়ে তুর্কি জাহাজ বহর ছেড়ে চলে যায়।

অ্যাডমিরাল শোচনকে আনুষ্ঠানিকভাবে নৌ কমান্ডার ইন চিফ পদে ভূষিত করায় জার্মানি দর্শনীয় এক বিজয় লাভ করে। পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে জার্মান নাবিকেরা তুর্কি নৌবাহিনীতে একাত্ম হয়ে যায়। আর ব্রিটিশ নৌ মিশন শেষ হয়ে যায়। জাভিদ বে তার বেলজিয়াম বন্ধুর কাছে বর্ণনা করে যে, জার্মানি ব্রাসেলস্ দখল করে নিয়েছে; বেলজিয়ান বন্ধুটি জাহাজদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে সমান একটি দুঃসংবাদ দেয়, "জার্মানি তুরস্ক দখল করে নিয়েছে।"

তুর্কিরা আর বেশি দিন পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকবে না, অনুধাবন করতে পেরে ফার্স্ট লর্ড উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ স্কোয়াড্রনকে জানায় প্রণালি দিয়ে যাওয়ার সময় মারমারা সাগরে এই দুই জার্মান জাহাজকে গুলি করে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সহকর্মীরা এটি মেনে নেয়নি। নতুন যুদ্ধ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কিচেনারের সাথে পরিকল্পনা করে চার্চিল গালিপল্লী দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করে। এতে গ্রিক বাহিনীর সমর্থন পাওয়ায় গ্রেকে নির্দেশ দেয় রাশিয়ার সমর্থন আদায়ের জন্য। রাজা কনস্টানটাইন (যার পত্নী ছিল কাইজারের ভগিনী) ঘোষণা করে তুর্কিরা প্রথমে আক্রমণ করলেই কেবল গ্রিকরা আক্রমণ করবে। অন্যদিকে উপদেষ্টারা মত দেয় যে স্থলবাহিনী ব্যতীত নৌ আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। তাই এ কর্মপরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।

এটি এমন একটি মুহূর্ত যখন শান্তি অথবা যুদ্ধ কিছুই নিশ্চিত নয়। তুর্কিরা এখন একটি শক্ত অবস্থানে আছে। ফলে কূটনৈতিকভাবে ত্রি-মৈত্রী জোটকে ও ত্রি-আঁতাতকে একে অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। আগস্টের ১৬

তারিখে রাশিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে একত্রিত হয় প্রস্তাবিত তুর্কি নিরপেক্ষতা ও অখণ্ডতা চুক্তিতে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। কেননা নিরপেক্ষতার বিনিময়ে তুরস্ক এমন সব দাবি জানায়, যা ত্রি-মৈত্রী জোট কখনোই স্বীকৃতি দিতে পারেনি–সন্ধি শর্তে আত্মসমর্পণের সম্পূর্ণ রদ, ব্রিটেন তুর্কি যুদ্ধজাহাজসমূহ ফিরিয়ে দেবে, আজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম থ্রেসে ভূ-খণ্ড ফিরে পাবে তুরস্ক। একরাত পরেই সংশোধিত প্রস্তাব প্রস্তুত হলেও ফ্রান্সে জার্মান বাহিনীর বিশাল বিজয়ের সংবাদে এ ধরনের সব প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়।

স্যার এডওর্য়াড গ্রে দুটি মূল উদ্দেশ্য পূরণে কূটনীতি শুরু করে। প্রথমত, যুদ্ধে তুরস্কের যোগদানকে ঠেকানো না গেলেও যতটা সম্ভব বিলম্ব করতে হবে। কেননা লর্ড কিচেনার চাপ প্রয়োগ করে যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে অথবা অন্তত ব্রিটেনের সাথে শান্তি বজায় রাখতে হবে। যেন সুয়েজ খাল দিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে নিরাপদে নিয়ে আসা যায়। দ্বিতীয়তা গ্রে নিশ্চিত করতে চেয়েছিল যে বিপর্যয় ভেঙে পড়লেও ব্রিটেনের যেন কোনো দোষ না হয়। উভয় উদ্দেশ্যই মোটামুটিভাবে পূর্ণ হয়।

ভারতীয় বাহিনী মিশর হয়ে ফ্রান্সের পথে ভূমধ্যসাগর দিয়ে নিরাপদে যাত্রা করে।

২৭ সেপ্টেম্বর দার্দেনালেসের মুখে তুর্কি টর্পেডো জাহাজকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এই অযৌক্তিক কার্য জামার্নিকে সাহায্য করে প্রণালিতে বিদেশি জাহাজ চলাচলের ওপর বাধা প্রয়োগে তুরস্ককে চাপ দিতে। ফলে অ্যানভার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে। রাজধানীতে হাজার হাজার জার্মান চলে আসে। জামান ও অস্ট্রীয় রাষ্ট্রদূত তুরস্ককে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে ত্রি-আঁতাততের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। ১১ অক্টোবর জার্মানির সশস্ত্র আক্রমণে রাজি হয়ে যায় তালাত ও অ্যানভার। প্রাক্তন জার্মান জাহাজ গোয়েবেন ও ব্রেসলাও অ্যাডমিরাল শোচনের নেতৃত্বে কৃষ্ণসাগরে ভেসে বেড়াতে থাকে রাশিয়াকে উসকানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

অবশেষে ২৮ অক্টোবর জার্মান অ্যাডমিরাল শক্তিশালী তুর্কি স্কোয়াড্রন নিয়ে কৃষ্ণসাগরে ভেসে পড়ে। অ্যানভার নিজের মন্ত্রিপরিষদীয় সহকর্মীদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিল এ নির্দেশের কথা "শক্তির প্রদর্শন করেই তুর্কি বাহিনীকে কৃষ্ণসাগর অধিকার করতে হবে। কোনো যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই রাশিয়ার জাহাজ বহর যেখানেই খুঁজে পাও, ধ্বংস করে দাও।" কোনো ঘোষণা ছাড়াই রাশিয়ার বন্দর ওডেসা, সেবাস্তোপোল, নোভোরোসিকে বোমা বর্ষণ করা হয় আর পথিমধ্যে বেশ কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়। নভেম্বর ৫ তারিখে ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স একযোগে অটোমান সাম্রাজ্যের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করে।

অসম্ভব ধ্বংসকারী একটি ফলাফল এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না। পূর্ব সময় হলে হয়তো ব্রিটেন তুরস্কের ওপর প্রভাব খাটিয়ে কূটনীতির মাধ্যমে নিরপেক্ষতা আদায় করে নিতে পারত। যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে, এ নীতি তুরস্কের নিজের স্বার্থের পাশাপাশি মিত্রদের স্বার্থও রক্ষা করত। বলকান যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তুরস্কের প্রয়োজন ছিল শান্তি বজায় রেখে সামরিক শক্তি গড়ে তোলা। মিত্র সামরিক শক্তি গড়ে তোলা। মিত্র ও কেন্দ্রীয় শক্তির মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখে ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া যে আক্রমণে জড়িয়ে পড়া উচিত বা অনুচিত হবে নাকি। আর যদি হয়ও তাহলে কোন পক্ষে যাবে তুর্কিরা মুস্তফা কামাল মধ্য জুলাইয়ে অ্যানভারকে এসময় যুক্তি বুঝিয়ে দেয়; মুলতফা বুলগেরিয়াতে সামরিক প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছিল। মুস্তাফা সবসময় জার্মানি'র মিত্রতা গড়ে তুলতে বাধা প্রদান করত, কেননা যদি জার্মানি যুদ্ধে জয় লাভ করে তাহলে তুরস্ক হবে তার উপগ্রহ; আর যদি পরাজিত হয় মুস্তাফা বিশ্বাস করত যে জার্মানি পরাজিত হবে—তুরস্ক সবকিছু হারিয়ে ফেলবে। একতাবাদী অন্যান্য উচ্চপদস্থরাও এমনটাই মনে করত। কিন্তু তুর্কিদের মনোভাব বদল করে ফেলে অ্যানভার আর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতও এতে আমল দেয়নি।

সাম্প্রতিক পরাজয়ে অহংকারী তুরস্ক নিপীড়িত বোধ করে, নতুন এবং পুরাতন শত্রু সম্পর্কে সন্দেহ সবকিছু মিলিয়ে তুরস্ক মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে ভয় পেত। বিশ্বাস করে বসে যে নিরপেক্ষ থাকলে ঘটনাক্রমে তার ভূখণ্ড বৃহৎ শক্তিবর্গ ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে।

এ ধরনের বাতাবরণে অ্যানভার পাশা বাজির দর কষে বসে। এ ঘোষণার কথা শুনে জাভিদ বে তরুণ তুর্কি সরকার থেকে পদত্যাগ করে। নিঃসঙ্কোচে উচ্চারণ করে, "যদি আমরা জয় লাভ করিও, এটি হবে আমাদের ধ্বংস।"

বস্তুত এখানেই লুকিয়ে ছিল ছয় শতাব্দী ধরে বেঁচে থাকা অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ পরিণতি। অটোমানদের জন্য যুদ্ধ হয় খারাপ ভাবে। প্রথমত ১৯১৪ সালে অধৈর্য অ্যানভার পাশা ককেশাস অঞ্চলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শীতকালীন অভিযানে প্রায় পুরো একটি তুর্কি সেনাবাহিনী হারিয়ে ফেলে। এরপর জামাল পাশা সিরিয়ার গভর্নর পানিহীন সিনাই মরুভূমি হয়ে সুয়েজ খালে অভিযাত্রী বাহিনী পাঠায়। নদীতীরে ব্রিটিশ সৈন্যদের বাধার মুখে মরুভূমি পার হয়ে ভীরসেবাতে সেনাবাহিনী হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসতে বাধ্য হয় তারা।

১৯১৫-এর প্রথম দিকে রাশিয়ার গোলাবারুদের মজুদ কমে যায়। আবার বসফরাসের ওপর তুর্কি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভূমধ্যসাগর দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ধ্বংস হয়। তাই গ্র্যান্ড ডিউক নিকোলাসের মাধ্যমে ব্রিটেনের কাছে

সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। এতে উইনস্টন চার্চিলের দার্দেনালেস আক্রমণ করার পূর্বপরিকল্পনা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। রাশিয়ার সামরিক শক্তি অটুট রাখার জন্য প্রস্তাব দেয়া হয় প্রণালি হয়ে মারমারা সাগরে ও ইস্তাম্বুল পর্যন্ত প্যাসেজ তৈরির। চার্চিল পুরোপুরি নৌ অভিযানের পরিকল্পনা করে। স্থলবাহিনীকে সংরক্ষিত রাখা হবে। এই আক্রমণের সম্ভাবনায় তুর্কিদের মাঝে ত্রাস সঞ্চার হয়। ব্রিটিশ নৌ-শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবশত ককেশাস ও সুয়েজের পর তৃতীয় আরেকটি পরাজয়ের ভয় পেতে শুরু করে তুর্কিরা।

কিন্তু কর্মচারীরা একমত না হওয়ায় ও লর্ড কিচেনারের বদৌলতে নৌ অভিযান, সামরিক দিকে পরিবর্তিত হয় ও গালিপল্লী দ্বীপপুঞ্জের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সকলে। ১৯১৫-এর শেষ দিকে চরম মূল্য দিয়ে ব্রিটিশরা এ অঞ্চল ত্যাগ করে ও তুর্কি বাহিনী জয়লাভ করে। মুস্তাফা কামালের দক্ষ নেতৃত্বের ফলেই এই অভাবনীয় জয় পায় তুর্কিরা। অটোমান সাম্রাজের অতীতের সুদক্ষ কমান্ডারদের সাথেই কেবল তার তুলনা করা চলে।

গালিপল্লীতে ব্রিটিশদের পরাজয়ের ফলে তরুণ তুর্কিদের তিনজন শাসক নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। বিদেশি হস্তক্ষেপ না থাকায় আর্মেনীয় জাতিকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণ করে তারা। তুর্কিরা ককেশাস যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হওয়ায় এতটা নিষ্ঠুর পরিণতি বরণ করতে হয় আর্মেনীয়দেরী যা আবদুল হামিদকেও হার মানিয়েছে। এক মিলিয়ন আর্মেনীয়কে নির্বিচারে হত্যা করা হয় ও নির্বাসনে পাঠানো হয়। যাদের অর্ধেকেরও বেশি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১৯১৬ সালে ককেশাসে আত্মরক্ষায় নিয়োজিত হয় রাশিয়া। আনাতোলিয়াতে আক্রমণ করার জন্য আরজুয়ামে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে রাশিয়া। এছাড়াও ত্রেবিজন্ড ও কৃষ্ণসাগরে যোগাযোগ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পাঁয়তারা কষে রাশিয়া। এ অগ্রযাত্রা থেমে যায় ১৯১৭-এর মার্চে রাশিয়া বিপ্লব ঘটাতে। এর ফলে তুর্কিরা এশিয়াতে পরাজিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু রসদ একেবারে কমে যাওয়ায় ও দলে দলে সৈন্যরা পালিয়ে যাওয়ায় তুর্কি বাহিনী ও শক্তি হারিয়ে ফেলে।

বাগদাদ মিত্র বাহিনীর হাতে চলে যায়। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী তাইগ্রিস উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ইরাকের মাঝে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে আরবীয়রা হেজাজে বিদ্রোহ করে বসে। অটোমান শাসনের হাত থেকে আরবীয় স্বাধীনতা দাবি করে তারা। পুরো আরব ভূখণ্ডে এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধের ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলে।

১৯১৮-এর শরতে শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হয়। মিত্র বাহিনী জেরুজালেম দখল করে প্যালেষ্টাইন সীমান্তে জেনারেল অ্যালেনবির নেতৃত্বে সমাবেশ

আত্মরক্ষার মশাল জ্বালাতে যাবে—এটি ছিল পূর্ব নির্ধারিত। একজন আরবীয় ঐতিহাসিকের মতে, "বাতাসে কাটাগাছ উপড়ানোর মতো করে" সিরিয়া থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করতে। আবারো তুর্কি অভিযানের নায়ক হয়ে ওঠে মুস্তাফা কামাল। আলেপ্পোর ওপরে কৌশলগত পলায়নের পর অটোমান বাহিনীর দেখা পায় তুরস্কের মাটি পাহারা দিতে। এটি ছিল একটি প্রাকৃতিক যুদ্ধক্ষেত্র। তারা তখনা অপরাজেয় রয়ে গেছে; সংবাদ এসে পৌঁছায় যে ১৯১৮-এর ৩০ অক্টোবর ব্রিটেন ও তুরস্ক যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছে-এর ফলে মুস্তাফা কামাল হয় তুর্কিদের একমাত্র কমান্ডার যে কিনা জীবনে একবারও পরাজিত হয়নি।

তার পেছনে ছিল তুর্কি জাতির আনাতোলীয় বাসভূমি, যেখানে তার এবং তার জনগণের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে।

তরুণ তুর্কিদের তিনজন শাসক পালিয়ে বিদেশে চলে যায় ও নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুবরণ করে। মিত্রবাহিনী ইস্তাম্বুল দখল করে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করে। অটোমান সাম্রাজ্যকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হয়। এর আনাতোলীয় ভূখণ্ড ফ্রান্স, ইটাল, গ্রিস ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়।

আনাতোলিয়াতে দেশের অধিকারের জন্য লড়াই করতে মুস্তাফা কামালকে দাপ্তরিক পদে নিয়োগ দেয় হয়। এখানে দুজন তুর্কি সেনাবাহিনীর কমান্ডারের সমর্থনে জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে ও শর্তের ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালায়। তিন বছরের মাঝে সুলতানের বাহিনীর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ ও স্বাধীনতাযুদ্ধে গ্রিকদের তাড়িয়ে দিয়ে বিদেশি দখলদারত্ব থেকে তুর্কি ভূখণ্ড মুক্ত করে মুস্তাফা কামাল। অ্যাঙ্গোরাতে নিজস্ব জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা করে কামাল। সবশেষে লূসানেতে নতুন শান্তি সম্মেলনে মিত্রবাহিনীর কাছ থেকে তুরস্কের জন্য নতুন সীমানা লাভ করে মুস্তাফা কামাল। এর ফলে আনাতোলিয়া ভূখণ্ড অক্ষত রয়ে যায় ও আড্রিয়ানোপলসহ ইউরোপে এক ফালি তুরস্ক সৃষ্টি হয়।

সালতানাত বিলোপ করেও শেষ সুলতান ষষ্ঠ মাহমুদকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে মুস্তাফা কামাল ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তুর্কি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য হিসেবে ধ্বংস হয়ে এখন একটি জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে টিকে যায়।

এভাবে শুরু হয় একটি নতুন অধ্যায়। পুরোনোকে বিদায় জানিয়ে তুর্কি জাতি নতুন পথচলা শুরু করে।

উপসংহার

ইতিহাসের মহান শক্তিগুলোর একটি হলো তুর্কি। মধ্যপ্রাচ্যের চারটি সাম্রাজ্য পারস্য, রোমান, আরবীয় ও তুর্কিদের মাঝে তুর্কি সাম্রাজ্য ছিল সর্বশেষ ও সবচেয়ে শক্তিশালী। এ রকম বিস্তৃত একটি অঞ্চলের যেখানে সাগর এসে সাগরে মিশেছে আর এক মহাদেশ এসে আরেক মহাদেশে বিলীন হয়ে গেছে—ওপর দীর্ঘকাল যাবৎ একতা বজায় রাখে তুর্কি সাম্রাজ্য। পূর্ব থেকে জীবনী শক্তি বহন করা তুর্কি'রা ইতিহাসে দুই ধরনের অবদান রেখেছে। প্রথমত, প্রথম দিককার সফল সুলতানদের মাধ্যমে এশীয় ভূখণ্ডে ইসলাম পুনর্জীবন লাভ করেছে ও একত্রিত হয়েছে; এরপর অটোমান রাজবংশের মাধ্যমে পূর্ব এবং পশ্চিমের মেলবন্ধন ঘটে। এশিয়াতে আরব সাম্রাজ্য ও ইউরোপে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মাঝখানে নতুন ও সৃষ্টিশীল অটোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে।

অটোমান সাম্রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, এটি মূলত একটি তুর্কি রাষ্ট্র; এটি একটি তুর্কি রাজবংশের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল; ভাষা তুর্কি; এর শিকড় নিহিত তুর্কিস্তানের গোত্রীয় সমাজে। পৃথক প্রথা ও জাতি চিহ্ন রয়েছে তাদের। কর্তৃত্বপরায়ণতার প্রাকৃতিক চেতনা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বোধ, সরকার গঠনের দক্ষতা প্রভৃতি সব কিছুই তুর্কিদেরকে একটি যাযাবর সম্প্রদায় হিসেবে পৃথক করেছে।

কিন্তু এটি একটি ইসলামিক রাষ্ট্র ছিল। জাতিগত বিভেদ নয়; কিন্তু মুসলিমদের মাঝে সাম্প্রদায়িক চেতনা ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের ভাব ছিল।

কিন্তু সমস্ত তুর্কি সৌহার্দ্য ও মুসলিম গঠন ব্যতিরেকে অটোমান রাষ্ট্র মোটের ওপরে একটি সার্বজনীন সাম্রাজ্য ছিল। এর সুবিস্তৃত শাসনামল একই সাথে আলিঙ্গন করেছিল শহর, সমভূমি, নদী-উপত্যকা, পর্বতমালা ও মরুভূমি, অসংখ্য জাতি, সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায় সহ বৈচিত্র্যময় রাজ্য। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল ক্যাথলিক ও অর্থডক্সদের মাঝে ধর্মীয় বিরোধ, ল্যাটিন ও গ্রিক, পোপ ও সম্রাট প্রভৃতি কর্মকে পরস্পর বিরোধিতার

কারণে। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর অটোমান বিজয়ী বীর নিজের ভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কৃতি সত্ত্বেও অর্থডক্স খ্রিস্টানদের মাঝে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। শুধু এর প্রভু নয় সক্রিয় নিরাপত্তারক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় অটোমান সুলতান। ফলে "ল্যাটিন পোপের দাসত্বের" চেয়ে মুসলিম সম্রাটের শাসন অধিকতর প্রিয় হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক পৃথক নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। সকলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাঝে স্বাধীন ছিল নিজ নিজ বিষয় পরিচালনার জন্য। তাদের নিজস্ব পরিচয়ও সংরক্ষিত হয়েছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে।

এখানে অটোমান আক্রমণকারীর বদৌলতে অর্থডক্স খ্রিস্টানেরা তাদের বহুল প্রতীক্ষিত শৃঙ্খলা ফিরে পায়। বাইজেন্টাইন সম্রাটের তুলনায় অটোমান সম্রাটের অধীনে গ্রিক যাজক প্রধান সার্বজনীনভাবে ধর্মীয় কর্তৃত্ব লাভ করে। এভাবে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মাঝে এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা নীতিগতভাবে অটোমান ও রোমান সাম্রাজ্যের মাঝে সাদৃশ্য গড়ে তোলে। পূর্বে রোমানরাও নিজেদের সীমান্তের মাঝে বিদেশিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলত; প্রায়ই তাকে রোমান নাগরিকত্ব দিয়ে নিজের এবং সাম্রাজ্যের উন্নতিতে দক্ষতা কাজে লাগানোতে উৎসাহ প্রদান করত।

এই ঐতিহ্যও যা ইসলামেও ছড়িয়ে আছে, ওসমান পরিবার তার বাস্তবায়ন করে। ওসমানের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে বহুজাতিক যেখানকার বৈচিত্র্যময় মানুষ তুর্কি বা মুসলিম, খ্রিস্টান অথবা ইহুদি যাই হোক কেন সকলে মিলে একত্রে অটোমান হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ও জাতিগত প্রশ্ন যেখানে এক হয়ে মিশে গেছে। এই সময়ে একমাত্র এই সাম্রাজ্যই কেবল এই তিন একেশ্বরবাদী বিশ্বাসকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল।

জয় করে নেওয়া খ্রিস্টান জনগণের জন্য সুলতানের গৃহকর্মের ওপর নির্ভরশীল একটি নাগরিক সেবা প্রদানের একক প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে দখল করে নেয়া, নিয়োগ দান, বাজারে ক্রয় করা, সুলতানকে উপহার হিসেবে দেয়া অথবা স্বেচ্ছায় সুলতানের সেবায় নিয়োজিত এসব খ্রিস্টান ইসলামে ধর্মান্তরিত হতো। কৌর্মায, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন আর সমস্ত সম্পত্তি আত্মত্যাগ করে জীবন-যাপন করত তারা। এর পুরস্কারস্বরূপ বালক ভৃত্যদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ বিদ্যালয়ে স্পার্টার কায়দায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করত এ সমস্ত খ্রিস্টান। এভাবে পরবর্তীতে নিজের মেধা কাজে লাগানোর জন্য সরকারি কর্মে নিযুক্ত হতো তারা। এর মাধ্যমে কার্যত বিজিতদের মাধ্যমেই বিজয়ী শাসন পরিচালনা করতেন। পশ্চিমের দৃষ্টিতে এ ধরনের দাসত্ব বিজাতীয় হলেও এর মাধ্যমে সুলতান নিজের তরুণ খ্রিস্টান প্রজাদের গুণাবলি ও দক্ষতা সাম্রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লাগাতে শুরু করেন। এমনকি ভৃত্যরা নিজেরাও

এতে উপকৃত হতে থাকে। কেননা নিজেদের এহেন পদমর্যাদা যা থেকে মুসলিম বংশোদ্ভূতরা বঞ্চিত হয়েছে, তা খ্রিস্টানদের মূল্যবান করে তোলে। নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও সুলতানের "পরিবারের" সদস্য হয়ে শুধু মেধার ওপর নির্ভরশীল একটি শাসক শ্রেণী গড়ে তোলে তারা।

সাম্রাজ্যের প্রথম শতক জুড়ে ক্ষমতা আহরণ ও অটোমান রাজবংশ'কে স্থিরতা প্রদানে সহায়তা করত এক শ্রেণীর অভিজাতরা। মোটের ওপর সুলতানেরা নিজেরাই হারেমে পালিত নারীদের মাধ্যমেও বংশবিস্তার করে চলেন। এর ফলে ভালো অথবা মন্দ যাই হোক না কেন অটোমান রাজবংশের শিরায় প্রবাহিত হতে থাকে মিশ্র রক্ত।

প্রথম দিকে অটোমান ভৃত্য বাহিনী সামরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। জানিসারিসে তরুণ খ্রিস্টানদের নিয়োগ করা হতো। শারীরিক গুণাবলির প্রেক্ষিতে তাদেরকে প্রশিক্ষিত ও নিয়ম-শৃঙ্খলিত করে তোলা হতো, সুলতানকে সেবা প্রদানের জন্য। প্রথম দিকে দেহরক্ষী এরপর সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে পদাতিক সৈন্যদলে পরিণত হয়ে অটোমান সেনাবাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে যুদ্ধ ক্ষেত্রে। এর সাথে যুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আরো গড়ে ওঠে মুসলিম-বংশোদ্ভূত নিয়ে অশ্বারোহী দল-সিপাহি, জমি থেকে সামন্তপ্রথার ভিত্তিতে এরা নিয়োজিত হতো। এর সম্পূর্ণতা প্রদান করত গোলন্দাজ বাহিনী, যারা গান-পাউডার ব্যবহার করত পূর্বে এটি এর আগে অপ্রচলিত ছিল। এছাড়াও যুদ্ধের সময় অনিয়মিত বাহিনী সংগ্রহ করা হতো। একত্রে মিলিত হয়ে এসব বাহিনী অটোমান সেনাবাহিনী আধুনিক করে তুলেছিল। ফলে সু-প্রশিক্ষিত, সশস্ত্র, সুশৃঙ্খল এবং কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলা এ বাহিনী একতাবদ্ধতা, অস্ত্রশক্তি আর একগুয়ে যুদ্ধ চেতনার জন্য এ সময়কার ইউরোপীয় বাহিনীর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অসাধারণ ছিল।

সর্বদা সামরিক ক্ষমতাসমৃদ্ধ একজন সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বাহিনীকে নেতৃত্ব ও উৎসাহ প্রদান করতেন। ফলে আড়াই শতকজুড়ে এর জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। দুটি সীমান্ত ও তিন মহাদেশে বিস্তৃত সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, যা পূর্ব দিকে এশিয়া হয়ে পারস্য উপসাগর, মিশর ও লোহিত সাগরের মাঝ দিয়ে আফ্রিকা ও পশ্চিমে বলকান ও দানিয়ুব পার হয়ে বেশির ভাগ পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে শুধু মধ্য ইউরোপে গিয়ে থেমে যায়। সমুদ্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আফ্রিকা উপকূলের বিশাল অংশে নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে ভারতীয় মহাসাগর ও আটলান্টিকের সাথেও যুক্ত হয়েছিল এ সাম্রাজ্য।

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পূর্ব-এর প্রতিষ্ঠানসমূহসহ পশ্চিমের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ অংশে সত্যিকারের প্রভাব

ফেলে অটোমান সাম্রাজ্য। পারসীয়রা আর আরবীয়রা তাদের পূর্বে ব্যর্থ হলেও অটোমানরা এক্ষেত্রে বিজয়ী হয়। নিজেদের সময়ে বিশ্বের মাঝে একটি মহান সাম্রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সামরিক দক্ষতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার গুণাবলির মাধ্যমে। রেনেসাঁ যুগের ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়ে কূটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে শ্রদ্ধা ও মূল্য আদায় করে নেয় অটোমান সাম্রাজ্য। এ রকমটাই ছিল ওসমানের সাম্রাজ্য; যেটি সুলেমানের অধীনে আইন প্রণেতা ও জমকালো সুলতান ক্ষমতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে যায়।

কিন্তু খুব দ্রুতই আবার তা হারিয়ে যায়। এর পর পঁচিশ জন সুলতান ক্ষমতায় এলেও সুলেমানের অনুসারী হতে পারেননি কেউ। এদের মাধ্যমে অটোমান সাম্রাজ্য বিভিন্ন ধরনের ভাগ্যবরণ করে ও সাড়ে তিন শতক পর্যন্ত কোনোক্রমে টিকে থাকে। অতীতে সুলতানেরা একক ক্ষমতা বলে শাসন পরিচালনা করতেন। কিন্তু সুলতানদের মাঝে এক ধরনের ঘাটতি ছিল। কেননা হারেমের প্ররোচনায় অনেক সময়ই সুলতানারা ক্ষমতার পেছনে কলকাঠি নাড়ত। শেষ দিকের সুলতানেরা তাই দক্ষতা হারিয়ে ফেলতে থাকে।

শেষ দিকে কোনো সুলতান প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে শাসনের পূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করতেন না। কোনো সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করতেন না। খুব কমই সেরাগলিও থেকে বের হতেন আর তাঁর উত্তরাধিকারেরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত হতো। এরা খাঁচাসুলভ জীবনযাত্রা তাদেরকে শাসন কাজের অনুপযুক্ত করে তুলত। এই দুর্বলতা কাকতালীয়ভাবে সামরিক শক্তির পালাবদলের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে।

অটোমান সেনাবাহিনী নিজেদের জাদুসুলভ যুদ্ধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আর দুই সীমান্তে হয়তো শত্রুকে পরাজিত করতে পারত, কিন্তু অধীনে আনতে ব্যর্থ হতো। তিন শতাব্দী পরে সামরিক প্রবাহ আরো একবার পূর্বের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। এটি পশ্চিমের সুবিধা আনয়ন করে দেয়। শিল্প, অর্থনৈতিক, কারিগরি দক্ষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিম এগিয়ে গেলে নেতৃত্ববিহীন ও কনজারভেটিভ পূর্ব তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়।

এছাড়াও অটোমান সাম্রাজ্য সামরিক ও নৌবাহিনীর পেছনে অত্যধিক খরচ করে ফেলায় সুলেমানের মৃত্যুর পর অর্থনৈতিক সংকটের মাঝে পতিত হয়। এর প্রভাব পড়ে পুরো ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বে। আটলান্টিকজুড়ে স্প্যানিশ-আমেরিকান সোনার বাটের সমাগম ঘটে। ফলে অটোমানীয় রুপার মুদ্রার দাম কমে যায় আর মুদ্রাস্ফিতী দেখা দেয়। কয়েন জাল হতে শুরু করে, করের মাত্রা বেড়ে যায়।

পূর্ব শতকগুলোর তুলনায় সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ও বিজয় অভিযান কমে যাওয়ায় বসতি স্থাপনের জন্য জমির অভাব দেখা দেয়। এছাড়া বেকারত্বও বেড়ে যায় বহুগুণে। এর মাধ্যমে শুধু জমিবিহীন কৃষকদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি, সেনাবাহিনীর অনিয়মিত অংশও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। শান্তির সময়ে বেতন ভাতা না পাওয়ায় এদের অধিকাংশ ডাকাত দলে যুক্ত হয়ে পড়ে। এর প্রভাব পড়ে সিপাহিদের ওপরে'ও। আধুনিক যুদ্ধের প্রয়োজনে কারিগরি উন্নয়ন ঘটতে থাকায় ও সশস্ত্র পদাতিক বাহিনীর চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে অশ্বারোহী বাহিনী গুরুত্ব হারাতে থাকে। জমি হারিয়ে এসব সিপাহি অন্যান্য জমিবিহীন দুষ্কৃতিকারীদের সাথে একত্রিত হয়ে আনাতোলিয়াতে গোত্রপ্রধানদের সাহচর্যে বিদ্রোহ জড়িয়ে পড়ে।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অভাবে বেশির ভাগ কৃষক ভেসে যায় আর বিপুল পরিমাণ জমি অপচয় হতে থাকে। এর ফলে সূচনা হয় নতুন ধরনের জমিদার শ্রেণীর। প্রায়ই এসব জমিদার শহরবাসী হতো বেশি। ফলে ঐতিহ্যবাহী জমি বণ্টনের অটোমান প্রক্রিয়া আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে সরে ধীরে ধীরে জমিদার শ্রেণীর হাতে যাওয়া শুরু করে। ফলে স্থানীয় শক্তি যেমন উপত্যকার প্রভু বা পর্বতের গোত্র-প্রধানদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। সুলেমান-পরবর্তী সুলেতানেরা এ ক্ষমতা হটানোর জন্য কিছু করতে ব্যর্থ হন।

এর প্রধান প্রভাব পড়ে শাসন প্রতিষ্ঠানের ওপর। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সাম্রাজ্যের পরিধি ও জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সুলতানের গৃহকর্মে মুসলিম বংশোদ্ভূত প্রজারা নিয়োগ অধিকার বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে, রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত শিষ্য ও বিশ্বাসের রক্ষার্থে যোদ্ধা হিসেবে তারাও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারের জন্য দাবি করা শুরু করে। সুলতানের গৃহকর্মে নিয়োগ পাওয়ার মাধ্যমে সরকারের ব্যবসায়ের যোগ্যতা অর্জনের অধিকারের দাবি জানাতে শুরু করে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল সুলতানেরা বাধ্য হয় চাপের মুখে মুসলিমদের জন্য দাপ্তরিক পদ সৃষ্টি করতে। এছাড়াও মৃত্যুর পর পুত্র, পিতার শূন্য পদ দখল করার অধিকারও লাভ করে। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে কমে গিয়ে একেবারে শেষ হয়ে যায় গৃহদাস বৃত্তি। ঘটনা পরম্পরায় প্রশাসন পরিণত হয় অদক্ষ আমলাতন্ত্রে, মেতে ওঠে ষড়যন্ত্রে ও দুর্নীতিতে এবং এর নেতিবাচক, নিজস্ব স্বার্থের সীমাবদ্ধতায় হয়ে ওঠে এতটাই কঠিন যেমনটা পূর্বে ইতিবাচক ও নিঃস্বার্থ শাসনামল গড়ে উঠেছিল।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় জানিসারিসদের বিলুপ্তি। এখানে একই ভাবে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিবাহ করার স্বাধীনতা ও

পুত্রদের নিয়োগের সুবিধা দেয়া হয়। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে এ সৈন্যবাহিনী বারো হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শত হাজারের ওপরে পৌঁছে যায়। এদের অনেকেই বাণিজ্য ও সাধারণ নাগরিকদের ন্যায় শিল্পদ্রব্য পণ্য তৈরি প্রভৃতির মাধ্যমে জীবীকা নির্বাহ করতে থাকে।

এর ফলে তাদের মূল ক্ষমতা হ্রাস পায়, তা হলো যুদ্ধক্ষেত্রে দলীয় সৌহার্দ্য ও শৃঙ্খলার চেতনা হারিয়ে যায়। শান্তিকালীন সময়ে যা ক্রমই বাড়তে থাকে—এরা রাষ্ট্রের মাঝে বিদ্রোহ ঘটাতে শুরু করে; কেন্দ্রীয় সরকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হতো। এর পাশাপাশি খ্রিস্টান কৃষক সমাজের জন্যও হুমকি হয়ে উঠতে থাকে এরা। যাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল এদের দায়িত্ব, তাদের লুটপাটে ব্যাপৃত হয় তারা। পরবর্তী দুই শতকজুড়ে এরা আরো বেশি অবাধ্য হয়ে ওঠে। ফলে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাধাগ্রস্ত হওয়ার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ঐক্য ও শৃঙ্খলা কমে যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশজুড়ে যখন ইউরোপ যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল অটোমান সাম্রাজ্য কোপরুলু পরিবারের হাত ধরে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা চালায়। প্রধান উজিরদের “রাজবংশ” আলবেনিয়া বংশোদ্ভূত এ কোপরুলুদের মাধ্যমে তিনজন সুলতান সফলভাবে ক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। এর মাধ্যমে রাজকোষের দুর্নীতি ও অন্যায় দমন হওয়ার পাশাপাশি সক্ষমতা ফিরে আসে। আনাতোলিয়া ও অন্যান্য জায়গার বিদ্রোহ দমন হয় এবং সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের কাজেও খানিকটা সফলতা আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাপরুলুদের শাসনকালও নিয়মিত হতে পারেনি। একক ক্ষমতাবান প্রধান উজির, সমান দায়িত্বশীল সুলতান আমলাদের সাথে নিয়ে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করতে থাকেন।

ইউরোপের দৃষ্টিতে সপ্তদশ শতকের শষ দিকে অটোমান সেনাবাহিনীর সম্মান অনেকটাই ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। ভিয়েনা অবরোধে দ্বিতীয়বার পরাজিত হয়েও এর পরবর্তী ব্যর্থ অভিযান ছিল এর কারণ। অযোগ্য প্রধান উজির যে কিনা দায়িত্বহীন সুলতানের জামাতা ছিল, সুলতান সুলেমানকে হারিয়ে দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে এতটাই ব্যর্থ হয় যে অটোমান রাজবংশের স্মৃতির ললাটে কালিমা লেপন হয়ে যায়। জানিসারিসদের পতনের পর শত্রুর সামনে তার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, যেমনটা পশ্চিমা সৈন্যরা অতীতের ক্রুসেডের সময়ে করত। ইতিহাসের গতি পরিবর্তনে উল্লসিত হয়ে ওঠে ইউরোপ। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ মুসলিম তুর্কিদের মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে ওঠে। চিরকালের মতো শক্তিমানদের পতন ঘটে। এই পতনের মাধ্যমে শুরু হয় অটোমান সাম্রাজ্যের ভূখণ্ড হারানোর প্রক্রিয়া; যা ব্যর্থ অভিযান আর সুবিধাহীন চুক্তির মাধ্যমে চলতে থাকে বিংশ শতক পর্যন্ত।

অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য নতুন হুমকি দেখা দেয় পিটার দ্য গ্রেটের রাশিয়া। সাম্রাজ্যের প্রথম দিককার একক ক্ষমতাসম্পন্ন সুলতানদের ন্যায় জার নিজের দক্ষতায় ও একক প্রচেষ্টায় গড়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী; যার মাধ্যমে জার খানিকটা ব্যতীত প্রায় পুরো পৃথিবী দখল করার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু এই নতুন আগ্রাসী শক্তির উত্থানের ফলে বরঞ্চ অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের গতি থেমে যায়।

পূর্বে যেমন শক্তিশালী হিসেবে ইউরোপের মাঝে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখত অটোমান সাম্রাজ্য, এখন সেভাবে দুর্বলতার দরুন ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ও রাশিয়ার মাঝে ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জা'রের বিরুদ্ধে তাই সুলতানদের টিকে থাকা বাফার হিসেবে অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। যেমন অটোমানরা শক্তির ওপর নয় বরঞ্চ নির্ভর হতে শুরু করে আলোচনার টেবিলের ওপর। পশ্চিমা শক্তি নিজেদের স্বার্থরক্ষায় অটোমানদের সমর্থন করা শুরু করে একদা যুদ্ধের মতো কূটনীতির ক্ষেত্রেও তাই অটোমানদের গুরুত্ব বেড়ে যায়।

ঐতিহ্যগতভাবে বিদেশিদের কাছ থেকে দূরে থাকা অটোমান প্রশাসন বাধ্য হয় বৈদেশিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে। মুসলিম অথবা খ্রিস্টান খুব অল্পসংখ্যক তুর্কিই এ সময়ে কোনো ইউরোপীয়ান ভাষা জানত বা বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল। তাই সুলতান বাধ্য হয় এ কাজে গ্রিক খ্রিস্টান প্রজা বিশেষ করে ফানারিয়তদের নিয়োগ দিতে। শুধু এদেরই ব্যবসা ও নৌ কাজের দরুন পশ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। তাই এর সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল গ্রিক খ্রিস্টানরা। এখন এদের মাঝে যোগ্যতরদের নিয়ে সুলতান রাষ্ট্রের কাজে নিয়োগ দান করেন। এরা সরকার পরিচালনায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

এদের মাঝে প্রথম সারিতে ছিল দোভাষীরা। পোর্তের মাঝে কার্যত এরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করত। অন্যান্য গ্রিক খ্রিস্টানেরা হয়ে ওঠে রাষ্ট্রদূত কিংবা স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের গভর্নর। এছাড়াও প্রশাসনের অন্যান্য পদে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতি-ধর্ম ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের কাজে সকলের অংশগ্রহণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে অটোমান সাম্রাজ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারের মতো অবমাননাকর পরাজয় বরণ করে। এইবার রাশিয়ার সাথে দীর্ঘকালীন যুদ্ধে লিপ্ত হয় অটোমান বাহিনী। নিজের জাহাজ বহর নিয়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে গ্রিস ও বৈরুতে পৌঁছানোর জন্য। এরপর নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করে আর তুরস্ক রাশিয়া ও ব্রিটেনের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলে এই সমৃদ্ধ প্রদেশ থেকে নেপোলিয়নকে বিতাড়িত করতে। এরই মাঝে পোর্তের

ওপর ইউরোপীয় প্রভাব হয়ে ওঠে সক্রিয় ও প্রধান। প্রথমত এটি সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া রোধ করে; এর প্রভাবে অটোমান সাম্রাজ্য বাধ্য হয় সংস্কার কাজ শুরু করতে ও নিজের খ্রিস্টান প্রজাদের অবস্থার উন্নতি করতে।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দী হয়ে ওঠে সংস্কার যুগ। প্রথমত সংস্কারক সুলতান ছিলেন তৃতীয় সেলিম। ফরাসি বিপ্লব ও এর পরবর্তী সামরিক উদাহরণ ছিল তাঁর সামনে। পশ্চিমা কায়দায় ও পশ্চিমা অফিসারদের মাধ্যমে অটোমান সেনাবাহিনীর নতুন মডেল গড়ে তোলেন তিনি। কিন্তু জানিসারিসরা নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধারে পদদ্যুত করে সুলতানকে। এর ঠিক বিশ বছর পর নিষ্ঠুর পদক্ষেপের মাধ্যমে জানিসারিসরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় সুলতান তৃতীয় সেলিমের যৌগ্য উত্তরসূরি সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের মাধ্যমে। আধুনিক অটোমান ইতিহাসে মহান সংস্কারক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন তিনি।

তাঁর এবং তাঁর সহকারী সংস্কারকদের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বলবৎ করা; প্রশাসন এবং নিরপেক্ষ আইনের জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সবশেষে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণে সুলতানের সকল প্রজার জন্য যৌক্তিক ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা। এর ফসল হলো মহান সনদ তানজিমাত। ঊনবিংশ শতকজুড়ে আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ক্ষেত্রে তানজিমাত মডেল হিসেবে কাজ করে।

এর উদ্দেশ্য ছিল মাত্র অর্ধ-শতকের কিছু বেশি সময়ের মাঝে পাঁচ শতক বয়স্ক মধ্যযুগীয় অটোমান রাষ্ট্রকে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। সংবিধাননির্ভর পশ্চিমা নীতি ছিল এর ভিত্তি। কিন্তু উলেমা ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলের চাপে মৃত্যুবরণ করে সুলতানের শুভ ইচ্ছা।

কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরে প্রশাসন ও বিচার বিভাগ, বিভিন্ন প্রাদেশিক সংস্কার, অ-মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৮৪০ এর দশকে স্বল্প সময়ের জন্য সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর আবার স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসে সুলতান আবদুল হালিমের কল্যাণে। এতদসত্ত্বেও এই স্বৈরশাসক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে প্রভুত অবদান রাখেন। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নতুন চিন্তাধারা ও সামাজিক ভাবের উদয় হয়। মর্মান্তিক সত্য এই যে এতে সুলতান নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই তৈরি করেন। পরবর্তী প্রজন্ম তরুণ তুর্কি নামে সুলতানকে উৎখাত করে।

ইতিমধ্যে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের কল্যাণে সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। এ ধারণা রাজবংশভিত্তিক বহুজাতিক সাম্রাজ্যের কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিল। গ্রিক স্বাধীনতাযুদ্ধের পর এই গতি আরো বেগবান হয়ে ওঠে। মুক্তির উদ্দেশ্যে পশ্চিমা উৎসাহে ও নিজের স্বার্থ রক্ষায় রাশিয়ার প্ররোচনায়

বিংশ শতকের শুরুতে বলকান যুদ্ধের মাধ্যমে অটোমান প্রদেশসমূহ স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কার্যত ইউরোপের পুরো তুরস্ক অংশটুকুই মুছে যায়। এরপরেও অটোমানরা বার্লিন কংগ্রেসে পশ্চিমা শক্তিবর্গের সমর্থন পেলেও—রাশিয়ার বিনিময়ে—ইউরোপের অসুস্থ ব্যক্তি হিসেবে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। জার্মানির সাথে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে মৈত্রী গড়ে তুলে সাম্রাজ্যের পতন নিশ্চিত করে অটোমানরা।

কিন্তু তুরস্ক, সাম্রাজ্য হিসেবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে জাতি হিসেবে টিকে যায়। মধ্যপ্রাচ্যের সকল জাতীয়তাবাদী নেতাদের মাঝে সবচেয়ে মহান হলেন কামাল আতাতুর্ক। নিজের তরুণ বয়স থেকেই সমসাময়িক তরুণ তুর্কিদের বদৌলতে বাস্তবিক অর্থেই বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়ে আসছে আর জাতি রাষ্ট্রের দিন এগিয়ে আসছে। সহতুর্কিরাও আরো একবার তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে রাজি হয়। ফলে পূর্বপুরুষের মাটিতে অটোমান সাম্রাজ্যের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে ওঠে প্রজাতন্ত্র। এশিয়া মাইনরের একটি অঞ্চল দখল করে আজকের তুরস্ক নিজেকে শেষ মধ্যপ্রাচ্য সাম্রাজ্যের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছে।

এর আধুনিক শাসকেরা সংস্কার যুগের ফসল। পেশাদার ও সামরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এদের উন্মেষ ঘটেছে। তুর্কি রাষ্ট্রের মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের যৌথ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের এহেন অশান্ত অঞ্চলেও স্থিরতা ও ভারসাম্য বজায় রাখার উপাদান রয়েছে তুরস্কের মাঝে। নতুন তুর্কি-পিতা কামাল আতার্তুক তাই গাজী উপাধি পাওয়ার যোগ্য। পূর্বতন ও পবিত্রতম যোদ্ধা সুলতান ওসমানের যোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি।

লর্ড কিনরস স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী জন প্যাট্রিক ডগলাস বালফোর পারিবারিক উপাধির কারণে পরিচিত তৃতীয় ব্যারন কিনরস নামে। স্কটিশ রাজনীতিবিদ ও আইনবিশারদ জন বালফোরের পৌত্র তৃতীয় ব্যারন কিনরস ছিলেন একজন সুলেখক, সাংবাদিক ও কূটনীতিবিদ। লেখক হিসাবে তিনি লর্ড কিনরস (Lord kinross) নামেই সমাধিক পরিচিত।

২৫ জুন ১৯০৪ সালে স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষিত ব্যারন প্রথম জীবনে মৌলিক লেখালেখির কারণে বিখ্যাত হওয়ার পরও পরবর্তীকালে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমির উপর লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত গ্রন্থ *Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire*। তুরস্ক ও অটোমান পটভূমি নিয়ে লেখা তার বিখ্যাত অপর দুটি গ্রন্থ হচ্ছে *Ataturk: A Biography of Mustafa Kemal, Father of Modern Turkey* ও *Portrait of Egypt* ও *Hajia Sophia (Wonders of man)*

৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে তিনি মারা যান।

অনুবাদক

জেসি মেরী কুইয়া পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগ থেকে শেষ করেছেন স্নাতকোত্তর। মূলত বই পড়ার আনন্দ থেকেই লেখালেখি করার আগ্রহ। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থসমূহ– দ্য শারলোকিয়ান, দি অটোমান সেঞ্চুরিস্, দোজ ইন পেরিল। এছাড়াও ভবিষ্যতে মৌলিক রচনা লেখার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

jasy_1984@yahoo.com